বাদশাহী মসনদ

কৃশানু বন্দ্যোপাধ্যায়

মণ্ডল বুক হাউস

৭৮।১ মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রথম প্রকাশ
বৈশাখ ১৩৬৭ সাল

১৫।

প্রকাশক
শ্রীসুনীল মণ্ডল। ৭৮।১, মহাত্মা গান্ধী রোড, কলিকাতা-৯

প্রচ্ছদশিল্পী
শ্রীপ্রণব শূর।

ব্লক নির্মাতা
কমার্সিয়াল আর্ট সিণ্ডিকেট। কলিকাতা-৬

গ্রন্থক
তৈফুর আলী মিঞা এণ্ড ব্রাদার্স।

মুদ্রক
শ্রীযুগলকিশোর রায়
শ্রীসত্যনারায়ণ প্রেস। ৫২এ, কৈলাস বসু স্ট্রীট, কলিকাতা-৬।

উৎসর্গ

শ্রীযুক্তা চুয়া চক্রবর্তী

ও

ডক্টর অর্ধেন্দুশেখর চক্রবর্তীকে

আন্তরিকতার সঙ্গে—

লেখকের অন্যান্য বই।

তুরঙ্গম তুরঙ্গী
কিন্নর কিংশুক।
কুহেলী বিলীন।
অঙ্গণে রনাঙ্গণে।
মায়ারী ময়াল।
কালো চোখের তারা।
ঝিকিমিকি জোনাকি।
ছায়া ছায়া রাতে।
অভ্ররোদ শুভ্রবিতান।
আলোয় আলোয় পূর্ণিমা।
বন ময়ূরী মন ময়ূরী।
তপ্তরুধির মুক্ত কৃপাণ।

ধীরে ধীরে রাত্রি গভীর হচ্ছে।

মসিকৃষ্ণ অন্ধকারের দিকে তাকিয়ে অনুমান করা যায় না এখন রাত কয় প্রহর। নগরের অসংখ্য সুপ্তিমগ্ন মানুষ হয়তো স্বপ্নের জাল বুনে চলেছে। এই গভীর রাতে এছাড়া আর তো কোন করণীয় নেই। সমস্ত দিনের পরিশ্রমের পর এই নিদ্রার মূল্য যে অনেক।

নগর নিদ্রার কোলে ঢলে থাকলেও দুর্গের মধ্যেকার একটি প্রাণীও দুচোখের পাতা এক করতে পারেনি। গভীর ক্লান্তি চোখের পাতায় পাতায় নেমে আসছে কিন্তু ঘুমবার উপায় নেই।

শিয়রে শমন।

আজ নয়, গত কাল নয়, গত পক্ষকাল থেকে বিনিদ্র ও অক্লান্ত-ভাবে দুর্গ রক্ষার কাজে ব্যস্ত রয়েছে অসংখ্য সৈন্য। এখনও ইংরেজরা দুর্গ প্রাকারের বাইরে এসে দাঁড়ায়নি। তবে সংবাদ এসেছে বহু সহস্র দেশী সৈন্য ও গোরা পল্টন এগিয়ে আসছে।

মুঙ্গেরের দুর্গ সুদৃঢ়।

মোগল আমল থেকেই এই দুর্গের সুনাম চতুর্দিকে পরিব্যাপ্ত। আশঙ্কাকে তবু মন থেকে ঝেড়ে ফেলা যায় না। ইংরেজের কূটবুদ্ধি আর শক্তিশালী কামানকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখার মতো মূঢ়তা আর কিছুতেই নেই। তাদের শক্তিমত্তার অসংখ্য দৃষ্টান্ত বাংলা-বিহারের কোটি কোটি মানুষের চোখের উপর ভাসছে।

তাই এত সাজ সাজ—।

তাই এত সতর্কতা।

সিপাহীদের সারিবদ্ধ ছাউনির প্রায় আটশো গজ পশ্চিমে প্রাসাদ। আবছা আলোয় পরিষ্কার দেখা যায় না প্রাসাদকে। তবে এটুকু

বুঝতে পারা যায় চল্লিশ স্তম্ভ যুক্ত চেহেল্ সেতুন বা বর্ণাঢ্য জাফারগঞ্জ প্রাসাদের অনুকরণে এটি নির্মিত নয়। এর গঠনশৈলী সম্পূর্ণ আলাদা। শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শুজা যখন ভাগ্যের তাড়নায় তাড়িত হয়ে মুঙ্গেরের এই দুর্গে আশ্রয় গ্রহণ করেছিলেন, এই প্রাসাদটির নির্মাণ হয়েছিল তখন। তারপর কতকাল কেটে গেছে। কত উত্থান পতনের ইতিহাস রচিত হয়েছে। কালের সঙ্গে তাল রেখে চলতে না পেরে প্রাকৃতিক বিপর্যয়ে লাঞ্ছিত এই প্রাসাদ শ্রীহীন হয়ে পড়েছে।

আবার যৌবনের জোয়ার এসেছে। জাহাঙ্গীরের খুসরুবাগ মহলের অনুকরণে নির্মিত এই প্রাসাদের অধীশ্বর এখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব মীর মহম্মদ কাশিম আলী খাঁ নসরতজঙ্গ বাহাদুর।

আফগানী নাগিশ আর বসরাই গোলাপের কেয়ারি অতিক্রম করে সুচিক্কণ মর্মর-চত্বর মাড়িয়ে প্রাসাদে প্রবেশ করতে হয়। কোথাও এতটুকু সোরগোল নেই। কোন কক্ষ থেকে নূপুরের নিক্বণ ভেসে এসে মনকে মাতাল করে তুলছে না। চলার ভঙ্গীতে যৌবন ছড়াতে ছড়াতে যাওয়া-আসা করছে না মদালসা বাঁদীর দল। বিলাসে গা ভাসিয়ে দেওয়ার নামে উগ্র কামনার স্রোতে নিজেকে হারিয়ে ফেলা পছন্দ করেন না মীরকাশিম। কঠোর আদেশ দিয়ে রেখেছেন, তাঁর প্রাসাদে বাঈজীরা নাচবে না, পণ্যা নারীদের নিয়ে হুল্লোড় চলবে না, সিরাজীর বন্যা বইবে না।

প্রহরের ঘণ্টায় মধ্যরাত্রি ঘোষিত হল।

পশ্চিম দিকের দীর্ঘ অলিন্দের দীপাধারগুলি তখন নিভু-নিভু। গঙ্গার স্রোতের একটানা হালকা আওয়াজ দিলরুবার করুণ মূর্ছনার মতো প্রতীয়মান হচ্ছে। থেকে থেকে ঠাণ্ডা হাওয়ার ঝাপ্টা আলোগুলিকে নিভিয়ে দেবার চেষ্টা করছে।

এই প্রায় অন্ধকার অলিন্দে সেলিমসাহী নাগরার শব্দ তুলে পদচারণা করছেন মীরকাশিম। তাঁর মুখ গম্ভীর, তীক্ষ্ণ চোখের দৃষ্টি

স্তিমিত। কপালের রেখা চিন্তা-জর্জরিত। পোষাকে নেই কোন পারিপাট্য। তখ্‌ত মুবারকের অধিকারী আজ বহু রাত্রি বিনিদ্র রয়েছেন।

তখ্‌ত মুবারক!

সত্যি, সময় সময় ওই তখ্‌তকে মুবারক জানাতে ইচ্ছে করে মীরকাশিমের। সিরাজের মর্মন্তুদ মৃত্যু লক্ষ্য করেও মীরজাফরকে যে কোন উপায়ে সরিয়ে তখ্‌ত অধিকার করবার জন্যে উন্মাদ হয়ে উঠেছিলেন তিনি। বোধহয় ঠিক বলা হল না—হাতছানি দিয়ে বারংবার আহ্বান করে তখ্‌ত মুবারক তাঁকে উন্মাদ করে তুলেছিল।

তবে দেশকে বাঁচাবেন, বাঙালীকে বাঁচাবেন, এরকম একটা উগ্র ইচ্ছে সেদিন তাঁর মনে দানা বেঁধেছিল। কোথায় ভেসে গেল সব। আশা-আকাঙ্ক্ষার উচ্চ মিনার ভেঙে পড়তে বিলম্ব হয়নি। একটি মীরজাফরকে তখ্‌ত থেকে নামিয়েছিলেন তিনি, তখন বুঝতে পারেন নি অসংখ্য মীরজাফর চতুর্দিকে ওত পেতে বসে আছে। এরা দেশকে বিদেশীর হাতে বিকিয়ে দেবার জন্যে আপ্রাণ চেষ্টায় ব্যাপৃত।

সেদিন বুঝতে পারেন নি—সত্যি, এদের চিনতে পারেন নি মীরকাশিম।

মসনদের স্বপ্ন তাঁর টুটে এসেছে। এখন ইংরেজদের উচিত শিক্ষা দিয়ে যদি কবর নেন তাতেও কোন ক্ষোভ নেই। তাই নকিব যখন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হিসেবে তাঁর নাম ঘোষণা করে তখন উচ্চহাস্যে ফেটে পড়তে ইচ্ছে হয় মীরকাশিমের। বাংলা ও উড়িষ্যা আজ তাঁর হাতের বাইরে, বিহারের উপর যে পরিপূর্ণ কর্তৃত্ব আছে তাও নয়। তবু তিনি বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব!

মীরকাশিম একই ভাবে পদচারণা করে চলেছেন।

এখন তিনি অন্য কোন কথা চিন্তা করছেন না। তাঁর মন জুড়ে রয়েছে তকী খাঁ। নিজের জীবন দিয়েও তকী খাঁ নিমকের দাম রেখে

গেছে। মীরকাশিমের মন অব্যক্ত বেদনায় টনটন করতে থাকে। আল্লাহ্ এইভাবে তাঁর একটি হাত কেটে নিলেন।

গতকাল রাত্রেও অলিন্দে দাঁড়িয়ে তিনি প্রিয়তমা বেগম ফতেমাকে বলেছিলেন, প্রচুর অস্থিরতা বোধ করছি বেগম।

দ্রুতকণ্ঠে ফতেমা প্রশ্ন করেছিলেন, কেন হজরত?

—আগামীকাল একটি শুভ সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত আমার এই অস্থিরতা দূর হবে না।

—শুভ সংবাদ? কোন্ শুভ সংবাদের কথা বলছেন হজরত?

—তুমি তো জান ফতেমা, কাটোয়াতে আমরা ইংরেজদের প্রতিরোধ করছি। যুদ্ধ করার ইচ্ছে ওখানেই ওদের চিরকালের মতো ঘুচে যাবে। সিরাজ বেনিয়াদের উচিত শিক্ষা দিয়েছিল কলকাতায়—তকী খাঁ সেই রকম শিক্ষা দেবে ওদের কাটোয়ার রণক্ষেত্রে। দেবে কি বলছি, দিয়ে চুকেছে।

—যুদ্ধক্ষেত্র থেকে কোন সংবাদ এসেছে?

—এতক্ষণে আসা উচিত ছিল। কাল ভোরেই আমি শুভ সংবাদ পাব এবিষয় নিশ্চিত।

—যুদ্ধে জয়লাভ করার সংবাদ পাবার পরই কি আমরা আবার বাংলায় ফিরে যাব সারতাজ?

—না ফাতেমা। ওখানে আর আমরা যাব না। ইংরাজদের দর্প চূর্ণ করে সুবে বাংলাকে শাসন করব এই মুঙ্গেরে বসে। তুমি জান না, মুর্শিদাবাদের জলে বিষ আছে, হাওয়ায় মৃত্যুর হাতছানি আছে।

ফতেমা কিছু বললেন না।

গঙ্গার গেরুয়া জলের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কিছুক্ষণ কেটে গেল নীরবেই।

মীরকাশিম আবার বললেন, চুপ করে গেলে কেন বেগম?

—আমার কেমন ভয় করছে হজরত।

—কিসের ভয় ?

—কয়েকদিন থেকে একটা অশুভ চিন্তা আমার মনের মধ্যে বাসা বেঁধেছে। অনেক চেষ্টা করেও ঝেড়ে ফেলতে পারছি না।

মীরকাশিম সকৌতুকে বললেন, তুমি আমার বেগম। তোমার মনে অশুভ চিন্তা স্থান পাবে কেন ?

—আমার বারংবার মনে হচ্ছে, ইংরেজকে ঠেকানো যাবে না। একদিন তারা সমস্ত অধিকার করে বসবে।

—আমি বেঁচে থাকতে এ অঘটন কখনই ঘটতে পারে না। কাটোয়ার যুদ্ধে হেরে যাবার পর ইংরেজের মেরুদণ্ড ভেঙে যাবে। কলকাতা থেকে আর এক পা এগিয়ে আসতে তারা সাহস করবে না। মন থেকে সমস্ত অশুভ চিন্তা তুমি জোর করে ঝেড়ে ফেলে দাও।

ফতেমা আর কিছু বললেন না।

অন্যান্য দিনের চেয়ে পরের দিন একটু আগে দরবারে গিয়ে বসলেন নবাব। মুর্শিদাবাদের মতো দরবার গমগম না করলেও, জৌলুস কিছু কম নেই। আমীর ওমরাহ্‌রা যে-যার আসনে গিয়ে বসেছেন। বাংলার মসনদকে নিয়ে যাঁরা অনেক খেলা খেলেছেন, সেই শেঠেরাও আছেন। গুরনি, সমরু, মার্কার ইত্যাদি ফিরিঙ্গী সৈনাধ্যক্ষরা আসন নিয়েছে।

মীরকাশিম ইব্রাহিমকে আহ্বান করলেন।

ইব্রাহিম জঙ্গ এগিয়ে এসে কুর্নিশ করে দাঁড়াল।

—কাটোয়া থেকে কোন সংবাদ এসেছে ইব্রাহিম ?

—না জাহাঁপনা। দূতের অনুসন্ধানে লোক রওয়ানা হয়ে গেছে।

মীরকাশিম শ্রেষ্ঠীদের দিকে দৃষ্টি ফেরালেন।

—জগৎশেঠ মহতাবচাঁদ—

জগৎশেঠ নিজের স্থূল শরীর নিয়ে যতদূর সম্ভব দ্রুত আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, জাহাঁপনা—

—কাটোয়ার যুদ্ধের ফলাফল কি হয়েছে আপনারা অনুমান করতে পারেন ?

—আমরা জয়লাভ করেছি জাহাঁপনা।

স্বরূপচাঁদ বললেন, বিশেষে তকী খাঁর মতো বীর সেনাপতি যেখানে রয়েছেন পরাজয়ের কথা সেখানে উঠতেই পারে না।

—আপনারা একথা মন থেকে বলছেন ?

—আমাদের উপর থেকে আপনার সন্দেহ এখনও দূর হয়নি জাহাঁপনা।

মৃদু হেসে মীরকাশিম বললেন, হয়তো কোনদিন হবে না। আমি জানি, আপনাদের মুখের কথা যা, মনের কথা তা নয়। আমার চূড়ান্ত জয় হোক তা আপনারা চান না। আমার ধ্বংস কামনা করে ঈশ্বরের কাছে অহরহ প্রার্থনা করছেন, আমি জানি।

বিনীত কণ্ঠে জগৎশেঠ বললেন, একটা অলীক ধারণা হজরতের মনে রয়েই যাচ্ছে, আমাদের দুর্ভাগ্য। অর্থে, সামর্থ্যে—সবরকম সমর্থন জানাবার প্রতিশ্রুতি আমরা দিয়েছি।

—প্রতিশ্রুতি !

মীরকাশিমের মুখে বিদ্রূপের হাসি খেলে গেল।

—প্রতিশ্রুতির মূল্য দিতে সুবে বাংলার লোক ভুলে গেছে। ওই শব্দের অর্থ পাল্টে দেওয়া দরকার।—রাজা রাজবল্লভ নীরবে বসে রয়েছেন ? আপনি কিছু বলছেন না ?

রাজবল্লভ ব্যস্ততার সঙ্গে বললেন, আমি শুনছি।

—শুনবেন বই কি। খুঁটিয়ে না শুনলে, তেমন সুযোগ-সুবিধা পেলে ইংরেজদের বলবেন কি ভাবে ?

রাজবল্লভ কথার মোড় ঘোরালেন।

ফিরে গেলেন পুরোনো প্রসঙ্গে।

—কাটোয়াতে আমরা জয়লাভ করেছি কি না এখুনি নিশ্চিতভাবে জানা যেতে পারে জাহাঁপনা।

—কি ভাবে ?

—জ্যোতিষীরা গণনা করে দেখুক।

মীরকাশিমের জ্যোতিষের উপর প্রগাঢ় আস্থা আছে। যে কোন বড় কাজ গণনা না করিয়ে হাত দেন না। অনেক বড় বড় পণ্ডিতকে এই কাজে নিযুক্ত করেছেন। স্বতন্ত্র একটি বিভাগ আছে। এই খাতে তিনি অনেক টাকা ব্যয় করেন।

রাজবল্লভের কথায় কেন কে জানে মীরকাশিম গণনা করার কথা এড়িয়ে গেলেন। বোধ হয় যে কোন মুহূর্তে সংবাদ এসে পড়তে পারে, এই কথা চিন্তা করে পণ্ডিতদের খড়ি নিয়ে বসানোটা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন না।

বললেন, তার প্রয়োজন হবে না। সংবাদ এখুনি হয়তো এসে পড়বে।

তাঁর কথাই বাস্তবে পরিণত হল।

সংবাদ পাওয়া গেল যুদ্ধক্ষেত্র থেকে দূত এসেছে।

সকলে সচকিত হলেন। নড়ে-চড়ে বসলেন যে-যার আসনে।

দূতকে দরবারে আহ্বান করা হল।

মনসুরবেগ দরবারে এল। একটানা এতখানি পথ অশ্বারোহণে আসার দরুন তাকে অত্যন্ত পরিশ্রান্ত দেখাচ্ছে। মিশ কালো দাড়িতে লাল ধুলোর আস্তরণ পড়েছে। পোষাক মলিন। মুখের ভাব থমথমে। জয়ের সংবাদ যে দূত বহন করে আনছে তার মুখের ভাব এমন দীপ্তিহীন হওয়া কখনই বাঞ্ছনীয় নয়।

মনসুর নবাবকে কুর্নিশ করে নত মস্তকে দণ্ডায়মান হল।

সাগ্রহে মীরকাশিম বললেন, কি সংবাদ এনেছো মনসুরবেগ ?

—জাহাঁপনা—

—বল—বল, আমি ধৈর্যের শেষ সীমায়—

নিজেকে কোন রকমে সংযত করে, কাঁপা গলায় মনসুর বললে, তকী খাঁ নিহত হয়েছেন হজরত।

দরবারে যেন বজ্রপাত হল।

শেঠেরা স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

মসনদ ছেড়ে বিদ্যুৎবেগে উঠে দাঁড়ালেন মীরকাশিম। দ্রুত পায়ে দূতের কাছে এগিয়ে এলেন। তার বাহু শক্ত করে ধরে প্রায় চীৎকার করে বললেন, আমি কি ভুল শুনলাম? কি বললে তুমি?

মনসুর নিজের কথার পুনরুক্তি করল।

—তকী খাঁ নিহত হয়েছেন হজরত।

গুরগিন খাঁ ও মার্কার ছুটে এসেছিল নবাবের কাছে। মনসুরের কথা শুনে টলে পড়ে যাচ্ছিলেন মীরকাশিম। গুরগিন খাঁ তাঁকে পড়তে দিল না। সযত্নে এনে বসালো মসনদে। অদ্ভুত নীরবতায় ছেয়ে রয়েছে দরবার। তকী খাঁর মৃত্যু হওয়ার পরে রণক্ষেত্রের অবস্থা যে কি তা অনুমান করতে কারও বিন্দুমাত্র অসুবিধা হচ্ছে না।

মীরকাশিমের মনের মধ্যে প্রবল ঝড় বইছে।

ওই সঙ্গে কেমন অসহায় বোধ করছেন তিনি।

তকী খাঁ নেই! স্থির বুদ্ধি অক্লান্ত যোদ্ধা তকী খাঁ তাঁর কাছ থেকে চির বিদায় নিয়েছে। এতক্ষণ যে পরিকল্পনা তাঁর মনে মিনারের মতো উঁচু হয়ে উঠেছিল দূতের বয়ে আনা সংবাদে ভেঙে গুঁড়িয়ে গেল। আর কোন দিন নবাব তকী খাঁকে নিজের পাশে পাবেন না!

বেশ কিছুক্ষণ নীরব থাকার পর মীরকাশিম বললেন, মনসুর বেগ, তুমি তোমার কথা শেষ কর।

—আমাদের জয় সুনিশ্চিত ছিল। সেনাপতি আহত হয়েও ইংরেজদের তাড়িয়ে নিয়ে যাচ্ছিলেন। হঠাৎ একটা গুলি এসে তাঁর মাথায় লাগে। তাঁর মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে আমাদের বাহিনী ছত্রভঙ্গ হয়ে যায় মালেক।

—কাটোয়াতে ইংরেজরা আমাকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করল। তাদের ভাগ্যের জোর দেখে হিংসে হয়। হারতে হারতেও সর্বত্র তারা জিতে যাচ্ছে।

যুদ্ধের বিস্তারিত সংবাদ এরপর পাওয়া গেল।

তকী খাঁ সসৈন্যে অপেক্ষা করছিল বর্ধমানে। ইংরেজদের বিহারের দিকে অগ্রসর হতে হলে বর্ধমান মাড়িয়ে যেতে হবে। তবে এই প্রচণ্ড গরমে ও আসন্ন বর্ষায় তারা মুর্শিদাবাদ ছেড়ে এগুবে এ ধারণা করা যায় না। শীতের মুখে দু-দলের সাক্ষাৎ হবে এই রকম একটা বিশ্বাস ছিল তকী খাঁর।

সে মাস চারেকের জন্যে রসদ সংগ্রহর কাজে ব্যস্ত হয়ে পড়ল। জেলা শাসক সৈয়দ মহম্মদকে সংবাদ পাঠানো হল কিছু গোলা-বারুদ অবিলম্বে পাঠিয়ে দেবার জন্যে। তকী খাঁর কাছ থেকে এই রকম একটা অনুরোধ পাবার জন্যে সৈয়দ মহম্মদ অনেক দিন থেকে অপেক্ষা করছিল।

এতদিন পরে তকী খাঁকে মুঠোয় পাওয়া গেছে।

মীরকাশিম অন্যান্য সৈনাধ্যক্ষদের অপেক্ষা তকী খাঁর উপর বেশী আস্থা রেখে ছিলেন। তিনি একথা বুঝে ছিলেন বিশ্বাসের মর্যাদা যদি কেউ রাখে তবে তকী খাঁ রাখবে। নবাবের এই পক্ষপাতিত্বে অনেকেই তার উপর রুষ্ট হয়ে পড়েছিল।

এদের মধ্যে সৈয়দ মহম্মদ একজন।

তকী খাঁর সর্বনাশ করবার অনেক চেষ্টা সে করেছে কিন্তু সফল হয়নি। এবার সফলতা আসবে নিশ্চিত রূপে। সংবাদ পেয়েও সৈয়দ মহম্মদ গোলা-বারুদ পাঠাবার কোন প্রয়োজনীয়তা বোধ করল না। তকী খাঁ বিস্মিত হয়ে আবার লোক পাঠাল।

দ্বিতীয়বার লোক আসতে সৈয়দ নির্বিকারভাবে জানাল, সিপাহশালার নিজে এলেই তো পারেন। নিম্নপদস্থ কর্মচারীদের আমার কাছে পাঠাচ্ছেন কেন? তাঁর প্রয়োজন যদি এত বেশী, নিজে আসুন। বুঝিয়ে সমস্ত বলুন আমায়।

অগত্যা তকী খাঁকে যেতে হল।

সৌজন্য বিনিময়ের পর সৈয়দ মহম্মদ বললে, কি ব্যাপার বলুন তো খাঁ-সাহেব? গোলা-বারুদের জন্যে কড়া কড়া তাগাদা দিচ্ছেন! আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না।

বিস্মিত তকী খাঁ বললে, না বুঝতে পারার তো কোন কারণ নেই। আমি বেশ পরিষ্কারভাবে লিখে জানিয়েছি সব কথা।

—তা জানিয়েছেন। কিন্তু যুদ্ধটা করবেন কার সঙ্গে। ফাঁকা মাঠে গোলা-গুলি ছুঁড়ে নিশ্চয় বাহাদুরী দেখাবেন না?

—প্রকৃত সৈনিক অকারণে লম্ফঝম্ফ করে না। ইংরেজদের সঙ্গে যুদ্ধ আসন্ন হয়ে পড়ছে আপনি বুঝতে পারছেন না?

—কই আর পারছি। তারা তো কাশিমবাজারে বসে আছে। তাদের হদিস আমার চেয়ে কি আপনি বেশী রাখেন?

—আপনার কথাবার্তা শুনে মনে হচ্ছে, আপনার চেয়ে তাদের হদিস আমি বেশী রাখি। জল-কাদার দিন শেষ হলেই ইংরেজরা মুঙ্গেরের দিকে রওয়ানা হবে। আমি এখানেই তাদের পথ রোধ করতে চাই। প্রয়োজনীয় গোলা-বারুদ অবিলম্বে আমার ছাউনিতে পাঠিয়ে দেবেন।

—এই পাগলামীকে আমি প্রশ্রয় দিতে পারব না।

তকী খাঁ হতবাক্ হয়ে গেল।

—আপনি আমাকে মাল সরবরাহ করবেন কি না বলুন?

—না।

কেন?

—নবাবের কাছ থেকে আমি কোন আদেশ পাই নি।

—সত্যের অপলাপ করবেন না সৈয়দ সাহেব। নবাব আদেশ দিয়ে রেখেছেন। আমার যখন যা প্রয়োজন হবে আপনি তা মিটিয়ে দিতে বাধ্য হবেন।

দাড়িতে বার কয়েক হাত বুলিয়ে সৈয়দ মহম্মদ বললে, সে আদেশ

বাতিল হয়ে গেছে। নবাব নতুন আদেশ দিয়েছেন, তাঁর লিখিত আদেশনামা না পেয়ে আমি কাউকে কিছু দিতে পারব না।

তকী খাঁর রক্ত ধীরে ধীরে মাথায় চড়ছিল।

—নির্জলা মিথ্যে কথা।

সৈয়দ মহম্মদ গর্জে উঠল।

—এরপর আপনার সম্মান হয়তো আমি রাখতে পারব না।

—নবাবের সামনে এই তর্জন-গর্জন বজায় রাখতে পারবেন আশা করি। আমার অনুরোধকে উপেক্ষা করার ফল বোধ হয় খুব ভাল হবে না। আজই আমি মুঙ্গেরে সংবাদ পাঠাচ্ছি।

তকী খাঁ আর অপেক্ষা করল না। রওয়ানা দিল নিজের ছাউনির উদ্দেশ্যে। রাগে তার সমস্ত শরীর কাঁপছে। এরা মানুষ না আর কিছু! অকারণ একটা বিদ্বেষকে মনের মধ্যে জাগিয়ে রেখে গোটা দেশের সর্বনাশ করতে চায়!

মুঙ্গের থেকে এখন প্রয়োজনীয় অস্ত্র আনিয়ে নেওয়া অসম্ভব। দূরত্বের জন্যে সময় লাগবে অনেক। তাছাড়া নদী-নালাতে বন্যার মাতামাতি থাকায় যাতায়াত ও যোগাযোগের অসুবিধা আছে। বিরাট এক সমস্যার মুখোমুখি এসে দাঁড়াল তকী খাঁ।

হঠাৎ তার মনে পড়ল রাজমহলের দুর্গে গুরগিন খাঁ এক সময় মুঙ্গেরের তৈরি অনেক কামান ও গোলা-বারুদ সঞ্চয় করে রেখেছিল। প্রয়োজন না পড়ায় সমস্ত আছে সেখানে। সহজেই আনিয়ে নেওয়া যায়। এখান থেকে রাজমহল অনেক কাছে।

চিন্তার মেঘ কেটে গেল।

হায়দাৎউল্লাকে তকী খাঁ রাজমহল পাঠাল।

দিন কুড়ি কেটে গেছে।

তকী খাঁ এখন সম্পূর্ণ প্রস্তুত।

এদিকে সৈয়দ মহম্মদ আরেক চাল চেলেছে। তকী খাঁর অধীনস্থ তিনজন সেনানায়ককে অর্থের লোভ দেখিয়ে দুর্বল করে তুলেছে। স্থির হয়েছে যুদ্ধের সময় এরা দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করবে। একা তকী খাঁর সাধ্য হবে না গোরা পল্টনকে হটিয়ে দেবার।

তারপর—

নবাব নিশ্চয় পরাজিত সৈন্যাধ্যক্ষকে সাদরে গ্রহণ করবেন না।

এই ষড়যন্ত্রের একটি কথাও তকী খাঁর কানে গেল না।

তবে সতর্ক সেনাপতি গুরুতর একটি সংবাদ সংগ্রহ করল। গুপ্তচর মুখে জানা গেল, ইংরেজ সৈন্য জলকাদাকে উপেক্ষা করেই দ্রুত এগিয়ে আসছে। তারা তকী খাঁর উপস্থিতি জানে না তা নয়। পরিষ্কার বুঝতে পারা যায় শক্তি পরীক্ষা দেবার জন্যে তারা বদ্ধপরিকর।

সাজ-সাজ রব পড়ে গেল।

কাটোয়াতেই সাক্ষাৎ হল দুপক্ষের।

যুদ্ধে নেমেই তকী খাঁ নিজে বর্তমান অবস্থা বুঝতে পারল। তিনজন সেনাধ্যক্ষ নিজেদের সমস্ত সৈন্য নিয়ে সরে দাঁড়াল। অনুরোধ উপরোধেও কাজ হল না। তকী খাঁ নিজের মনকে শক্ত করল। এখন দুর্বলতাকে প্রশ্রয় দেওয়া কাপুরুষতা। আফগান ও রোহিলা সৈন্যদের নিয়ে তকী খাঁ ইংরেজদের রুখে দাঁড়াল।

ঘোরতর যুদ্ধ হল।

পদে পদে প্রমাণ পাওয়া গেল এত চেষ্টা করেও নবাবী সৈন্যবে শৃঙ্খলার বাঁধনে বাঁধা যায় নি। যুদ্ধ করতে করতে তারা কেমন আস্থ হারিয়ে ফেলছে। অপর দিকে ইংরেজদের শৃঙ্খলা ও নির্ভিকত প্রশংসনীয়। শান্ত, সংযতভাবে তারা নিজেদের কর্তব্য পালন কে চলেছে। তকী খাঁ আপ্রাণভাবে সমস্ত দিক সামলে চলেছে।

পদাতিক সৈন্য দিয়ে বিশেষ সুবিধা হবে না প্রথমেই বুঝতে পার গিয়েছিল। সূর্য যখন মধ্যগগনে, পদাতিকদের দক্ষিণদিকে ঠেলে দিে

তকী খাঁ আসরে নামাল অশ্বারোহীদের। ইংরেজ বাহিনীতে অশ্বারোহীর সংখ্যা নগণ্য।

মেজর স্যাডম্‌স অসুবিধায় পড়লেন।

বেয়নেট চার্জ করে বিরাট সুফল কিছু পাওয়া গেল না। কিছু ঘোড়া প্রাণ দিল। তকী খাঁ স্বয়ং আহত বাহন থেকে ছিটকে পড়ল। তবু দুর্বার গতিকে রোধ করা অসম্ভব হয়ে উঠল। প্রমাদ গুণলেন বেনিয়া সেনাপতির দল।

যুদ্ধের মোড় ঘুরে গেছে।

অসংখ্য ইংরেজ যুদ্ধক্ষেত্রের রক্তকর্দমে শেষ শয্যা গ্রহণ করেছে। ওরা পালাচ্ছে। রোহিলা অশ্বারোহীদের রোধ করবার ক্ষমতা ওদের আর নেই। তকী খাঁ নিজের অধীনস্থদের উৎসাহ দিতে দিতে ঝড়ের বেগে এগিয়ে চলেছে।

এই সময় অঘটন ঘটল।

একটি গুলি এসে লাগল তকী খাঁর দক্ষিণ পায়ে। অসহ্য যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর দুমড়ে এল। ঝলকে ঝলকে বেরিয়ে আসতে লাগল রক্ত। একটা ভয় গুলিয়ে উঠল তকী খাঁর মনে। সিপাহশালার আহত হয়েছে দেখে সৈন্যরা না ভীত হয়ে পড়ে।

ইংরেজদের অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে আরো। এখন বিন্দু মাত্র দুর্বলতা প্রকাশ করলে সর্বনাশ হয়ে যেতে পারে। আফগান অশ্বারোহীদের নিয়ে তকী খাঁ ইংরাজদের তাড়িয়ে নিয়ে চলল। ওরা খোলা মাঠ ছেড়ে ঝোপ-ঝাড়ের মধ্যে আশ্রয় নিচ্ছে। এছাড়া আর কোন পথও খোলা নেই এখন ইংরেজদের সামনে।

আবার একটা গুলি তকী খাঁকে আহত করল। কাঁধ ভেদ করে বেরিয়ে গেল বুলেট। দ্রুত হাতে নিজের জোব্বা ছিঁড়ে তকী খাঁ ক্ষতটা বেঁধে ফেলল। যন্ত্রণায় মুখ বিকৃত হয়ে উঠছে। ঝিমঝিম করছে সমস্ত শরীর।

হায়দাৎউল্লা পাশেই ছিল।

অনুনয় করে বললে, আপনি শিবিরে ফিরে যান। কিছু বিশ্রাম না নিলে আপনার শরীর আরো খারাপ হয়ে পড়বে।

তকী খাঁ গর্জে উঠল।

—তুমি কি বলছো হায়দাৎ! যুদ্ধক্ষেত্র ছেড়ে যাব?

—আপনার শরীর—

—আমার জীবনের মূল্যর চেয়ে দেশের স্বাধীনতার মূল্য অনেক বেশী। আমি শিবিরে ফিরে গেলেই বিশৃঙ্খলা আসবে। যুদ্ধ শেষ হতে আর সময় নেবে না। হেরে গিয়ে কোন্ মুখ নিয়ে আমি নবাবের সামনে গিয়ে দাঁড়াব হায়দাৎ? গুরুতর আহত সিপাহশালারের দেশ-প্রেম হায়দাৎউল্লাকে মুগ্ধ করল। তকী খাঁ তখন বলছে, ইংরেজদের ডান দিকটা লক্ষ্য কর হায়দাৎ। লোক সরে গেছে, জায়গাটা ফাঁকা। ওই পথ দিয়ে গিয়ে আমরা ওদের সম্পূর্ণ ঘিরে ফেলতে পারব।

এই কথাই তকী খাঁর জীবনের শেষ কথা। যে জায়গাটাকে ফাঁকা বলে মনে হয়ে ছিল আদবেই তা ফাঁকা ছিল না। ধূর্ত ইংরাজ ফাঁদ পেতে রেখেছিল সেখানে ওই পথে সৈন্য নিয়ে এগিয়ে যেতেই তৃতীয় গুলি এসে লাগল তকীর খাঁর মাথায়। ঘোড়ার পিঠে আর নিজেকে খাড়া রাখতে পারল না অসীম বলের অধিকারী নবাবের বিশ্বস্ত সেনাপতি।

মাটিতে লুটিয়ে পড়ার সঙ্গে সঙ্গে তকী খাঁর প্রাণ অসীমে মিলিয়ে গেল। ইংরেজেরা মুহুর্মুহুঃ চীৎকার করে আকাশ-বাতাস ভরিয়ে তুলল। সিপাহশালারের মৃত্যুর পর ভীত নবাব-সৈন্য আর দাঁড়াল না যুদ্ধক্ষেত্রে। যাদের জয় সুনিশ্চিত ছিল প্রাণ ভয়ে তারা পালিয়ে যাচ্ছে।

ভাগ্যের বিচিত্র পরিহাস।

কাটোয়ার যুদ্ধে সম্পূর্ণ পরাজিত হলেন মীরকাশিম।

পশ্চিমের দীর্ঘ অলিন্দে সেলিমসাহী নাগরার শব্দ তুলে তখন পদচারণা করে চলেছেন মীরকাশিম। থেকে থেকে তকী খাঁর কথা মনে পড়ছে। হৃদয় মথিত করে একটা দীর্ঘনিঃশ্বাস বেরিয়ে আসছে সঙ্গে সঙ্গে।

সৈয়দ মহম্মদকে বরখাস্ত করেছেন নবাব। তার কাছ থেকে কাজ বুঝে নেবার জন্যে অন্য লোক রওয়ানা হয়ে গেছে। বাংলার সুফলা নরম মাটিতে এত বিশ্বাসঘাতক জন্মায় কিভাবে নবাব বুঝে উঠতে পারেন না। আল্লাহ্‌র দরবারে দাঁড়িয়ে নিজের স্বপক্ষে একটি কথাও বলবার থাকবে না একথা কি তাদের স্মরণ হয় না!

বিশ্বাসঘাতক !!!

মীরকাশিম চমকে উঠলেন। বিশ্বাসঘাতকতায় সৈয়দ মহম্মদ কি তাঁর কাছে শিশু নয়? ইংরেজকে সমর্থন করে বাংলার সঙ্গে, সিরাজের সঙ্গে তিনি সেদিন যে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন পলাশীর প্রান্তে রক্তাক্ত অক্ষরে তা কি লেখা নেই?

আছে। সে অক্ষর কোন দিন মুছবে না।

বেহেস্তে যাবার অধিকার মীরকাশিম হারিয়েছেন। এই একটি মাত্র কাজে তাঁর ইহকালের সমস্ত সুকৃতি এক অজানা স্রোতের টানে কোথায় ভেসে গেছে। অথচ সেদিন তাঁর অবচেতন মনেও তো নবাব হবার স্বপ্ন ছিল না। তখ্‌ত মুবারককে দূর থেকে দেখতেই তো তিনি অভ্যস্ত ছিলেন।

তবে—তবে কেন সিরাজের সঙ্গে এত নির্মম ব্যবহার করেছিলেন সেদিন।

কেন—কেন?

নবাব মীরকাশিমের হৃদয় হাহাকার করে ওঠে।

চোখের উপর ভেসে ওঠে সিরাজের করুণ কাকুতি। আমি কিছু চাই না—আমায় বাঁচতে দাও—আমায় বাঁচতে দাও। সেদিন তো তাঁর হৃদয় এই করুণ আহ্বানে সাড়া দেয় নি। তিনি তো মীরজাফরকে গিয়ে বলতে পারেন নি, বলতে পারেন নি মীরনকে গিয়ে, তখ্ত কেড়ে নেওয়া হয়েছে, সিরাজকে প্রাণে মেরে আর কাজ নেই।

অবশ্য তাঁর কথা ওঁরা রাখতেন না। তবু তিনি অনুরোধ করেন নি কেন? কেন হয়ে পড়ে ছিলেন এত অমানুষ? আজ এই অজস্র কেনর উত্তর মীরকাশিম খুঁজে পান না। তবে একটা আতঙ্ক ক্রমেই তাঁকে সাপটে ধরছে। বিশেষ করে তকী খাঁর মৃত্যু সংবাদ পাবার পর থেকে ওই আতঙ্ককে কোন মতেই মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে পারছেন না। দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছে ইংরেজ। শেষ রক্ষা যদি তিনি করতে না পারেন? সিরাজের মৃত্যুর চেয়ে মর্মন্তুদ মৃত্যু কি তাঁর জন্যে অপেক্ষা করছে?

পদশব্দ দ্রুত হল।

চিন্তাস্রোতে বাধা পড়ল মীরকাশিমের।

—কে?

—আমি হজরত।

—ফতেমা।

ফতেমা এগিয়ে এলেন।

—বিশ্রাম করতে চলুন হজরত।

—বিশ্রাম?

—রাতের পর রাত এইভাবে কাটালে গুরুতর অসুস্থ হয়ে পড়বেন। বিশ্রাম করতে চলুন।

মীরকাশিম দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেললেন।

—আমি কবরে গিয়ে বিশ্রাম করব। তার আগে আমার বিশ্রাম করবার অবকাশ কোথায় ফতেমা।

—তকী খাঁর মৃত্যু আপনার বুকে গভীরভাবে বেজেছে তা আমি জানি হজরত। আল্লার নির্দেশের উপর মানুষের তো কোন হাত নেই। আপনি ভেঙে পড়লে আমার অবস্থা কি হবে?

—ভেঙে আমি পড়ি নি। বিবেকের দংশনে ক্ষতবিক্ষত হয়েছি। কাল তুমি বলছিলে না, একটা অশুভ চিন্তা তোমার মনে আনাগোনা করছে। কাল হেসে উড়িয়ে দিয়েছিলাম, তবে আজ মনে হচ্ছে ইংরেজদের ঠেকিয়ে রাখার শক্তি হিন্দুস্থানে কারুর নেই। মোগল বাদশাহেরও না। তবে ওদের আমি আপ্রাণ ভাবে বাধা দেব।

—আপনি জয়ী হবেন।

—জয়ী হব! সত্যি যদি আমি জয়ী হই, আমার চেয়ে সুখী মানুষ দুনিয়াতে আর কেউ হবে না।

মীরকাশিম বেগমের খুব কাছে এগিয়ে গেলেন।

—ফতেমা—

—সারতাজ—

—সে সমস্ত দিনের কথা তোমার মনে পড়ে ফতেমা?

—কোন্ দিনের কথা বলছেন সারতাজ।

—যখন তুমি আমার জীবনে প্রথম এসেছিলে। যখন আমি তোমাকে কবিতা পড়ে শোনাতাম।

ফতেমা স্বামীর মুখের দিকে তাকালেন। আবছা অন্ধকারে মীরকাশিমের মুখ ভাল করে দেখা যাচ্ছে না। স্বামী সময় সময় ভীষণ ছেলেমানুষ হয়ে পড়েন একথা অজানা নয় বেগম সাহেবার।

—মনে পড়ে। আপনি অদ্ভুত ভাল শায়রি করতে পারতেন।

—চেষ্টা করলে হয়তো এখনও পারি। এক এক সময় আমার কি মনে হয় জান ফতেমা?

—বলুন হজরত?

—মনে হয় সব ছেড়ে ছুড়ে চলে যাই। এমন জায়গায় যাই

যেখানে বিশ্বাসঘাতকতা ও স্বার্থ নিয়ে হানাহানি নেই। তখ্ত মুবারক আমার স্বপ্নের মধ্যেই বিরাজ করুক। সেখানে গিয়ে আমি কি করব বলতো বেগম?

—সেখানে গিয়ে·······

দুহাত দিয়ে মীরকাশিম ফতেমাকে নিজের কাছে টেনে নিলেন।

—সেখানে গিয়ে আমি শায়রি করব। শ্রোতা শুধু তুমি। এই বিরাট দুনিয়ায় নিজের বলতে তুমি ছাড়া আমার আর কেউ নেই। শায়রি শুনতে শুনতে বিরক্ত হয়ে সেদিন আমায় ছেড়ে যাবে নাতো?

—এ কথা বলবেন না হজরত। খোদা জানেন, আপনাকে ছাড়া আর কোন কিছুকে আমি চিন্তার মধ্যেও মনে স্থান দিই না। আপনি কেন এত হতাশ হয়ে পড়ছেন। মনকে প্রফুল্ল করুন। তখ্ত মুবারক আপনার। সেখানে অন্য কাউকে মানায় না।

ফতেমাকে বাহুবন্ধন থেকে মুক্তি দিয়ে মীরকাশিম নীরবে কি চিন্তা করলেন। বললেন তারপর, তুমি ঠিক বলছো বেগম। তখ্ত মুবারকে আমাকে ছাড়া অন্য কাউকে মানায় না। ছেলেমানুষীকে প্রশ্রয় দেব কেন? আমার জীবনে তো কোন মধ্যপথ নেই। হুগলীর সেই জ্যোতিষ আমার ভাগ্য গণনা করে বলেছিল, তোমার জীবনে মাঝামাঝি কিছু নেই। হয় নবাবী নয়তো ফকিরী। মহম্মদ কাশিম আলী নসরত জঙ্গ বাহাদুর ফকিরী করতে জন্মগ্রহণ করেনি, সে নবাবী করবে। ফতেমা, তুমি এখন যাও। আমি একটু একলা থাকতে চাই।

—বিশ্রাম করবেন না?

—বললাম তো কবরে যাবার আগে বিশ্রাম করবার উপায় আমার নেই। তুমি যাও বেগম। নিভৃতে আমি অতীতকে রোমন্থন করি।

ফতেমা কিছু বলতে গিয়েও বললেন না।

অনিচ্ছার সঙ্গে স্থান ত্যাগ করলেন।

মীরকাশিম আবার পদচারণা আরম্ভ করলেন। এক অজানা কারণেই এখন নিজের অতীতকে রোমন্থন করবার তীব্র তাগিদ অনুভব করছেন। এইরকম ভাবের আবেগ কখনো কখনো তাঁকে উতলা করে তোলে। নিজের অতীত জীবন বিশ্লেষণ করে নিজেই অবাক্ হয়ে যান।

তিনি শায়ার হতে চেয়ে ছিলেন।

নবাব হতে তো চান নি।

তবে—

মীরকাশিম অলিন্দের এক প্রান্তে গিয়ে দাঁড়ালেন। ভরা গঙ্গার উপর মরা চাঁদের আলো পড়েছে। ঢেউ-এর মাথাগুলি চিকচিক করে উঠেছে। আজ সীমাহীন জলের সামনে দাঁড়িয়ে আছেন মীরকাশিম। অথচ তাঁর উধ্বর্তন পঞ্চমপুরুষ একফোঁটা জলের জন্যে করুণ আর্তনাদ করেছেন। মধ্য এশিয়ার দুস্তর মরুভূমিতে নিজের জীবন রক্ষা করার জন্যে ব্যর্থ অন্বেষণ করছেন।

চারিদিকে বালি আর শুধু বালি।

সে একদিন গেছে।

পারস্যের ধনী ব্যবসায়ী শেখ মুর্তুজার জীবনের সে এক করুণ দিন।

তিনি কি শেষ পর্যন্ত জীবন রাখতে পেরেছিলেন? আব্বাজানের কাছ থেকে বহুবার শোনা সেই কাহিনী মীরকাশিমের চোখের উপর যেন পরিষ্কার ভেসে উঠছে। সেদিন........

উটের কারবাঁ চলেছে।

নীরবে চলে উটের সারি। সংখ্যায় শ দেড়েকের কম হবে না। পারস্যের রাজধানী থেকে এই দল যাত্রা করেছে। দলের বেশীর ভাগ মানুষই ব্যবসায়ী। পণ্য নিয়ে চলেছে হিন্দুস্থানে। হিন্দুস্থানের

বাজারে মাল নিয়ে গিয়ে পড়তে পারলে লাভ ভালই হয়। তাই এই বিরাট দূরত্ব আর কষ্টদায়ক পথকে সকলে হাসিমুখে অতিক্রম করে। অবশ্য সবসময় একটা ভয় সকলকে সচকিত করে রাখে।

দস্যু ভয়।

মরুভূমি অঞ্চলেই তাদের দৌরাত্ম্য বেশী। তারা কোথায় যে আত্ম-গোপন করে থাকে, সহস্র সতর্ক চক্ষুও অনুসন্ধান করে বার করতে পারবে না তা। হঠাৎ হৈহৈ করে কারবাঁর উপর এসে পড়ে। নির্বিচারে লুণ্ঠন করে আবার মিলিয়ে যায় চোখের আড়ালে।

ধনী এক মুহূর্তে হয়ে যায় ফকির।

কান্না আর হা-হুতাশে ভরে যায় মরু অঞ্চল।

দস্যুরা যে শুধু ধনরত্ন লুণ্ঠন করে তা নয়, যুবতী নারী ও কর্মঠ পুরুষদেরও ধরে নিয়ে যায়। এশিয়ার বিভিন্ন নগরে তাদের বিক্রি করা হয়। নানা দেশের সম্রাট, খলিফা, আমীর, ওমরাহ, ধনী—এমন কি মধ্য বিত্তরাও চড়া দামে পছন্দ মতো দাস কিনে নিয়ে যায়।

এখন আর নিরস্ত্র কারবাঁ মরুভূমি অতিক্রম করে না।

প্রত্যেক দলে কম করেও পঞ্চাশজন যোদ্ধা সঙ্গে নেওয়া হয়। দস্যুদের প্রতিরোধ করবার এই ব্যবস্থা অবলম্বন করায় দৌরাত্ম্য বহুলাংশে কমেছে। তবে ব্যবসায়ীদের মনে শঙ্কা থাকেই। শঙ্কা পরিহার করে মরুভূমি অতিক্রম করবার কথা চিন্তাই করা যায় না।

কারবাঁ মরুভূমির গভীরে ক্রমে প্রবেশ করছে।

মরুভূমি অতিক্রম করবার পর বিরাট বিরাট পর্বতের সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। কোথাও, কোথাও গভীর অরণ্য। পর্বত আর অরণ্যের পর হিন্দুস্থানের সুবিখ্যাত পেশওয়ার নগর। পেশওয়ার থেকে রাজধানী দিল্লী যাওয়ার কোন অসুবিধা নেই। মোগল সম্রাটরা প্রশস্ত পথের ব্যবস্থা করে রেখেছেন। হিন্দুস্থানের মানুষরাও সজ্জন। বিদেশী ব্যবসায়ীদের সঙ্গে অতি ভদ্র ব্যবহার করে থাকেন।

শেখ মুর্তুজা আলী এই কারবাঁর সঙ্গে হিন্দুস্থান চলেছেন।
জহরতের ব্যবসায় পারস্যে তিনি সুখ্যাত। দূর দূর বিদেশে তাঁর মালের চাহিদা। প্রাচ্য ও পাশ্চাত্যের অনেক দেশনায়কের কণ্ঠ ও মস্তকের সমস্ত জহরত তিনি সরবরাহ করেছেন। সততার সঙ্গে এই ব্যবসায় লিপ্ত আছেন শেখ মুর্তুজা আজ চল্লিশ বছর।
বয়স তাঁর ঢের হয়েছে।
কবে মাটি নিতে হয় কোন স্থির নেই। তাই স্থির করে ফেললেন মৃত্যুর পূর্বে হিন্দুস্থানের মোগল দরবারে একবার যাবেন। মোগল বাদশাহের বৈভবের খ্যাতি দিগ্‌-বিদিক ছেয়ে রয়েছে। দুনিয়ার সেরা সমস্ত কিছু গ্রহণ করতে তাঁরা অভ্যস্ত। সুতরাং সেরা জহরত উচিত মূল্যে গ্রহণ করবেন তাঁরা এতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই।
আজ কুড়ি বছর ধরে হিন্দুস্থানে যাবার চিন্তা করছেন শেখ মুর্তুজা। অন্যত্র ব্যবসায় ব্যস্ত থাকার দরুন সময় করে উঠতে পারেন নি। এবছর অনেক লোভনীয় প্রস্তাবকে উপেক্ষা করে হিন্দুস্থানে যাওয়াই স্থির করলেন। সন্ধান নিলেন একটি বড় দল চলেছে। সুতরাং সেই দলের সঙ্গে যাওয়াই যুক্তি সঙ্গত মনে হল তাঁর।
পথে দস্যু তস্করের দৌরাত্ম্যের কথা মুর্তুজা জানতেন। দলকে রক্ষা করবার জন্যে কুড়িজন অস্ত্রধারীকে নেওয়া হয়েছিল। মুর্তুজা নিজের খরচে আরো দশজনকে বাড়িয়ে দিলেন। সঙ্গে নিয়ে যাচ্ছেন প্রায় ত্রিশ লক্ষ টাকার হীরা জহরত। যত সতর্কতা অবলম্বন করা যায় ততই ভাল।
ব্যবসা করতে যাবার সময় মুর্তুজা কোনবার আরিফকে সঙ্গে নেন না। এবার সঙ্গে চলেছে বেহেস্তের সঙ্গে প্রায় তুলনা চলে সেই হিন্দুস্থানে বেড়িয়ে আসবে বলে। বিশাল বক্ষ, সৌম্যদর্শন আরিফ মুর্তুজার একটি মাত্র পুত্র। দুনিয়ায় উনত্রিশটি বছর সে অতিক্রম করেছে।
কারবাঁ এগিয়ে চলেছে।

তিন দিনের উপর হল-কারবাঁ মরুভূমির উপর দিয়ে চলেছে। অভিজ্ঞ পথ-প্রদর্শকদের অভিমত হল দিন পনেরো আরো লাগবে এই ভয় উৎপাদক পথ অতিক্রম করতে। সময় একরকম ভাবে কেটে যাচ্ছিল। সারাটা দিন তাঁরা এগিয়ে চলেন। সন্ধ্যা হবার পর কোন মরুস্থানে আশ্রয় গ্রহণ করেন। মরুস্থান পাওয়া না গেলে খোলা আকাশের তলায় বস্ত্রাবাস খাটিয়ে রাত কাটিয়ে দেন।

পশ্চিম গগনে সূর্য সম্পূর্ণ হেলে পড়লেও, আলোকিত ছিল চতুর্দিক। এই সময় মরুস্থানটি দৃষ্টিগোচর হল। আর অগ্রসর না হয়ে, আজকের রাতের মতো এখানে আশ্রয় নেওয়াই যুক্তিযুক্ত।

মরুস্থানটি বড়।

উটেদের বিশ্রাম দেওয়া হল মালপত্র নামিয়ে। বেশীর ভাগ লোক কিছু পেতে নিয়ে গা ঢেলে দিল। অনেকে ব্যস্ত হল রান্নার কাজে। মরুস্থান কোলাহল মুখর হয়ে উঠল। মুর্তজা ফসি টানতে লাগলেন আর চিন্তা করতে লাগলেন মোগল দরবারে কি রকম জাঁকিয়ে ব্যবসা হবে।

খাওয়া-দাওয়া সাঙ্গ হল একসময়।

এবার শোয়ার পালা। মুর্তজা আর আরিফ গায়ে ভেড়ার লোমের কম্বল টেনে নিয়ে শুয়ে পড়লেন। দিনের বেলা এখানে প্রচণ্ড গরম আবার বেশ ঠাণ্ডা রাত্রে। কম্বল ব্যবহার না করে উপায় নেই। সকলেই ক্লান্ত। অন্যান্যরাও ঘুমের কোলে আশ্রয় নিল।

কতক্ষণ মুর্তজা ঘুমিয়েছেন জানেন না। প্রবল চীৎকারে ঘুম ভেঙে গেল। দ্রুত উঠে বসেই তাঁর চক্ষুস্থির। অসংখ্য মশালের আলোয় চতুর্দিক আলোকিত। হাতাহাতি যুদ্ধ চলেছে। মুর্তজার অনুমান করে নিতেই কষ্ট হয় না, দস্যুরা অতর্কিতে আক্রমণ করেছে তাঁদের। রক্ষীরা প্রাণপণে লড়ছে।

মুর্তজা এই রক্ত জল-করা দৃশ্য খুব বেশীক্ষণ দেখতে পাননি—তাঁর

মাথায় সজোরে আঘাত করল কে। বৃদ্ধ মুর্তুজা ঘুরে পড়লেন। ক্ষতস্থান থেকে ঝুঁঝিয়ে রক্ত পড়তে লাগল। জ্ঞান হারালেন তিনি। জ্ঞান যখন ফিরে এল, দেখলেন রাত মিলিয়ে গিয়ে দিন এসেছে, তিনি উত্তপ্ত বালির উপর শুয়ে আছেন। ব্যথায় সমস্ত শরীর টনটন করছে। রক্ত শুকিয়ে জমাট হয়ে গেছে ক্ষতস্থানের উপর। মুর্তুজাকে সর্বস্বান্ত করে শুধু দস্যুরা চলে যায়নি, মরুদ্যান থেকে আহত অবস্থায় তাঁকে কোথায় নিয়ে এসে ফেলেছে তার সন্ধান কে দেবে।

আরিফ—আরিফ কোথায়?

কোন রকমে মাথা তুলে তিনি তাকালেন এধার ওধার। কুড়ি পঁচিশটি মৃতদেহ পড়ে আছে এখানে ওখানে। আরিফ তাদের মধ্যে নেই বলেই মনে হচ্ছে। কোথায় গেল সে? দস্যুরা তাকে কি বন্দী করে নিয়ে গেছে? তাঁর প্রশ্নের উত্তর দেবে কে?

কিন্তু মুর্তুজা যে আর চিন্তাও করতে পারছেন না। গলা শুকিয়ে কাঠ হয়ে গেছে। জল চাই—জল। কোথায় জল? সীমাহীন তপ্ত মরুভূমি যেন তাঁর দিকে তাকিয়ে বিদ্রূপের হাসি হাসছে। বোখারো সুমিষ্ট আঙুরের রস পান করা মুর্তুজার অভ্যাস, এখন একফোঁটা জলের জন্যে ছটফট করতে লাগলেন।

ভাগ্যের কি নিদারুণ পরিহাস।

—জল—জল—

আকুল হয়ে আর্তনাদ করতে লাগলেন শেখ মুর্তুজা আলী।

কে দেবে জল তাঁকে?

মুমূর্ষু বৃদ্ধকে জীবন দান করবার জন্যে কে এখানে অপেক্ষা করছে?

মরুদ্যানের মধ্যেই আহত হয়ে পড়েছিল আরিফ।

ও আপ্রাণভাবে দস্যুদের বাধা দেবার চেষ্টা করেছিল। কিন্তু খুব

বেশীক্ষণ যুঝতে পারেনি। কারণ অসি চালানো ওর পেশা নয়, অভ্যাসও নেই সুতরাং রক্তাক্ত শরীরে ওকে এলিয়ে পড়তে হয়েছিল।

জ্ঞান যখন আরিফের হল তখন সূর্য মধ্যগগনে। ও উঠে বসল কোন রকমে। আব্বাজানকে খুঁজে পেল না নির্দিষ্ট জায়গায়। দস্যুরা তাঁকে কি নিয়ে গেছে ? কিন্তু তাঁর মতো বৃদ্ধকে সঙ্গে নিয়ে যাবার তো কারণ থাকতে পারে না। তবে—

তেষ্টায় গলা শুকিয়ে উঠেছিল। মূল্যবান যা কিছু সব নিয়ে গেছে দস্যুরা। পড়ে আছে মৃতদেহের স্তূপ আর কিছু তৈজসপত্র। তৈজস-পত্রের মধ্যেই পাওয়া গেল মুখ-বন্ধ দুটি জলের পাত্র। জল রয়েছে তাতে।

আরিফ প্রাণভরে জল খেল।

এখন ওর কর্তব্য কি ?

আব্বাজানের অনুসন্ধান করবে ? কিভাবে করবে ? এই বালির সমুদ্রের মধ্যে তিনি কোথায় আছেন, কিভাবে আছেন—কে বলে দেবে। হয়তো তিনি নেই। দস্যুরা কোথাও মেরে ফেলে রেখে গেছে। আরিফ অনেকক্ষণ বসে বসে চিন্তা করল।

এখানে চুপচাপ বসে থাকার চেয়ে এগিয়ে যাওয়াই ভাল। হয়তো কোন কারবাঁর সন্ধান পাওয়া যেতে পারে। আরিফ জলের পাত্র তুলে নিয়ে মরুস্থান ছেড়ে যাত্রা করল। কত অল্প সময়ের মধ্যে ভাগ্যবিপর্যয় ঘটে গেল। এই ধরনের একটা ঘটনা ঘটতে পারে, আরিফের মনে আগেই সন্দেহ হয়েছিল।

পারস্য থেকে যাত্রা করবার পূর্বে বলেছিল আব্বাজানকে, আমার কেমন মন খুঁত খুঁত করছে। পথে বিপদ হতে পারে। এবার হিন্দুস্থানে যাওয়া বাতিল করে দেওয়াই ভাল আব্বাজান। আগামী বছর বরং—

মুতুর্জা বলেছিলেন, আগামী বছরেও আবার তোমার মন খুঁত খুঁত

করতে পারে। এইভাবে চলতে থাকলে আমার তো হিন্দুস্থানে যাওয়াই হবে না। মনের আশঙ্কাকে ঝেড়ে ফেলে দাও।

আরিফ আর কিছু বলেনি।

শেষ পর্যন্ত ওর আশঙ্কাই বাস্তবে পরিণত হল।

আধ মাইলটাক আরিফ এগিয়েছে, মৃতদেহগুলি দেখতে পেল। আর ওই সঙ্গে দেখল আব্বাজানকে। ছুটে গেল। শেখ মুর্তজা তখন আর দুনিয়াতে নেই। জল, জল করে বিদায় নিয়েছেন। আর কিছু সময় জীবনকে ধরে রাখতে পারলে জল তিনি পেতেন, একমাত্র পুত্রের হাত থেকে জল পেয়ে মৃত্যুর হাত থেকেও হয়তো নিষ্কৃতি লাভ করতেন।

ভবিতব্যকে রোধ করার ক্ষমতা মানুষের নেই।

আব্বাজানের মৃতদেহের উপর আরিফ কান্নায় ভেঙে পড়ল। শিশুর মতো ফুঁপিয়ে ফুঁপিয়ে কাঁদল অনেকক্ষণ ধরে। একটানা কান্নার পর মন হালকা হল তার। শোকের প্রথম ধাক্কা আরিফ সামলে উঠল। চিন্তা করে দেখল এখন তার প্রধান কর্তব্য হচ্ছে, আব্বাজানকে কবর দেওয়া।

এই মরুভূমিতে ধর্মাচরণ করবার জন্যে কোন মৌলবী উপস্থিত নেই, নেই কবর নির্মাণের সামগ্রী। হাত দিয়ে বালি সরিয়ে তার মধ্যে মুর্তজাকে শুইয়ে দিল আরিফ। আল্লার নাম উচ্চারণ করে বালি চাপা দিল। অন্যান্য মৃতদেহগুলিকে একইভাবে কবরস্থ করল।

বিষণ্নমনে ফিরে এল আবার মরুদ্যানে। অনির্দিষ্টভাবে এগিয়ে গিয়ে লাভই বা কি? বরং এখানে থাকাই সঙ্গত। যাত্রীরা বিশ্রাম নেয় মরুদ্যানে। কয়েকদিনের খাদ্য রয়েছে, জলও আছে—ইতিমধ্যে কোন কারবাঁ কি এসে পড়বে না?

আরিফ এখানকার মৃতদেহগুলি একে একে বালির মধ্যে কবর দিল।

সেদিন কেটে গেল।

পরের দিনও কাটল।

আতঙ্কিত মনে সম্পূর্ণ নিঃসঙ্গ আরিফ বুক বেঁধে বসে আছে।

তৃতীয় দিনও প্রায় যায় যায়—

সন্ধ্যার মুখে বিরাট এক দল এসে উপস্থিত হল। শ আটেক লোক হবে দলেতে। আরিফ দলপতির নিকটে গিয়ে নিজের অবস্থা বর্ণনা করল। মৃতদেহগুলির অবস্থান দেখিয়ে দিল। দলপতি মর্মাহত হলেন। আরিফকে প্রচুর সান্ত্বনা দেবার পর বললেন, আমি তোমার জন্যে কি করতে পারি বল?

—আমাকে সঙ্গে করে নিয়ে চলুন।

—আমি পারস্যে যাচ্ছি না। আমার গন্তব্যস্থল ঠিক তার বিপরীত। কাবুল হয়ে হিন্দুস্থান যাব।

—আমি যে কোন লোকালয়ে যেতে প্রস্তুত।

বেশ।

পরের দিন ব্যবসায়ীদের সঙ্গে আরিফ কাবুল যাত্রা করল।

পথে আর কোন বিপদ ঘটল না। দীর্ঘযাত্রা শেষ হল একদিন। কাবুল হিন্দুস্থানের বাদশাহের অধীন সমৃদ্ধশালী নগর। এখানেই ব্যবসায়ীদের কাছ থেকে আরিফ বিদায় নিতে চাইল।

দলপতি বললেন, নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু ভেবেছো?

—আজ্ঞে না।

—দিনকাল খুব খারাপ। অনির্দিষ্টভাবে যাবে কোথায়?

—আমিও তাই ভাবছি।

দলপতির কেমন মায়া পড়ে গিয়েছিল আরিফের উপর।

তিনি বললেন, একটা কাজ সংগ্রহ করে নিতে পারলে কোন অসুবিধা হবে না। তারপর পারস্যগামী কোন দল পেলে তাদের সঙ্গে দেশে ফিরে যাবে।

—কিন্তু কাজ আমায় দেবে কে ?

—বাদশার সুবেদার থাকেন এখানে। তাঁর সঙ্গে আমার পরিচয় আছে। তুমি লেখাপড়া জান। আমার বিশ্বাস সুবেদার সাহেব তোমাকে চাকরি দেবেন।

দলপতির সুপারিশে আরিফের চাকরি হয়ে গেল।

অর্থদপ্তরে মুনসির পদ পেল সে।

মাস দুয়েক কাটল। বার্ষিক হিসেবপত্র দিল্লীতে পাঠাবার সময় এসে পড়ল। অর্থদপ্তরের কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে সুবেদার আরিফকেও রাজধানীতে পাঠালেন। বলতে গেলে দিল্লীতে পা দেবার সঙ্গে সঙ্গে তার ভাগ্যের চাকা ঘুরে গেল।

কাজ শেষ হবার পর শাহজাহান এই প্রখর বুদ্ধি পারসীক যুবককে কাবুল ফিরে যেতে দিলেন না। দাক্ষিণাত্যে পাঠিয়ে দিলেন তৃতীয় পুত্র আওরঙ্গজেবের কাছে। তারপর—তারপর নয়, তার আগের কিছু কথা এখানে বলে নিতে হবে নইলে আসল ঘটনার খেই ধরা যাবে না।

উত্তর ভারতের তীব্র গরম তখনও আত্মপ্রকাশ করেনি। সন্ধ্যা অতিক্রম করেছে বেশ কিছুক্ষণ পূর্বে। প্রাসাদ সম্পূর্ণ নিস্তব্ধ। স্বর্ণ খচিত পালঙ্কের উপর এইমাত্র নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছেন শাহজাহান।

জাহান আরা পিতার পদপ্রান্তে বসে ছিলেন। সম্রাট নিদ্রিত হলে তিনি উঠে পড়লেন। একটি দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে কক্ষের বাইরে এলেন। মমতাজের মৃত্যু হয়েছে আজ বহুদিন। শাহজাহান সিংহাসন আরোহণ করবার পর মাত্র তিন বছর জীবিত ছিলেন তিনি। মাতার মৃত্যুর পর পিতার পরিচর্যায় নিজেকে সম্পূর্ণ বিলিয়ে দিয়েছেন জাহান আরা।

অলিন্দে তখন তাঁর চারজন পরিচারিকা অপেক্ষা করছিল। তাদের

দিকে তাকিয়ে সম্রাট নন্দিনী বললেন, তোরা বিশ্রাম কর গিয়ে। আমি একাই নিজের মহলে ফিরে যাব। পরিচারিকারা ইতস্তত করে অলিন্দ অতিক্রম করবার জন্যে পা বাড়াল।

জাহান আরা তখন কিছু দূর এগিয়ে গেছেন। সেখান থেকে মুখ ফিরিয়ে একজনকে আহ্বান করলেন, মরিয়ম—

—বাদশাহ বেগম—

মরিয়ম ছুটে এল।

শাহজাহান তখ্‌তে আরোহণ করবার সঙ্গে সঙ্গে নিজের প্রিয় কন্যাকে বাদশাহ বেগম উপাধিতে ভূষিত করেছিলেন এবং যাতে এই উপাধির সম্মান অক্ষুণ্ণ রাখা সম্ভব হয় তাই এক লক্ষ মোহর ও ছয় লক্ষ টাকা বার্ষিক আয়ের ব্যবস্থা করে দিয়েছিলেন।

জাহান আরা বললেন, আজ গোটা কয়েক সুন্দর রোবাই লিখেছি। নসিফাকে ডেকে নে। তোদের দুজনকে রোবাই শুনিয়ে ছুটি দেব।

অলোকসামান্য রূপবতী এই চাঘতাই কুমারী মোগল রাজপরিবারের রত্ন স্বরূপ। অন্যান্য বহু গুণাবলী ছাড়াও ফার্সিতে রোবাই রচনায় তিনি সিদ্ধহস্তা। দীর্ঘ অলিন্দের উপর দিয়ে মরিয়ম আর নসিফাকে নিয়ে তিনি এগিয়ে চললেন।

জাহান আরার তপ্ত কাঞ্চনবর্ণ দেহলতার সঙ্গে জড়িয়ে রয়েছে মূল্যবান সূক্ষ্ম মসলিন। চলার তালে তালে মসলিনের ওড়না পক্ষ বিস্তার করে উড়ে যাবার চেষ্টা করছে। অল্প দূরত্বের ব্যবধানে অলিন্দ গাত্রে অসংখ্য দীপাধার। চতুর্দিকে আলোকিত হয়ে রয়েছে। হাল্কা নিশ্চিন্ত পরিবেশ।

হঠাৎ এক বিপর্যয় ঘটে গেল। অলিন্দের বাঁকের মুখে সম্রাট কুমারীর ওড়না একটি দীপাধার স্পর্শ করল। দপ করে জ্বলে উঠল আগুন। মরিয়ম ও নসিফার কিংকর্তব্যবিমূঢ় অবস্থার মধ্যেই জাহান আরা অগ্নির জঠরের মধ্যে নিমজ্জিত হলেন। আর্ত

চীৎকার করে উঠলেন সাহায্যের জন্যে। ততক্ষণে নসিফার সংবিৎ ফিরে এসেছে।

সে সাপটে ধরল তাঁকে। মরিয়ম তখন চীৎকারে চতুর্দিক মুখরিত করে তুলেছে। নিঝুম নিস্তব্ধ প্রাসাদ মুহূর্তের মধ্যে জেগে উঠল। প্রকৃতপক্ষে ঘটনাটা কি ঘটেছে প্রথমে কেউই হৃদয়ঙ্গম করতে পারে নি। উন্মুক্ত তরবারি নিয়ে খোজরা ছুটে এল ঘটনাস্থলে।

অলিন্দে শায়িতা জাহান আরা তখন ছটফট করছেন। তাঁর যন্ত্রণা-কাতর সুন্দর মুখে তখন সহস্র কুঞ্চনে বিচিত্র রূপ ধারণ করেছে। অর্ধদগ্ধা হতজ্ঞান নসিফাও এক ধারে পড়ে রয়েছে। প্রচণ্ড কোলাহলে নিদ্রাভঙ্গ হয়ে ছিল শাহজাহানের। কক্ষের বাইরে এলেন। দ্বারের সম্মুখেই তাঁর দেহরক্ষী বাহিনীর অধিনায়ক নিয়াজ খাঁ দণ্ডায়মান ছিল।

সম্রাট দ্রুত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, এত কোলাহল কিসের নিয়াজ ?

কুর্নিশ করে নতমস্তকে নিয়াজ বললে, আলিজা, বাদশাহ বেগম অগ্নিদগ্ধা হয়েছেন।

—কি বললে জাহান অগ্নিদগ্ধা হয়েছে ?

আর সেখানে অপেক্ষা করলেন না প্রৌঢ় সম্রাট।

উন্মত্তের মতো ছুটে চললেন প্রিয় কন্যার নিকটে। একি অসম্ভব কথা শুনলেন তিনি। ঘটনাস্থলে পৌঁছে তিনি দেখলেন জাহান আরাকে তুলে নিয়ে যাওয়া হয়েছে তাঁর কক্ষে। সম্রাট কন্যার কক্ষের দিকে ধাবিত হলেন।

এই সংবাদ মুহূর্তের মধ্যে ছড়িয়ে পড়ল সমগ্র রাজধানীতে। প্রখ্যাত হাকিমরা জাহান আরার চিকিৎসার ভার গ্রহণ করলেন। শাহজাহান তাঁদের জন্যে উন্মুক্ত করলেন নিজের ধনাগার। সমস্ত যাক—তিনি শুধু প্রিয়তমা কন্যার প্রাণ ফিরে পেতে চান। তাঁর এই সুলক্ষণা কন্যাকে কোন মূল্যেই সম্রাট হারাতে প্রস্তুত নন। তাঁর চরম দুর্দিনে

—রাজনৈতিক চক্রজালে যখন তিনি ঘুরপাক খাচ্ছেন, জাহান আরার জন্ম সেই সময়। সঙ্গে সঙ্গে পরিবেশ অন্যরূপ নিল। এর পরের ইতিহাস সর্বত্র শাহজাহানের জয়লাভের ইতিহাস। তাই কন্যাকে এত অধিক স্নেহ করেন তিনি।

মাসাধিক কাল অতিক্রান্ত হয়েছে।

জাহান আরা এখনও নিরাময় হন নি। বরং তাঁর দেহের অগ্নিদগ্ধ ক্ষতর অবস্থা আরো শোচনীয় হয়ে উঠেছে। হাকিমরা বহু চেষ্টা করেও কিছু করতে পারছেন না। কন্যার অসুস্থতার দরুন সম্রাট দরবারে যাওয়াও ছেড়ে দিয়েছেন। অবস্থান করছেন দিবারাত্রি রুগীর কক্ষে।

প্রতিদিন সন্ধ্যার পর থেকে মধ্যরাত্রি পর্যন্ত খোদার কাছে প্রার্থনা করছেন। তারপর এক সহস্র মুদ্রা জাহান আরার উপাধানের তলায় রেখে দিচ্ছেন। সেই মুদ্রা প্রতিদিন দরিদ্রদের মধ্যে বিতরিত হচ্ছে।

ইতিমধ্যে অগ্নিদগ্ধা নসিফার মৃত্যু হয়েছে।

উৎকণ্ঠার মধ্যেই সময় কেটে চলেছে।

একদিন প্রাতে সম্রাটের জ্যেষ্ঠ পুত্র দারা ম্রিয়মাণ মুখে জ্যেষ্ঠা ভগিনীর কক্ষে প্রবেশ করলেন। শাহজাহান তখন একাগ্র দৃষ্টিতে জাহান আরার মুখের দিকে তাকিয়ে বসেছিলেন।

—জাহাঁপনা—

—কে, দারা? কিছু বলতে চাও?

—দীর্ঘদিন হল আপনি দরবারে যাননি। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা সৃষ্টি হওয়ার সম্ভাবনা দেখা দিয়েছে।

অসহায় দৃষ্টিতে শাহজাহান শাহীবুলান্দের দিকে তাকিয়ে বললেন, জাহানকে এই অবস্থায় ফেলে আমি কি ভাবে দরবারে যেতে পারি?

—কিন্তু—

--শোন দারা, মোগল রাজপরিবারের প্রথানুসারে আমার পরই তখ্‌তের অধিকারী তুমি। সুতরাং আমার অনুপস্থিততে এখনও তুমি রাজকার্য পরিচালনা করতে পার।

শাহীবুলান্দ ইকবাল দারা শিকো সম্রাটের কথায় অত্যন্ত পুলকিত হলেন। শ্রেষ্ঠ সুযোগ তাঁর সামনে উপস্থিত। রাজকার্য পরিচালনার ব্যাপারে একবার কায়েমী হয়ে বসলে আওরঙ্গজেবের সাধ্য কি তাঁকে টলাতে পারে।

সম্রাট আবার বললেন, আরেকটা কথা, অবিলম্বে সুজা, আওরঙ্গজেব ও মুরাদকে জাহানের অসুস্থতার সংবাদ প্রেরণ কর। যাও—

দ্বারের দিকে কয়েক পা অগ্রসর হয়ে আবার ফিরে দাঁড়ালেন দারা। সসঙ্কোচে বললেন, জাহাঁপনা—

—আরো কোন বক্তব্য আছে ?

—আপনার প্রদত্ত সমস্ত আদেশ আওরঙ্গজেব উপেক্ষা করেছে সংবাদ পেয়েছি। গম্ভীরভাবে কয়েকবার পদচারণা করলেন শাহজাহান। বললেন তারপর, তার ঔদ্ধত্য ক্রমেই গগনস্পর্শী হয়ে উঠছে লক্ষ্য করছি। জাহান সুস্থ হয়ে ওঠবার পরই আওরঙ্গজেব সম্বন্ধে ব্যবস্থা অবলম্বন করব।

কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন দারা।

জাহান আরার অসুস্থতার সংবাদ বাংলা ও গুজরাটে শুজা ও মুরাদের কাছে প্রেরিত হল। কিন্তু দাক্ষিণাত্যের সুবেদার আওরঙ্গজেবকে এ সম্পর্কে কোন সংবাদ দেওয়াই হল না। কাজেই শুজা ও মুরাদ রাজধানীতে উপস্থিত হলেও আওরঙ্গজেব এলেন না।

সম্রাটকে এই বিষয় দারা সচেতন করলেন। আওরঙ্গজেবের অনুপস্থিতি যে শাহনশাহর আদেশকে আরেক দফা উপেক্ষা প্রদর্শন, একথা তিনি সালঙ্কারে বর্ণনা করতে ভুললেন না।

আরিফ তখন দাক্ষিণাত্যেই অবস্থান করছে। আওরঙ্গজেবের খাস পার্শ্বচরদের মধ্যে সে স্থান করে নিতে পেরেছে। পারস্যে আর ফিরে যাবার ইচ্ছে নেই। জীবনকে অন্য সূত্র দিয়ে গেঁথে নেবে। তার পারস্যের সম্পত্তি খুল্লতাত পুত্ররা ভোগ করুক।

প্রয়োজনের তাগিদে সেদিন আরিফ সুলতানের বাজারে গিয়েছিল। ইয়ারবক্সের সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। ইয়ারবক্স আগে রাজস্ব বিভাগে নিযুক্ত ছিল। এখন তার কাজ হল শাহী ফৌজের জন্যে অশ্ব সংগ্রহ করা।

রাজধানীতেই আলাপ হয়েছিল দুজনের।

কুশল বিনিময়ের পর আরিফ বললে, রাজধানীর খবর কি বল ?

—খবর সেই রকমই। বাদশাহ বেগম সুস্থ হয়ে উঠবেন কি না সন্দেহ।

—বাদশাহ বেগম! কি হয়েছে তাঁর ?

সবিস্ময়ে ইয়ারবক্স বললে, সে কি, শোননি কিছু! বাদশাহ বেগম আগুনে ঝলসে গেছেন। তাঁকে বাঁচাবার জন্যে তো শাহনশাহ জলের মতো টাকা খরচ করছেন। বাংলা আর গুজরাটের দুই শাহজাদা তো এখন ওখানেই।

আরিফ ঘটনাটা পুঙ্খানুপুঙ্খ জেনে নিয়ে, ছুটল আওরঙ্গজেবের কাছে। তিনি সমস্ত শুনে অনেকক্ষণ চিন্তা করলেন। শুজা আর মুরাদ আহ্বান পেয়ে গেছে না, এমনি গেছে। আহ্বান পেয়ে যদি গিয়ে থাকে তবে তাঁকে আহ্বান না করে দারা নতুন কোন চক্রান্তের সৃষ্টি করছে অবধারিত।

ঘটনা যাই হোক, আওরঙ্গজেবের আর দাক্ষিণাত্যে অপেক্ষা করা চলবে না। অবিলম্বে তিনি যাত্রা করলেন। পৌঁছাবার পর দীর্ঘ পথের ক্লেশকে উপেক্ষা করে, বিশ্রাম না নিয়ে তিনি জ্যেষ্ঠা ভগিনীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার উদ্দেশ্য নিয়ে তাঁর মহলে উপস্থিত হলেন। কিন্তু মহলের অভ্যন্তরে প্রবেশ করতে পারলেন না। দ্বার রক্ষক খোজারা

তাঁর পথরোধ করল। তাদের মধ্যে একজন নতমস্তকে বললে, অপরাধ ক্ষমা করবেন। আমরা সম্রাটের আদেশ পালন করছি।

আওরঙ্গজেব স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। তাঁর গৌরবর্ণ ললাটে কুটিল ভ্রূকুটি দেখা দিল। তাঁর আর অনুমান করে নিতে কষ্ট হচ্ছে না এক গভীর চক্রান্ত সত্যিই গড়ে উঠেছে। তিনি সেখানে আর অপেক্ষা করলেন না। গেলেন মুরাদের প্রাসাদে। মুরাদ তখন মখমলের তাকিয়া ঠেসান দিয়ে পাত্রের পর পাত্র সরাব উজাড় করে চলেছেন। রক্তাভ নেত্রে আওরঙ্গজেবের দিকে তাকিয়ে বললেন, কবে এলেন?

জাজিমের উপর বসতে বসতে আওরঙ্গজেব বললেন আজই।

মুরাদ তাঁর এই বড় ভাইটিকে শ্রদ্ধা এবং ভয় দুই করতেন। তাঁর ধারণা ছিল আওরঙ্গজেব তাঁর একজন পৃষ্ঠপোষক।

—আপনাকে কিছু বিমর্ষ দেখাচ্ছে।

—বাদশাহ বেগমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলাম, কিন্তু তাঁর মহলে ঢুকতে দেওয়া হল না। শুনলাম সম্রাটের আদেশ নেই।

—ষড়যন্ত্র। আরেক পাত্র সরাব গলায় ঢেলে দিয়ে মুরাদ বললেন, শাহনশাহর প্রিয়পুত্র, আমাদের জ্যেষ্ঠ দারার ষড়যন্ত্র এই সমস্ত। তারই জন্যে আমায় মরুভূমির রাজ্য গুজরাটে পড়ে থাকতে হয়েছে।

দাঁতে দাঁত চেপে আওরঙ্গজেব বললেন, তুমি কি ভাব আমার এবিষয়ে অজ্ঞতা আছে? তা নয় মুরাদ, আমি সব বুঝি। দারার সঙ্গে বোঝা-পড়া আমার একদিন হবেই। সে যাক—। উপস্থিত যে সম্রাটের সঙ্গে সাক্ষাতের ব্যবস্থা তোমাকে করে দিতে হয়। তিনি বাদশাহ বেগমের মহল থেকে মোটেই বেরুচ্ছেন না। নইলে—

—আজ কোন্ দিন? জুম্মা না। সপ্তাহের এই দিনটি শাহনশাহ বৈকালিক নামাজের পর তাজমহলে যান। আপনি সেই সময় তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে পারেন।

মৃদু হেসে আওরঙ্গজেব মুরাদের প্রস্তাবকে স্বাগত জানালেন।

বৈকালিক নামাজ শেষ করে প্রিয়তমা পত্নী মমতাজের স্মৃতিসৌধ তাজমহল দেখতে গিয়েছিলেন। এখন ফিরে চ'লছেন। জাহান আরা অসুস্থ হয়ে পড়বার পর তাঁর কোন কাজই সঠিক নিয়মে চলছে না। শুধু এই একটি মাত্র ব্যতিক্রম—প্রত্যেক জুম্মায় পূর্বের মতো এখনও ঠিক তাজমহলে যাচ্ছেন। অবশ্য এই স্মৃতিসৌধ নির্মাণ এখনও সম্পূর্ণ হয়নি।

চিন্তিত মনে অশ্বারোহণে প্রাসাদে ফিরে চলেছেন শাহনশাহ। তাঁর সঙ্গে দারা ও এক সহস্র গণ্যমান্য ব্যক্তি রয়েছেন। দেহরক্ষীবাহিনী তো আছেই। এখনও জাহান আরার রোগ নিরাময় হবার কোন লক্ষণই প্রকাশ পায় নি।

পারস্য থেকে পারস্য সম্রাটের সুপ্রসিদ্ধ চিকিৎসক আগ্রায় এসেছিলেন। তাঁকে দিয়েও চিকিৎসা করানো হয়েছে। কোন ফল পাওয়া যায়নি। কন্যার ভবিষ্যৎ চিন্তায় শাহজাহান তাই সর্বদা চিন্তিত।

পথেই আওরঙ্গজেব শাহনশাহর সঙ্গে মিলিত হলেন। তাঁকে দেখে ভ্রূকুঞ্চিত করলেন শাহজাহান। আওরঙ্গজেব পিতাকে সম্মান প্রদর্শন করবার পর বললেন, আমাকে বাদশাহ বেগমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে দেওয়া হয়নি জাহাঁপনা। আমি অত্যন্ত অপমানিত বোধ করেছি।

—নিজের মান অপমান সম্বন্ধে তুমি অত্যন্ত সচেতন তা আমি জানি ওই সঙ্গে এও জানি, গুরুজন স্থানীয়দের অপমান করতে তুমি পশ্চাদ্‌পদ নও।

—আমি কোন গুরুজনকে অপমান করি নি।

অশ্বের লাগাম দৃঢ় হস্তে আকর্ষণ করে শাহজাহান বললেন, সত্যকে মিথ্যা দিয়ে ঢাকবার চেষ্টা ক'রো না। তোমার পিতা হিন্দুস্থানের শাহনশাহর একাধিক আদেশকে উপেক্ষা করে তুমি তাঁকেই অপমানিত করেছে।

আওরঙ্গজেব নীরব রইলেন।

—জাহানের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গিয়েছিলে কোন্ সাহসে? আজ কয়েক মাস ধরে সে মৃত্যুর দ্বারে দাঁড়িয়ে রয়েছে এ সংবাদ পেয়েও তুমি এতদিন আসনি। এখন এসেছ দায়সারাভাবে কর্তব্য শেষ করতে!

—বাদশাহ বেগম অসুস্থা একথা আমি জানতাম না। আমাকে কোন সংবাদ প্রেরণ করা হয়নি।

—মিথ্যা কথা। দারা তোমাকে সংবাদ পাঠিয়েছে।

দৃঢ়তার সঙ্গে আওরঙ্গজেব বললেন, মিথ্যা কথা আমি বলছি না জাহাঁপনা। যাকে আপনি সংবাদ প্রেরণ করতে আদেশ দিয়েছিলেন, সেই আপনাকে মিথ্যা সংবাদ পরিবেশন করেছে।

দারা নিকটেই ছিলেন। ঝলসে উঠলেন।

—স্তব্ধ হও কুক্কুর।

মুহূর্তের মধ্যেই ভদ্রতার মুখোস ছিঁড়ে পড়ল। কুক্কুর সম্বোধনে আওরঙ্গজেব ক্ষিপ্ত হয়ে উঠলেন।

—সংযত ভাষায় কথা বলুন নইলে ....

—নইলে কি করবে? আমি আবার বলছি, তুমি দাক্ষিণাত্যের ক্ষিপ্ত কুক্কুর—

দারার কথা শেষ হবার সঙ্গে সঙ্গে খাপ থেকে অসি উন্মুক্ত করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন আওরঙ্গজেব। মর্মন্তুদ ঘটনা ঘটে যেতে পারত কিন্তু নিয়াজ খাঁ ক্ষিপ্র হস্তে আওরঙ্গজেবের অসিকে প্রতিহত করে দারার জীবন রক্ষা করল।

আচম্বিতে এই বিস্ময়কর ঘটনা ঘটে যাওয়ায় শাহজাহান স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। কিছুক্ষণ তাঁর বাক্‌রোধ হয়ে গেল, তারপর বললেন, আমার সম্মুখে অসি খাপ মুক্ত করা গুরুতর অপরাধ নিশ্চয় তোমার অজানা নয়। সেই অপরাধের শাস্তি হল মৃত্যুদণ্ড। কিন্তু তোমার

প্রতি আমি যথেষ্ট দয়া প্রদর্শন করলাম, মৃত্যুদণ্ডের পরিবর্তে তোমাকে দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তার পদ থেকে বিচ্যুত করা হল।

কঠিন মুখে নিজের শাস্তিবাক্য শ্রবণ করলেন আওরঙ্গজেব। একটি কথাও বললেন না। নিজের কথা শেষ করে শাহজাহান অগ্রসর হলেন।

মাসাধিক অতিক্রান্ত হয়েছে।

অপমানিত অবহেলিত আওরঙ্গজেব আগ্রাতেই আছেন। এদিকে জাহান আরার অবস্থার আরো অবনতি ঘটেছে। তাঁকে বোধহয় সত্যিই বাঁচানো যাবে না। রাজধানীতে বিষাদের ছায়া। নামাজ শেষ করে নিজের প্রাসাদের একটি কক্ষে অন্যমনস্কভাবে বসেছিলেন আওরঙ্গজেব। এই সময় কক্ষে প্রবেশ করল আরিফ।

—বাদশাহ বেগমের অবস্থা এখন কেমন, কিছু জান?

—তাঁর অবস্থা ভাল নয় শাহজাদা।

—এত চিকিৎসার পরও যে কেন তিনি নিরাময় হচ্ছেন না বিস্ময়ের বিষয়।

আরিফ এক অসম্ভব কথা বলে বসল।

—আমি বোধহয় তাঁকে সুস্থ করে তুলতে পারি।

—তুমি! বিস্ময়ে ভেঙে পড়লেন আওরঙ্গজেব।—বিখ্যাত চিকিৎসকবর্গ এত পরিশ্রম করে যা করতে পারছেন না, তুমি কিভাবে তা পারবে?

—আমাদের দেশীয় একটি প্রলেপের কথা আমার জানা আছে শাহজাদা। সেই প্রলেপ প্রয়োগ করলে বাদশাহ বেগমের ক্ষত নিশ্চয় শুকিয়ে যাবে।

—এতদিন একথা বলনি কেন?

—সাহস সঞ্চয় করতে পারি নি।

ক্ষণেক চিন্তা করলেন আওরঙ্গজেব। তাঁর চোখ উজ্জ্বল হয়ে উঠল। যদি আরিফ বাদশাহ বেগমকে সুস্থ করে তুলতে পারে তাহলে……। এই সুযোগ গ্রহণ করবেন শাহজাদা। সৌভাগ্য হয়তো আবার এই পথ দিয়েই ফিরে আসতে পারে, বলা তো যায় না।

তিনি বললেন, আমি তোমাকে একটি পত্র লিখে দিচ্ছি, মুরাদের নিকটে যাও। সে তোমাকে জেনানা মহলে নিয়ে যাবে। মনে রেখো, যদি আমার জ্যেষ্ঠ ভগিনীকে সুস্থ করে তুলতে পার, আমি তোমাকে সোনায় মুড়ে দেব।

—আল্লাহ্, আপনাকে দীর্ঘ জীবন দিন।

আরিফ নতমস্তকে দণ্ডায়মান রইলো।

আওরঙ্গজেব পত্র রচনায় ব্যস্ত হলেন।

পত্র নিয়ে আরিফ তখনই রওয়ানা হল মুরাদের নিকট। মুরাদ তাকে নিয়ে গেলেন জেনানা মহলে। সমস্ত শুনে সম্রাট আগ্রহে আরিফকে চিকিৎসা করবার আদেশ দিলেন। এখন তাঁর অবস্থা অতল জলে নিমজ্জিত মানুষের মতো। খড়কুটো যা হাতের কাছে পাচ্ছেন, তাকেই অবলম্বন করতে চাইছেন তিনি।

নিষ্ঠার সঙ্গে জাহান আরার চিকিৎসায় আত্মনিয়োগ করল আরিফ। দিন দশেকের মধ্যেই ফলাফল বুঝতে পারা গেল। জ্বর সম্পূর্ণ তিরোহিত হয়েছে, ক্ষত ক্রমেই শুকিয়ে আসতে লাগল। শুধু শাহনশাহ নয়, সমস্ত আগ্রাবাসী বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেল। প্রখ্যাত চিকিৎসকবর্গ যা করতে পারেন নি, একজন সামান্য ব্যক্তি সেই অসাধ্য সাধন করতে চলেছে!

এই সমস্ত ব্যাপার বিন্দু-বিসর্গ অবশ্য জাহান আরা জানেন না। কি করেই বা জানবেন, অসুস্থতার দরুন প্রায় অজ্ঞান অবস্থাতেই তাঁর সময় কেটেছে। আজ নিজেকে বেশ সুস্থ মনে করছেন। একটু বেলাতেই ঘুমের ঘোর কেটেছে তাঁর। কিছুক্ষণ চোখ বন্ধ করে রইলেন।

চোখ খুলতেই, দেখতে পেলেন মরিয়মের সুন্দর মুখ। সে তাজা ফল কেটে পাত্রে রাখছিল। তখন কক্ষে আর কেউ ছিল না। কন্যার সুস্থতা লক্ষ্য করে বহুদিন বাদে শাহনশাহ নিজের মহলে গেছেন বিশ্রাম করতে।

জাহান আরা চোখ মেলেছেন লক্ষ্য করেই মরিয়ম নিজের কাজ ফেলে তাঁর কাছে এগিয়ে এল। বললে, কেমন আছেন বাদশাহ বেগম?

—ভাল। আমাকে সাহায্য কর। আমি জানলার সামনে গিয়ে দাঁড়াতে চাই।

জাহান আরা শয্যায় উঠে বসলেন। পালঙ্ক থেকে নিজের দুটি পা নামিয়ে মরিয়মকে অবলম্বন করে দাঁড়াতে যাবেন—ঠিক সেই সময় কে বলে উঠল, শয্যা ছেড়ে উঠবেন না। শরীরকে এখন পূর্ণ বিশ্রাম দিতে হবে।

জাহান আরা মুখ ফিরিয়ে দেখলেন, ঘরের মধ্যে প্রবেশ করেছে একজন রূপবান যুবক। তার হাতে কিছু ঔষধপত্র। তিনি বিস্মিত হয়ে মরিয়মের দিকে তাকালেন। যুবক তৎক্ষণে হস্তস্থিত ঔষধপত্র তার হাতে দিয়ে, বাদশাহ বেগমকে সম্মান জানিয়ে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল।

সাগ্রহে জাহান আরা প্রশ্ন করলেন, কে এই যুবক?

মরিয়ম সসম্ভ্রমে উত্তর দিল, আপনার জীবনদাতা সাহেবা।

—আমার জীবনদাতা!

এরপর সমস্ত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে তিনি শুনলেন মরিয়মের মুখ থেকে। আওরঙ্গজেবের একজন সাধারণ সহচর এই অসাধ্যসাধন করেছে ভেবে তিনি হতবাক্ হয়ে যান।

জাহান আরার সম্পূর্ণ নিরাময় হয়ে উঠতে আরো মাস দুয়েক সময়

লেগেছে। শাহনশাহ এই উপলক্ষ্যে ভোজ ও উৎসবের ব্যবস্থা করলেন। বিরাট মোগল পরিবারের সর্বজন সমক্ষে তিনি কন্যাকে দশলক্ষ আশরফি উপহার দিলেন। তারপর সস্নেহে বললেন, এবার তুমি নিজে থেকে আমার কাছ থেকে কিছু চেয়ে নাও জাহান। সঙ্কোচ ক'র না।

নম্র কণ্ঠে জাহান আরা বললেন, আপনি আমাকে প্রয়োজনের অতিরিক্ত দিয়েছেন বা-জান। আবার....

—তা হোক। তুমি বল।

সুস্থ হয়ে ওঠবার পর আওরঙ্গজেবের সঙ্গে তাঁর সাক্ষাৎ হয়েছিল। তিনি শুনে ছিলেন শাহনশাহ কর্তৃক আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তার পদ থেকে চ্যুত হয়েছেন। জাহান আরা কনিষ্ঠদের ভালবাসেন। তাছাড়া এই সূত্রে ভ্রাতৃ-বিরোধ জটিল হয়ে উঠতে পারে। কোন মূল্যে তা বাঞ্ছনীয় নয়।

তিনি ইতস্তত করে বললেন, আপনি আমার একটি অনুরোধ পূর্ণ করুন। এ ছাড়া আর কিছু চাইবার নেই।

—বল, জাহান?

—আপনি আওরঙ্গজেবকে পূর্ব গৌরবে প্রতিষ্ঠিত করুন বা-জান। জাহান আরার এই কথায় সমস্ত আত্মীয় পরিজনবর্গ সচকিত হলেন। দারার দৃষ্টি তীক্ষ্ণ হয়ে উঠল। শাহনশাহর মুখে বিরক্তির ছায়া নামল। তিনি বললেন, তোমার অন্য যে কোন অনুরোধ আমি নিশ্চয় রাখব জাহান।

—আমার এই অনুরোধ আপনি কেন রাখবেন না বা-জান?

—আওরঙ্গজেবের ঔদ্ধত্যের কথা তুমি জান না। ওর এখন শাস্তি ভোগ করাই উচিত। ও শ্বেত-সর্প।

—আপনার কোন্ পুত্র উদ্ধত নয়? বর্তমানে ও প্রশ্ন নিরর্থক বা-জান। আমার জীবন ফিরে পাবার জন্যে আপনি মরিয়া হয়ে উঠে ছিলেন।

জলের মতো অর্থ ব্যয় করেছেন। কেউ আমাকে সুস্থ করে তুলতে পারে নি। বিস্মৃত হবেন না, শেষে আওরঙ্গজেবের পার্শ্বচর আরিফ আমাকে জীবন দান করেছে। শাহজাদার প্রতি এখন আমার ও আপনার কিছু কর্তব্য রয়েছে।

এই ভাষায় শাহনশাহকে অন্য কেউ কিছু বললে অনর্থ ঘটে যেত। কিন্তু জাহান আরার কথা স্বতন্ত্র। শাহজাহান ক্ষণেক চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, বেশ তোমার যখন ইচ্ছা তখন তাই হোক। এই মুহূর্ত থেকে শাহজাদা আওরঙ্গজেব দাক্ষিণাত্যের শাসনকর্তা নিযুক্ত হলেন।

জাহান আরা আনন্দিত হলেন।

বলা বাহুল্য আওরঙ্গজেবও আনন্দিত হলেন।

কিন্তু দারা.......

ভোজ শেষ হল ক্রমে।

এবার আরম্ভ হবে নৃত্যগীতের অনুষ্ঠান। অন্যান্য অনেকের সঙ্গে জৌনপুরের সুবিখ্যাত বাঈজী সকিলা খানমও এসেছে। প্রথমে সেই অনুষ্ঠানের সূচনা করবে। জাহান আরা ক্লান্ত বোধ করছিলেন। শরীরে এখনও তেমন বল সঞ্চয় হয়নি। তিনি বিশ্রামের জন্যে ব্যগ্র হয়ে উঠলেন।

উৎসবের ব্যবস্থা হয়ে ছিল উদ্যানে। শাহনশাহর কাছ থেকে অনুমতি নিয়ে তিনি উদ্যান অতিক্রম করে প্রাসাদে প্রবেশ করলেন। সম্পূর্ণ একা তিনি নিজের মহলে ফিরে চলেছেন। মরিয়ম সঙ্গে নেই। অন্যান্য পরিচারিকাদেরও আজ ছুটি দিয়েছেন। প্রাসাদে প্রবেশ করে কয়েক পা অগ্রসর হয়েছেন মাত্র, দারার সঙ্গে সাক্ষাৎ হল বুকে হাত বেঁধে গম্ভীর মুখে শাহীবুলান্দ দাঁড়িয়ে ছিলেন।

জাহান আরা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, তুমি এখানে দাঁড়িয়ে?

—আপনার জন্য অপেক্ষা করছিলাম।

—কিছু বলবে ?

—আমি কখনই চিন্তা করিনি আপনি এইভাবে আওরঙ্গজেবকে সমর্থন করবেন।

—প্রয়োজন হলে আমি তোমাকেও সমর্থন করব। বিস্মৃত হ'য়ও না আমি তোমাদের জ্যেষ্ঠা।

দৃঢ় কণ্ঠে দারা বললেন, আওরঙ্গজেবকে সমর্থন করা আপনার উচিত হয়নি। সে জাহাঁপনার সমস্ত আদেশকে উপেক্ষা করেছে। সে সাম্রাজ্যের মধ্যে অশান্তি ছড়াবার চেষ্টা করছে।

জাহান আরার কণ্ঠেও দৃঢ়তা প্রকাশ পেল।

—উচিত বিবেচনা করেই যা করবার করেছি। তোমার আর কিছু বলবার মতো কথা নেই নিশ্চয়ই ?

—আছে। আপনি তাকে সমর্থন করলেন তার রহস্যটা আমার জানা আছে।

—গূঢ় রহস্য !

—হ্যাঁ।

—কি বলতে চাও তুমি ?

শ্লেষের সঙ্গে দারা বললেন, আপনাকে সুস্থ করে তুলেছে আওরঙ্গজেবের পার্শ্বচর। কাজেই ওর পক্ষ অবলম্বন আপনি করবেনই। তাছাড়া আমার অজানা নয় যে, আপনার জীবনদাতা যুবক এবং রূপবান।

—স্তব্ধ হও—

বাঘিনীর মতো গর্জে উঠলেন জাহান আরা।

—বয়ঃজ্যেষ্ঠার সঙ্গে কিভাবে কথা বলতে হয় সে শিক্ষা আজও তোমার হয়নি। এত সাহস !! কদর্য ইঙ্গিত করছ আমার সম্পর্কে !!!

তিনি আর অপেক্ষা করলেন না।

ক্রোধে অভিমানে তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপছে। কিন্তু কিছু দূর দ্রুত

অগ্রসর হবার পর গতি মন্থর করলেন। কেউ কোথাও নেই। উৎসবে মেতে আছে সকলে মন থেকে ক্রোধ ক্রমেই মুছে যাচ্ছে, আর সেই স্থান অধিকার করছে একরাশ চিন্তা। কিন্তু······

দারা যে ইঙ্গিত দিল, সত্যই কি সেই কারণে আওরঙ্গজেবকে সমর্থন করেছেন তিনি? নিজের মনের গহনে নেমে গেলেন জাহান আরা। মানসপটে ভেসে উঠল আরিফের সুন্দর কান্তি। এক অজানা কারণেই মনের মধ্যটা হুহু করে উঠল বয়স্কা চাকঘতাই কুমারীর।

পরমুহূর্তে নিজেকে সংযত করলেন তিনি। ছি ছি—একি ভাবছেন! একটা অবাস্তব চিন্তা তাঁর মনে প্রশ্রয় পাবে কেন? তবে জীবনদাতা সম্বন্ধে তাঁর কিছু করণীয় রয়েছে। তার বিষয় সম্পূর্ণ নিশ্চেষ্ট থাকাটা মনুষ্যত্বের পরিচায়ক নয়। আরিফের প্রভু আওরঙ্গজেবের জন্য তিনি দাক্ষিণাত্যের সুবেদারী প্রার্থনা করলেন। আর প্রকৃত প্রার্থীর জন্য কিছুই করবেন না।

তা হয় না। জাহান আরা হতে দেবেন না।

শাহনশাহর কাছে আরিফের জন্য দরবার করবেন।

বাদশাহ বেগমের মহলে আর যাওয়া হল না। তিনি আবার ফিরে চললেন উদ্যানে—যেখানে শাহনশাহ রয়েছেন।

তারপর—

তারপর কপর্দক শূন্য পারসীক যুবক হিন্দুস্থানের একছত্র সম্রাটের অনুগ্রহে বিহারে কিছু জায়গীর লাভ করল। আওরঙ্গজেবও নিজের প্রতিশ্রুতি রাখলেন, আরিফ তাঁর কাছ থেকে পেল প্রচুর ধনরত্ন।

শেখ আরিফ আলী হিন্দুস্থানের স্থায়ী বাসিন্দা হয়ে গেল।

বছর দশেক অতিক্রান্ত হয়েছে।

আরিফ আলী বিহারের একজন সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি হয়ে উঠেছেন। বিয়ে

করেছেন সম্ভ্রান্ত ঘরেই। সন্তানের জনক হয়েছেন। তিনি এখন একজন সুখী মানুষ।

সময় কেটে চলল।

পরিণত বয়সেই আরিফ আলী দেহ রাখলেন।

তাঁর পুত্র ইমতিয়াজ আলী জন্মদাতার চেয়ে কোন বিষয়ে ন্যূন ছিলেন না। মোগল দরবারে তাঁর অবাধ গতি ছিল। আওরঙ্গজেব ইমতিয়াজকে স্নেহের চক্ষে দেখতেন। শেষ পর্যন্ত মনসবদারের পদ পেয়ে তিনি পাটনায় দেওয়ানী করতে আরম্ভ করলেন। ইমতিয়াজ আলীর পুত্র রাজী আলী রাজনৈতিক ব্যাপারে আগ্রহ প্রকাশ করেন নি। তিনি নির্বিরোধ এবং শান্ত প্রকৃতির লোক ছিলেন।

ইমতিয়াজ আলী রাজনৈতিক খচাখচির মধ্যে থাকলেও ফার্সীতে রোবাই লিখতেন। রাজী আলী তাও পারতেন না। তবে সঞ্চিত অর্থকে কি উপায়ে চতুর্গুণ করা যায় সে সম্পর্কে তাঁর তীক্ষ্ণ জ্ঞান ছিল।

জায়গীর তো ছিলই, তেজারতী কারবারে নেমে পড়লেন রাজী আলী। তাঁর পুত্র কাশিম আলী পিতামহর গুণাবলী নিয়ে দুনিয়ায় এসেছিলেন। অল্প বয়স থেকেই রোবাই রচনায় সিদ্ধ হস্ত হয়ে উঠলেন। গণিতের উপরও তাঁর আন্তরিক আগ্রহ পরিলক্ষিত হল।

রাজী আলী পুত্রের মতিগতিতে শঙ্কিত হলেন। তাঁর সন্তান আশরফি না চিনে ইনিয়ে-বিনিয়ে রোবাই লিখে জীবন অতিবাহিত করবে, খুবই পরিতাপের বিষয়। তিনি কাশিম আলীকে ব্যবসার মধ্যে জড়িয়ে নেওয়াই মনস্থ করলেন। সরফরাজ খাঁ নামে এক ব্যক্তিকে রাজী আলী বহু টাকা ঋণ দিয়ে ছিলেন। চড়া হারে সুদ দেবে সরফরাজ এই রকম কথা পাকা ছিল। কিন্তু কার্যক্ষেত্রে দেখা গেল সুদ দেওয়া তো দূরের কথা, আসলটাই আত্মসাৎ করবার পরিকল্পনা করেছে সরফরাজ.

সে কিছুদিন গা ঢাকা দিয়ে থাকার পর মুর্শিদাবাদ চলে গেল। নবাব সরকারে বড় একটা চাকরি সংগ্রহ করে সেখানেই আছে। বিহারে তার এ জীবনে হয়তো আসার সম্ভাবনাই নেই। সুতরাং রাজী আলীর টাকা প্রায় যায় যায়। তিনি স্থির করলেন কাশিম আলীকে পাঠাবেন মুর্শিদাবাদ। যে কোন উপায়ে হোক সরফরাজ খাঁর কাছ থেকে সে টাকাটা উদ্ধার করে নিয়ে আসবে। এই সূত্রে কাশিম আলীকে ব্যবসায় নামিয়ে দেওয়ার সুযোগ হবে।

কাশিম প্রথমে আপত্তি করে ছিলেন মুর্শিদাবাদ যেতে।

রাজী আলীর দৃঢ়তায় তাঁকে শেষ পর্যন্ত সম্মত হতে হল।

মুর্শিদাবাদে পা দেবার পর থেকেই কাশিম আলী মীরকাশিম নামে খ্যাত হয়ে পড়লেন। সরফরাজ খাঁর সন্ধান পেতে তাঁর বিলম্ব হল না। কিন্তু ঋণ পরিশোধ করবার তেমন কোন আগ্রহ দেখা গেল না খাঁ সাহেবের। অনন্যোপায় হয়ে মীরকাশিম নবাবের দরবারে নালিশ জানাবার মনস্থ করলেন।

নবাব আলীবর্দী একাগ্রমনে শুনলেন মীরকাশিমের আবেদন। দলিল-দেখলেন। তিনি বিচক্ষণ ব্যক্তি। সরফরাজ খাঁর অসাধুতা সম্পর্কে তাঁর মনে কোন সন্দেহ রইল না। সরফরাজকে আহ্বান করে তিনি কৈফিয়ত দাবি করলেন। দেবার মতো কৈফিয়ত সরফরাজের ছিল না। সে নবাবের দণ্ডাদেশ শোনবার জন্য নীরবে অপেক্ষা করতে লাগল।

আলীবর্দী বললেন, আমার কোন প্রজা এইভাবে কারুর সঙ্গে তঞ্চকতা করুক তা আমি কখনই বরদাস্ত করব না। সরফরাজ খাঁ—

—জাহাঁপনা—

—তোমাকে তুদিন সময় দেওয়া হচ্ছে। এই সময়ের মধ্যে ঋণ পরিশোধ করতে পার ভাল, নইলে তোমার স্থাবর অস্থাবর সমস্ত সম্পত্তি বাজেয়াপ্ত করে এই যুবকের ঋণ নবাব সরকার শোধ করবেন।

সরফরাজ নতমস্তকে দরবার ত্যাগ করল।

আলীবর্দী মীরকাশিমকে তখ্‌ত মুবারকের নিকট আহ্বান করে তাঁর সমস্ত পরিচয় সংগ্রহ করলেন। সম্ভ্রান্ত বংশীয় এই যুবকটিকে তাঁর বিলক্ষণ পছন্দ হল। নবাব মীরকাশিমের মধ্যে কি দেখেছিলেন অনুমান করা শক্ত। তবে তিনি তাঁকে বললেন, তোমার জীবন যদি মুর্শিদাবাদে অতিবাহিত করবার অভিপ্রায় থাকে তাহলে ব্যক্ত কর। তোমাকে কোন সম্মান জনক কাজে নিযুক্ত করা কঠিন হবে না।

মীরকাশিম সবিনয়ে এই লোভনীয় প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন। তিনি জানালেন বর্তমানে চাকরির বন্ধনে জড়িয়ে পড়বার ইচ্ছে তাঁর নেই। ভবিষ্যতে প্রয়োজন হলে নবাবের নিকট আর্জি নিয়ে আসবেন। দরবার ভঙ্গ হল।

দিন দুয়েকের মধ্যে সরফরাজ খাঁ বাধ্য হল ঋণ পরিশোধ করতে। মীরকাশিম একটি সুরম্যগৃহ ক্রয় করে ফেললেন।

মুর্শিদাবাদে তাঁর বর্ণাঢ্য জীবন আরম্ভ হল।

বর্ণাঢ্য বলতে সিরাজীর ঢেউ আর কামনার বন্যা রইল না। মীরকাশিম সিরাজী স্পর্শ করতেন না তা নয়; মাঝে মধ্যে অতি অল্প মাত্রায় গ্রহণ করতেন, তাও বিশেষ কোন ব্যক্তির চাপে পড়ে। বরবধূ আর নর্তকীদের প্রতি তাঁর আসক্তি ছিল না। হিন্দুস্থানের প্রতিটি অর্থশালী মানুষ কি রকম নারী মাংসলোলুপ হয়ে উঠেছে তা তিনি জানতেন— মনে প্রাণে ঘৃণা করতেন তাদের।

দৈবাৎ একদিন আলাপ ঘটে গেল মীরকাশিমের সঙ্গে সুবে-বাংলার সিপাহশালার মীরজাফর আলী খাঁর সঙ্গে। তিনি আবার নবাব আলীবর্দীর নিকটতম আত্মীয়। অত্যন্ত পদমর্যাদাসম্পন্ন ব্যক্তি। ঈদ উৎসবের দিন অন্যান্য বহু অতিথির সঙ্গে মীরকাশিমকেও তিনি আমন্ত্রণ জানালেন আহারের।

মীরকাশিম তো এই চান, মুর্শিদাবাদের মানী সমাজে তিনি আদৃত

হন। তখন তাঁর তীব্র আকাঙ্ক্ষা প্রচুর সুনামের। কোন রাজনৈতিক পঙ্কিলতায় প্রবেশ করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে নেই। দাওয়াত রাখতে গেলেন মীরকাশিম। স্বয়ং নবাব অতিথিদের একজন। তাঁর আদরের নাতি সিরাজদ্দৌলাও এসেছেন।

ভোজের পর নৃত্য গীতের আসর বসল।

ও রসে বঞ্চিত মীরকাশিম। তিনি সিপাহশালারের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে গৃহ অভিমুখে যাত্রা করলেন। উদ্যান অতিক্রম করবার সময় লক্ষ্য করলেন, প্রাসাদ-সংলগ্ন একটি মসজিদ। পারিবারিক ধর্মাচরণের জন্যই এই মসজিদটি এখানে নির্মিত হয়েছে অনুমান করে নেওয়া যায়।

মীরকাশিম মসজিদের অভ্যন্তর দেখে আসবার তাগিদ অনুভব করলেন। তিনি ধর্মভীরু ব্যক্তি। তাছাড়া কিঞ্চিৎ কৌতূহলও হল সিপাহ-শালারের উপাসনার স্থানটি দেখে আসবার। গেলেন মসজিদের অভ্যন্তরে। চমৎকার শিল্পকর্ম শোভিত স্তম্ভ দিয়ে সজ্জিত। একজন বৃদ্ধ মৌলবী অনেক দূরে বসে তসবি ঘুরিয়ে চলেছেন। আর কেউ নেই।

শূন্যতায় খাঁ খাঁ করছে চতুর্দিক।

মীরকাশিম ফিরে আসছিলেন, হঠাৎ একদিকে দৃষ্টি নিবদ্ধ হতেই থামলেন। মৌলবী একাই এখানে নেই, আরেকজন আছে। উপাসনা শেষ করে যুবতীটি সবে ঘুরে দাঁড়িয়েছে—দৃষ্টি বিনিময় হল দুজনের। মীরকাশিম তীব্র শিহরণ অনুভব করলেন মনের গহনে। যুবতী দ্রুত দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে অগ্রসর হল। বুভুক্ষুর মতো দাঁড়িয়ে রইলেন মীরকাশিম।

যুবতী দূরে সরে যাচ্ছে তাঁর, এক সময় চোখের আড়ালে চলে গেল। জীবনে নারীদের সম্পর্কে তিনি বিশেষ আসেন নি। এক বিচিত্র বিকার তাঁকে বাধা দিয়েছে।

তবে আজ এই যুবতীটিকে একবার মাত্র দেখে তিনি উতল হয়ে উঠেছেন কেন? তার মোহময় দৃষ্টিটি কি তাঁর হৃদয়পটে গভীরভাবে রেখায়িত হয়ে গেল? সংবিৎ ফিরে পেয়েই মীরকাশিম মসজিদের বাইরে এলেন।

যুবতীটি কে?

এই মসজিদে যখন এসেছিল তখন সিপাহশালারের গৃহেরই কেউ হবে। তাঁর নিকটতম কোন আত্মীয়া। যুবতীর পরিচয় জানবার জন্য তিনি ব্যাকুল হয়ে উঠলেন। কে বলে দেবে? কার কাছ থেকে জেনে নেবেন তিনি? অবস্থা পাগলামীর পর্যায়ে চলে যাচ্ছে নাকি? নিজের মনের অবস্থা পর্যালোচনা করে দেখেন তিনি। কোন ভদ্র বংশীয়া যুবতীর সম্পর্কে এই রকম উৎকট আগ্রহ শোভন নয়।

নিজের চিত্তচাঞ্চল্য প্রবলভাবে দমন করবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে লাগলেন তিনি। ফারহাদ বা মাজনুর মতো প্রথম দর্শনে এতটা আত্মহারা হয়ে পড়া তাঁর মতো স্থিরচিত্ত ব্যক্তির পক্ষে অবিশ্বাস্য দৃষ্টান্ত। তিনি মসজিদের বাইরে এসে একজন রক্ষীকে দেখতে পেলেন।

সমস্ত রকম সংযম ভেসে গেল।

রক্ষীকে প্রশ্ন করলেন, এইমাত্র যিনি চলে গেলেন তাঁর পরিচয় কি বলতে পার?

রক্ষী বিস্মিত হলেও সসম্ভ্রমে বললে, উনি সিপাহশালারের কন্যা।

মীরজাফরের কন্যা !!!

মীরকাশিম আর অপেক্ষা করলেন না। অসংখ্য চিন্তা তাঁর মনে ওঠানামা করতে লাগল। তিনি গৃহে প্রত্যাবর্তন করলেন।

এই ঘটনা চাপা রইল না।

মীরজাফরের কানে উঠল। তিনি ভ্রূকুঞ্চিত করে কি চিন্তা করলেন, তারপর গেলেন নবাবের প্রাসাদে। উপরিপূর্ণ আগ্রহ নিয়ে আলীবর্দী শুনলেন ঘটনাটি। বললেন শেষে, কি স্থির করলে তুমি?

—কিছুই স্থির করতে পারিনি। অবশ্য ছেলেটি সম্ভ্রান্ত বংশীয় এবং ধনশালীও।

—তবে—

—আবার কিন্তু কিসের? কিছুদিন চেষ্টা করেও ফতেমাকে যোগ্যপাত্রে দেওয়া যায়নি। মীরকাশিমের যোগ্যতা সম্পর্কে সন্দেহের বিন্দুমাত্র অবকাশ নেই। বেশ কিছুদিন থেকে ফতেমার জন্যে একটি যোগ্য পাত্রের অনুসন্ধান করছেন মীরজাফর; যোগ্য পাত্রের অবশ্য অভাব নেই, তবে তারা সকলেই ইতিপূর্বে তিনটি চারটি স্ত্রীর পাণি গ্রহণ করেছে। এতগুলি সপত্নীর মধ্যে ফতেমাকে পাঠাতে তাঁর বিশেষ আপত্তি ছিল।

মীরজাফর বললেন, আপনার মত নিতেই আমি এসেছি।

আলীবর্দী বললেন, আমার সম্পূর্ণ মত আছে। অবশ্য আমাদের মতামতই চূড়ান্ত নয়। এই প্রস্তাবে মীরকাশিমের সম্মতির উপর কিছু নির্ভর করছে। তুমি প্রস্তাব পাঠাও।

—আজই মীরনকে পাঠাচ্ছি।

—মীরনকে নয়। ও অত্যন্ত বদরাগী। হয়তো সমস্ত ভেস্তে দেবে। বরং তুমি তাকে ডেকে পাঠিয়ে নিজেই বল।

—জাহাঁপনার যেমন অভিরুচি।

আহ্বান পেয়ে মীরকাশিম গেলেন সিপাহশালারের গৃহে। মনের মধ্যে যে কিছু ভয় নিয়ে গেলেন না তা নয়। ফতেমার সঙ্গে দৈবাৎ সাক্ষাৎ হয়ে যাওয়ার বিষয় নিয়ে যে কথা উঠবে এ সম্পর্কে তিনি নিঃসন্দেহ। মীরজাফর হয়তো তাঁকে তিরস্কার করবার জন্যেই আহ্বান করেছেন।

মীরকাশিম নিজের স্বপক্ষে নিটোল যুক্তির অবতারণা করবেন। তিনি ইচ্ছাকৃতভাবে ফতেমা বেগমের নিকট উপস্থিত হন নি। মসজিদের অভ্যন্তরে গিয়েছিলেন নিছক আগ্রহের বশবর্তী হয়ে। সেখানে

তাঁর সঙ্গে আচম্বিতে সাক্ষাৎ হয়ে গেছে। এক্ষেত্রে তাঁর অপরাধ কোথায় ?

মীরজাফর সমাদর করে বসালেন মীরকাশিমকে।

খোস গল্প চলতে লাগল।

শেষে আসল কথা ব্যক্ত করলেন মীরজাফর। মীরকাশিম বিস্ময়ে হতবাক্। তাঁর ধারণার সম্পূর্ণ বিপরীত উক্তি শুনে প্রথমে কিছু বলতে পারলেন না। অসহ্য আনন্দ তাঁকে স্তব্ধ করে রাখল। গত দুটি দিন ফতেমাকে নিয়ে তিনি কল্পনার সৌধ রচনা করেছেন। মানসপটেই তার ফুলের মতো সুন্দর মুখ অজস্রবার মুগ্ধ হয়ে লক্ষ্য করেছেন।

সেই ফতেমাকে তিনি স্ত্রীরূপে পাবেন।

সঙ্কোচকে অজস্র চেষ্টায় দমন করে শেষে সম্মতি জানালেন।

বিবাহ হয়ে গেল।

উৎসবের আড়ম্বর অল্প ছিল না। একান্তে ফতেমার সঙ্গে মীরকাশিমের যখন সাক্ষাৎ হল তখন অনেক রাত্রি। শুক্লপক্ষের চাঁদ পূর্বগগন থেকে মধ্যগগনে আশ্রয় নিয়েছে। লজ্জাবনতা ফতেমা পালঙ্কের উপর উপবিষ্টা ছিলেন। আরো অপরূপ দেখাচ্ছে তাঁকে।

কক্ষে প্রবেশ করে দ্বারের নিকট থেকে পত্নীর রূপসুধা আকণ্ঠ পান করলেন মীরকাশিম। নিকটে গিয়ে মৃদু কণ্ঠে বললেন, বেগম—

ফতেমা নত মস্তকে নীরব রইলেন।

—বেগম, আজ আমার অনেক পাওয়ার দিন।

ফতেমা নীরব।

—নারীদের সম্পর্কে দুর্বলতা আমার কোন দিনই নেই। অনেক প্রলোভনকে হেলায় জয় করেছি। তবে সেদিন—যেদিন তোমায় প্রথম দেখলাম। সেই নাটকীয় সাক্ষাতের পরমুহূর্ত থেকেই এক অবিশ্বাস্য ভাবান্তর আমার মনের মধ্যে দেখা দিল। তুমি আমাকে কত তীব্রভাবে

আকর্ষণ করেছিলে তা বলে বোঝাতে পারব না। আজ তোমাকে পেয়েছি, দুনিয়ার আর কোন কিছুতে আমার প্রয়োজন নেই।

ফতেমা তবুও নীরব।

—আমি একাই বলে যাব, তুমি কিছু বলবে না বেগম?

মীরকাশিম পত্নীর স্কন্ধে হাত রাখলেন। ফতেমার সমস্ত শরীর তীব্র পুলকে চিনচিন করে উঠল। প্রথম পুরুষের স্পর্শ অনাঘ্রাত নারীকে উতলা করে তুলবেই। বিমনা হয়ে তিনি নতমুখী রইলেন।

—কিছু বল?

—আমি ...... আমার.......

অস্ফুট অসংলগ্ন স্বর ফতেমার।

—থামলে কেন, বল— ?

—আমি......আমি আপনার বাঁদী হতে পেরে ধন্য সারতাজ।

—বাঁদী নও, তুমি আমার বেগম। তুমি কোন দিন চিন্তা করতে পেরেছিলে বেগম, বাংলার বাইরের কোন ব্যক্তি তোমার স্বামী হবে?

—না।

—শুনলাম, সওকত জঙ্গের হাতে তোমাকে তুলে দেবার ইচ্ছে ছিল এক সময় তোমার আব্বাজানের। যোগ্যতার বিচারে সে আমার চেয়ে শ্রেষ্ঠ ছিল। তার সঙ্গে—

—সওকত জঙ্গের মতো অপদার্থ ব্যক্তি মুর্শিদাবাদে দ্বিতীয় নেই, একথা আপনার হয়তো অজানা নয়।

ফতেমার বাক চাতুর্যে মুগ্ধ হলেন মীরকাশিম।

—সওকত জঙ্গ অপদার্থ, আমি যে নই জানলে কি ভাবে?

—আমি জানি।

—এত দৃঢ়তা পেলে কোথা থেকে?

—আপনি আমাকে পরীক্ষা করছেন?

—পরীক্ষা! না—না—

মীরকাশিম ফতেমাকে নিজের কাছে টেনে নিলেন। বুকের সঙ্গে মিশিয়ে ফেলতে চাইলেন। এই আকর্ষণে ফতেমার অস্থি-মজ্জা সব যেন দ্রবিভূত হয়ে গেল। তিনি সজল চোখে স্বামীর বুকের উপর মুখ রাখলেন।

—পরীক্ষা আমি তোমায় করিনি। এ আমার একটি অর্থহীন প্রশ্ন বলতে পার।

ফতেমা নীরব রইলেন।

কিছু সময় কাটল নীরবতার মধ্যে।

—বেগম—

—সারতাজ—

—নীরব থেকে আজকের এই সুন্দর রাতটি ব্যর্থ করে দিও না বেগম।

ফতেমা মীরকাশিমের বাহুবন্ধন থেকে নিজেকে মুক্ত করে ধীর কণ্ঠে বললেন, আপনি বলছেন, আমি তো শুনছি।

—আজকের রাতে শুধু শুনবে না, হৃদয় উজাড় করে কিছু বলতেও হবে।

—আমাকে আপনার ভাল লাগছে?

—বললাম তো, তোমাকে লাভ করবার পর দুনিয়ার আর কোন বস্তুতে আমার লোভ নেই।

—একটি নারীর জন্য আপনি এত ত্যাগ স্বীকার কেন করবেন?

—ত্যাগ স্বীকার!

—দুনিয়ায় আপনার অনেক পাবার আছে, দাবি করবারও আছে যা একটি নারীর হৃদয়ের চেয়ে অনেক মূল্যবান।

—দুনিয়ায় আমার আর কিছু পাবার নেই। তোমাকে লাভ করার পূর্বেই আমি সব পেয়েছি।

—সমস্ত কিছু পেয়েছেন?

—সমস্ত। উচ্চবংশে জন্মগ্রহণ করেছি, প্রচুর অর্থের অধিকারী আমি, লাভ করেছি তোমার মতো স্ত্রী-রত্ন। আর আমার কি চাই?

মুর্শিদাবাদে আমার মতো সুখী ব্যক্তি ক'জন আছে—সুবে বাংলাতেও দ্বিতীয়জনকে খুঁজে পাবে না হয়তো।

—আপনি অল্পে সন্তুষ্ট।

—ঠিকই বলেছো।

—আমার শিরায় যে রক্ত প্রবাহিত হচ্ছে, সে রক্ত গগনস্পর্শী আকাঙ্ক্ষা নিয়েই এই দুনিয়ায় আসে সারতাজ। অল্পে সন্তুষ্ট কোন মানুষের সঙ্গে আমার সাক্ষাৎ এই প্রথম হল।

মীরকাশিম ফতেমার কথায় কৌতুক মিশ্রিত বিস্ময় অনুভব করলেন।

—তুমি আমায় কি করতে বল?

—আমার পরামর্শে আপনি চলুন তা আমি চাই না। নারীর ঈঙ্গিতে চালিত পুরুষ দুনিয়ায় অনেক অঘটন ঘটিয়েছে। আপনি নিজের পথ করে অগ্রসর হবেন এই আমার আকাঙ্ক্ষা।

মৃদু হাসলেন মীরকাশিম।

—তোমার আকাঙ্ক্ষার কথা আমার স্মরণ থাকবে। যাক, গুরুগম্ভীর আলোচনার এবার ইতি হোক। রোবাই শুনবে? আমার লেখা।

—শুনব।

মীরজাফর নিজের সৈন্যবাহিনীতে জামাতাকে যোগ দেবার জন্য আহ্বান জানালেন। আহ্বানে সাড়া দিলেন মীরকাশিম। নবাবের বিরাট বাহিনীর একটি সেনানায়কের পদ দেওয়া হল তাঁকে।

নির্বিবাদে সময় কেটে যেতে লাগল।

কোন যুদ্ধবিগ্রহ নেই, কোন বিদ্রোহ দমনের তৎপরতা নেই, সুতরাং সৈন্যবাহিনীর সতর্কতার সঙ্গে আদেশের অপেক্ষা করা ছাড়া আর কোন কর্তব্য ছিল না। নবাব আলীবর্দীর প্রতাপে এবং শাসনের

গুণে চতুর্দিকে শান্তি বিরাজ করছিল। সুবে বাংলার প্রজাদের সময় কাটছিল অতিমাত্রায় সুখে।

দিন একরকম যায় না।

আকাশের এক কোণে কালো মেঘের সন্ধান পাওয়া গেল। সেই মেঘ বিস্তারিত হতে সময় নিল না, প্রজাপালক সুবে বাংলার নবাব আলীবর্দী খাঁ দেহ রাখলেন। মুর্শিদাবাদে শোকের ছায়া নামল। হিন্দু ও মুসলমান উভয় শ্রেণীর প্রজা ঈশ্বরের কাছে তাঁর আত্মার শান্তির জন্য প্রার্থনা জানালেন।

পক্ষকাল রাষ্ট্রীয় শোক পালিত হবার পর তখ্‌ত মুবারকে আরোহণ করলেন সিরাজউদ্দৌলা। আলীবর্দী কনিষ্ঠ কন্যা আমিনা বেগমের পুত্র পরম স্নেহের পাত্র সিরাজকে নিজের উত্তরাধিকারী মনোনীত করে গিয়েছিলেন।

এরপর ঘটনার আবর্ত আরম্ভ হল মুর্শিদাবাদে।

যে ইংরেজ বেনিয়া ব্যবসার সূত্রে বাংলার মাটিতে পা দিয়েছিল। তারা আর ব্যবসার গণ্ডীর মধ্যে নিজেদের আবদ্ধ করে রাখছে না। তাদের লালসার দীর্ঘ হাত বিস্তারিত হচ্ছে এধারে ওধারে। স্বাভাবিক কারণেই ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সঙ্গে নবাবের গোলযোগ পাকিয়ে উঠল।

অসংখ্য ঘটনা ঘটল। ষড়যন্ত্রের জাল বিস্তারিত হল। রক্তের ধারা বইল কোথাও কোথাও। দৃঢ়চেতা সিরাজ নিজের মন স্থির করে ফেললেন। ইংরেজকে এই দেশ থেকে সমূলে উৎপাটিত করতে ওদের কেন্দ্রবিন্দুতে হানা দিতে হবে। সুতরাং কলকাতা জয় করা ছাড়া আর কোন পথ নেই।

আদেশ প্রচারিত হল।

বিরাট নবাব বাহিনী এগিয়ে চলল কলকাতার পথে। বাহিনীতে মীরকাশিমও আছেন। স্থির হয়েছে হুগলীতে এসে গঙ্গা অতিক্রম

করে ইংরেজদের পেরিন পয়েণ্ট বিধ্বস্ত করে ওদের প্রথমেই পঙ্গু করে ফেলা হবে।

প্রচণ্ড গরম। সূর্য যেন আগুন বর্ষণ করছে। সতর্কতার সঙ্গে নবাব সৈন্য গঙ্গা অতিক্রম করল। কিন্তু পেরিন পয়েণ্ট অধিকার করা সম্ভব হল না। ইংরেজরা প্রচণ্ড গোলা বর্ষণ করে আক্রমণ প্রতিরোধ করল। বিকল্প ব্যবস্থার জন্য ব্যস্ত হলেন সিরাজ। নক্শার উপর ঘন ঘন দৃষ্টি বুলিয়ে যেতে লাগলেন।

ইংরেজদের করায়ত্ত করবার নতুন পথ চাই।

মীরকাশিম পথ নির্দেশ দিলেন।

তিনি বললেন, এখানে কিছু সৈন্য মোতায়েন রেখে, বাকিদের নিয়ে দমদমের পথ ঘুরে অন্য পাশ দিয়ে ইংরেজদের কেল্লা সহজেই ঘিরে ফেলা যায়।

সিরাজ প্রস্তাবটি পছন্দ করলেন।

ওই পথ দিয়ে এগিয়ে নবাব সৈন্য ঘিরে ফেলল কেল্লা। ছেয়ে গেল কলকাতার সর্ব্বত্র। সমস্ত দিন অনল বর্ষণ করে চলল সিরাজের কামান। ইংরেজ সেনাপতি হলওয়েল অসুবিধায় পড়ে গেলেন। তাঁর বেশীর ভাগ কামান পেরিন পয়েন্টে রয়েছে। এদিকে পঞ্চাশ হাজার নবাবী সৈন্যের বিক্রম সহ্য করা প্রায় অসম্ভব হয়ে উঠেছে।

অনন্যোপায় হয়ে তিনি কেল্লার মধ্যে ক্যাপ্টেন ক্লেটনের নিকট যুদ্ধের অবস্থা বর্ণনা করে সংবাদ পাঠালেন। হলওয়েলকে কেল্লার মধ্যে আহ্বান করলেন ক্যাপ্টেন ক্লেটন। অগ্নিবর্ষী কামানের একটানা গর্জন কেল্লার মধ্যেকার পরিবেশকেও শঙ্কিত করে তুলেছে।

ক্লেটন বললেন, পশ্চাদপসরণ করতে হবে।

—কিন্তু সরে আসতে গেলে—

হলওয়েলকে বাধা দিয়ে ক্লেটন বললেন, কিন্তু ক্ষয়ক্ষতি সহ্য করা ছাড়া আমাদের উপায় নেই। পশ্চাদপসরণ করে আসবার সময় ভারী

কামানগুলি সঙ্গে আনা হয়েছিল। হলওয়েল সরে এসে দৃঢ়তার সঙ্গে দুর্গের মুখ রক্ষা করতে সচেষ্ট হলেন। দুর্গের পতন হলে একটিও ইংরেজ জীবিত থাকবে না—বেনিয়ার স্বপ্ন ভেঙে যাবে চিরদিনের মতো। অবশ্য দুর্গ যে রক্ষা পাবে তাও নয়। তবে একটি আশার পথ চেয়ে দুর্গকে পতনের হাত থেকে কিছু সময় রোধ করে রাখতেই হবে।

সেই আশা হল প্রিন্স জর্জ।

কোম্পানির এই জাহাজখানি পেরিন পয়েন্টে এসে পড়তে পারলেই দুর্গের সকলে তাতে গিয়ে প্রাণ বাঁচাবেন। স্থলে ইংরেজ অসহায়, জলে নয়। একবার ভেসে পড়তে পারলে নবাবের সাধ্য হবে না তাদের হাতের মুঠোয় পাবার। কিন্তু বারংবার চেষ্টা করেও প্রিন্স জর্জ তীরে নোঙর করতে পারছে না।

ওরা জাহাজে চড়ে পালিয়ে যেতে চায় সিরাজ-বুঝতে পেরেছিলেন। তিনি গোলন্দাজ বাহিনীর কিছু অংশকে পেরিন পয়েন্টে পাঠালেন। মীরকাশিম গেলেন তাদের চালনা করতে। পুরো দুটি দিনে প্রিন্স জর্জ পঞ্চাশ হাতও অগ্রসর হতে পারল না নবাবী ফৌজের বিক্রমে।

এদিকে ইংরেজ যোদ্ধার সংখ্যা দ্রুত কমে আসছে। কেল্লার মধ্যে পড়ে গেছে হাহাকার। আহতদের সেবা করতেও কেউ এগিয়ে আসছে না। নিজের জীবন কোন উপায়ে রক্ষা পায় সেই চিন্তায় শুধু সকলে বিভোর। যা অবস্থা দাঁড়িয়েছে তাতে আত্মসমর্পণ করা ছাড়া উপায় নেই। ইংরেজরা জানে আত্মসমর্পণের অর্থ হল অমানুষিক অত্যাচার সহ্য করে মৃত্যু বরণ করা।

সমস্ত জানিয়ে সাঙ্কেতিক বার্তা পাঠানো হল জাহাজে টমাস হেগের কাছে কিন্তু কোন উপায় নেই। মীরকাশিম পরিচালিত গোলন্দাজ বাহিনী[illegible]ড়িয়ে পেরিন পয়েন্টে পৌঁছানো সম্পূর্ণ অসম্ভব। যদি সমস্ত[illegible] উপেক্ষা করে অগ্রসর হওয়া যায় তাহলে জাহাজ আর জাহাজ[illegible]বে না। প্রিন্স জর্জের কাঠের টুকরোগুলি

স্রোতের মুখে পড়ে যাবে বঙ্গোপসাগরে। তারপর কোথায় ভেসে যাবে কে বলতে পারে।

প্রিন্স জর্জের তীরে ভেড়ানোর পরিকল্পনা বাতিল করে দেওয়া হল। এদিকে কেল্লার পতন হতে বিলম্ব নেই। বৃষ্টির মতো গোলা এসে পড়ছে। জয়ের চীৎকারে আকাশ-বাতাস মুখরিত করে তুলেছে নবাবী ফৌজ। নারীরা তো বটেই, অনেক লৌহ-হৃদয় ইংরেজ পুরুষেরও চোখে জল দেখা দিয়েছে। আর একটি মাত্র উপায় আছে। পেরিন পয়েন্টের অনেক দক্ষিণে প্রায় আঘাটায় ডোডোলে জাহাজটি দাঁড়িয়ে আছে। এই জাহাজে চড়ে কয়েকবারেই সকলে প্রিন্স জর্জে পৌছাতে পারবে। ডোভেলের দিকে নবাবের দৃষ্টি নেই। রাতের অন্ধকারে পলায়ন-পর্ব সহজেই সমাধা হবে। তখনও কোন আদেশ প্রচারিত হয়নি। মরিয়া ইংরেজ আদেশের অপেক্ষা করল না। যে যেমন পারল গুপ্তপথ দিয়ে বেরিয়ে ডোভেলেতে আরোহণ করল।

সে এক চরম বিশৃঙ্খলা।

কলকাতাকে রক্ষা করার যার দায়িত্ব সবচেয়ে বেশী, সেই গভর্নর ড্রেক নিজের দায়িত্বের কথা চিন্তা না করে প্রাণ ভয়ে সবচেয়ে আগে জাহাজে উঠলেন। কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যরাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করলেন। এমন কি ক্যাপ্টেন গ্রান্টও। কেল্লা রক্ষা করবার জন্য যারা শেষ চেষ্টা করছিল তারা। এই কাণ্ড-কারখানায় স্তম্ভিত। তাদের জলে পাড়ি জমাবার জন্য একটা নৌকাও ছেড়ে রেখে যায়নি কেউ।

কাউন্সিলার পিয়ারকীল ডাঙায় ছিলেন। স্বেচ্ছায় ছিলেন বলে মনে হয় না। তিনি স্থূল ব্যক্তি। প্রাণ ভয়ে যারা গঙ্গার তীরে ছুটেছিল, তাদের পিছনে ফেলে এগিয়ে নৌকা বা জাহাজে স্থান করে নিতে পারবেন না জেনেই বোধ হয় ও চেষ্টা করেননি।

তিনি জোড়াতালি দিয়ে মিটিং-এর আয়োজন করলেন। মিটিং-এ

সর্বসম্মতিক্রমে হলওয়েলের উপর সমস্ত ভার ন্যস্ত করা হল। হলওয়েল সমস্ত ভার পেলেন বটে কিন্তু তখন তাঁর চোখে অন্ধকার দেখা ছাড়া আর কিছু করবার ছিল না। তবু তিনি মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

পরের দিন মৃত্যুপণ করে ঝাঁপিয়ে পড়লেন নবাবী ফৌজের উপর। সিরাজ মুষ্টিমেয় ইংরেজের কাছ থেকে এতটা সাহস আশা করেননি। অবশ্য বিশেষ অসুবিধার মুখোমুখি তিনি হলেন। ইংরেজদের বিক্রমকে অনায়াসে পর্যুদস্ত করা সম্ভব হল।

বন্দী হলেন হলওয়েল।

জাহাজ পরিপূর্ণ ভীত কাউন্সিলার ও অন্যান্য ইংরেজদের নিয়ে যখন বজবজের দিকে ভেসে যাচ্ছিল তখন কলকাতায় জয়ের উন্মত্ততা চলেছে। দুরুদুরু বক্ষে হলওয়েল ও তাঁর সহকর্মীরা নিজেদের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করছেন। কি রকম শাস্তি সকলের জন্য অপেক্ষা করছে ঈশ্বর জানেন।

সিরাজ কলকাতা জয় করে ফিরে গেছেন মুর্শিদাবাদ।

কলকাতার বিলি-ব্যবস্থা করেই গেছেন। মীরকাশিম ফিরে যান নি। কয়েকদিন হুগলীতে থেকে মুর্শিদাবাদ ফিরবেন এই স্থির হয়ে আছে। হুগলীতে অপেক্ষা করার উদ্দেশ্য আর কিছুই নয়, পূর্ব পরিচিত এক ব্যক্তির আমন্ত্রণ রক্ষা করছেন। সিরাজ লাভবান হয়েছেন ঠিক, মীরকাশিমও কলকাতা অভিযানে এসে কম লাভবান হন নি।

জীবনে প্রথমবার তিনি এখানেই যুদ্ধক্ষেত্রে অবতীর্ণ হলেন। আশ্চর্য হয়ে অনুভব করলেন, তাঁর মন বিচলিত হয় নি। গোলন্দাজ বাহিনীর অধিনায়ক হয়ে তিনি যখন পেরিন পয়েন্টে দক্ষতার সঙ্গে যুদ্ধ করছিলেন তখন কে বলবে অপূর্ব ছন্দে রোবাই লিখতে তিনি অভ্যস্ত।

তাঁর জীবনের একটি বন্ধ দ্বার এই অবসরে খুলে গেল—একি কম লাভ ? আরো এক দিক ছিল। যেদিকে মীরকাশিমের পক্ষে দৃষ্টি দেওয়া সম্ভব ছিল না। ভবিষ্যতের দিক। কলকাতা অভিযানে না এলে তাঁর হুগলী যাওয়া সম্ভব হত না। হুগলী না গেলে ভবিষ্যত পথের আবছা ইঙ্গিত তিনি পেতেন না—পেতেন না আগামী জীবনের শ্রেষ্ঠ সহকারীর সন্ধান।

হুগলীতে মীরকাশিম ইমদাদ আলীর গৃহে অবস্থান করছিলেন। ইমদাদ আলী মুর্শিদাবাদের সম্ভ্রান্ত ব্যবসায়ী ছিলেন। তুজনের মধ্যে বন্ধুত্ব হয় তখনই। মাস আটেক হল মুর্শিদাবাদ থেকে ব্যবসা তুলে হুগলীতে চলে এসেছেন। পত্র বিনিময় হত তুজনের মধ্যে। কলকাতা যাওয়ার পথে হুগলী অতিক্রম করবার সময় ইমদাদ আলী মীরকাশিমের সাথে সাক্ষাৎ করেছিলেন। বলেছিলেন, যুদ্ধ শেষ হলে আমার এখানে কয়েকদিন আতিথ্য গ্রহণ করবেন।

মৃত্ হেসে উত্তর দিয়েছিলেন মীরকাশিম, যুদ্ধে যদি প্রাণ না যায় আপনার আতিথ্য গ্রহণ করব কথা দিলাম।

যুদ্ধে মীরকাশিমের প্রাণ যায়নি, সুতরাং আতিথ্য তিনি গ্রহণ করেছেন। হুগলী মনোরম নগর। ব্যবসার অন্যতম প্রাণকেন্দ্র। নানা দেশের ব্যবসায়ীর এখানে নিত্য আনাগোনা। ইমদাদ আলীর এখানে ফলাও ব্যবসা। দিন তুয়েক পরে হুগলীর দ্রষ্টব্যগুলি দেখলেন মীরকাশিম। কথা প্রসঙ্গে ইমদাদকে তিনি বললেন, আমার ধারণা ছিল না হুগলীতে এত ফিরিঙ্গী আছে।

—ব্যবসার জায়গা ফিরিঙ্গী তো থাকবেই। ওরা জন্ম নেয় ব্যবসায়ী বুদ্ধি নিয়ে। তবে এখানে এত ফিরিঙ্গী ছিল না। সম্প্রতি বেড়েছে।

—এরা সকলে ইংরেজ নয় বোধ হয় ?

ইমদাদ হাসলেন।

—আপনি ইংরেজদের উপর প্রসন্ন নন বলে সর্বত্র তাদের উপস্থিতি

লক্ষ্য করেন। এখানে একটিও ইংরেজ নেই। আর্মানী আর পোর্তুগিজের সংখ্যাই বেশী। চলুন, একজন আর্মানীর সঙ্গে আলাপ করবেন। এখানকার ফিরিঙ্গীদের মধ্যে সবচেয়ে বুদ্ধিমান।

ওঁরা পদব্রজেই নগর পরিক্রমায় ব্যস্ত ছিলেন।

কয়েক পা এগিয়েই ইমদাদ আলী বললেন, ওই হল পিক্রুসের দোকান। মীরকাশিম দেখলেন তাঁরা বিরাট এক কাপড়ের দোকানের সামনে এসে দাঁড়িয়েছেন। পিক্রুস তাঁদের দেখতে পেয়েছিল। দোকান থেকে পথে নেমে এল দ্রুত পায়ে। খাটো নিরেট তার শরীর। টকটকে লাল বিরাট মুখ। দু-চোখের তারায় লোভ আর ধূর্ততার ছায়া। একমাথা অবিন্যস্ত সোনালী চুল।

মুখে তৈলাক্ত হাসি মাখিয়ে পিক্রুস বললে, কি সৌভাগ্য, আসুন আসুন খাঁ সাহেব। ইমদাদ মীরকাশিমকে সঙ্গে নিয়ে দোকানে গিয়ে বসলেন। বন্ধুর পরিচয় দিয়ে বললেন, কি রকম ব্যবসা চলছে?

—খুব ভাল।

—ব্যবসা যখন ভাল চলছে তখন অন্য পথে পা বাড়াচ্ছো কেন?

পিক্রুস আকাশ থেকে পড়ল।

—অন্য পথ! কি বলছেন খাঁ সাহেব?

—কিছু দিন থেকেই শুনছি কথাটা। রাজনৈতিক ব্যাপারে নাক গলানোটা বোধ হয় তোমার খুব ভাল কাজ হচ্ছে না।

—রাজনৈতিক ব্যাপার। আপনি আমাকে অবাক্ করলেন খাঁ সাহেব। কাপড়ের কারবার করে ফুরসত পাই না, অন্য ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামাবার আমার সময় কোথায়?—কি শুনছেন বলুন তো?

ইমদাদ বললেন, শুনছিলাম, নবাবী ফৌজের অনেক গুপ্ত-সংবাদ সংগ্রহ করে তুমি অর্থের বিনিময়ে ইংরেজদের জানাচ্ছ।

বুকে ক্রুশচিহ্ন অঙ্কিত করে দ্রুত কণ্ঠে পিক্রুস বললে, মাতা মেরী আমাকে রক্ষা করুন। আমি বিদেশী, ব্যবসা করে দু-পয়সার মুখ

দেখবার জন্য এখানে এসেছি। ও-সমস্ত গোলমেলে ব্যাপারে মাথা গলিয়ে জীবনটা কি দেব খাঁ সাহেব ?

—তুমি কি করছো, তা তুমি আর তোমার ভগবান জানেন। যা আমি শুনেছি তোমাকে বললাম।

—দুষ্ট লোকের কাজ। আমার ফলাও ব্যবসা দেখে অনেকের চোখ টাটাচ্ছে। তারাই এই সমস্ত বলে বেড়াচ্ছে—আপনি কার কাছ থেকে শুনলেন ?

—আমায় বাগ্রাঞ্জা বলছিল।

—বাগ্রাঞ্জা ! ওই মাতাল পোর্তুগিজটা তো বলবেই। ওর যে আমি অনেক উপকার করেছি। দেখছেন তো খাঁ সাহেব, দুনিয়ায় কি রকম অকৃতজ্ঞর সংখ্যা বেড়ে চলেছে।

—যাক ওকথা। আর সংবাদ পাঠালেই বা কি, কলকাতায় তোমার ইংরেজ তো মার খেয়ে ফৌত হয়ে গেল।

ইমদাদ আলী মীরকাশিমের দিকে তাকিয়ে বললেন, কাপড় কিনবেন নাকি ?

—আপত্তি নেই।

পিদ্রুস থান থান মূল্যবান কাপড় এনে জমা করল ওঁদের কাছে। হাজার খানেক টাকার কাপড় কিনে ফেললেন মীরকাশিম। ফতেমা খুশী হবে। ইমদাদও কিনলেন। তাঁর বয়স যদিও পঞ্চাশ অতিক্রম করেছে, আগের বিবিকে তালাক না দিয়েই, একটি কিশোরীকে গ্রহণ করেছেন সম্প্রতি। কিশোরী পত্নীর মনোরঞ্জন করবার জন্য তাঁকে সর্বদাই ব্যস্ত থাকতে হয়।

কেনাকাটা শেষ হবার পর ইমদাদ বললেন, ওই ছোকরাটি কে ? আগে দেখেছি বলে তো মনে পড়ে না ?

পিদ্রুস বললে, আমার ভাই, গ্রেগারী। একা ব্যবসা সামলাতে পারছিলাম না। ওকে আনিয়ে নিয়েছি।

—আর্মেনীয়া থেকে আনালে নাকি!

—না, না, গোয়ায় ছিল গ্রেগারী—

গ্রেগারী খদ্দেরের সঙ্গে কথা শেষ করে এগিয়ে এল।

তাকে খুঁটিয়ে দেখলেন মীরকাশিম। বলিষ্ঠ ও দীর্ঘকায়। তীক্ষ্ণ সুন্দর মুখশ্রী। পিক্রুসের সঙ্গে তার চেহারার পার্থক্য আকাশ-পাতালের। বিশ্বাস করতে কষ্ট হয়, ওরা ভাই।

গ্রেগারীকে একনজর দেখলেই মনে হবে, যে ব্যবসাদার নয়—সে একজন যোদ্ধা।

মীরকাশিম বললেন, তোমার ভাইকে কাপড়ের ব্যবসায় মানায় না। ওর উচিত কোন সৈন্যদলে যোগ দেওয়া।

—গ্রেগারীর তো তাই ইচ্ছে। অস্ত্রচালনায় গোয়াতে ওর সঙ্গে পেরে উঠত না কেউ। আমি আটকে রেখেছি। বিদেশে এসে কোথায় যুদ্ধ করতে গিয়ে প্রাণ দেবে। ও সমস্ত রক্তারক্তি ব্যাপারের মধ্যে গিয়ে লাভ কি?

আর কিছু বললেন না মীরকাশিম।

দোকান থেকে বেরিয়ে এলেন ওঁরা।

ক্রীত মাল বাড়িতে পাঠিয়ে দেবার নির্দেশ দেওয়া হল।

পথে নেমে ইমদাদ বললেন, আর্মানীটা মিথ্যে কথা বললে। ব্যবসার আড়াল নিয়ে ও অনেক কুকাজ করছে।

—ওর মুখ দেখে আমারও তাই ধারণা হল—ওখানে এত ভিড় কিসের? রাস্তার ধারে বেশ কিছু লোক জমায়েত হয়ে কি যেন করছে।

—চলুন, দেখা যাক।

ভিড় ঠেলে ওঁরা ভিতরে গেলেন।

একজন হিন্দু জ্যোতিষী খড়ি পেতে ভাগ্য গণনা করছেন। মানুষকে আকর্ষণ করবার মতো তাঁর শ্রদ্ধাব্যঞ্জক অবয়ব। জ্যোতিষের উপর মীরকাশিমের প্রচুর আস্থা। ইমদাদের দিকে তাকিয়ে তিনি বললেন,

লোকটি ভণ্ড নয় বলেই আমার ধারণা হচ্ছে। এঁকে দিয়ে ভাগ্য বিচার করিয়ে নিলে কেমন হয়? ইমদাদ আলীর এসমস্ত বিষয়ে কোন আগ্রহ নেই। মীরকাশিমের ইচ্ছা দেখে, নিজের মনের ভাব প্রকাশ না করে বললেন, বেশ তো। জ্যোতিষীকে বরং বাড়িতে আহ্বান করি। ইমদাদ আলী হুগলীর অতি পরিচিত সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁকে দেখে ভিড় একটু দূরে সরে গিয়েছিল। জ্যোতিষী মুখ তুলে নবাগত আগন্তুকদের দেখলেন। আবার সম্মুখস্থ পাতা ছকে দৃষ্টি নিবদ্ধ করলেন।
ইমদাদ বললেন, আমার বন্ধু আপনাকে দিয়ে নিজের ভাগ্য বিচার করাতে চান।
জ্যোতিষী কিছু বললেন না।
—আপনি চলুন আমাদের সঙ্গে।
—কোথায়?
—আমার গরীবখানায়। আপনাকে উপযুক্ত পারিশ্রমীক দেওয়া হবে।
আমি কারুর গৃহে যাই না। ভাগ্য বিচার করে কারুর নিকট থেকে অর্থ গ্রহণ করি না। কার ভাগ্য বিচার করব, কার ভাগ্য করব না তা নির্ভর করে সম্পূর্ণ আমার ইচ্ছার উপর।
জ্যোতিষীর কথা শুনে বিস্মিত হলেন ইমদাদ আলী। তাঁর অনুমান করে নিতে কষ্ট হল না, পথে ছক কেটে বসলেও এ ব্যক্তিকে সাধারণ পর্যায়ে ফেলা যাবে না।
তিনি বললেন, আমার বন্ধুটি মুর্শিদাবাদ থেকে এসেছেন। সম্ভ্রান্ত ব্যক্তি। তাঁর ভাগ্য বিচার করে দিলে তিনি আনন্দিত হবেন।
জ্যোতিষী এতক্ষণ নত মুখেই কথা বলছিলেন।
এবার মুখ তুললেন। এক দৃষ্টিতে মীরকাশিমের দিকে তাকিয়ে রইলেন কিছুক্ষণ। তাঁর রক্তাভ চোখ থেকে লোহিত জ্যোতি বেরিয়ে আসতে লাগল যেন।
বললেন তারপর, তোমার ললাটের লেখা আমি পড়লাম।

তিনটি কথা বলতে পারি।

—বলুন?

—তোমার জীবনে কোন মধ্যপথ নেই। নির্বিঘ্নে—শান্তিতে জীবন তুমি কাটাতে পারবে না। গভীর রাজনৈতিক আবর্তে তুমি জড়িয়ে পড়বে।

জ্যোতিষীর কথা শুনে মীরকাশিম বিস্মিত হলেন।

বললে, আপনার কথার পরিষ্কার অর্থ আমি ধরতে পারলাম না।

—যা বলেছি তার অধিক এখন আর কিছু আমার পক্ষে বলা সম্ভব নয়।

মীরকাশিম আর কিছু বললেন না। ভিড় ঠেলে ইমদাদ আলীর সঙ্গে ওখান থেকে চলে এলেন। তাঁর মনের মধ্যে অজস্র কথা ওঠানামা করতে লাগল। জ্যোতিষী যা বললেন তার গূঢ় অর্থ কি? তিনি কেমন গম্ভীর হয়ে গেলেন।

ইমদাদ বললেন, কি এত ভাবছেন, কাশিম সাহেব?

—ভাবছি জ্যোতিষীর কথাগুলি। তিনি যা বললেন, তার প্রকৃত অর্থ কি হয় বলুন তো?

মৃদু হাসলেন ইমদাদ আলী।

—শোভান আল্লাহ্। ওই কথা নিয়ে আবার কেউ মাথা ঘামায় নাকি। যত সব বুজরুক।

গোটা কতক প্যাঁচালো কথা বলে আপনাকে ঘাবড়ে দিয়েছে।

—আমাকে ঘাবড়ে দিয়ে ওর কি লাভ ইমদাদ সাহেব?

—সস্তায় বাহবা পাবার জন্যে মানুষকে অনেক সময় অনেক কিছু করতে হয়।

—আপনি বলছেন লোকটা বুজরুক?

—আলবাৎ। একবার মুখের দিকে তাকিয়ে ভবিষ্যৎ বলে দেওয়া মুখের কথা নয়।

মীরকাশিম নীরব রইলেন।

দিন দুয়েক হুগলীতে আরো কাটিয়ে মুর্শিদাবাদ ফিরলেন তিনি।

খোজা পিত্রুসের দোকানের দামী দামী কাপড় পেয়ে ফতেমা খুশী হলেন।

মীরকাশিমের পছন্দর প্রশংসা করলেন। হুগলীর দ্রষ্টব্যগুলি পুঙ্খানুপুঙ্খ বর্ণনা শুনতে চাইলেন। মীরকাশিম যতদূর সম্ভব খুটিয়েই বললেন।

সমস্ত শুনে যাবার পর ফতেমা বললেন, বলার ভঙ্গীমায় কিন্তু স্বাচ্ছন্দ্য ছিল না আপনার। কিছু হয়েছে কি ?

—কি আবার হবে।

—আপনাকে দেখে অবধি মনে হচ্ছে যেন একটু বিমনা।

একটু নীরব থেকে মীরকাশিম বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো বেগম। বিশেষ এক চিন্তা আমাকে বিমনা করে রেখেছে।

—কিসের চিন্তা হজরত ?

—হুগলীতে এক জ্যোতিষী আমায় গোটা কয়েক কথা বলেছে। ইমদাদ আলী যদিও বললেন লোকটা বুজরুক। তবু কেন জানি না তার কথা মন থেকে চেষ্টা করেও ঝেড়ে ফেলতে পারছি না।

—কি বলেছিল জ্যোতিষী ?

মীরকাশিম বললেন সমস্ত।

ফতেমা শুনলেন মনোযোগ সহকারে।

বললেন, জ্যোতিষী মিথ্যে বলে নি। আপনাকে রাজনৈতিক আবর্তে জড়িয়ে পড়তেই হবে।

—আমি তো রাজনীতি পছন্দ করি না। কি হবে ওই পঙ্কিল পরিবেশের মধ্যে গিয়ে পড়ে।

—নির্লিপ্ত থাকতে চাইলেও আপনি নির্লিপ্ত থাকতে পারবেন না। আপনাকে বিষ নজরে দেখতে আরম্ভ করেছেন মীরন।

মরীকাশিম সচকিত হলেন।

—তোমার জ্যেষ্ঠ মীরন!

—হ্যাঁ হজরত।

—আমি তো তার কোন ক্ষতি করিনি! আমাকে বিষ নজরে দেখার তো কোন সঙ্গত কারণ থাকতে পারে না।

—আপনি তার ঈর্ষার পাত্র হয়ে উঠেছেন। কলকাতার যুদ্ধে গোলন্দাজ বাহিনীকে আপনি সুষ্ঠুভাবে পরিচালনা করেছিলেন। নবাব আপনার প্রশংসায় পঞ্চমুখ।

এ তো সুখের কথা বেগম। গর্বে তোমার বুক ভরে উঠেছে জানি। কিন্তু এই প্রশংসার সঙ্গে মীরনের সম্পর্ক কি?

—এই প্রশংসাই তাঁকে ঈর্ষান্বিত করে তুলেছে।

—কেন?

ফতেমা হাসলেন।

নারীর হাসির অর্থ মীরকাশিম সব সময় অনুধাবন করতে পারেন না।

—আম্মার ডাকে ওখানে গিয়েছিলাম। ফিরে আসার পথে কথাগুলি আমার কানে গেল। ভাইজান আপনার বিরুদ্ধে বিষোদ্গার করছিলেন আব্বাজানের কাছে। বার বার জানতে চাইছিলেন কেন আপনাকে গোলন্দাজের দায়িত্ব দেওয়া হয়েছিল।

—তোমার আব্বাজান কি বললেন?

—উনি আপনার স্বপক্ষে গোটা কয়েক কথা অবশ্য বললেন। এখন থেকে আপনি যদি সতর্ক না হন, ওরা কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাবে। ভাইজানের মতো নিষ্ঠুর লোক মুর্শিদাবাদে বোধ হয় দ্বিতীয় নেই।

—বেশ, আমি সতর্ক থাকব।

—শুধু সতর্ক থাকলে চলবে না। ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নিতে হবে। আমি হজরতকে দরবারে অতি উচ্চপদে দেখার জন্যে বিশেষ ব্যস্ত।

ফতেমাকে নিবিড়ভাবে কাছে টেনে আনলেন মীরকাশিম।

—তোমার আকাঙ্ক্ষা তো অনেক বেগম ?

—অনেক—অনেক হজরত।

মীরকাশিম মৃদু হাসলেন।

এর পর দ্রুত ঘটেছে অনেক ঘটনা।

তরুণ নবাবের কার্যকলাপের দরুন চাপা অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। শ্রেষ্ঠীকুল নবাবের হঠকারিতায় বিব্রত। কোন রকমে দিন কাটছিল। চরম হল একদিন একটি ঘটনাকেও কেন্দ্র করে। প্রকাশ্যে দরবারে বসে বাংলার শ্রেষ্ঠ ধনকুবের জগৎশেঠকে সিরাজ চপেটাঘাত করলেন। চপেটাঘাতের পর নবাব শান্ত হয়নি। মীরজাফরকে আদেশ দিয়ে ছিলেন বন্দী করতে জগৎশেঠকে। সবিনয়ে এই আদেশকে প্রত্যাখ্যান করেছিলেন সিপাহশালার। তরুণ নবাবকে তিনি আপ্রাণভাবে বোঝাবার চেষ্টা করেছিলেন, শ্রেষ্ঠীবর্গ মানী ব্যক্তি। তাঁদের সম্মান নিয়ে এইভাবে ছেলেখেলা করা কোন দিক থেকেই বাঞ্ছনীয় নয়। এই উপদেশ গ্রহণ করেন নি নবাব।

আরো উগ্র হয়ে উঠেছিলেন।

মীরকাশিম সতর্কতার সঙ্গে সমস্ত লক্ষ্য করছেন।

প্রকাশ্য দরবারে জগৎশেঠ প্রহৃত হওয়ায় শুধু তিনি অপমানিত বোধ করেন নি, ওই সঙ্গে অপমানিত হয়েছিলেন, রাজবল্লভ, রামনারায়ণ, রায়দুর্লভ, গোলাম হোসেন এবং মীরজাফর। মনে মনে সিরাজের চাপল্য মীরজাফর কোন দিন বরদাস্ত করেন নি। প্রকাশ্যে প্রতিবাদ করবার সাহস সংগ্রহ করতে পারেন নি বলে প্রতিবাদও করেন নি।

জগৎশেঠ অপমানিত হবার পর শ্রেষ্ঠীবর্গ ও তিনি সিরাজের পতনের জন্যে তৎপর হলেন।

মীরজাফরের মনে তখ্‌ত মুবারকে বসবার আগ্রহ প্রবল হয়ে উঠল এই সূত্রে। সিরাজের পর তখ্‌তে বসবেই বা কে ? অবশ্য অনুসন্ধান করলে তখ্‌তের অধিকারীর সন্ধান যে পাওয়া যাবে না তা নয়। তবে—তবে নিজের মনের ইচ্ছে সুহৃদের কাছেও প্রকাশ করেন নি। প্রকাশ্যে বিদ্রোহ করে সিরাজকে তখ্‌ত থেকে নামাতে যখন পারছেন না তখন মনের কথা মনেই থাকে। মোহনলাল না থাকলে কি হত বলা যায় না। যা হোক মনের ইচ্ছা মনেই চেপে রাখলেন মীরজাফর। তাঁর মনোভাব হল দেখাই যাক না কোথাকার জল কোথায় গিয়ে দাঁড়ায়।

সিরাজ এই ষড়যন্ত্রের কিছুই জানেন না।

বরং মীরজাফরকে কয়েকদিন দরবারে অনুপস্থিত দেখে তিনি চিন্তিত হলেন।

সিপাহশালার নিয়মিত দরবারে আসেন, তাঁর কি হল ? অসুস্থ হয়ে পড়েন নি তো ? বয়স হচ্ছে। অসুস্থ হয়ে পড়া বিচিত্র নয়।

—তিনি মোহনলালকে প্রশ্ন করলেন, সিপাহশালারের দরবারে কয়েক দিন অনুপস্থিত হবার কারণ তুমি জানো মোহনলাল।

প্রকৃত কারণ না জানলেও, মোহনলাল এটুকু বুঝেছিলেন, সেদিন দরবারে জগৎশেঠকে বন্দী করতে অস্বীকার করায় মীরজাফরকে কটু কথায় জর্জরিত করে ছিলেন নবাব। ওই কারণেই হয়তো তিনি দরবারে অনুপস্থিত।

মোহনলাল বললেন, আপনার আদেশ অমান্য করবার পর থেকে উনি আর দরবারে আসেন নি জাহাঁপনা।

—হুঁ—।

সিরাজ গম্ভীর হয়ে গেলেন।

সন্ধ্যা গভীর হয়ে আসছে।

মীরকাশিম প্রয়োজনীয় কথা সেরে নিচ্ছিলেন নিজের খাজাঞ্চীর সঙ্গে। গোলাম হোসেন এলেন। ইদানীং গোলাম হোসেনের সঙ্গে মীরকাশিম কিঞ্চিৎ ঘনিষ্ঠ হয়েছেন। গোলাম হোসেন মুর্শিদাবাদের একমাত্র ব্যক্তি যাঁর বিচরণের ক্ষেত্র সীমাহীন। শ্রেষ্ঠীবর্গের সঙ্গে তাঁর হৃদ্যতা আছে, আবার রাজধানীর দুস্থ দুর্গতদের সমাজেও তিনি আদৃত।

মীরকাশিম খাজাঞ্চীকে বিদায় দিয়ে বললেন, কি সৌভাগ্য, আমার গরীবখানায় আপনি এসেছেন। আপনার মতো জ্ঞানীর সাহচার্যে সন্ধ্যা ভালই কাটবে।

গোলাম হোসেন বললেন, আলাপ-আলোচনায় সন্ধ্যা এখানে কাটাতে পারলে খুশী হতাম। উপায় নেই। আমি আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যেতে এসেছি।

—কোথায়?

—জগৎশেঠ মহতাব চাঁদের গৃহে।

মীরকাশিম হতবাক্।

—জগৎশেঠের গৃহে! কেন?

—কেনর উত্তর গিয়েই পাবেন। সকলেই সেখানে উপস্থিত আছেন। আপনার উপস্থিতিও প্রয়োজন। সিপাহশালারের অনুরোধে আপনাকে সঙ্গে করে নিয়ে যাবার জন্যে এসেছি।

মীরকাশিম দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন।

জগৎশেঠের গৃহে সকলে একত্রিত হয়েছেন কেন? ষড়যন্ত্র কি পাকিয়ে উঠল না এখনও আলোচনা পর্যায়ে? অবস্থা যাই হোক, তাঁকে আহ্বান করবার তো কোন সঙ্গত কারণ খুঁজে পাওয়া যাচ্ছে না। এই পরিস্থিতির সুযোগ নিয়ে মীরন কি তাঁকে বিপাকে ফেলতে চায়?

—কি ভাবছেন? গোলাম হোসেন প্রশ্ন করলেন।

—ভাবছি, আমাকে আহ্বান করা হল কেন?

—এখানে দাঁড়িয়ে ভেবে কূলকিনারা পাবেন কি?

—তা অবশ্য। চলুন।

জগৎশেঠের গৃহে পেঁাছে মীরকাশিম দেখলেন, রাজবল্লভ, রামনারায়ণ, রায়দুর্লভ, মীরজাফর উপস্থিত রয়েছেন। মীরন নেই। মীরকাশিমের উপস্থিতিকে কেউ গুরুত্ব দিলেন না। আলোচনা পূর্ববৎ চলতে লাগল।

—রাজা রাজবল্লভ রাজনীতিতে প্রবীণ। তাঁর উপদেশ অগ্রাহ্য করা আমি সমীচীন মনে করি না।

জগৎশেঠের কথা শুনে রাজবল্লভ বললেন, আমার কথা মেনে চলতে হবে এমন কোনবাধ্যবাধকতানেই। আপনারা শুধু গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন, আমরা প্রকাশ্যে নবাবের বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করতে গেলে প্রজারা আমাদের বিরুদ্ধাচরণ করতে পারে, তখনকার অবস্থা ভেবে দেখেছেন কি? সুবে বাংলায় আমাদের স্থান হবে না। এমন কি দুনিয়া থেকেও বিদায় নিতে হতে পারে। রামনারায়ণ বললেন, রাজা ঠিক কথাই বলছেন। আমরা শুধু কলকাঠি নাড়ব। ওই উদ্ধত ছোকরাকে তখ্‌ত থেকে নামাতেই হবে।

রায়দুর্লভ বললেন, তবে সিরাজের পরএমনএকজনকেতখ্‌তে বসাতে হবে যে আমাদের খুব বাধ্য।

মীরজাফর সকলের মুখের ওপর দৃষ্টিবুলিয়ে নিলেন। আশার জোয়ার বইতে আরম্ভ করল তাঁর মনে। তিনি ছাড়া বর্তমানে উপযুক্ত ব্যক্তি কে আছে আর।

মীরকাশিম বুদ্ধিমান ব্যক্তি। তিনিএবারতাঁরনাম মীরকাশিম নিশ্চয় উত্থাপন করবেন। জামাতাকে আহ্বান করে আনার উদ্দেশ্যই তাই। পূর্বে সতর্ক করে না দেওয়ার জন্য নাম উত্থাপন তিনি করলেন না।

জগৎশেঠ বললেন, গণ্ডে এখনও আমি আঘাত অনুভব করি। এই

অপমানের জ্বালা থেকে এ জীবনে আমার পরিত্রাণ নেই। সিরাজকে তখ্‌ত থেকে নামাতে পারলে অবশ্য জ্বালার কিছু উপশম হবে। কাকে সামনে রেখে আমরা কলকাঠি নাড়ব? আপনি এ সম্পর্কে কিছু চিন্তা করেছেন রাজা রাজবল্লভ?

—চিন্তা করেছি শ্রেষ্ঠী মহতাব চাঁদ।

—কে—কে—?

সকলে আগ্রহে ভেঙে পড়লেন।

মীরজাফরের মুখ আলোকিত।

রাজবল্লভ বললেন, আমি উপযুক্ত ব্যক্তির কথাই চিন্তা করেছি।

গোলাম হোসেন বললেন, কে সেই উপযুক্ত ব্যক্তি?

সিরাজের নিকটতম আত্মীয় সাওকতজঙ্গ।

সাওকতজঙ্গ !!!

হতাশায় মীরজাফর ভেঙে পড়লেন।

তাঁর কথা রাজবল্লভের স্মরণ হল না। অপদার্থ সওকতজঙ্গকে সিরাজের পর সুবে বাংলার তখ্‌তে বসাতে চান তিনি। মতিচ্ছন্ন ছাড়া একে আর কি আখ্যা দেওয়া যায়।

জগৎশেঠ বললেন, আপনি পূর্ণিয়ার শাসক সওকতজঙ্গের কথা বলছেন?

—হ্যাঁ।

রায়দুর্লভ বললেন, উপযুক্ত মনোনয়ন। এখন সওকতজঙ্গকে শুধু তাতিয়ে তুলতে হবে। অবশ্য আমার ধারণায় সে কাজ খুব কঠিন হবে না।

রাজা রাজবল্লভ বহুদর্শী ব্যক্তি। তিনি অনুমান করেছিলেন মীরজাফরের মনোগত ইচ্ছা কি। এখন মুখের ভাব দেখে সম্পূর্ণ নিশ্চিন্ত হলেন। বললেন, তখ্‌তে বসবার যোগ্যতা অবশ্য সওকতজঙ্গের নেই। যোগ্যতার বিচারে মীরজাফর আলী শ্রেষ্ঠ ব্যক্তি। কিন্তু আমরা পূর্বেই স্থির

করেছি আসরে নামবার উপযুক্ত সময় এখন নয়। সওকতজঙ্গ সিরাজকে সরিয়ে প্রথমে তখ্‌তে বসুক। তারপর তার অপদার্থতা প্রমাণ করতে আমাদের বিশেষ অসুবিধা হবে না। তখন সিপাহ-শালারের তখ্‌ত মুবারক অধিকার করবেন প্রজা সাধারণের সম্পূর্ণ সম্মতির সঙ্গে। আপনারা কি বলেন?

—আপনার যুক্তি অকাট্য।

মীরজাফরের মনে যে মেঘ পুঞ্জীভূত হয়েছিল, রাজবল্লভের কথায় তা কেটে গেল। তিনি প্রসন্ন মনে বললেন, সওকতজঙ্গকে আমাদের মনোভাব এবার তাহলে জানিয়ে দেওয়া হোক। শুভকাজে বিলম্ব না হওয়াই বাঞ্ছনীয়।

—তা তো বটেই। জগৎশেঠ বললেন, আমাদের পূর্ণ সমর্থন জানিয়ে গুছিয়ে একটি পত্র লিখে পূর্ণিয়ায় পাঠাতে হবে। গোলাম হোসেন—

—শ্রেষ্ঠীবর—

—লেখনীতে আপনার দক্ষতা সর্বজনবিদিত। আমার অনুরোধ পত্রটি রচনা করুন আপনি। আর সকলের বোধহয় এই ইচ্ছে।

সকলে সম্মতি প্রকাশ করলেন।

গোলাম হোসেন সংযত ভাষায় রচনা করলেন পত্রটি।

এর পর প্রশ্ন উঠল পত্র নিয়ে যাবে কে।

যাবার লোকের অভাব নেই। তবে এই দায়িত্বপূর্ণ কাজ যে কোন লোককে দেওয়া যাবে না। কোন রকমে পত্রখানি যদি নবাবের হাতে গিয়ে পড়ে, অবস্থা চরমে গিয়ে উঠবে। সে ঝুঁকি নেওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়।

মীরজাফর ভেবেচিন্তে দেখলেন এই গুরুদায়িত্ব সহজেই অর্পণ করা যায় মীরকাশিমের ওপর। তিনি হাওয়া বদল করতে পূর্ণিয়া যাচ্ছেন এই কথা প্রচার করে দিলেই হল। পত্র দেওয়া ছাড়াও মীরকাশিম পরিস্থিতি বর্ণনা করতে পারবেন সওকতজঙ্গ-এর কাছে।

মীরজাফর বললেন, কাশিম তুমি তো পূর্ণিয়া যেতে পার ?
—আমি—।
—তুমি এই মন্ত্রণাসভায় উপস্থিত রয়েছো। পত্র দেওয়া ছাড়াও সওকতজঙ্গকে সমস্ত বুঝিয়ে বলতে পারবে।
মীরজাফরের প্রস্তাবকে সকলে স্বাগত জানালেন।
অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়লেন মীরকাশিম।
বললেন আমাকে ক্ষমা করুন।
—আপত্তি করছো, কি কারণে ?
—আমার পক্ষে এখন পূর্ণিয়ায় যাওয়া সম্ভব হবে না।
—সম্ভব না হওয়ার কারণটা কি ?
—সম্পূর্ণ ব্যক্তিগত কারণেই আমি যেতে চাইছি না। এই গুরুদায়িত্ব আমার উপর অর্পণ করবেন না।
রাজবল্লভ বললেন, আপনি আপত্তি জানাচ্ছেন কাজেই আমাদের আর কিছু বলবার রইল না। অবশ্য আপনি পূর্ণিয়া গেলেই সমস্ত দিক রক্ষা পেত। যা হোক গোলাম হোসেন, এই দায়িত্ব গ্রহণ করতে আপনার কোন আপত্তি আছে ?
গোলাম হোসেন চিন্তা না করে বললেন, আমার কোন আপত্তি নেই।
সকলে স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।
প্রস্তাব দেওয়ায় পর মীরকাশিম আপত্তি জানানোতে সকলে বিশেষ চিন্তিত হয়ে পড়েছিলেন। গোলাম হোসেন সম্মত হয়ে যাওয়ায় সকলের মনের উপরকার পাষাণভার নেমে গেল।
জগৎশেঠ বললেন, আপনার আগামীকাল পূর্ণিয়া যাত্রা করতে নিশ্চয় কোন অসুবিধা হবে না ?
—বিন্দুমাত্র না।
যাত্রা সম্পর্কিত আরো দু'চার কথা হবার পর সভা ভঙ্গ হল।

সওকতজঙ্গ আলীবর্দীর মধ্যম কন্যার পুত্র। আলীবর্দী নিজের জীবদ্দশাতেই তাঁকে পূর্ণিয়ার শাসকের পদ দিয়েছিলেন। সওকত-জঙ্গ নিজেকে অত্যন্ত যোগ্য ও বিবেচক বলে মনে করেন। প্রকৃত পক্ষে তাঁর মতো বিলাসপরায়ণ অপদার্থ ও খামখেয়ালী ব্যক্তি সুবে বাংলায় বোধ হয় দ্বিতীয় নেই।

দরবারে তিনি বিশেষ আসেন না। তাঁর সময় অতিবাহিত হয় তসবির মহলে। এই মহলে অসংখ্য অর্ধ-উলঙ্গ সুন্দরী তাঁর মনোরঞ্জন করবার জন্য নিজেদের মদালসা যৌবন নিয়ে তৎপর হয়ে রয়েছে। এ ছাড়া বয়ে চলে সিরাজীর স্রোত। শাসন পরিচালনা করেন উজীর।

গোলাম হোসেন পূর্ণিয়ায় পৌঁছোলেন।

সৌভাগ্যক্রমে সওকতজঙ্গ দরবারে এসেছেন সেদিন।

নিজের পরিচয় দিয়ে গোলাম হোসেন পত্রখানি প্রদান করলেন।

প্রায় আঁতকে উঠলেন সওকতজঙ্গ।

—পত্র! পত্র কেন—? কে লিখল পত্র?

—পত্র পাঠ করলেই আপনি সমস্ত বুঝতে পারবেন।

—আমি পত্র পাঠ করব! উজীর, দেখতো, মুর্শিদাবাদ থেকে আবার কি হুকুম এল। প্রজাদের সুখে শান্তিতে রাখবার জন্য আমি সব সময় ব্যস্ত। আবার নবাবের নতুন নতুন হুকুম তামিল কর! আর পারা যায় না।

উজীর পত্র পাঠ করলেন।

উজ্জ্বল মুখে পত্রের সারাংশ বললেন সওকতজঙ্গকে।

সওকতজঙ্গ চকিতে মসনদ থেকে উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, অ্যাঁ—বলকি—বলকি উজীর? জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, মীরজাফরের মতো মানী লোক আমাকে বাংলার মসনদে চাইছেন!

গোলাম হোসেন বললেন, তাঁরা অন্যায় কিছু করতে যাননি। তখ্‌তের উপর দাবি সিরাজের চেয়ে আপনার কম কোথায়?

—তা তো বটেই। আমরা দুজনেই আলীবর্দীখাঁর নাতি। তখ্তের উপর আমার যতটা দাবি তার দাবি এক রতি বেশী নয়। শুধু—

—শুধু পক্ষপাতিত্ব করে আলীবর্দী তাঁকে তখ্ত দিয়ে গেছেন। উৎসাহের সঙ্গে সওকতজঙ্গ বললেন, ঠিক ওই কথাই আমি বলতে যাচ্ছিলাম। পক্ষপাতিত্ব—বটেই তো। শেষ বয়সে বুড়ো বেশ চাল চেলে গেল।

নিম্ন কণ্ঠে উজীর বললেন, জাহাঁপনা, আমদরবারে এ সমস্ত বিষয় নিয়ে আলপ-আলোচনা না করাই ভাল।

—ঠিক উজীরের বুদ্ধি বিবেচনা আছে বলতে হবে।

—হাতের ঈশারায় সভাস্থ সকলকে বিদায় নিতে বললেন সওকত-জঙ্গ। সকলে বিদায় নেবার পর দরবারে রইলেন, সওকতজঙ্গ, গোলাম হোসেন, উজীর এবং কয়েকজন পদস্থ কর্মচারী।

—যাক, এবার নিশ্চিন্ত মনে কথাবার্তা বলা যেতে পারে। বুঝলেন মিঞা সাহেব, গোলমালের সৃষ্টি তখনই আমি করতে পারতাম। মায়া হল সিরাজের উপর। হাজার হোক ছোট ভাই। বসুক তখ্তে। সবিনয়ে গোলাম হোসেন বললেন, আপনার মহানুভবতা তুলনা-হীন। কিন্তু নবাবের অত্যাচারে চতুর্দিকে হাহাকার পড়ে গেছে। প্রজা সাধারণ চায় আপনাকে। সকলের দাবি এখন আপনি কি ভাবে উপেক্ষা করবেন।

—তাই তো, কি ভাবে উপেক্ষা করব আমি। উজীর, তুমি তো কিছু বলছো না?

—আমি কি বলব জাহাঁপনা। আপনি যখন বলছেন—

—তা বটে। কিন্তু আমার কর্তব্যে যে একটা ত্রুটি থেকে যাচ্ছে। কি যেন নাম তোমার?

—গোলাম হোসেন।

—ঠিক, ঠিক গোলাম হোসেন। তুমি এত বড় সুসংবাদ এনে দিলে,

তোমাকে আমার পুরস্কার দেওয়া উচিত। আমার হেফাজতে পনেরো থেকে চল্লিশের মধ্যে সব বয়সের নাচওয়ালী আছে। কোন বয়সের কজনকে চাই বল ?

ঘৃণায় গোলাম হোসেনের মন রি রি করে উঠল।

—নাচওয়ালী আমার প্রয়োজন নেই জনাব। যে পত্র নিয়ে এসেছি সে সম্পর্কে কি ব্যবস্থা অবলম্বন করবেন তা জেনে যেতে পারলে সুখী হব।

—নাচওয়ালী চাও না! এমন বিচিত্র মানুষ আমি তো দেখিনি। যাক—। একটা ব্যবস্থা অবলম্বন করতে হবে, না? উজীর, কি করা যায় বলতো?

—আপনি যেমন আদেশ করবেন আমি সেইভাবে কাজ করব জাহাঁপনা।

—তাই তো। বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব হতে চলেছি আমি আর আদেশ করবে অন্য লোক!

সওকতজঙ্গ চিন্তা করতে লাগলেন।

চিন্তা করতে করতে পদচারণা করলেন।

এক সময় উল্লাসিত কণ্ঠে বললেন, উজীর, মুর্শিদাবাদে পরোয়ানা পাঠিয়ে দাও। লিখে দাও, পরোয়ানা পাওয়া মাত্র সিরাজ যেন তখ্‌ত ছেড়ে দেয়।

উজীর ইতস্তত করে বললেন, তিনি যদি পরোয়ানাকে গ্রাহ্য না করেন?

—বল কি? গ্রাহ্য করবে না?

—গ্রাহ্য না করার সম্ভাবনাই প্রবল।

বুঝলে কি ভাবে?

এই প্রশ্নের উত্তরে নিরেট সওকতজঙ্গকে কি বলবেন উজীর চিন্তা করতে লাগলেন।

—উত্তর দাও?

প্রায় প্রাণ হাতে করে উজীর বললেন, শত হলেও তিনি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার বর্তমান নবাব। তিনি কোন প্রাদেশিক শাসনকর্তার পরোয়ানাকে গ্রাহ্য নাও করতে পারেন।

—তুমি বলছো, সিরাজ চিন্তা করে দেখবে না এই প্রাদেশিক শাসন-কর্তা নবাব হবার জন্য বদ্ধপরিকর।

নবাব অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতির। তিনি হয়তো—

—ঠিক—ঠিক বলেছো। তবে ওর ঔদ্ধত্য আমি আর বরদাস্ত করব না। আমার পরোয়ানাকে অগ্রাহ্য করবে—!

সওকতজঙ্গ ইঙ্গিত করতেই দুজন সুরূপা বাঁদী দ্রুত পায়ে এল। তাদের হাতে সোনার পাত্রে সিরাজী। নিজের শুষ্ক কণ্ঠকে আর্দ্র করে নিলেন বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার ভাবী নবাব।

তারপর বললেন উৎসাহের সঙ্গে।

—অগ্রাহ্য করলে শাস্তি তাকে পেতে হবে। উজীর, পরোয়ানায় লিখে দাও, তখ্‌তের অধিকার না ত্যাগ করলে আমি সসৈন্যে গিয়ে তাকে তখ্‌ত- থেকে নামিয়ে দেব। সিরাজ ভয় পেয়ে যাবে। প্রাণের মায়া বড় মায়া, কি বল—কি যেন নাম তোমার, ও—হ্যাঁ, হ্যাঁ—গোলাম হোসেন?

—আপনি যথার্থই বলেছেন। প্রাণকেই আমরা ভালবাসি প্রাণ দিয়ে। নবাবের আবার আরো দামী প্রাণ, আমাদের চেয়ে মায়া একটু বেশী হবে বই কি।

—তাহলেই দেখ, তখ্‌ত থেকে নেমে দাঁড়ানো ছাড়া উপায় নেই। উজীর বিলম্ব যেন না হয়, পরোয়ানা আজই পাঠিয়ে দেওয়া চাই।

সওকতজঙ্গ মসনদে গিয়ে বসলেন।

গোলাম হোসেনকে নিকটে আহ্বান করে খোস গল্প আরম্ভ করলেন। অল্প সময় পরে উজীর পরোয়ানা লিখে নিয়ে এলেন।

সওকত চোখ তুলে বললেন, আবার তোমার কি চাই?

সবিনয়ে উজীর বললেন, পরোয়ানা লেখা হয়ে গেছে জাহাঁপনা। আপনি স্বাক্ষর করে দিলেই পাঠিয়ে দিতে পারি।

সবিস্ময়ে সওকতজঙ্গ বললেন, পরোয়ানা! কিসের পরোয়ানা?

—পরোয়ানা লিখতে আপনি আদেশ দিলেন, আমি সেই পরোয়ানা লিখে এনেছি জাহাঁপনা।

—আমি আদেশ দিয়েছি! তোমার জটপাকানো কথা আমার বুঝে উঠতে মাঝে মাঝে কষ্ট হয় উজীর।

গোলাম হোসেন বিব্রত উজীরকে উদ্ধার করবার জন্য বললেন, আপনি বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হতে চলেছেন। সিরাজউদ্দৌলাকে পরোয়ানা পাঠাবার কথা স্থির হল—

—ও—হ্যাঁ, হ্যাঁ। মনে পড়েছে। আসল কথা হল—কি যেন তোমার নাম, মনে পড়েছে গোলাম হোসেন—প্রজাদের চিন্তায় এত ব্যস্ত থাকতে হয়, মনে থাকে না কোন কথা। উজীর পরোয়ানা যখন লেখা হয়ে গেছে, পাঠিয়ে দাও।

—জাহাঁপনা, আপনার স্বাক্ষর—

—স্বাক্ষর! আমার স্বাক্ষরের প্রয়োজন কি?

—আপনার স্বাক্ষর না থাকলে পরোয়ানা কার্যকরী হবে না।

—আমার স্বাক্ষর না থাকলে পরোয়ানা কার্যকরী হবে না?—বল কি? অ্যাঁ—আমার স্বাক্ষরের এত মূল্য? কিন্তু—আমি বলছিলাম স্বাক্ষর না দিলে সিরাজ কি আমার হুমকিতে ভয় পাবে না?

খামখেয়ালী অকর্মণ্য এই লোকটির কার্যকলাপে গোলাম হোসেন হতবাক্ হয়ে যান। সময়ের মূল্য এরা বোঝে না। স্বাক্ষর করে দিলেই কাজ মিটে যায় তবু অযথা বিলম্ব করে আনন্দ পাওয়া।

তিনি বললেন, পরোয়ানার উপর স্বাক্ষর করে দেওয়াই হল বিধি। এতে আপনার অসুবিধার কিছু নেই।

গোলাম হোসেন না জানলেও সওকতজঙ্গ জানেন বিলক্ষণ অসুবিধা আছে। লেখাপড়ার ধার তিনি ধারেন না। কোন রকমে নাম স্বাক্ষর করতে পারেন। তবে স্বাক্ষর করতে গিয়ে কতগুলি কলমের প্রয়োজন হবে তা তিনি নিজেও জানেন না।

—স্বাক্ষর করে ঝামেলা তাহলে মিটিয়েই ফেলা যাক। এত কাজ কি একসঙ্গে করা যায়। উজীর, নিয়ে এস দেখি পরোয়ানা।

উজীর পরোয়ানা এগিয়ে ধরলেন।

—স্বাক্ষর শেষ করে আমি ভীষণ ক্লান্ত হয়ে পড়বো। রুমেলা বাঈ, হীরা বাঈ এদের সংবাদ পাঠাও। ঘিরে থাকুক আমায়। সুন্দরীরা কাছে থাকলে ক্লান্তি ভাবটা কেটে যাবে।

তসবির মহলে সংবাদ গেল।

দল বেঁধে সুন্দরীরা এল দরবারে।

তাদের মুখের দিকে তাকাতে তাকাতে পরোয়ানায় স্বাক্ষর করলেন প্রচুর অঙ্গভঙ্গী সহকারে। কপালে ঘামের বন্যা বইল। মুখ অসম্ভব গম্ভীর হয়ে উঠল। কোন রকমে সওকত কথাটুকু লিখে সওকত-জঙ্গ যখন কলম রাখলেন, মনে হতে লাগল অসম্ভব পরিশ্রমের কোন কাজ তিনি করেছেন।

গোলাম হোসেন স্বস্তির নিশ্বাস ফেললেন।

সওকতজঙ্গের পরোয়ানা পেয়ে সিরাজ স্তম্ভিত হয়ে গেলেন। ক্রোধে তাঁর সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। পূর্ণিয়ার নবাব এত সাহস সংগ্রহ করলেন কোথা থেকে? কে তাঁর মনে ইন্ধন জুগিয়েছে?

সে যেই হোক।

সওকতজঙ্গকে সিরাজ ক্ষমা করবেন না।

এত স্পর্ধা। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবকে পরোয়ানায় তখ্‌ত

ত্যাগের নির্দেশ দেওয়া হয়েছে! আদেশ অমান্য করলে, সসৈন্যে মুর্শিদাবাদ আক্রমণের হুমকি!

নবাব বিশাল দরবারের চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন, সিপাহশালার মীরজাফর অনুপস্থিত।

—মোহনলাল।

মোহনলাল সসম্ভ্রমে এগিয়ে এসে কুর্নিশ করল।

—জাহাঁপনা—

—সৈন্য সাজাও।

—পূর্ণিয়ায় গিয়ে সওকতজঙ্গকে চূড়ান্ত শিক্ষা দিয়ে এস। সেই অপদার্থ পালিয়ে প্রাণ বাঁচাতে না পারে সেদিকে দৃষ্টি রাখবে।

—জাহাঁপনার আদেশ পালিত হবে।

সওকতজঙ্গের পতন ঘটল।

তাঁর ছিন্নশির দেখে তৃপ্ত হলেন নবাব। এবার অন্য পথ ধরলেন শ্রেষ্ঠীবর্গ ও মীরজাফর। ইতিহাসের কলঙ্কতম অধ্যায় রচিত হল পলাশীর প্রান্তে। ইংরেজদের সহায়তায় চূড়ান্তভাবে জয়লাভ করলেন মীরজাফর ওই সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতার অবিস্মরণীয় দৃষ্টান্ত তিনি তুলে ধরলেন।

হিরাঝিল প্রাসাদেই দরবার বসছে।

ক্লাইভের চক্রান্তে ইতিপূর্বেই উমিচাঁদ সম্পূর্ণ উন্মাদ হয়ে গেছেন। বাংলার মসনদের আড়ালে দাঁড়িয়ে তিনি ত্রিশ লাখ টাকা লাভ করবেন ভেবেছিলেন। টাকার স্বপ্ন যখন ভাঙল স্বাভাবিক জ্ঞান আর ফিরে এল না। উন্মাদ হয়ে গেলেন মর্তের কুবের উমিচাঁদ।

আজকে দরবারে অন্যান্যদের সঙ্গে উপস্থিত আছেন জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ স্বরূপচাঁদ, মীরকাশিম, মীরন, ক্লাইভ, ওয়াটস ও

স্ক্রাফটন। নবাব তখন দরবারে আসেননি। সিরাজের রুধির সিক্ত তখ্‌ত মুবারক শূন্য রয়েছে।

নকীব ঘোষণা করল।

—নবাব সুজাউল মুল্ক হাসানদ্দৌলা মীর মহম্মদ জাফর আলী খাঁ মহবতজঙ্গ বাহাদুর—

সকলে আসন ত্যাগ করে নবাবকে সম্মান প্রদর্শন করলেন। মীরজাফর মসনদে উপবেশন করে সকলকে আসন গ্রহণ করবার জন্য ইঙ্গিত করলেন। সকলে আসন গ্রহণ করবার পর নবনিযুক্ত দেওয়ান রায়দুর্লভ বললেন, জাহাঁপনা, সাহেবরা আজই আপনার সঙ্গে কথাবার্তা শেষ করে নিতে চান।

মীরজাফর এই রকম একটা আশঙ্কা নিয়েই দরবারে এসেছিলেন। টাকার জন্য সাহেবরা এক জোট হয়ে আসবেন দরবারে। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে তিনি কল্পনাও করতে পারেননি অর্থের জন্য ক্লাইভ ক্ষুধার্ত হায়নার মতো ব্যবহার করবেন।

তাঁর ধারণা ছিল, তিনি তখ্‌তে বসবার পর ইংরেজদের মোটা অঙ্কের অর্থ দেবেন—অথবা যাই দিন না কেন তাতে তারা সন্তুষ্ট থাকবে। তিনি অবশ্য তাদের অবাধ বাণিজ্য করার অনুমতি দেবেন।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে অন্য দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে।

ক্লাইভ খেলার পুতুল করে রেখেছেন মীরজাফরকে। প্রকারান্তরে তিনি জানিয়েই দিয়েছেন তাঁকে মসনদে বসানো হয়েছে শুধু সর্তের টাকা পাবার জন্য নয়, প্রয়োজন মতো ছুয়ে নেবার অবকাশও রইল। প্রথম থেকেই ইংরেজদের সম্পর্কে অকারণ ভয় মীরজাফরের মনে বাসা বেঁধেছিল। কোন মূল্যেই ক্লাইভের তিনি বিরুদ্ধাচরণ করবেন না, একথা প্রায় জানিয়েই দিয়েছিলেন। তখ্‌ত অধিকার করবার পর তিনি যদি কঠোর মনোভাব অবলম্বন করতেন, ইতিহাসের রূপ আমূল পরিবর্তন হত সন্দেহ নেই।

রায়দুর্লভের কথায় মীরজাফর বললেন, কোন্ কথাবার্তার কথা আপনি বলছেন দেওয়ান ?

রায়দুর্লভ কিছু বলার পূর্বেই ওয়াটস বললেন, ইওর এক্সলেন্সি, আমাদের পাওনা সংক্রান্ত কথা আজই আমরা মিটিয়ে ফেলতে চাই।

—সিরাজের ধনাগার তো আপনাদের উন্মুক্ত করে দিয়েছিলাম সাহেব।

—তা দিয়েছিলেন কিন্তু ধনাগার থেকে যা পাওয়া গেছে তাতে আমাদের পাওনার এক তৃতীয়াংশ শোধ হয়নি।

অসহায় কণ্ঠে মীরজাফর বললেন, আমার অবস্থা তো দেখছেন। কিছু সময় না পেলে কোথা থেকে টাকা সংগ্রহ করে দেব বলুন ?

ওয়াটস বললেন, কোম্পানির কাউন্সিলররা আপনাকে সময় দেবে না। সর্ত যখন হয়, সময় নেওয়ার কোন কথা তখন হয়নি। আপনার কাছে টাকা না থাকে, শেঠেদের কাছ থেকে নিয়ে আপাতত কাজ চালান।

আলীবর্দীর অফুরন্ত ধন-রত্ন ছিল। সিরাজ অতি অল্প সময় রাজত্ব করলেও সেই ধনরত্নকে আরো বৃদ্ধি করে গিয়েছিলেন। এই ধনাগারের সন্ধান মীরজাফর জানতেন। তিনি স্থির করেছিলেন, সমস্ত গোলমাল না মিটে যাওয়া পর্যন্ত ওই ধনাগার সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিস্পৃহ থাকবেন। ইংরেজদের শ্যেন চক্ষু থেকে রক্ষা করতে হবে। ওয়াট্স গুপ্ত ধনাগারের কথা না তুলে, শেঠেদের কাছ থেকে টাকা তাঁদের দিতে বলায় তিনি খুশী হলেন।

মীরজাফর জগৎশেঠের দিকে তাকিয়ে বললেন, আমাকে বর্তমানের এই অসুবিধার হাত থেকে রক্ষা করুন শ্রেষ্ঠী মহতাবচাঁদ।

জগৎশেঠ বিনয়ে নুয়ে পড়লেন।

—এ আমার সৌভাগ্য জাহাঁপনা। প্রয়োজনের সময় আপনি আমাকে স্মরণ করেছেন। কিন্তু—বর্তমানে আমার নিজেরই অর্থের বিশেষ টানাটানি যাচ্ছে। এক্ষেত্রে—

—রাজা রাজবল্লভ, আপনার সঙ্গে হৃদ্যতা আমার দীর্ঘদিনের। এই বিপাক থেকে বন্ধুকে উদ্ধার করতে কি পারেন না ?

—জাহাঁপনা, মহানুভব। রাজবল্লভ বললেন, তিনি আমাকে বন্ধুর মর্যাদা দিয়ে বিরল সৌভাগ্যের অধিকারী করেছেন। তাঁকে এই দায় থেকে উদ্ধার করতে পারলে আমি কৃতার্থ হতাম। কিন্তু সামর্থ্য বর্তমানে আমার নেই হজরত।

মীরজাফর পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, সামর্থ্য আছে কিন্তু সাহায্য করবেন না এঁরা। অথচ কিছুই বলবার নেই। এই সুবিধাবাদের সহায়তায় তিনি মসনদে বসেছেন। জগৎশেঠ এবং রাজবল্লভ যখন টাকা দিতে অস্বীকার করলেন তখন স্বরূপচাঁদকে প্রশ্ন করা নিরর্থক। তবু ক্ষীণ আশা নিয়ে মীরজাফর বললেন, স্বরূপচাঁদ, আপনিও কি আমাকে নিরাশ করবেন ?

স্বরূপচাঁদ বিনীতভাবে বললেন, আমার ক্ষমতা কতটুকু জাহাঁপনা ? বিপদের সময় আপনাকে সাহায্য করতে পারলে আমি তো ধন্য হয়ে যেতাম। আমার দুর্ভাগ্য আপনাকে সাহায্য করতে পারছিনা।

—কর্নেলসাহেব, অর্থ সংগ্রহ করবার চেষ্টা আমি করলাম, দেখলেন তো কিছুই সংগ্রহ করতে পারলাম না। আমাকে কিছুদিন সময় অনুগ্রহ করে দিন।

মীরন বললেন, আপনি কেন এত বিনয় প্রকাশ করছেন হজরত। কোষাগারে অর্থ নেই। অর্থ এলে সর্ত পূরণ করবেন।

বিরক্তসূচক ভাবে মীরজাফর বললেন, তুমি এসমস্ত ব্যাপারে কথা ব'ল না মীরন। কর্নেল সাহেব, আপনি আমার প্রস্তাব বিবেচনা করে দেখুন।

ক্লাইভ বলেন, আমার ব্যক্তিগত মতামতের ওপর কোন কিছুই নির্ভর করে না। কাউন্সিলাররা যা স্থির করবেন আমাকে তাই মেনে চলতে হবে ইয়োর এক্সেলেন্সি।

অর্থ বাকী ফেলে রাখা অসম্ভব।

—কিন্তু এখন আমি কিভাবে অর্থ দেব বলুন?

—আমার অপরাধ ক্ষমা করবেন। ইয়োর এক্সেলেন্সি ইচ্ছাকৃত ভাবে আমাদের বঞ্চিত করবার চেষ্টা করছেন।

সিরাজের মুখের উপর কেউ এই ভাষায় কথা বললে, রসাতল কাণ্ড ঘটে যেত। কিন্তু মীরজাফর কোন রকম উষ্মা প্রকাশ করলেন না। শুধু মুখে বিস্ময়ের ভাব ফুটিয়ে বললেন, আমি দিতে পারতাম কিন্তু ইচ্ছাকৃতভাবে অর্থ দিচ্ছি না, এই কথাই বোধহয় কর্নেলসাহেব বললেন?

নির্বিকার মুখে ক্লাইভ বললেন, আপনি ঠিকই অনুমান করেছেন।

—বিশ্বাস করুন আমার কাছে কিছু নেই।

—আপনার কাছে অর্থ নেই কিন্তু গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান আপনার জানা আছে। প্রবলভাবে মীরজাফরের বুক স্পন্দিত হল।

—গুপ্ত ধনাগার!

—মৃত নবাবের গুপ্ত ধনাগারের কথা মুর্শিদাবাদে কার অজানা ইয়োর এক্সেলেন্সি? ধনাগারের প্রকৃত অবস্থানের কথা শুধু জানা আছে আপনার।

—আমার—! কিন্তু—

জগৎশেঠ ক্লাইভকে সমর্থন করলেন।

—সিরাজের গুপ্ত ধনাগারের কথা জানে সকলেই। আপনি কোম্পানিকে ধনাগারের সন্ধান দিলে ঋণমুক্ত হতে পারবেন, এও কম কথা নয় জাহাঁপনা।

মীরজাফর ইতস্তত করতে লাগলেন।

তাঁর মনের মধ্যে প্রবল দ্বন্দ্ব আরম্ভ হয়েছে।

রায়দুর্লভ শেষে মুশকিল আসান করলেন।

তিনি নিম্ন কণ্ঠে বললেন, নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে ইতস্তত

করবেন না হজরত। ইংরেজরা আপনাকে তখ্‌তে বসিয়েছে, তাদের সঙ্গে বিবাদ করলে তারা আপনাকে তখ্‌ত থেকে নামিয়ে দিতে পারে। আমাদের ক্ষমতা নেই যে তাদের কাজে বাধা দেবার চেষ্টা করি। সুতরাং—

মীরজাফর বিচলিত হলেন।

চিন্তা করে দেখলেন, রায়দুর্লভ অন্যায় কিছু বলেন নি। ইংরেজদের কথা অমান্য করলে তাঁর সাধের নবাবী শূন্যে মিলিয়ে যাবে সন্দেহ নেই। ক্লাইভ হয়তো রাজা রাজবল্লভকে কিংবা তাঁর দেওয়ান রায়দুর্লভকেই তখন তখ্‌তে বসিয়ে দেবেন। সুতরাং গুপ্ত ধনাগারের সন্ধান দিয়ে দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

—মীরন—

—জাহাঁপনা।

—কর্নেলসাহেবকে গুপ্ত ধনাগারে নিয়ে যাও।

মীরন স্থানকাল ভুলে প্রায় ফেটে পড়লেন।

—এ আপনি কি আদেশ দিচ্ছেন?

—প্রতিবাদ ক'রো না। এঁদের নিয়ে যাও ওখানে।

—আদেশ আপনি ফিরিয়ে নিন জাহাঁপনা। এই বেনিয়াদের এখন সংযত করতে না পারলে এদের লোভের হাত থেকে কোনদিন রেহাই পাবেন না।

ক্লাইভ ও ওয়াট্‌সের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হল।

ক্লাইভ বললেন, ইয়োর এক্সেলেন্সি, আমরা বুঝতে পারছি না, পলাশীতে আমরা প্রাণপণ যুদ্ধ করেছিলাম আপনার ভবিষ্যতকে উজ্জ্বল করবার জন্য না আমরা নিজেরাই তখ্‌ত অধিকার করব স্থির করেছিলাম?

রায়দুর্লভ আবার নিম্ন কণ্ঠে বলেন, জাহাঁপনা, ছোট নবাবকে না সামলালে কেলেঙ্কারীর আর বাকী কিছু থাকবে না। আপনি একটু শক্ত হোন।

মীরন চীৎকার করে উঠলেন।

—দেওয়ান সাহেব, আপনি আর ওঁকে কুমন্ত্রণা দেবেন না।

—হজরতকে আমি কুমন্ত্রণা দেব ?

—দেব নয়, দিচ্ছেন।

মীরজাফর গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, মীরন, তোমার যা বক্তব্য আমায় পরে বলো, আমি শুনবো। এখন আমি যা বলছি, সে আদেশ পালন কর। কর্নেলসাহেবকে গুপ্ত ধনাগারে নিয়ে যাও।

মীরন কি বলতে গিয়েও বললেন না। দৃঢ় পদক্ষেপে অগ্রসর হলেন। নবাবের জয়ধ্বনি করে ক্লাইভ, ওয়াট্‌স ও ক্রাফটন তাঁকে অনুসরণ করলেন।

জগৎশেঠ বললেন, আপনার উদারতা প্রশংসনীয়। ইংরেজদের অসন্তুষ্ট না করে, ধনাগারের সন্ধান দিয়ে ভাল কাজই করেছেন জাহাঁপনা।

রাজবল্লভ বললেন, আপনি চিন্তা করবেন না জাহাঁপনা। রাজকোষ আবার পূর্ণ হয়ে যাবেই।

মীরজাফর কিছু বললেন না।

গম্ভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

তখ্‌ত অধিকার করবার পূর্বে তিনি যে উৎসাহ লাভ করেছিলেন, সে উৎসাহের কণামাত্র আর তাঁর মনে অবশিষ্ট নেই। তিনি উপলব্ধি করছেন, তিনি এখন দাঁড়িয়ে আছেন বালির বাঁধের উপর। বাঁধ যে কোন মুহূর্ত ভেঙে পড়তে পারে।

তাঁর অবস্থাও কি সিরাজের মতো হবে ?

গুপ্ত ধনাগারে গিয়ে ঐশ্বর্যের স্তূপ দেখে ক্লাইভ আত্মহারা হয়ে পড়লেন। বললেন ওয়াট্‌সকে, কতদিন থেকে এই ধনাগারে আমাদের জন্য হীরা জহরৎ সঞ্চিত হয়েছে, তুমি বলতে পার ওয়াট্‌স ?

ওয়াট্‌স মৃদু হাসলেন।

এরপর সেই বিপুল ধনরত্ন বহু নৌকায় চাপিয়ে কলকাতায় চালান দেওয়া হল।

মীরকাশিম সতর্কতার সঙ্গে চতুর্দিক লক্ষ্য করছেন।

মীরজাফরের ইংরেজদের দেবতাজ্ঞানে পূজা করাটাকে তিনি সুনজরে দেখছেন না।

ক্রমে উগ্রভাব প্রকট হয়ে পড়ছে, ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি আর ব্যবসার আওতায় নিজেদের আবধ্য রাখবে না। ভবিষ্যতে শাসনদণ্ড হাতে তুলে নেওয়াই হয়তো তাদের মূল উদ্দেশ্য।

মীরকাশিম মনে প্রাণে ঘৃণা করেন ইংরেজদের।

মীরজাফরের ইংরেজতোষণ তাঁর মনে নবাবের প্রতি প্রচণ্ড বিদ্বেষ এনে দিয়েছে।

অবশ্য মীরন ইংরেজদের প্রতি প্রসন্ন নন। তিনি মীরজাফরকে অবিশ্রান্তভাবে বুঝিয়ে চলেছেন, ইংরেজদের আর প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হচ্ছে না। কিন্তু আফিমের নেশায় সদা সর্বদা বুঁদ মীরজাফর বন্ধু ক্লাইভের মোহ কাটাতে পারছিলেন না।

মীরনকে শুধু স্তোক দিয়ে নিরস্ত রেখেছেন।

মীরকাশিম সম্পর্কে ক্লাইভের কোন মাথাব্যথা নেই। মাথাব্যথা থাকার কথাও নয়। তিনি সক্রিয় রাজনীতিতে অংশ গ্রহণ করবার চেষ্টা করেন নি। দরবারে তাঁর কোন ভূমিকাই নেই। তবে মীরনের সম্পর্কে ক্লাইভ সতর্ক আছেন।

নবাবজাদা যে কোন সময় তাঁদের বিপাকে ফেলতে পারেন এবিষয়ে তিনি স্থির নিশ্চিত।

এদিকে আরেক ঘটনা ঘটেছে।

ঘটনাটি দরবারের নয়, অন্তঃপুরের।

মীরজাফর মসনদে বসবার পর স্বাভাবিকভাবেই ফতেমা ধারণা করেছিলেন তিনি মীরকাশিমকে উচ্চপদে প্রতিষ্ঠিত করবেন। কিন্তু, কার্যক্ষেত্রে সেরকম কিছু ঘটল না। মীরকাশিম নিম্নপদস্থ সেনানায়ক পদেই রয়ে গেলেন। অথচ বহু অযোগ্যব্যক্তির পদোন্নতি হল।

কিঞ্চিৎ অভিমান নিয়েই ফতেমা পিতৃগৃহে গেলেন।

মীরজাফর বিশ্রাম কক্ষে ছিলেন।

মণিবেগমও ছিলেন সেখানে।

কন্যার আগমন সংবাদ পেয়ে, বিশ্রাম কক্ষেই ফতেমাকে আহ্বান করলেন নবাব।

কুশল প্রশ্ন করবার পর, তিনি আগমনের উদ্দেশ্য জানতে চাইলেন। মণিবেগম উপস্থিত থাকায় ফতেমার মনে ইতস্তত ভাব এল। কারণ মীরজাফরের এই তরুণী বেগম ফতেমাকে কোনদিন ভাল চোখে দেখেন নি।

অসীম বলে সংকোচকে জয় করলেন ফতেমা।

—জাহাঁপনা, আর্জি নিয়ে এসেছি।

—কিসের আর্জি বেটি?

স্বামীর সম্পর্কে জন্মদাতাকে, বিশেষ করে তিনি আবার নবাব—তাঁকে কিছু বলা এক অসম্ভব ব্যাপার। ফতেমা লজ্জাশীলা নন। সংকোচের জীর্ণ যবনিকাকে মনের উপর থেকে যখন তুলে ফেলতে পেরেছেন তখন নিজের বক্তব্য পরিষ্কারভাবে বলবেন।

—আমার সারতাজ দরবারে উচ্চ পদ লাভ করুন, এই অনুরোধ নিয়ে আমি আপনার কাছে এসেছি জাহাঁপনা।

মীরজাফর বিব্রত হলেন।

মীরকাশিমকে দরবারে উচ্চ পদ দেওয়া তাঁর নিশ্চয় উচিত ছিল। বিশেষ কোন কারণের বশবর্তী হয়ে যে দেন নি তা নয়। তখ্‌ত আগলে রাখবার জন্য সদাসর্বদা এত বেশী ব্যস্ত আছেন যে অন্য কোন দিকে

দৃষ্টি দেবার অবসর পান নি। ফতেমার কথায় এখন তাই বিব্রত না হয়ে আর উপায় কোথায় ?

যাক, যা হবার তা হয়ে গেছে। এবার ভুল শুধরে নেবেন। মীরকাশিমকে দরবারের কোন উচ্চ পদ দিয়ে সম্মানিত করবেন। কেনই বা করবেন না। তাঁর মতো মর্যাদা সম্পন্ন ব্যক্তিকে উচ্চ পদ দিলে আপত্তি করছে কে ? আর আপত্তি করলেই বা নবাব শুনবেন কেন ?

তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন কিন্তু বলা হল না। মণিবেগম ভ্রূভঙ্গী করে বললেন, আর্জি নিয়ে তোমার এইভাবে উপস্থিত হওয়া লজ্জাজনক। মীরজাফর সবিস্ময়ে তাকালেন মণিবেগমের দিকে।

ফতেমা গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমি নিজের দাবি নিয়ে আব্বাজানের কাছে এসেছি। লজ্জাজনক কোন কাজ করি নি।

টেনে টেনে হাসলেন মণিবেগম।

ওঁদের দুজনের প্রথম সাক্ষাতের লগ্ন বোধহয় শুভ ছিল না। মীরজাফরের বেগম হয়ে যেদিন প্রথম পদার্পণ করেন মণিবেগম সেই দিন থেকে দুজনে দুজনকে বিষ দৃষ্টিতে দেখছেন।

—কোন লজ্জাজনক কাজ করনি ? জাহাঁপনার কাছে স্বামীর প্রসঙ্গ নিয়ে কথা বলা লজ্জাজনক নয় ? দাবির কথা বলছিলে ? এমন কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি যে দাবি মেনে চলতে জাহাঁপনা বাধ্য ?

—বেগম—

—আমাকে বলতে দিন হজরত। মীরকাশিমকে দরবারে উচ্চ পদ দেওয়া হয়নি। তাঁর যোগ্যতার অভাব বলেই দেওয়া হয়নি। আবার দাবির কথা তোলা কেন ?

ফতেমার সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপছে।

মীরজাফরের দিকে তাকিয়ে কোন রকমে ফতেমা বললেন, জাহাঁপনা আপনারও কি এই অভিমত ?

মীরজাফর কিছু পূর্বে চিন্তা করেছিলেন, মীরকাশিমকে উচ্চ পদ দিলে কার কি বলবার থাকতে পারে। কেউ বিরূপ মনোভাব পোষণ করলেও তা তিনি গ্রাহ্য করবেন না। কিন্তু ফতেমার প্রশ্নের উত্তরে এখন তিনি কিছুই বলতে পারছেন না। মণিবেগমের কোন কথার প্রতিবাদ করবার সাহস তিনি বহুদিন হারিয়ে ফেলেছেন।

অসংলগ্নভাবে বললেন, না…মানে…

মণিবেগম দ্রুত কণ্ঠে বললেন, জাহাঁপনা, দরবার থেকে পরিশ্রান্ত হয়ে এসেছেন! এখন তাঁর বিশ্রামের প্রয়োজন। তোমার আর কোন কথা বলবার নেই নিশ্চয়?

ফতেমা আর অপেক্ষা করলেন না।

রাগে, আত্মধিক্কারে কাঁপতে কাঁপতে ফিরে এলেন নিজের গৃহে। মীরকাশিম তখন ছিলেন না। কার্যোপলক্ষ্যে কোথাও গিয়েছিলেন। কেন গিয়েছিলেন ওখানে ফতেমা? তাঁর জন্যে চূড়ান্ত অপমান যে অপেক্ষা করবে তাকি তিনি জানতেন না?

তবু কেন গিয়েছিলেন?

কান্নায় ভেঙে পড়লেন ফতেমা।

আল্লার বোধহয় অভিপ্রায় ছিল এইভাবে তিনি অপমানিত হন।

বিবাহের পূর্বে, কুমারী অবস্থায় যখন ছিলেন ফতেমা, মণিবেগম তাঁকে পদে পদে অপমানিত করেছেন। অথচ চিরটা কাল তাঁর একই ভাবে যায় নি।

মীরজাফর ফতেমাকে স্নেহ করতেন। সহস্র কাজের মধ্যেও তাঁর আদর আব্দার রাখবার জন্য সচেষ্ট থাকতেন।

হঠাৎ একদিন আব্বাজান ও তাঁর মধ্যে মণিবেগম রূপী বিরাট প্রতিবন্ধক সৃষ্টি হল। সে সমস্ত দিনের কথা আজও পরিষ্কার মনে পড়ে ফতেমার। বিস্নুবেগের নাচওয়ালীর দল বহু পথ অতিক্রম করে মুর্শিদাবাদে এসেছিল। মুন্নি ছিল সেই দলে।

সুশ্রী মুখ, টকটকে রং, এক মাথা কোঁকড়া চুল আর ভরা যৌবন নিয়ে মুন্নি যখন নাচের আসরে নামতো, দর্শক পাগল হয়ে উঠতো। নগরের লোকের মুখে মুখে তার খ্যাতি। সিপাহশালারও শুনলেন একদিন মুন্নির রূপ গুণের কথা। বিশেষ মনোযোগী হলেন না। কিন্তু শেষ পর্যন্ত মুন্নি বাঈএর সঙ্গে সাক্ষাৎ হল জাফরগঞ্জ প্রাসাদেই।

কিছুদিন পূর্বে ফৈজীকে দেখে মীরজাফর আত্মহারা হয়েছিলেন। কিন্তু সেই বাইশ সেরি সুন্দরীকে ভুবাহুর মধ্যে পান নি। সিরাজ ছিনিয়ে নিয়েছিলেন। প্রকৃতপক্ষে আত্মধিক্কারে জর্জরিত সিপাহ-শালারের নারীর প্রতি আসক্তি সেই দিন থেকে অনেক স্তিমিত হয়ে গিয়েছিল।

মুন্নি বাঈকে দেখে আবার কামনার আগুন জ্বলে উঠল।

জ্বলে উঠল দাউদাউ করে।

নাচওয়ালীকে ঘরে আনলেন মীরজাফর।

মুন্নি বাঈ রূপান্তরিত হল মণিবেগম।

তাঁবু থেকে হঠাৎ প্রাসাদে চলে এসে চোখ তাঁর ধাঁধিয়ে গিয়েছিল। ঐশ্বর্যের চমকে দিশেহারা হয়ে গিয়েছিলেন। অবশ্য ধাতস্থ হতে সময় নেয়নি। তীক্ষ্ণবুদ্ধির অধিকারিণী তিনি। অবিলম্বে তাঁর রূপ মুগ্ধ পতঙ্গ—বৃদ্ধ স্বামীকে করতলগত করলেন। পরিবারের অন্যান্য সকলের সঙ্গে মীরজাফরের সম্পর্ক তিক্ত করে তুললেন!

ফতেমা মণিবেগমকে ঘৃণা করেছেন কিন্তু অপমানিত হয়েও কোন প্রতি-বাদ করেন নি। প্রতিবাদ করে কোন লাভ হবে না, অথচ অশান্তিকে শুধু এগিয়ে নিয়ে যাওয়া হবে। তবে আজ যে ঘটনা ঘটল তা ফতেমার কল্পনার অতীত ছিল।

তাঁর মতো সম্ভ্রান্ত ব্যক্তির স্ত্রীকে মণিবেগম এইভাবে অপমানিত করবেন এবং মীরজাফর প্রকারান্তরে সমর্থন করে যাবেন এ কল্পনাতীত।

মনস্থির করে ফেলেন ফতেমা।

যে কোন উপায়ে হোক, আজকের এই অপমানের প্রতিশোধ তিনি দেবেন। মণিবেগমকে স্মরণ করিয়ে দিতে হবে তিনি নাচওয়ালী ছাড়া আর কিছুই নন। অভিজাত রক্ত অনেক গাঢ়, অনেক লাল।

সন্ধ্যার প্রক্কালেই মীরকাশিম এলেন।

তাঁর মুখ গম্ভীর—থমথমে।

কিছু যেন হয়েছে। কিছু যেন চিন্তা করছেন।

মীরকাশিম পত্নার মুখের দিকে তাকিয়ে বললেন, বেগম—

—সারতাজ…

—তোমার কিছু হয়েছে বেগম? মুখের অবস্থা কেমন থমথমে?

—আপনাকেও তো কেমন চিন্তিত—গম্ভীর দেখাচ্ছে সারতাজ?

—একটা কথা আমায় বিশেষ চিন্তিত করে তুলেছে। পরে বলছি। আগে তুমি বল, কি হয়েছে তোমার?

—আমার—

ফতেমা ইতস্তত করতে লাগলেন।

—থামলে কেন, বল।

—ঘটনাটি শুনলে আপনি আমার উপর বিরক্ত হবেন।

মীরকাশিম মৃত্যু হেসে বললেন, তুমি বিরক্ত হওয়ার মতো কোন কাজ আজ পর্যন্ত করনি বেগম।

—আমি আব্বাজানের কাছে গিয়েছিলাম।

—হীরাঝিল প্রাসাদে গিয়েছিলে?

মীরকাশিম বিস্মিত হলেন না।

বললেন, আমি জানি বেগম তুমি কেন গিয়েছিলে। মনের ক্ষোভ নিয়ে গিয়েছিলে জাহাঁপনার কাছে দরবার করতে, যাতে তিনি আমায় কোন উচ্চ পদে প্রতিষ্ঠিত করেন। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ফতেমা বললেন, হ্যাঁ। আমি সেই কারণেই ওখানে গিয়েছিলাম সারতাজ! কিন্তু—

জাহাঁপনা তোমার কথা গ্রাহ্য করেন নি, রূঢ় ভাষায় প্রত্যাখ্যান করেছেন। তুমি মনের মধ্যে প্রচুর অশান্তি নিয়ে ফিরে এসেছো বুঝতে পারছি।

—অপমান আমাকে আব্বাজান করেন নি, অপমান করেছে মণিবেগম, ওই নাচওয়ালী—

—তুমি ওখানে না গেলেই ভাল করতে বেগম।

—আমায় শাস্তি দিন হজরত।

ফতেমা পা জুড়ে বসে পড়লেন মাটিতে।

—শাস্তি! না, না বেগম, শাস্তি আমি তোমায় দেব না। তুমি প্রমাণ করে দিলে, তুমি আমায় কত ভালবাস।

মীরকাশিম ফতেমাকে বাহুর মধ্যে তুলে নিলেন।

কিছুক্ষণ কেটে গেল সুখাবেশে।

তারপর—

মীরকাশিমের বুক থেকে মুখ তুলে ফতেমা বললেন, আমার অপরাধ যখন ক্ষমা করলেন তখন একটা অনুরোধ আপনাকে রাখতেই হবে হজরত।

—বল?

—এই অপমান আমাকে করা হয়নি—

পত্নীকে আর বলতে না দিয়ে মীরকাশিম বললেন, অপমান আমাকে করা হয়েছে। তুমি কি অনুরোধ করবে আমি অনুমান করেছি। এই অপমানের যোগ্য প্রতিশোধ কি জান? তোমার আব্বাজানকে তখ্‌ত মুবারক থেকে নামিয়ে, সেই তখ্‌ত অধিকার করা।

ফতেমা ব্যাকুল হয়ে উঠলেন।

—বলবেন না—আর বলবেন না। চতুর্দিকে চর ঘুরছে, ভাইজানের কানে কথা উঠলে অনর্থ ঘটে যেতে পারে।

মীরকাশিম হাসলেন।

—রহস্যচ্ছলে একথা আমি বলি নি। ঘটনার সূত্রপাত এইভাবে হয়ে ভালই হল। মণিবেগমকে নয়—মণিবেগম আর ফিরিঙ্গি কোম্পানির কথায় যে বৃদ্ধ সুবে বাংলার প্রজাদের সুখ-স্বাচ্ছন্দ্য নিয়ে ছেলেখেলা করছে সেই মীরজাফরের উপর প্রতিশোধ আমি নেব।

—হজরত—

—বহুদিন থেকে মনের অবচেতনে যে চিন্তা বাসা বেঁধেছিল, আজ তা অবচেতনার অন্তরাল থেকে বেরিয়ে এসেছে। মসনদ—ওই তখ্‌ত মুবারক আমার চাই ফতেমা।

—হজরত দেওয়ালেরও কান আছে।

—নিরেট দেওয়াল আমার কতটুকু ক্ষতি করতে পারবে। আজ আমার জীবনের বিচিত্রতম দিন বেগম। তুমি প্রশ্ন করছিলে না, আমাকে গম্ভীর দেখাচ্ছে কেন। ওই প্রশ্নের উত্তর পেলে তুমি সমস্ত বুঝতে পারবে। তোমার স্মরণ আছে নিশ্চয়, হুগলীর এক জ্যোতিষী কি ভবিষ্যত বাণী করেছিল?

—আছে হজরত।

—জ্যোতিষীর সে ভবিষ্যত বানী আমি ভুলিনি। বারংবার চিন্তা করে দেখেছি, তাঁর কথাগুলির প্রকৃত অর্থ কি। অর্থ মনের অবচেতনে লুকিয়েছিল। আজ আর কোন রকম ধাঁধায় আমি নেই। কিছুক্ষণ পূর্বে পুরানো ঝিলের কাছ দিয়ে ফিরছিলাম, গৈরিক বসনধারী এক পুরুষের সঙ্গে সাক্ষাৎ হল সেখানে। যোগী পুরুষ আমাকে দেখে আহ্বান করলেন। কোন প্রশ্ন না করতেই বললেন, তোমার শুভ সময় সমাগত। স্মরণ রেখো তোমার জীবনে কোন মধ্যপথ নেই, হয় নবাবী করবে নয়তো ফকিরী। এসে শুনলাম তুমি আমারই জন্য অপমানিত হয়ে এসেছো। আর কোন দ্বিধা নেই। দুনিয়ায় ফকিরী করতে আসিনি, নবাবী করব বেগম। ক্লাইভের গর্বভকে বুঝিয়ে দেব যোগ্যতা আমার আছে কি না।

—আপনার কথা শুনে আমার দুশ্চিন্তা হচ্ছে। সৈন্য-সামন্ত, যুদ্ধ—সে যে এলাহি কাণ্ড হজরত? প্রাণের আশঙ্কা রয়েছে। না, না ও সমস্ত ব্যাপারে মাথা গলিয়ে আপনার কাজ নেই।

—তুমি বলতে চাও বাকী জীবন আমি ফকিরী করব?

—ফকিরী কেন করবেন হজরত। অর্থের তো আপনার কোন অভাব নেই।

—এখন নেই, পরে হতে পারে তো? আমার জীবনে কোন মধ্য পথ নেই শুনলে তো? অর্থ থাকতেই নবাবী লাভ করার জন্য সচেষ্ট হওয়া উচিত নয় কি?

—মনের আশঙ্কাকে দূরে সরিয়ে দাও। তোমার আব্বাজানের সঙ্গে যুদ্ধক্ষেত্রে সাক্ষাৎ আমার হবে না। কৌশল এবং অর্থের সাহায্যে তখ্ত মুবারককে আমি অর্জন করব। মীরজাফরকে ইংরাজরা তখ্তে বসিয়েছে, আমাকেও বসাবে।

—আপনি তো ইংরেজদের ঘৃণা করেন হজরত?

—ঘৃণা করি, আজীবন ঘৃণা করবও। সুবে বাংলায় ওরা যতদিন আছে, আমার সোয়াস্তি নেই। তবে ওদের সাহায্যে কার্যোদ্ধার না করে উপায় নেই। তোমার আব্বাজান ইংরেজদের কাছে মাথা বিকিয়ে বসে আছেন। আমার এখন আশ্চর্য মনে হচ্ছে বেগম, আমার আকাঙ্ক্ষা ছিল আমি একজন শায়ার হব। সুছন্দের কবিতা লিখে সকলকে মুগ্ধ করে দেব, সেই আমি সুবে বাংলার মসনদ পাবার জন্য আজ লালায়িত। বিচিত্র মানুষের মনের গতি।

ফতেমা কিছু বললেন না।

মনের মধ্যে থেকে আশঙ্কাকেও ঝেড়ে ফেলতে পারলেন না।

মীরকাশিম বললেন আবার, ভয়কে জয় কর বেগম। এই মুহূর্তে আমি তো কিছু করব না। সময়ের অপেক্ষায় থাকব। সময় যেদিন

াসবে এক ফোঁটা রক্তও ব্যয় হবে না সেদিন যাক ও কথা রোবাই শুনবে বেগম ?

—রোবাই।

—হ্যাঁ।

—শুনব হজরত।

মীরজাফরের মনে শান্তি নেই।

কি হিন্দু কি মুসলমান কেউ তাঁর উপর খুশী নয়।

এমন কি যে ইংরেজ—যাদের দাসানুদাস হয়ে রয়েছেন, প্রকৃত পক্ষে যাদের জন্য তাঁর এত কলঙ্ক, সেই ইংরেজ এখন তাঁর উপর বিরক্ত। তখ্ত অধিকার করে নবাবী করতে এসে গোলামী করছেন তবু কারুর মন পেলেন না। মীরজাফরের একবারও একথা স্মরণ হল না, তিনি সকলের উপেক্ষা ও অবজ্ঞার পাত্র হয়ে রয়েছেন তাঁর অসংলগ্ন কর্ম্মপন্থা ও ভীরুতার জন্য।

তিনি সর্বদা চিন্তা করে চলেছেন কি কৌশলে, সন্ধিপত্রের অবশিষ্ট শর্ত উপেক্ষা করে যান। ইংরেজদের এক কপর্দক আর দেবার ক্ষমতা যেমন নেই, থাকলেও দেবার মতো মনের জোর আর খুঁজে পান না।

কিন্তু কার্যক্ষেত্রে তাঁর দৃঢ়তা লোপ পায়।

ক্লাইভ নির্বিকারভাবে সমস্ত সুবিধা আদায় করে নেন।

দরবারে যেতে মীরজাফরের ভাল লাগে না।

অভাব অভিযোগ নিয়ে সকলে মুখিয়ে আছে।

অভাব অভিযোগের প্রতিকার করবার ক্ষমতা তাঁর কোথায় ? নখদন্ত হীন শার্দ্দূল তিনি। তবু অভাব অভিযোগ তাঁকে শুনতে হবে। প্রতিকার করবার ভান করতে হবে। অনিচ্ছা নিয়েই আজ দরবারে এলেন মীরজাফর।

দরবার পরিপূর্ণ।

শ্রেষ্ঠীবর্গ আছেন। আমীর ওমরাহবর্গ আছেন।

ক্লাইভও আছেন অনুচরদের নিয়ে।

মীরজাফর মসনদে গিয়ে বসলেন। মুর্শিদকুলী থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত কোন নবাব এত বিমর্ষভাবে মসনদে হয়তো বসেন নি।

রায়দুর্লভ প্রশ্ন করলেন, জাহাঁপনা কি অসুস্থ ?

মীরজাফর অন্যমনস্কভাবে বললেন, আমি সম্পূর্ণ সুস্থ দেওয়ান সাহেব

—অনুমতি করলে দরবারের কাজ আরম্ভ হতে পারে।

—আজ কোন বিশেষ কাজ আছে কি ?

—আর্জি নিয়ে এসেছেন কয়েকজন। তাঁদের মধ্যে শ্রেষ্ঠী জগৎশেঠ মহতাবচাঁদ অন্যতম।

মীরজাফর সবিস্ময়ে তাকালেন জগৎশেঠের দিকে।

বললেন, আপনি কি আর্জি নিয়ে এসেছেন শ্রেষ্ঠী মহতাবচাঁদ ?

জগৎশেঠ তাঁর বিপুল দেহ নিয়ে আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করলেন।

—অভিযোগও বলতে পারেন জাহাঁপনা।

—অভিযোগ ! কিসের অভিযোগ ?

—আমরা চিরকাল নবাব সরকারের জন্য টাকা তৈরি করে আসছি কয়েক পুরুষ ধরে আমাদের এই ব্যবসা। আজ পর্যন্ত আমাদের কাজে কোন ত্রুটি পরিলক্ষিত হয়নি। অথচ জাহাঁপনা আমাদের মতামত না নিয়ে কলকাতায় ইংরেজদের টাঁকশাল বসাবার অনুমতি দিয়েছেন।

জগৎশেঠের কথায় দরবারস্থ সকলে সচকিত হলেন। মসনদের উপর নত মুখে অপরাধীর মতো বসে রইলেন মীরজাফর।

—আমাদের অপরাধ কি জাহাঁপনা ?

—অপরাধ—না, না আপনাদের আর অপরাধ কি।

কথা শেষ করেই মীরজাফরের দৃষ্টি পড়ল ক্লাইভের উপর। ক্লাইভের মুখে অর্থপূর্ণ হাসি। মীরজাফর নিজেকে দ্রুত সামলে নিয়ে বললেন, অপরাধের কোন কথা নয় শ্রেষ্ঠী মহতাবচাঁদ। আপনারাও আমার বন্ধু, কর্নেল ক্লাইভও আমার বন্ধু। দীর্ঘদিন ধরে আপনারা নবাব সরকারের জন্য টাকা তৈরি করে আসছেন, এবার থেকে না হয় কর্নেল ক্লাইভ সে ভার নিলেন। বন্ধুদের তো আমার একই দৃষ্টিতে দেখতে হবে।

জগৎশেঠ আর কিছু বললেন না।

অরণ্যে রোদন করে লাভ কি! তিনি আসন গ্রহণ করলেন।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেললেন মীরজাফর।

রায়দুর্লভ বললেন, লক্ষ্ণৌ-এর বিখ্যাত সোরা ব্যবসায়ী খোজা বাজীদ আলীর প্রতিনিধি হজরতের সাক্ষাৎ প্রার্থী।

মীরজাফর ভ্রূকুঞ্চিত করলেন।

—আজ থাক। অন্য কোনদিন তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করব।

—এক সপ্তাহ থেকে সে অপেক্ষা করছে জাহাঁপনা। আমি এতদিন তাকে আপনার সমীপে আসবার অনুমতি দিই নি। আজ তার সঙ্গে কথাবার্তা বলে নিলে ভাল হয়।

—বেশ, কি বলতে চায় বলুক।

বাজীদ আলার প্রতিনিধি কুর্নিশ করে বললে, আমাদের অন্ন ছিনিয়ে নেবেন না জাহাঁপনা।

—পরিষ্কার করে বল!

—সোরার ব্যবসায় এক চেটিয়া অধিকার আমাদের। স্বর্গীয় আলীবর্দী খাঁ বাহাদুর এই অধিকার আমাদের দিয়েছিলেন। আমাদের সমাজের হাজার হাজার লোক এই ব্যবসায় লিপ্ত আছে। ইংরেজদের এই ব্যবসা করবার অধিকার দেওয়ায় আমরা বঞ্চিত হয়েছি জাহাঁপনা। অনাহারে মৃত্যু আমাদের জন্যে অপেক্ষা করছে। মীরজাফর বিরক্ত হয়ে উঠলেন।

উচ্চ কণ্ঠে বললেন, তুমি আমাকে আবেদন জানাতে এসেছো না সমালোচনা করতে এসেছো! সোরার কারবারে তোমাদের চেয়ে সাহেবরা অনেক উপযুক্ত। সুতরাং সোরার ব্যবসা করবার অধিকার তাঁদের দেওয়া হয়েছে।

—আমাদের উপর দয়া করুন জাহাঁপনা—

—অবিলম্বে একে দরবার থেকে সরিয়ে নেওয়া হোক।

নবাবের আদেশ মুহূর্তের মধ্যে পালিত হল।

—অভিযোগ জানাতে এসেছে এমন আর কোন লোককে উপস্থিত করা যেন না হয়।

রায়দুর্লভ বললেন, আর কোন অভিযোগকারী আপনাকে বিরক্ত করবে না জাহাঁপনা। আমাদের হাতে আর একটি মাত্র কাজ রয়েছে, সেটি হয়ে গেলেই আজকের মতো দরবার শেষ হতে পারে।

—কোন প্রয়োজনীয় কাজের কথা বলছেন দেওয়ান সাহেব?

রায়দুর্লভ ক্লাইভের হাত থেকে একটি দলিল নিয়ে মীরজাফরের সামনে মেলে ধরে বললেন, এই দলিলে জাহাঁপনাকে স্বাক্ষর দিতে হবে।

কিসের দলিল?

ক্লাইভ বললেন, দলিল আমরাই লিখে এনেছি ইয়োর এক্সেলেন্সি। আপনি অনুগ্রহ করে স্বাক্ষর করে দিন।

—দলিল কিসের তা আমার জানা দরকার কর্নেল সাহেব।

—দরকার বই কি। নিশ্চয় দরকার।

রায়দুর্লভ বললেন, জমিদারদের উদ্দেশ্যে এই দলিল লেখা হয়েছে।

মীরজাফর বিরক্তির শেষ ধাপে গিয়ে পৌঁছোলেন। রায়দুর্লভ নুন খাচ্ছেন তাঁর অথচ প্রাণপাত করছেন ইংরেজদের জন্য। যত রকম সুযোগ সুবিধা পাইয়ে দেওয়া যায়, সে চেষ্টার বিরাম নেই তাঁর। আবার নবাবের প্রতিবাদ করবার ক্ষমতাও নেই। কার উপর নির্ভর করবেন, কাকে বিশ্বাস করবেন? মীরজাফর ঈষৎ উষ্মার সঙ্গে

বললেন, বর্ধমান, নদীয়া ও হুগলী এই তিনটি জেলা এখন কোম্পানির। সে সনদে আমি স্বাক্ষর করেছি। তাঁরা রাজস্ব আদায় করতে পারেন। আবার স্বাক্ষর কিসের?

ধীর কণ্ঠে ক্লাইভ বললেন, ইয়োর এক্সেলেন্সি, আপনি উত্তেজিত হয়ে পড়েছেন। আপনি পূর্বে স্বাক্ষর দিয়েছেন সে কথা স্মরণ আছে। এই দলিলে স্বাক্ষর দিতে হবে প্রজা সাধারণের অবহিতির জন্য, যাতে রাজস্ব আদায় করতে কোন করম অসুবিধা আমাদের না হয়। ইয়োর এক্সেলেন্সি দলিল পড়ে দেখতে পারেন। প্রয়োজনের অতিরিক্ত একটি কথাও আমরা লিখিনি।

মীরজাফর দলিল পাঠ করলেন।

দলিলে লেখা আছে,—

> এতদ্বারা বর্ধমান, নদীয়া ও হুগলীর জমিদারবর্গ, চৌধুরীবর্গ প্রভৃতি সকলকে জানানো যাইতেছে যে, অদ্য হইতে তোমরা কোম্পানির শাসনাধীন হইলে, তাঁহারা ভালমন্দ যেরূপ আচরণ করুন না কেন, তোমরা তাহা বিনা বাক্যব্যয়ে স্বীকার করিয়া লইবে, ইহাই আমার বিশেষ রাজাজ্ঞা।

রায়দুর্লভ লক্ষ্য করছিলেন মীরজাফরের মুখের ভাব বিশেষ ভাল নয়। মরিয়া হয়ে মানুষ অনেক সময় অনেক কিছু করে ফেলে। নবাবের যা মনের অবস্থা তাতে কর্নেল সাহেবের সামনে অবাঞ্ছনীয় কিছু বলে ফেললে কেলেঙ্কারীর সীমা থাকবে না।

রায়দুর্লভ একথা উপলব্ধি করেই নিম্নকণ্ঠে বললেন, ইতস্তত করবেন না হজরত। ইতস্তত করলে অনর্থ ঘটে যবে। কয়েকজন জমিদার বিদ্রোহ ঘোষণা করতে পারে সে সংবাদ জাহাঁপনা পেয়েছেন। পূর্ণিয়ার অবস্থাও ভাল নয়। এই সময় ইংরেজদের হাতে রাখতে না পারলে কাউকে সায়েস্তা করা যাবে না। মীরজাফর দীর্ঘশ্বাস ত্যাগ করলেন।

—এত কৈফিয়ত কেন দিচ্ছেন দেওয়ান সাহেব। আপনারা স্থির করে ফেলেছেন যখন ওই দলিলে আমাকে স্বাক্ষর দিতে হবে তখন আমার আপত্তির প্রশ্ন তো আর ওঠে না। দলিল ধরুন, আমি স্বাক্ষর করে দিচ্ছি।

মীরজাফর যখন সিপাহশালার ছিলেন ভোজনবিলাসী হিসেবে তাঁর সুনাম ছিল। রাত্রে শয্যায় গা ঢেলে দিলে নিদ্রার কোলে আশ্রয় পেতেন প্রায় পরমুহূর্তে। মসনদে বসবার পর দুশ্চিন্তা আর দুর্ভাবনায় বিশালদেহী নবাবের আহার পাখির আহারে পরিণত হয়েছে। নিদ্রা নেই। নেশার মাত্রা অত্যধিক বাড়িয়ে দেওয়ায় ঝিমিয়ে থাকেন।

নিত্য নতুন উপসর্গ তাঁকে বিভ্রান্ত করে চলেছে।

ইংরেজের শোষণে রাজকোষ অর্থশূন্য। তবু তাদের চাহিদা মেটানো যায় নি। নিত্য নূতন আবদার। ক্লাইভের রক্তচক্ষের কথা স্মরণ করে মুখে হাসি টেনে আবদার মিটিয়ে দিতে হচ্ছে নবাবকে। তবু তিনি ইংরাজদের মন জয় করতে পারছেন না, পারছেন না প্রজাদের কাছ থেকে এক বিন্দু শ্রদ্ধা আদায় করতে। অশান্তিতেই আছেন মীরজাফর।

বর্তমানে নবাবকে সবচেয়ে বেশী চিন্তিত করে তুলেছে সৈন্যবাহিনী। রাজকোষ অর্থশূন্য থাকায় কয়েক মাস তাদের এক কপর্দকও দেওয়া সম্ভব হয় নি। ছাউনিতে প্রবল অসন্তোষ দেখা দিয়েছে। অসন্তোষ দুটি কারণে, প্রথম, তারা হাতে অর্থ পাচ্ছে না। দ্বিতীয়, ক্লাইভের গোরা সৈন্যরা নবারের অর্থেই বিলাসে দিন কাটাচ্ছে।

অবিলম্বে কোন ব্যবস্থা অবলম্বন করা প্রয়োজন। মীরজাফর চিন্তা করে দেখলেন, ব্যবস্থা অবলম্বন না করলে সৈন্যরা নিশ্চত বিদ্রোহ করে বসবে।

তাঁর সাধের নবাবী মিলিয়ে যাবে শূন্যে। রায়দুর্লভকে আহ্বান করে মীরজাফর প্রশ্ন করলেন, দেওয়ান সাহেব, সৈন্যদের বাকী টাকা মিটিয়ে দেওয়ার কোন ব্যবস্থা করলেন কি ?

এই প্রশ্ন কয়েকদিন থেকেই রায়দুর্লভ আশা করছিলেন নবাবের কাছ থেকে। উত্তর তিনি তৈরি রেখেছিলেন ঠোঁটের আগায়।

—আপ্রাণ চেষ্টা করেও তো কোন ব্যবস্থা করতে পারি নি। রাজকোষ সম্পূর্ণ অর্থশূন্য হুজরত।

মীরজাফর বিরক্ত কণ্ঠে বললেন, একথা আমার অজানা নয়। নতুন কিছু বলুন ?

—আমি নিরুপায় জাহাঁপনা। নতুন কথার পরিবর্তে আপনাকে পুরানো কথাই আমাকে শোনাতে হচ্ছে। শ্রেষ্ঠীদের কাছ থেকে ঋণ নেবার চেষ্টা আমি করেছিলাম, তাঁরা অস্বীকৃত হয়েছেন। কিভাবে যে এই অসম্ভবকে সম্ভব করা যাবে আমার জ্ঞান-বুদ্ধির বাইরে জাহাঁপনা।

—সমস্তই আমি বুঝতে পারছি দেওয়ান সাহেব। কিন্তু হাত গুটিয়ে বসে থাকলেও তো চলবে না। উপায় তো আবিষ্কার করতেই হবে।

—এ সমস্ত ব্যাপারে কর্নেল সাহেবের মাথা খুব পরিষ্কার। তাঁর পরামর্শ আমাদের কাজে লাগতে পারে জাহাঁপনা।

—আপনি মন্দ কথা বলেননি দেওয়ান সাহেব। কর্নেল ক্লাইভ কোন ভাল পরামর্শ আমাদের নিশ্চয় দিতে পারবেন।

ক্লাইভকে আহ্বান করা হল।

তিনিও এই আহ্বানের অপেক্ষায় ছিলেন।

তিনি মন্ত্রণা কক্ষে এলেন। শুনলেন সমস্ত কথা।

বললেন, ইয়োর এক্সেলেন্সি, এই সমস্যার হাত থেকে উদ্ধার পাবার একটি মাত্র পথ আছে।

—কোন পথ কর্নেল সাহেব ?

—খরচ আপনাকে অর্ধেক কমিয়ে ফেলতে হবে।

—আপনি যে কথা বলছেন তা কি আমি চিন্তা করে দেখিনি সাহেব? দেখেছি। কিন্তু কোন্ খরচটা কমাবো? সব খরচই তো প্রয়োজনের আওতায় পড়ে।

ক্লাইভ তির্যক্ দৃষ্টিতে একবার নবাবের মুখের দিকে তাকিয়ে নিলেন, তারপর বললেন, আপনার বিরাট একটা খরচ এক কথায় কমিয়ে ফেলতে পারেন ইয়োর এক্সেলেন্সি।

—সৈন্য বাহিনী ভেঙে দিন। লক্ষ লক্ষ টাকা আপনার বেঁচে যাবে।

মীরজাফর বিস্ময়জড়িত কণ্ঠে বললেন, আপনি বলছেন কি কর্নেল সাহেব। শত্রুর হাত থেকে আমাকে বাঁচাবে কে?

—আমরা বাঁচাবো ইয়োর এক্সেলেন্সি। ইংরেজবাহিনী আপনার জন্যে প্রাণ দেবে। আমরা আপনাকে মসনদে বসিয়েছি, আমরা আপনাকে রক্ষা করব।

মীরন মন্ত্রণা কক্ষেই ছিলেন।

ক্লাইভের কথা শুনে তীব্র কণ্ঠে বললেন, আপনাদের তো আজকাল কোন কথা বলতেই আটকায় না। ঘুরিয়ে না বলে, পরিষ্কার করে বললেই তো পারেন, তখ্ত থেকে জাহাঁপনাকে নামিয়ে নিজেদের নবাবী করবার ইচ্ছে হয়েছে।

ক্লাইভ মীরনকে অত্যন্ত অপছন্দ করেন। মীরনের অপরাধ তিনি মীরজাফরের মতো ইংরেজদের প্রতিটি কথা সত্য বলে মনে করেন না। এবং মনেপ্রাণে ইংরেজদের ঘৃণা করেন। শুধু ক্লাইভ নয়, ইংরেজদের সকলেই তাঁর প্রতি খড়্গ হস্ত। তাঁদের আন্তরিক ইচ্ছা যদি কার্যকরী হত তাহলে বিদায় নিতে হত মীরনকে দুনিয়া থেকে কিছুদিন পূর্বেই। নানা দিক চিন্তা করে ক্লাইভ এই ইচ্ছাকে কার্যকরী হতে দেন নি।

—নবাবজাদা আমাদের অন্যায়ভাবে দোষ দিচ্ছেন। তখ্ত অধিকার করবার বিন্দুমাত্র ইচ্ছে আমাদের নেই। আমরা এদেশে এসেছি ব্যবসা করতে। রাজনৈতিক ব্যাপারে জড়িয়ে পড়েছি তাও ব্যবসার খাতিরে।

—মিথ্যের আবরণ দিয়ে সত্যকে ঢাকবেন না সাহেব। আপনাদের ব্যবসাদারীর মুখোশ খুলে পড়েছে।

মীরজাফর বললেন, আঃ তুমি কি সমস্ত বলছো মীরন! কর্নেল সাহেব আমার বন্ধু, তিনি আমাকে কোন কুপরামর্শ দিতে পারেন না।

ক্লাইভ বললেন, ইয়োর এক্সেলেন্সি ঠিকই বলছেন।

রায়দুর্লভ বললেন, আপনি চিন্তা করে দেখুন জাহাঁপনা, বিরাট সৈন্য-বাহিনী রেখে লাভ কি? গোরা পল্টন যখন আমাদের পক্ষে তখন দুশ্চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলাই ভাল।

মীরজাফর চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, গোরাপল্টন যদি আমাকে রক্ষা করে তবে—

মীরন বাধা দিলেন।

—অসম্ভব। ওই সর্তে আপনি কখনই মত দিতে পারেন না জাহাঁপনা।

—না, তবে—

—আপনার বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত গড়ে উঠছে বুঝতে পারছেন না?

রায়দুর্লভ বললেন, ওকথা বলবেন না। কর্নেল সাহেব জাহাঁপনার ভালর জন্যই এই পরামর্শ দিচ্ছেন।

মীরন উত্তর উত্তর ক্রুদ্ধ হয়ে উঠছিলেন।

প্রায় ফেটে পড়লেন এবার।

দেওয়ান সাহেব, আপনি দেওয়ানী করছেন আমাদের না ইংরেজদের? কর্নেল সাহেবের মনের কথা আপনি জানবেন কি ভাবে? তিনি মুখে যা বলছেন তিনি যে শেষ পর্যন্ত সেই কথা রাখবেন তার প্রমাণ কোথায়?

রায়দুর্লভ ভয় পেয়ে গেলেন।

মীরনের কথার উত্তরে কিছু বললেন না।

ক্লাইভ বললেন, ইয়োর এক্সেলেন্সি আমি আপনার সঙ্গে কথা বলতে চাই। আপনার বুদ্ধি-বিবেচনার উপর আমার প্রচুর আস্থা আছে। অন্য কেউ এই আলোচনায় বাধা দিক আমি তা পছন্দ করব না।

মীরজাফর মীরনকে অত্যন্ত স্নেহ করেন। প্রশ্রয়ও দিয়েছেন প্রচুর। কিন্তু কর্নেল সাহেব ক্রুদ্ধ হতে পারেন বিবেচনা করে বললেন, মীরন, তুমি আর কিছু ব'ল না।

আমাদের আলোচনা শেষ হবার পর তোমার সঙ্গে কথা বলব।

—এরপর আমার উপস্থিতি এখানে নিষ্প্রয়োজন। যাবার আগে জাহাঁপনাকে অনুরোধ করে যাচ্ছি তিনি যে কোন ঝুঁকি নেবার পূর্বে পরিস্থিতিকে পর্যালোচনা করে দেখবেন।

মীরন কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

ক্লাইভ বললেন, কি স্থির করলেন ইয়োর এক্সেলেন্সি?

—স্থির—ও, সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেওয়ার কথা বলছেন?

হ্যাঁ—হ্যাঁ—

—আমায় কিছু সময় দিতে হবে কর্নেল সাহেব। বিষয়টি গুরুত্বপূর্ণ, চিন্তা করে দেখতে চাই।

—বেশ, চিন্তা করুন। সময় আপনাকে বেশী দিতে পারব না। ইয়োর এক্সেলেন্সি বোধ হয় শুনেছেন, আমি স্বদেশে ফিরে যাচ্ছি। সুতরাং যাবার পূর্বে উত্তর পেলে আমার সুবিধা। প্রসঙ্গ ক্রমে জানিয়ে যাই, তেইশ লক্ষ টাকা এখনও পাওনা আছে কোম্পানির আপনার কাছে। সে টাকা বোধ হয় অবিলম্বে আপনাকে পরিশোধ করতে হবে। আপনি দীর্ঘ জীবন লাভ করুন ইয়োর এক্সেলেন্সি।

ক্লাইভ বিদায় নিলেন।

ক্লাইভের কথার নিগূঢ় অর্থ বুঝতে পারলেন মীরজাফর। অর্থাৎ তাঁর এই নতুনতম সর্তে সম্মত না হলে কোম্পানী তেইশ লক্ষ টাকা বকেয়া রাখবে না। যে টাকা এখন নবাবের পক্ষে দেওয়া অসম্ভব। সুতরাং জল ঘোলা না করে সর্তে সম্মত হয়ে যাওয়াই হবে বুদ্ধিমানের কাজ।

মীরজাফর অসহায় দৃষ্টিতে রায় দুর্লভের দিকে তাকালেন।

রায় দুর্লভ নির্বিকার মুখে বসে আছেন।

ক্লাইভ চলে যাবার পর ও প্রসঙ্গ নিয়ে রায়দুর্লভের সঙ্গে আর আলোচনা করলেন না মীরজাফর। তাঁর মন রয়েছে মীরনের পিছু পিছু। ছোট নবাব কি তাঁর কথায় কিছু মনে করল? নিদারুণ উভয় সঙ্কটের মধ্যে দিন চলেছে নবাবের। কোন দিক্‌কে তিনি সামলাবেন।

দেওয়ানকে বিদায় দিয়ে মীরজাফর মীরনের সন্ধানে চললেন।

মীরন মন্ত্রণা কক্ষ থেকে বেরিয়ে নিজের মহলে চলে গিয়েছিলেন। সরাব নিয়ে বসেছিলেন মুক্তার ঝালর দেওয়া তাকিয়া ঠেসান দিয়ে। কয়েকজন সুন্দরী তাঁর সেবায় ব্যস্ত ছিল। কয়েক পাত্র সরাব শেষ করবার পর সুন্দরীদের সঙ্গ ভাল লাগল না।

তাদের বিদায় দিয়ে বহু নৃশংস হত্যাকাণ্ডের নায়ক মীরন আব্বাজানের ভবিষ্যৎ চিন্তা করতে লাগলেন। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছেন ইংরেজদের আজ্ঞাবহ ভৃত্য হয়ে মসনদ আঁকড়ে থাকার কোন অর্থ হয় না। কিন্তু একথা হৃদয়ঙ্গম করলেও, ইংরেজদের সম্পর্কে কঠোর হতে পারছেন না মীরজাফর।

একজন বান্দা এসে সংবাদ দিল নবাব তাঁকে স্মরণ করেছেন।

অনিচ্ছার সঙ্গে মীরন মীরজাফরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে গেলেন।

ছোট নবাবকে দেখে নবাব বললেন, আমি একেই খুব অশান্তিতে আছি। তার ওপর তুমিও যদি সময় অসময়ে উত্তেজিত হয়ে পড়, আমি কোন্ দিক সামলাব বল তো?

—আমি অকারণ উত্তেজিত হইনি আব্বাজান। আপনি একটু চিন্তা করে দেখুন, ইংরেজদের সাহায্যে রায়দুর্লভ কি রকম ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলছে।

—রায়দুর্লভ লোভী লোক। কিছু টাকার লোভে ইংরেজদের কথায় সায় দিয়ে চলেছে। ষড়যন্ত্র করার মতো মনের জোর তার নেই।

মীরন তাচ্ছিল্যের হাসি হাসলেন।

—আপনি ঠিকই বলেছেন, সে লোভী লোক। তার লোভ এখন তখ্‌ত মুবারকের উপর।

মীরজাফর বললেন, রায়দুর্লভ তখ্‌তে বসতে চায়!

—কেন বসতে চাইবে না আব্বাজান? ইংরেজের মতো মুরুব্বি তার রয়েছে। আপনাকে তখ্‌তে বসিয়ে ক্লাইভ প্রচুর ধনরত্ন লাভ করেছে। রায়দুর্লভকে তখ্‌তে বসিয়ে তারা লাভের অঙ্ক বাড়িয়ে নিতে চায়।

মীরজাফর দ্রুত পায়ে পদচারণা করতে লাগলেন।

তাঁর আতঙ্কিত মনকে অসংখ্য চিন্তা সাপটে ধরল।

বেশ কিছুক্ষণ পরে বললেন, তুমি ঠিকই বলেছো মীরন। রায়দুর্লভ তখ্‌ত বসতেই চায়। ইংরেজদের কথায় সায় দিয়ে চলেছে। তাদের সঙ্গে অসম্ভব মাখামাখি।

মীরন বললেন, আমি সেই কথাই তো বলছি। রায়দুর্লভকে আর প্রশ্রয় দেওয়া ঠিক হবে না আব্বাজান।

—বটেই তো।

—আপনি আদেশ করুন, দেওয়ানকে বিদায় করছি দুনিয়া থেকে।

চমকে উঠলেন মীরজাফর।

সভয়ে বললেন, হত্যা? না—না মীরন। কর্নেল সাহেব বিরূপ হয়ে উঠবেন আমার উপর। কোন্ অনর্থ ঘটিয়ে বসেন কে জানে।

—আপনি কর্নেল সাহেবের ভয় মন থেকে দূরে সরিয়ে দিন আব্বাজান। সব গেছে, এখন সৈন্য বাহিনীও যেতে বসেছে। এখন ইংরেজকে রুখে দাঁড়াতে না পারলে আমরা ফকির হয়ে যাব।

—কি ভাবে রুখে দাঁড়াব? কার উপর নির্ভর করে রুখে দাঁড়াব?

—আপনি প্রস্তুত হোন, নির্ভর করবার লোকের অভাব হবে না।

—কার কথা বলছো মীরন?

—ওলন্দাজ বণিকদের কথা বলছি আব্বাজান। ওদের সাহায্যে সহজেই আমরা ইংরেজদের বিতাড়িত করতে পারব।

আর্তকণ্ঠে মীরজাফর বললেন, চুপ, চুপ মীরন। তুমি এক অনর্থ না বাধিয়ে ছাড়বে না। রায়দুর্লভের কানে কথা উঠলে, কর্নেল সাহেবের জানতে বাকী থাকবে না।

—তাহলে সমস্ত দিক কিভাবে সামলাবেন স্থির করেছেন কি ?

—কিছুই স্থির করি নি। এই সময় কিছু টাকা পেলে সৈন্যদের মুখ বন্ধ করা যেত। তারপর না হয়—। কে দেবে আমায় টাকা। তাছাড়া কর্নেল সাহেবকে অল্প দিনের মধ্যেই উত্তর দিতে হবে।

—ইংরেজদের আর সৈন্যবাহিনীকে কিছুদিন ব্যস্ত রাখলে, সৈন্যবাহিনী ভেঙে দেওয়ার হাত থেকে বেঁচে যান। কর্নেল সাহেবকে উত্তরও দিতে হয় না।

সাগ্রহে মীরজাফর বললেন, তোমার মতো সন্তান পেয়ে আমি ধন্য। কত বুদ্ধি, কত পরিকল্পনা তোমার মাথায়। কিভাবে দু'দলকে ব্যস্ত রাখা যায় ?

মীরন নিজের নূতন পরিকল্পনা প্রকাশ করলেন।

পরিকল্পনা শুনে মহাখুশী হলেন মীরজাফর।

এই পরিকল্পনার প্রসঙ্গে আলোচনা সূত্রপাত করতে গেলে অতীতের কিছু ঘটনার খেই ধরতে হবে। পূর্ণিয়ার শাসনকর্তা সওকতজঙ্গ নিজের হঠকারিতায় নবাবী ফৌজের হাতে মণিহারের যুদ্ধে মারা যাবার পর, সিরাজ নিজের প্রিয়পাত্র মোহনলালকে পূর্ণিয়ার ফৌজদারের পদ দেন। মোহনলাল অবশ্য পূর্ণিয়ায় যান নি। মুর্শিদাবাদেই থাকতেন। পূর্ণিয়ার ফৌজদারের কাজ চালাতেন তাঁর ছেলে। এবং অচল সিংহ নামে একজন বিশ্বাসী ব্যক্তিকে দেওয়ান করে ওখানে পাঠিয়ে ছিলেন মোহনলাল।

পলাশীর যুদ্ধের পর পাল্লা পালটাল।

বিশ্বাসী অচল সিংহ আর বিশ্বাসী রইলেন না। প্রভুর পুত্রকে কয়েদ করে নিজের এক বন্ধুকে গদিতে বসালেন। বন্ধু হাজীর আলী ভাল

যোদ্ধা ছিলেন। দেশ শাসন করতে হয় কিভাবে জানতেন না। অচল সিংহ পূর্বের মতো দেওয়ানের পদে অধিষ্ঠিত থাকলেও, ফৌজদারকে মুঠোর মধ্যে পেয়ে একজন ধনাঢ্য ব্যক্তি হয়ে উঠলেন। রাজস্ব পাঠানো বন্ধ হল। মীরজাফরকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেন অচল সিংহ।

এই ব্যাপারে মীরজাফর প্রথমে নির্লিপ্ত ছিলেন। কিন্তু মীরন তাঁকে নির্লিপ্ত থাকতে দিলেন না। বোঝালেন, অচল সিংহকে শায়েস্তা করতে না পারলে, অন্যান্য ফৌজদারও নবাবকে অগ্রাহ্য করতে পারেন। সেই সঙ্গীন মুহূর্ত আসবার পূর্বেই অচল সিংহকে শায়েস্তা করে সকলকে বুঝিয়ে দেওয়া ভাল যে, কর্তব্যে অবহেলা বা অন্য কোন রকম মনোভাব প্রকাশ করলে নবাব কত কঠোর হতে পারেন।

মীরজাফর অচল সিংহ ও হাজীর আলীকে শায়েস্তা করবার জন্য পূর্ণিয়া যাত্রার দিন স্থির করলেন। গোলমাল বাঁধল যাত্রার জন্য নির্দিষ্ট দিনটিতে। সৈন্যরা পরিষ্কার জানিয়ে দিল, পাওনা টাকা না পেলে তারা মুর্শিদাবাদ ছেড়ে কোথাও যাবে না। নবাবের অবস্থা বেশ সঙ্গীন হয়ে উঠল। এই সময় রঙ্গমঞ্চে উদয় হলেন খাদেম হোসেন।

মুর্শিদাবাদে কেন, সুবে বাংলায় খাদেম হোসেনের মতো চরিত্রহীন, নেশাখোর ও রক্তলোলুপ ব্যক্তি বোধহয় দ্বিতীয় ছিল না। তিনি মীরজাফরের বাল্যবন্ধু। অনেক কুকার্যের সঙ্গী। এমন কি পলাশীর চক্রান্তেও তাঁর বিশেষ সহযোগিতা ছিল। মীরজাফর মসনদে বসবার পর খাদেম হোসেনের প্রতিপত্তি প্রচুর বৃদ্ধি পেয়েছিল। তিনি নিজের পরিচয় দিতে লাগলেন নবাবের নিকট আত্মীয় বলে।

মীরজাফরের সঙ্গে তাঁর আত্মীয়তা ছিল আবার ছিলও না। মীরজাফরের ভগ্নীপতির অনেকগুলি রক্ষিতা ছিল, খাদেম হোসেন সেই রক্ষিতাদের কোন একজনের গর্ভজাত। সুতরাং আত্মীয়তার দাবি করতে অসুবিধা কোথায়।

খাদেম হোসেন মীরজাফরকে বললেন, পূর্ণিয়ার ফৌজদারের পদ আমাকে দিন জাহাঁপনা। সমস্ত দিক রক্ষা পাবে।

মীরজাফর কিঞ্চিৎ বিরক্ত হয়ে বললেন, অচল সিংহ আর হাজীর আলীকে না সরিয়ে তোমাকে ফৌজদারের পদ দেওয়া যায় না।

—ও বিষয় বিন্দুমাত্র চিন্তা করবেন না। ওদের ব্যবস্থা করার ভার আমি নিলাম। সৈন্য ও রসদের ব্যয়ভার আমি বহন করব জাহাঁপনা।

নানা উপায়ে খাদেম হোসেন প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করেছেন এ কথা নবাবের অজ্ঞাত ছিল না। তিনি খাদেমের আবেদনের বিষয় চিন্তা করে দেখবেন জানালেন। মীরন এখন নবাবকে বোঝালেন, আপত্তি না করে খাদেম হোসেন রূপী নৌকায় বিপদের বৈতরণী অতিক্রম করা বুদ্ধিমানের কাজ। অর্ধেক সৈন্যকে যদি পূর্ণিয়ার পথে রওয়ানা করে দেওয়া যায় মন্দ কি। তাদের পাওনা গণ্ডা মেটাবার দায়িত্ব নেবে খাদেম হোসেন। অর্ধেকের দায়িত্ব কমে যাওয়ার পর বাকীদের সামলাবার নূতন পন্থা আবিষ্কারের জন্য চিন্তা করলেই চলবে।

প্রস্তাবটি মীরজাফরেরও মনঃপূত হল।

খাদেম হোসেনের ফৌজদারী খেলাত পেতে বিলম্ব হল না।

এদিকে রায়দুর্লভের কানে কি ভাবে যেন সংবাদ পৌছাল, মীরন তাঁকে হত্যার পরিকল্পনা করছেন। তিনি দরবারে যাওয়া বন্ধ করলেন। অসুস্থতার ভান করে নিজের গৃহেই অবস্থান করতে লাগলেন। তাঁর বিপদের কথা জানিয়ে পত্র পাঠালেন ইংরাজদের কুঠিতে।

মীরনও নীরব ছিলেন না।

অবশিষ্ট সৈন্যদের প্রকারান্তরে বুঝিয়ে দিলেন, পাওনা ফেলে রাখা নবাব কোনদিন পছন্দ করেন নি। দেওয়ানকে বহু পূর্বেই আদেশ দিয়েছেন পাওনা মিটিয়ে দিতে। রায়দুর্লভের গাফিলতিতে সৈন্যরা এখনও তাদের পাওনা হাতে পায় নি। সুতরাং দেওয়ানকে গিয়ে চেপে

ধরাই হল যুক্তিসঙ্গত কাজ। আর কিছু বলতে হল না। বাঁধ ভাঙা বন্যার জল যেমন চতুর্দিক প্লাবিত করে তোলে—অসংখ্য সৈন্য তেমনি ছেয়ে গেল রায়দুর্লভের বিশাল গৃহের চতুর্দিকে।

তাদের মুখে এক বুলি, টাকা—টাকা—

রায়দুর্লভ ইষ্টমন্ত্র জপ করতে লাগলেন। মীরনের ষড়যন্ত্রে যে সৈন্যরা তাঁকে ঘিরে ধরেছে অনুমান করে নিতে কষ্ট হল না। কাশিমবাজার কুঠি থেকে দ্রুত ইংরেজরা এসে না পড়লে মান এবং প্রাণ দুই গেল বোধ হয়।

রায়দুর্লভের ভাগ্যের জোর আছে।

মান এবং প্রাণ কিছুই গেল না।

গোরা পল্টন এসে পড়ল। ক্লাইভ মুর্শিদাবাদে উদয় হলেন। সৈন্যদের বুঝিয়ে আবার ছাউনিতে পাঠানো হল। রায়দুর্লভের ঝিমিয়ে পড়া অবস্থা কেটে গেল। তিনি কর্নেল সাহেবের পিছু পিছু ঘুরে বেড়াতে লাগলেন। ক্লাইভ ভদ্রভাবে প্রচুর ধমকালেন মীরজাফরকে। পদাশ্রিত নবাবের এই ধরনের আচরণ শোভন নয়, প্রকারান্তরে একথা জানিয়ে দিলেন।

ভীত মীরজাফর গলদঘর্ম হলেন। কিন্তু মনের কথা কর্নেল সাহেবকে বলতে পারলেন না রায়দুর্লভকে বিদায় দিয়ে অন্য দেওয়ান তিনি রাখতে চান। তবে ক্লাইভ বিদায় নেবার পর এক পরিকল্পনা তিনি খাড়া করলেন, নিজে বলতে না পারলেও এমন একজনকে দিয়ে বলবেন যাঁর কথা ক্লাইভ উপেক্ষা করতে পারবেন না।

সেই ব্যক্তি মহারাজ নন্দকুমার রায়।

কোম্পানিতে তাঁর বিশেষ খাতির আছে। সাধারণ মানুষ এবং গোরা পল্টনের কাছে কালা কর্নেল নামে পরিচিত। কালা কর্নেল নন্দকুমারের জন্ম এক মধ্যবিত্ত ব্রাহ্মণ বংশে। তাঁর পিতা পদ্মনাভ নবাব সরকারে আমিনের কাজ করতেন। সংসারে অভাব ছিল না। পুত্রকে তিনি

নানা শিক্ষা দিয়েছিলেন। অল্প বয়সেই সংস্কৃত ও পারসী ভাষায় নন্দকুমার পারদর্শী হয়ে উঠেছিলেন। কর্মজীবনেও অতি অল্পদিনের মধ্যেই বিরাট সাফল্য লাভ করলেন তিনি। আলীবর্দী রাজস্ব সংগ্রহের কাজে তাঁকে নিযুক্ত করেছিলেন। পরে তাঁকে হুগলীর ফৌজদার পদে নিযুক্ত করা হয়।

ফৌজদারের পদ থেকে নন্দকুমার অপসারিত হবার পর আর নবাব সরকারের কোন পদ গ্রহণ করেন নি। ক্লাইভ এই সুযোগ্য ব্যক্তিটিকে কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত করে নেন। কিন্তু নন্দকুমার হেষ্টিংসের স্বেচ্ছাচারিতাকে সহ্য করতে না পেরে কাজে ইস্তফা দিয়ে বাড়িতে বিশ্রাম নিচ্ছেন বর্তমানে।

মীরজাফর গোপনে নন্দকুমারের কাছে পোঁছালেন।

নন্দকুমার মহাসমাদরে নবাবকে অভ্যর্থনা করলেন।

—কি সৌভাগ্য আমার। জাহাঁপনা স্বয়ং আমার গৃহে এসেছেন। অবশ্য তিনি এই কষ্টটুকু না করলেও পারতেন। সংবাদ পেলেই আমি হজরতের হুজুরে গিয়ে উপস্থিত হতাম।

নবাব বললেন, আপনি ব্যস্ত হবেন না মহারাজ। আমি বিশেষ প্রয়োজনে সকলের চোখ বাঁচিয়ে এসেছি আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে।

নন্দকুমার বিস্মিত গলায় বললেন, বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব আপনি। আপনি কার ভয়ে ভীত জাহাঁপনা?

দীর্ঘশ্বাস ফেললেন মীরজাফর।

—এই গালভরা উপাধিটুকুই এখনও আমার আছে মহারাজ নন্দকুমার। আর যা ছিল সমস্ত ধোঁয়া হয়ে উড়ে যাচ্ছে। আমি আটকে আছি শুধু ষড়যন্ত্রের কঠিন বেড়াজালে।

—ষড়যন্ত্রের বেড়াজাল। আপনার বিরুদ্ধে কে ষড়যন্ত্র করছে জাহাঁপনা?

মীরজাফরের মুখে বিচিত্র হাসি ফুটে উঠল।

—একদিন আমার সঙ্গে হাত মিলিয়ে যে অন্যের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করেছিল। সেদিন নায়ক ছিলাম আমি। আজকে নায়ক হতে চাইছে রায়দুর্লভ।

—রায়দুর্লভ! আপনার দেওয়ান?

—ঠিক তাই। আমি যেমন সিরাজের সিপাহশালার হয়েও তার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলাম। রায়দুর্লভ তেমনি দেওয়ান হয়েও ইংরেজদের সাহায্যে আমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবার চেষ্টা করছে।

নন্দকুমার বুঝলেন, নবাবের মনের মধ্যে প্রবল সংগ্রাম চলেছে। তিনি কখনও ভীত হয়ে পড়ছেন, কখনও অনুতাপের আগুনে দগ্ধ হচ্ছেন।

—আপনি নিজের ব্যক্তিত্ব হারিয়ে ফেলবেন না জাহাঁপনা। সমস্ত ষড়যন্ত্রকে ব্যর্থ করে দিন। ইংরেজ যদি বিরুদ্ধাচরণ করে তাদের বিরুদ্ধে যুদ্ধ ঘোষণা করে সমুচিত শিক্ষা দিন।

—সে সাহস, সে শক্তি আমার কোথায়?

—একটু দৃঢ় হোন হজরত। মনে সাহস আসবেই। আপনার বিশাল সৈন্যবাহিনী—সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হলে ইংরেজরা পর্যুদস্ত হবেই।

—আমার আর সেদিন নেই নন্দকুমার। বিশাল সৈন্যবাহিনী ঠিকই আছে, তবে তারা আর আমার আজ্ঞাবহ নয়। তাদেরই বা অপরাধ কি। বহুদিনের বেতন বাকী পড়ে গেছে। পাওনার জন্য তারা ক্ষুধার্ত তরক্ষুর মতো হিংস্র হয়ে উঠেছে। কোথা থেকে তাদের পাওনা আমি মেটাব। ইংরেজের ক্ষুধা মেটাতে রাজকোষ সম্পূর্ণ শূন্য। শ্রেষ্ঠীবর্গ ঋণ পর্যন্ত দেবেন না। আমার অত্যন্ত নিরুপায় অবস্থা।

এই সমস্ত কথা নন্দকুমার জ্ঞাত ছিলেন না। পূর্বের মতো কোথাও কাজে নিযুক্ত থাকলে এই অজ্ঞতা তাঁর থাকত না। নবাবের কথা শুনে তিনি স্তব্ধ হয়ে গেলেন। ভাগ্যের পরিহাস বোধহয় একেই বলে। বললেন শান্ত কণ্ঠে, আপনাকে কোন পরামর্শ দেবার স্পর্ধা আমার থাকা

উচিত নয় জাহাঁপনা। তবু বলছি, শ্রেষ্ঠীদের দ্বারস্থ না হয়ে নিজের জামাতা মীরকাশিমের কাছ থেকে প্রয়োজনীয় অর্থ সংগ্রহ করতে পারতেন।

—মীরকাশিম !!!

—তাঁর অপর্যাপ্ত ধনরত্নের কথা কার অজানা জাহাঁপনা তিনিই একমাত্র এই বিপদে আপনাকে সাহায্য করতে পারেন।

মীরজাফরের মন আশার আলোয় আলোকিত হয়ে উঠল। এই সহজ পন্থা তাঁর চোখে এতদিন পড়ে নি, আশ্চর্য। মীরকাশিমের বিপুল ধনরত্নের কথা তাঁর যে অজানা তাতো নয়। নন্দকুমারকে ধন্যবাদ জানালেন।

মুশকিল আসানের এই সহজ পথটি নির্দেশ করে দেবার জন্য।

মীরকাশিম কি তাঁকে সাহায্য করবেন ?

হয়তো করবেন।

হয়তো নয়, নিশ্চয় করবেন।

মীরজাফরের অনুতাপ হতে লাগল, কেন তিনি মীরকাশিমকে দরবারের উচ্চপদে অধিষ্ঠিত করেন নি এতদিন। মণিবেগম আর মীরনের অনেক কথাই তো উপেক্ষা করেন, মীরকাশিমের বিরুদ্ধে তাঁদের চক্রান্তকে তিনি ব্যর্থ করে দেন নি কেন ? অবশ্য এখনও সামলে নেবার পথ আছে। মীরজাফর সামলে নেবেন।

তিনি প্রকাশ্যে বললেন, অসংখ্য ধন্যবাদ আপনাকে। এই সহজ বিষয়টি কোন এক অজানা কারণেই আমার মনে উদয় হয় নি। আপনি যথার্থ বলেছেন এই বিপদ থেকে মীরকাশিমই আমাকে রক্ষা করতে পারে। আমার মন অসম্ভব হালকা হয়ে গেল মহারাজ।

—আমার পরামর্শ আপনি গ্রহণ করলেন, এ আমার সৌভাগ্য জাহাঁপনা।

—আপনার বিচক্ষণতা আমি দীর্ঘদিন থেকে লক্ষ্য করছি।

—আমি অনুগৃহীত।

মীরজাফর বললেন, আমার আগমনের উদ্দেশ্য এখনও ব্যক্ত করি নি।

—আদেশ করুন।

সুবে বাংলার দেওয়ানের পদ আপনাকে গ্রহণ করতে হবে।

বিস্ময়ের অতলে তলিয়ে গেলেন নন্দকুমার।

—জাহাঁপনা—

—আপনার বিচক্ষণতা আমার মনে স্থৈর্য আনবে।

—এই গুরু-দায়িত্ব বহন করবার সাধ্য আমার নেই হজরত।

মীরজাফর মৃদু হাসলেন।

—নিজের সাধ্যের প্রকৃত মূল্য আপনার অজানা আছে। ওই পদের দ্বিতীয় যোগ্য ব্যক্তি আপনি ছাড়া সুবে বাংলায় আর কেউ নেই।

—কিন্তু—

—আপনি আপত্তি করবেন না।

—আপত্তি না করে আমার উপায় নেই জাহাঁপনা। তাছাড়া রায়দুর্লভ দেওয়ানের পদে আসীন রয়েছেন। তাঁর—

মীরজাফর নিস্তেজ গলায় বললেন, রায়দুর্লভকে বরখাস্ত করার সাহস আমার নেই। কর্নেল সাহেব তাঁকে মনোনীত করেছেন। অথচ তাঁকে পদ থেকে সরাতেই হবে। আপনি এই কাজ সহজেই সমাধা করতে পারেন।

—আমি!

—হ্যাঁ। কর্নেল সাহেব আপনাকে সম্মান করেন। আপনার কথা উপেক্ষা তিনি কখনই করবেন না। তাঁকে কৌশলে শুধু জানিয়ে দেওয়া, দেওয়ানের পদ গ্রহণ করতে আপনার আপত্তি নেই। রায়দুর্লভ অন্তরায় সৃষ্টি করে রয়েছেন।

—আমায় ক্ষমা করবেন জাহাঁপনা। বর্তমানে কোন রাজনৈতিক ব্যাপারে মাথা গলানো আমার ইচ্ছে নয়।

—আরেকবার বিবেচনা করে দেখুন মহারাজ।

—আপনার কথাকে মান্য করতে না পারায় আমি নিদারুণ মর্মাহত হজরত।

কিন্তু আমি উপায়হীন। ব্রাহ্মণকে আপনি অন্তর থেকে ক্ষমা করুন জাহাঁপনা।

ক্ষুণ্ণ কণ্ঠে মীরজাফর বললেন, অনেক আশা নিয়ে আপনার কাছে এসেছিলাম। যে কোন কারণেই হোক আপনি যখন আমার প্রস্তাব প্রত্যাখ্যান করলেন তখন আর কি বলবার থাকতে পারে। আমাদের আলোচনা তৃতীয় ব্যক্তি জানতে না পারুক, এই অনুরোধ আশা করি আপনি রাখবেন।

—আমাদের আলোচনা তৃতীয় ব্যক্তির কর্ণগোচর হওয়ার কোন সম্ভাবনা নেই।

নবাব আর কিছু বললেন না।

বিদায় নিলেন।

মীরকাশিম নীরবে বসে নেই।

নিজের কাজে এগিয়েছেন অনেকটা এখন সুযোগের অপেক্ষায় দিন গুণছেন শুধু। অবশ্য মুর্শিদাবাদ থেকে তাঁকে অনেক দূরে পাঠিয়ে দেওয়া হয়েছে। এখন তিনি রংপুরে ফৌজদার। মীরন মীরকাশিমের তীক্ষ্ণবুদ্ধিকে ভয় পান। তিনি চিন্তা করে দেখলেন রাজধানীতে তাঁকে না রাখাই ভাল। জগৎশেঠ, রাজা রাজবল্লভ প্রমুখ শ্রেষ্ঠীবর্গর কোন কিছুই অসাধ্য নয়। তাঁরা মীরকাশিমকে দলে টেনে আরেক চক্রান্তের সৃষ্টি করতে পারেন। সুতরাং পূর্বাহ্নেই সাবধান হয়ে থাকা দোষণীয় নয়।

ফৌজদারের লোভনীয় পদের জন্য সকলেই লালায়িত। রংপুরের ফৌজদারের পদ পেয়ে কিন্তু মীরকাশিম খুশী হলেন না। মুর্শিদাবাদ

থেকে দূরে কোথাও গিয়ে থাকার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। ভবিষ্যতের রঙীন কল্পনাকে বাস্তবের রূপ দিতে গেলে তখ্‌ত মুবারক থেকে বেশী দূরে থাকা চলবে না।

উপায় নেই। বহু চেষ্টা করেও রংপুর যাওয়ার আদেশকে তিনি বাতিল করাতে পারলেন না। অগত্যা যেতে হল কর্মস্থলে। অবশ্য সুযোগ সুবিধা পেলেই মুর্শিদাবাদ আসছেন। সেই অবকাশে যতদূর সম্ভব নিজের পরিকল্পনাকে বাস্তবতার দিকে ঠেলে নিয়ে যাচ্ছেন।

রংপুরে একদিন সংবাদ পৌঁছল, অবিলম্বে নবাব মীরকাশিমের সাক্ষাত প্রার্থী। মীরকাশিম ভীত হলেন। তাঁর মনোভাব কি নবাবের কাছে স্পষ্ট হয়ে গেছে?

তাই আহ্বান করেছেন কঠোর শাস্তি দেবার জন্য। না, এই আহ্বান এসেছে অন্য কোন কারণে? কারণ যাই হোক। আদেশ অমান্য করবার উপায় নেই। তিনি মুর্শিদাবাদ যাত্রা করলেন।

নন্দকুমারের কাছ থেকে প্রত্যাবর্তন করে সমস্ত কথা মণিবেগমকে জানিয়ে ছিলেন মীরজাফর। সংশয় প্রকাশ করেছিলেন বৃদ্ধ নবাব। সংশয় যে তিনি অকারণে প্রকাশ করেছিলেন তা নয়। অতীতের ঘটনাকে পর্যালোচনা করে স্বাভাবিক ভাবেই তাঁর মনে উদয় হয়েছিল, এই দুর্দিনে মীরকাশিম হয়তো তাঁকে সাহায্য করবেন না।

বলেছিলেন, তুমি যদি আমাকে বাধা না দিতে, ফতেমার অনুরোধ আমি যদি রাখতে পারতাম, মীরকাশিমের বিপুল দৌলত আমার করতলগত থাকত। আমি বিপদ মুক্ত হতাম।

যৌবনবতী মণিবেগম হেসেছিলেন।

শব্দ তুলেই হেসেছিলেন।

—আপনি অনর্থক চিন্তা করছেন। মীরকাশিম অর্থ সাহায্য করে আপনাকে বিপদ মুক্ত করবেন।

—যদি না করে?

—করবে—নিশ্চয় করবে। লোভী জানোয়ার ওরা। একটি মাত্র মাংস খণ্ড দিয়ে অনেক জানোয়ারকে বশ করা যায়। মাংস খণ্ডের মতো ছুঁড়ে দেবেন দরবারের উচ্চপদ, দেখবেন মীরকাশিমের দৌলতখানা আপনার জন্য উন্মুক্ত।

বিলম্ব না করে রংপুরে সংবাদ পাঠান।

সংবাদ পেয়ে মুর্শিদাবাদে মীরকাশিম এলেন।

জাফরগঞ্জ প্রাসাদে তাঁকে আহ্বান করা হল।

চূড়ান্ত সমাদরে অভ্যর্থিত হলেন তিনি।

তারপর মীরকাশিম আসল কথার অবতারণা করলেন।

—আমি তোমাকে কেন আহ্বান করেছি জান?

—কারণ আমার অজ্ঞাত জাহাঁপনা।

—বর্তমান সময় আমার অত্যন্ত আতান্তারের মধ্যে যাচ্ছে তা বোধহয় তোমার অজানা নেই। বহুসহস্র সৈন্যের কয়েক মাসের বেতন বাকী পড়েছে। রাজকোষে এমন অর্থ নেই যে ওই পাওনা মিটিয়ে দেওয়া যায়।

থামলেন মীরজাফর।

মীরকাশিমের মুখের দিকে তাকিয়ে আবার বললেন, একমাত্র তুমিই আমাকে এই আতান্তারের হাত থেকে রক্ষা করতে পার কাশিম আলী।

—আমি! আমি আপনাকে কিভাবে সাহায্য করব জাহাঁপনা?

—অর্থ দিয়ে।

—অর্থ দিয়ে?

—তুমি আমার উত্তমর্ণ হয়ে বর্তমানের বিপদকে কাটিয়ে দাও।

মীরকাশিম নীরব রইলেন।

—দরবারে শ্রেষ্ঠতম পদ দিয়ে আমি তোমাকে সম্মানিত করব। সুবে বাংলার কোন্ জমিদারী তোমার পছন্দ বল, আমি তোমায় লিখে দিতে প্রস্তুত আছি। শুধু আমার মান সম্মানকে রক্ষা কর বর্তমানে অর্থ

সাহায্য দিয়ে। চিন্তা করে দেখ কাশিম আলী, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব বিনীতভাবে তোমার সাহায্যপ্রার্থী।

মীরকাশিম আমন্ত্রণ ও সমাদরের অর্থ বুঝতে পারলেন।

বললেন মোলায়েম কণ্ঠে, আমার কাছ থেকে সাহায্য চেয়ে জাহাঁপনা আমাকে সম্মানিত করেছেন বিশেষভাবে। কিন্তু একান্ত অনিচ্ছার সঙ্গে জানাতে হচ্ছে, সাহায্য করবার মতো বিরাট অঙ্কের অর্থ আমার নেই।

—আমার উপর তীব্র রাগ তোমার থাকা স্বাভাবিক। দরবারে তোমার উচ্চপদ প্রাপ্য, তোমাকে আমি বঞ্চিত করে রেখেছি। সেই রাগের প্রতিশোধ আজ তুমি আমার উপর নিয়ো না।

—আমার দুর্ভাগ্য জাহাঁপনা, আমার সম্পর্কে ভুল ধারণা নিয়ে রয়েছেন। উচ্চপদের লালসা আমার নেই। অর্থ থাকলে হুজরতকে সাহায্য করতে কার্পণ্য করতাম না। আমি অত্যন্ত নিরুপায় হয়ে নিজের অক্ষমতা প্রকাশ করছি।

—তোমার অক্ষমতা দেখে আমি বিস্মিত হচ্ছি। তোমার ধনরত্নের কথা মুর্শিদাবাদে প্রবাদে পরিণত হয়েছে। অথচ—

—মন্দ লোকের মুখ আমি কি ভাবে বন্ধ করব জাহাঁপনা? পূর্বেই বললাম, আপনাকে সাহায্য করবার মতো ধনরত্ন আমার নেই।

মীরজাফর চিন্তা করতে লাগলেন, মীরকাশিম মিথ্যা কথা বলছেন না প্রকৃত পক্ষেই তাঁর কাছে সাহায্য করবার মতো অর্থ নেই? নবাব অনেক আশা নিয়ে ছিলেন। আশা ভঙ্গের বেদনা তাঁকে সবিশেষ কাতর করে তুলল। নিজের শেষ অবলম্বনটুকুও চোখের উপর ভেসে যেতে দেখলেন।

—কাশিম আলী—

—জাহাঁপনা।

—আমি যাঁদের উপর নির্ভর করে তখ্‌তে বসেছিলাম, আজ সকলেই

আমাকে ছেড়ে গেছেন। আমার আদরের ফতেমাকে তোমার হাতে তুলে দিয়েছি, তুমি আমার কত আদরের—কাশিম, এই বিপদের দিনে তুমি আর আমায় উপেক্ষা করো না। পবিত্র কোরান স্পর্শ করে তোমার স্বপক্ষে যে কোন প্রতিজ্ঞা করতে প্রস্তুত আছি।

নবাব মীরকাশিমের হাত নিজের করতাল বদ্ধ করলেন।

মীরকাশিম সবিনয় ভঙ্গীতে হাত ছাড়িয়ে নিয়ে বললেন জাহাঁপনা আমাকে এখনও বিশ্বাস করতে পারছেন না। তাঁর বিশ্বাস অর্জন করবার জন্য আমি একটি প্রস্তাব উত্থাপন করছি। আমার গৃহ তল্লাস করা হোক। যদি অপর্যাপ্ত হীরা, জহরত ও আশরফি পাওয়া যায়, যে কোন শাস্তি গ্রহণ করবার জন্য আমি প্রস্তুত আছি জাহাঁপনা।

মীরজাফরের আর কোন কথা বলার পথ রইল না।

কক্ষে তৃতীয় ব্যক্তি ছিল না।

—রংপুরে ফৌজদারের পদ থেকে আমাকে অব্যাহতি দেওয়া হোক। রাজকার্যে আমার রুচি নেই। আমি রোবাই লিখে সময় অতিবাহিত করতে চাই।

মীরজাফর কিছুই বললেন না।

কুর্নিশ করে বিদায় নিলেন মীরকাশিম।

মীরকাশিম কি ভাবে তখ্‌ত মুবারকের দিকে অগ্রসর হচ্ছিলেন তার বর্ণনা দিতে গেলে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির আভ্যন্তরীণ কথা কিছু বলতে হয়। ক্লাইভের দেশে ফিরে যাবার সময় হল। তাঁর বর্তমানে ভারতবর্ষ ছাড়বার ইচ্ছে ছিল না কিন্তু ইংলণ্ডে না গিয়েও উপায় নেই। নিজের পরিকল্পনা ডিরেক্টরদের কাছে তাঁকে দিতে হবে। একথা এখন কে না জানে ক্লাইভ না থাকলে বাংলাদেশ থেকে এত

বিপুল ঐশ্বর্য করায়ত্ত করা যেত না। ডিরেক্টররা অনেকেই তাঁকে পছন্দ করছেন। সুতরাং ক্লাইভের এখন অনেক স্বপ্ন।

ক্লাইভ মনে মনে স্থির করে রেখেছিলেন, তিনি বিদায় নেবার পর বাংলাদেশের ইংরেজবাহিনীর প্রধান সেনাপতির পদ গ্রহণ করবেন লায়লন ফোর্ড। কিন্তু ইংলণ্ড থেকে আদেশ এল কর্নেল কুটকে ওই পদটি যেন দেওয়া হয়। কুট কোম্পানির কর্মচারী ছিলেন না। তিনি ছিলেন বৃটিশ সামরিক বিভাগের কর্মচারী। তাঁকে এই পদে মনোনীত করে এক বিশেষ চাল চেলেছিলেন কোম্পানি। আয়ার কুট বাংলার জঙ্গীলাট হলে তাঁর অধীনস্থ ইংরেজ সৈন্যকে বেতন না দিয়েই কাজে লাগানো যাবে।

এই মনোনয়ন ক্লাইভের পছন্দ হল না।

পছন্দ না হওয়ার গুটিকয়েক বলিষ্ঠ কারণ ছিল।

প্রথম আয়ারকুট ইংলণ্ড থেকে এদেশে এসে দাক্ষিণাত্যেই আছেন। বাংলাদেশ ও এখানকার রাজনীতি সম্বন্ধে তাঁর কোন জ্ঞান নেই। সুবে বাংলার জঙ্গীলাট হতে গেলে যা বিশেষভাবে প্রয়োজন। তিনি অত্যন্ত রাগী ব্যক্তি। তাঁর অধীনস্থ কর্মচারীরা পর্যন্ত তাঁর এই স্বভাবের জন্য বিরক্ত। সুবে বাংলার রাজনৈতিক পরিস্থিতি যেরকম চলেছে তাতে আয়ারকুটের মতো প্রচণ্ড রাগী মানুষ সম্পূর্ণ বেমানান। তিনি না কোম্পানির কাউন্সিলারদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবেন না নবাবকে সামলাতে পারবেন।

ক্লাইভ যাত্রা করবার পূর্বেই ইংলণ্ডে নিজের আপত্তির কথা জানিয়ে পত্র দিলেন। অবশ্য কলকাতার গভর্ণর তাঁর মনোমত ব্যক্তিই মনোনীত হলেন। তিনি ভান্সিটার্ট। নির্দিষ্ট দিনে ক্লাইভ ইংলণ্ডে যাত্রা করলেন। কিন্তু নির্দিষ্ট দিনে কার্যভার গ্রহণ করবার জন্য আয়ারকুট কলকাতায় আসতে পারলেন না। এমন কি এ কথাও জানা গেল, তিনি কার্যভার আদপেই গ্রহণ করতে পারবেন না। কারণ

দক্ষিণ দেশে ফরাসী সেনাপতি কাউন্ট লালীর সঙ্গে ঘোরতর যুদ্ধ চলেছে। যুদ্ধ বেশ কিছুদিন চলবে এইরকম অনুমান করা যাচ্ছে। সুতরাং আয়ারকুটের সুবে বাংলায় আসার কোন প্রশ্ন ওঠে না।

মাদ্রাজে কোম্পানির সঙ্গে যুক্ত হেনরী ভান্সিটার্ট কলকাতার স্থায়ী গভর্নরের পদ পেয়েও, ওখানকার কাজ শেষ করে ক্লাইভ বিদায় নেবার পূর্বে কলকাতা আসতে পারলেন না। অগত্যা একজন অস্থায়ী গভর্নর নিযুক্ত করবার প্রয়োজনীয়তা দেখা দিল।

কে এই পদে নিযুক্ত হবেন তা নিয়ে কিঞ্চিৎ তর্ক-বিতর্কের অবকাশ ছিল। কাউন্সিলের প্রবীণরা অনেকেই এই পদটি পাবার জন্য লালায়িত হলেন। অনেক অনুরোধ উপরোধ বাঁকা পথ দিয়ে কর্নেল ক্লাইভের কাছে পৌঁছাতে লাগল। তিনি কারুর কথা গ্রাহ্য না করে হলওয়েলকে মনোনীত করলেন।

সিরাজ যখন কলকাতা আক্রমণ করেছিলেন, একমাত্র হলওয়েলই যা কিছু বীরত্ব প্রদর্শন করেছিলেন। তা সত্ত্বেও পরবর্তীকালে এই কারণে ইংরেজ মহলে তাঁর খ্যাতি প্রসার লাভ করে নি। যা তিনি স্বাভাবিকভাবেই আশা করেছিলেন। অবশ্য পরে অন্ধকূপ হত্যার অলীক কাহিনী প্রচার করে তিনি খ্যাতিমান হন। সেই হলওয়েল কলকাতার অস্থায়ী গভর্নর পদে আসীন হলেন।

সেরা পদটি পাবার পরই হলওয়েল কাজে নামলেন। কাজে নামলেন, অর্থের নিজের ভবিষ্যৎ গুছিয়ে নেবার জন্যও তৎপর হলেন। পলাশীর যুদ্ধের পর সর্ত অনুসারে মীরজাফর মসনদে বসে প্রচুর খয়রাত করেছিলেন। কিন্তু হলওয়েলের অংশে যা পড়েছিল তা যৎসামান্য। অনেক বিনিদ্র রাতে সে সমস্ত কথা তাঁর মনে পড়েছে, দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলেছেন হলওয়েল। টাকার ঝন্ঝনানিতে সেদিন ভরে উঠেছিল কাউন্সিলকক্ষ।

সকলের মুখেই একই কথা, কে কত টাকা পাচ্ছে। ক্লাইভ পেলেন

কুড়ি লক্ষ আশি হাজার টাকা। ওয়াটস পেলেন, দশ লক্ষ চল্লিশ হাজার টাকা। অনেকেই লোভনীয় অঙ্কের টাকা পেলেন। আর হলওয়েল পেলেন এক লক্ষ টাকা।

ছিটেফোঁটা মাত্র।

সেদিন হলওয়েল ছিলেন কাউন্সিলের একজন সাধারণ সভ্য। পদমর্যাদানুসারে যা পেয়েছিল তাতেই সন্তুষ্ট না হয়ে উপায় ছিল না। তারপর সময় অতিক্রান্ত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে হলওয়েলের পদমর্যাদা বৃদ্ধি পেয়েছে। এখন ক্লাইভের অনুগ্রহে তিনি অস্থায়ী গভর্নর। একথা তিনি বুঝে নিয়েছিলেন, অস্থায়ী পদটি স্থায়ী কোনদিনই হবে না। ভ্যান্সিটার্ট মাদ্রাজ থেকে এলেন বলে। তিনি এসে পড়বার পূর্বেই এমন খেলা আরম্ভ করে দিতে হবে যাতে অদূর ভবিষ্যতে তিনি মোটা রেস্ত পকেটস্থ করতে পারেন।

মীরজাফরের কাছ থেকে আর কানাকড়ি আদায় করা যাবে না। যদিও নবাব ইংরেজদের ভয় করে চলেন। তখ্‌ত বাঁচাতে গেলে ইংরেজদের সহযোগিতা ছাড়া বাঁচানো যাবে না তাও জানেন। কিন্তু বর্তমানে প্রতিশ্রুতি ছাড়া আর কিছু তার কাছ থেকে আদায় করা যাবে না। নিদারুণভাবে নবাবকে নিংড়ে নেওয়া হয়েছে।

উপায়?

অনেক চিন্তার পর অবশেষে হলওয়েল উপায় স্থির করলেন।

ক্লাইভ যে পথ অবলম্বন করেছিলেন, তাঁকেও সেই পথ অবলম্বন করতে হবে। আবার রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটানো চাই। সিরাজকে সরিয়ে মীরজাফরকে তখ্‌তে বসিয়ে ইংরেজরা প্রচুর অর্থ লাভ করেছিল। আবার একজন তখ্‌তের দাবিদার সংগ্রহ করতে হবে, মীরজাফরকে সরিয়ে যাকে তখ্‌তে দিয়ে প্রচুর উপঢৌকন পাওয়া যাবে। নবাবকে কেউ চায় না। তাঁকে তখ্‌ত থেকে বিদায় দিলে কোন মহলই বিশেষ অসুখী হবে না।

কিন্তু কাকে অবলম্বন করবেন হলওয়েল?

তখ্‌ত মুবারকের জন্য উন্মাদ হয়ে রয়েছে কে?

শেষে—

খোজা পিক্রুসকে আহ্বান করলেন। নানা বিষয়ে পিক্রুস কোম্পানিকে বহু সাহায্য করেছে। বিশেষ তার সাহায্য না পেলে দরবারের অনেক গুপ্ত কথাই ইংরেজদের অজানা থেকে যেত। নিজেকে কাপড়ের আড়ালে রাখলেও, রাজনৈতিক খেলার সে একজন প্রথম শ্রেণীর খেলোয়াড়।

হলওয়েল আকারে ইঙ্গিতে নিজের মনোবাসনা পিক্রুসের কাছে প্রকাশ করলেন। তখ্‌ত মুবারকের কোন প্রার্থীর কথা তার জানা আছে কিনা তাও জানতে চাইলেন, পিক্রুস ব্যবসাদার লোক। সে প্রথমেই টাকার কথা তুলল।

—আপনি যা বললেন আমি তা বুঝেছি। আপনি যা বললেন না তাও আমার বুঝে নিতে কষ্ট হয় নি। আপনি যখন আমার সহযোগিতা চাইছেন তখন আমারও কিছু স্বার্থ থাকা নিশ্চয় দরকার?

হলওয়েল পিক্রুসের চরিত্রের বিষয় ওয়াকিবহাল ছিলেন।

বললেন, নিশ্চয়। তোমার স্বার্থ না থাকলে তুমি কাজ করবে কেন?

—আমার স্বার্থ কি ভাবে পূরণ করতে চান বলুন?

—কার্যোদ্ধার যদি হয় তুমি মোটা টাকা ভাগ পাবে।

পিক্রুস নির্বিকার গলায় বললে, ওই যদি কথাটায় আমার আপত্তি আছে।

—অর্থাৎ—

—শুনুন মিঃ হলওয়েল, আমি আপনাদের সঠিক পথ বলে দেব। কার্যোদ্ধার হোক বা না হোক, সে সম্পর্কে আমার কোন দায়দায়িত্ব থাকবে না। টাকা আমাকে আগাম দিতে হবে।

—বেশ।

—কত দিতে চান বলুন?

হলওয়েল চিন্তা করতে লাগলেন। লোকটি অতি জঘন্য চরিত্রের। টাকা নেবার পর তাঁকে যদি বিপথে চালিত করে? অবশ্য অতীতে টাকা নিয়ে সে এমন কোন কাজ করেনি যাতে কোম্পানি ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে। তাছাড়া অনিশ্চয়তার উপর নির্ভর করা ছাড়া উপায় তো নেই। হলওয়েল বললেন, তুমিই বল, কত চাও?

পিক্রুসও চিন্তা করল কিছুক্ষণ।

—এক লক্ষ।

হলওয়েল সচকিত।

—এক লক্ষ!

—খুব বেশী বললাম কি?

—অত্যন্ত বেশী।

—এর কমে আমার পক্ষে অসুবিধা হবে।

—আমি ত্রিশ হাজার টাকা দিতে পারি।

—আপনি আমাকে টাকা দয়া করে দান করছেন না মিঃ হলওয়েল। আপনারা যে অঙ্ক লাভ করবেন, আমার দাবির অঙ্ক তার কাছে কিছুই নয়।

—কিন্তু তুমি আগাম টাকা চাইছো। বর্তমানে ওই অঙ্কের টাকা দেওয়ার ক্ষমতা আমাদের নেই।

পিক্রুস আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল।

—এখানে তার অপেক্ষা করা বৃথা। শুভ রাত্রি মিঃ হলওয়েল।

হলওয়েল ব্যস্ততার সঙ্গে বললেন, দাঁড়াও পিক্রুস। আমার শেষ কথা হল, চল্লিশ হাজার টাকা আমি দিতে পারব।

পিক্রুস আর আপত্তি করল না। চিন্তা করে দেখল বোধহয়, বেশী দরাদরি করতে গেলে চল্লিশ হাজার টাকাও হাতছাড়া হয়ে যাবে। সুতরাং যা আসছে তা সাগ্রহে গ্রহণ করাই হল বুদ্ধিমানের কাজ।

চল্লিশ হাজার টাকা হস্তান্তরিত হল।

হলওয়েল বললেন, এবার তোমার পরিকল্পনা বল ?

—মীরকাশিম। মীরকাশিমের পক্ষ অবলম্বন করলেই তিনি আপনাকে হীরা জহরতে মুড়ে দেবেন।

হলওয়েল দ্রুত চিন্তা করতে লাগলেন। মীরকাশিমকে তিনি দেখেছেন। মীরজাফরের দূত হয়ে কয়েকবার কলকাতায় এসেছিলেন। মীর-কাশিমকে স্বাধীনচেতা মনে হয়েছিল হলওয়েলের—তিনি নবাবকে সরিয়ে তখ্‌ত মুবারকে বসতে আগ্রহী তা কখনই মনে হয় নি।

—মীরকাশিম শ্বশুরের বিপক্ষে যাবেন ?

পিক্রুস হাসল।

—কর্নেল ক্লাইভ কিন্তু প্রশ্ন করতেন না মিঃ হলওয়েল। এদের প্রতি রক্ত কণিকায় বিশ্বাসঘাতকতা ও প্রবঞ্চনা। তখ্‌তের জন্য এরা জন্মদাতার বুকে অস্ত্র বসিয়ে দিতে পারে। আপনি নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন আপনাদের সাহায্য পেলে মীরকাশিম যথেষ্ট সাহসের পরিচয় দেবেন।

—মীরকাশিম যে তখ্‌তে বসতে চান এ রকম মনোভাবের পরিচয় কি পেয়েছো ?

—তিনি চতুর ব্যক্তি। নিজের মনোভাব এখনও প্রকাশ করেন নি। তবে তাঁর কার্য-কলাপে তাঁর মনের ভাব অনুমান করে নিতে কষ্ট হয় নি আমার।

—অনুমান !

—রাজনীতিতে অনুমানের মূল্য অনেক মিঃ হলওয়েল। আপনি চিন্তিত হবেন না। আমি সমস্ত ব্যবস্থা পাকা করে শীঘ্রই আপনাকে জানাচ্ছি।

পিক্রুস তখনকার মতো হলওয়েলের কাছ থেকে বিদায় নিল।

দরবার এবং দরবারের সূত্রে গ্রথিত সমস্ত সংবাদ তার নখদর্পণে ছিল। কখন কোন্ সংবাদ তাকে অর্থ এনে দেবে বলা তো যায় না। যেমন

মীরকাশিমের মনোভাব আঁচ করা ছিল বলেই নগদ চল্লিশ হাজার টাকা লাভ করা সম্ভব হল। পিক্রুস হলওয়েলের কাছ থেকে বিদায় নিয়েই কাজে নামল।

গিয়ে উপস্থিত হল রংপুরে।

ফৌজদারের পদ নিয়ে যে মীরকাশিম রংপুর চলে গেছেন সে সংবাদ যথাসময় সংগ্রহ করেছিল পিক্রুস। মীরকাশিম পিক্রুসকে দেখে অবাক্ হলেন। ধূর্ত আরমানী হুগলী থেকে এতদূর ব্যবসা করতে আসবে তা তাঁর কল্পনার বাইরে ছিল। আবার মনে হল, আর্মেনীয়া থেকে যদি সুবে বাংলায় এসে থাকতে পারে তবে হুগলী থেকে রংপুরে ব্যবসা করতে আসবে না কেন?

তিনি বললেন, তোমায় দেখে খুশী হলাম পিক্রুস। কি সওদা নিয়ে এসেছো বল? সে বছর তোমার কাছ থেকে কেনা কাপড় বেগম পছন্দ করেছিলেন।

—আমার সৌভাগ্য। পিক্রুস বললে, রংপুরে আমি ব্যবসা করতে এখন আসি নি জনাব। এসেছি আপনার সঙ্গে এক বিশেষ বিষয় নিয়ে আলোচনা করতে।

মীরকাশিম তীক্ষ্ণ চোখে পিক্রুসের দিকে তাকালেন।

—তার বীভৎস মুখ ভাবলেশহীন।

—কি বলতে চাও বল?

—আলোচনা কোন নিভৃতস্থানে হওয়াই ভাল।

—পিক্রুসকে নিয়ে মীরকাশিম কক্ষান্তরে গেলেন।

—বল, এবার।

—আমি সংবাদ পেয়েছি গভর্নর হলওয়েল, আপনার সম্পর্কে আগ্রহশীল হয়ে পড়েছেন।

—আমার সম্পর্কে আগ্রহশীল হয়ে পড়েছেন। কেন বল তো?

পিক্রুস পরিষ্কার গলায় বলল, আমার কথা যদি আপনি না বোঝার

ভান করেন তাহলে অবশ্য আলোচনা চালিয়ে যাবার সার্থকতা নেই। আমি জানি জনাব, তখ্ত মুবারকের আহ্বান আপনি শুনতে পেয়েছেন। নবাবের ব্যবহারে প্রজাসাধারণ তাঁকে চায় না। ইংরেজদের মন তিনি বিষিয়ে তুলেছেন। এখন স্বাভাবিকভাবেই হলওয়েল আপনাকে সমর্থন করতে চাইবেন।

অজস্র চিন্তা মীরকাশিমকে লেহন করতে লাগল।

খোজা পিক্রস কি সত্যই তাঁর উজ্জ্বল ভবিষ্যতের পথপ্রদর্শক হয়ে এসেছে? না তাকে মীরন পাঠিয়েছে তাঁর মনের গভীরতা পরিমাপ করতে। সুদূর রংপুরে বসে তিনি কোন ষড়যন্ত্র করছেন কিনা তা জেনে নিতে চান। মীরনের অসাধ্য কাজ নেই।

—কি চিন্তা করছেন জনাব?

—চিন্তা করছি তোমার আগমনের আসল উদ্দেশ্য কি?

—আমাকে সন্দেহ করছেন?

—তোমার চরিত্র কি সন্দেহ করার মতো নয়?

পিক্রস গম্ভীর কণ্ঠে বললো, আপনি আমাকে সন্দেহ করছেন, করুন। কিন্তু এই নষ্ট চরিত্র ব্যক্তিই আপনাকে তখ্ত পর্যন্ত বসাতে পারে জনাব।

—দীন দুনিয়ার অবস্থা ভাল নয়। তুমি যে প্রস্তাব নিয়ে এসেছো, সন্দেহ হওয়া স্বাভাবিক। আমি কি চিন্তা করতে পারি না, তোমাকে মীরন পাঠিয়েছে আমায় পরীক্ষা করবার জন্য।

—মীরন! ছোটে নবাব!!

—তুমি এই মাত্র বললে, নবাবের প্রতি ইংরেজ আর সন্তুষ্ট নয়। তারা আমাকে সমর্থন করতে চায়। প্রশ্ন হচ্ছে, আমাকে তারা সমর্থন করবে কেন মীরন থাকতে?

—ছোটে নবাব অত্যন্ত উদ্ধত প্রকৃতির। তাছাড়া ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর বিন্দুমাত্র সদ্ভাব নেই ইংরেজদের প্রতিটি কাজ তিনি সমালোচনা

করেন। তাদের অগ্রাহ্য করে চলেন। কাজেই হলওয়েল সাহেবের মনোভাব যদি আপনার অনুকূলে হয় তাতে তো বিস্ময়ের কিছু নেই। পিক্রুস একটু থেমে আবার বলতে আরম্ভ করল, আপনার জায়গায় আমি থাকলে, আমিও হয়তো সংবাদ দাতাকে অবিশ্বাস করতাম। স্বাভাবিক। একটি পথ অবলম্বন করলে সব দিক রক্ষা পায়।

—কোন্ পথ?

—আপনি আমাকে নজরবন্দী করে কলকাতায় নিয়ে চলুন। হলওয়েল সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর আমাকে মুক্তি দেবেন। এই ভাবে এগোলে আপনার সন্দেহ করবার কিছু থাকবে না।

মীরকাশিম প্রস্তাবটি বিবেচনা করে দেখলেন।

গ্রহণযোগ্য। বিপদ হওয়ার সম্ভাবনা কম।

তিনি বিলম্ব না করে কলকাতা যাত্রা করলেন তিনজন বিশ্বস্ত কর্মচারা তাঁর সঙ্গে রইল। তারা পিক্রুসকে পাহারা দিয়ে নিয়ে চলল। নবাবের আদেশ ছাড়া ফৌজদার ঘাঁটি ত্যাগ করতে পারে না। কিন্তু এই বিশৃঙ্খলার সময় নবাব এত খুঁটিনাটির উপর দৃষ্টি দিচ্ছেন না। তাছাড়া সুদূর রংপুরের ফৌজদার রংপুরে আছে কি অন্যত্র গেছে সে সংবাদ নবাবের কাছে কে পৌঁছে দিচ্ছে।

কলকাতা পৌঁছে মীরকাশিম হলওয়েলের গৃহে গেলেন না।

হলওয়েলও এলেন না মীরকাশিমের অস্থায়ী বাসস্থানে। দুজনের সাক্ষাৎ হল তৃতীয় একটি গৃহে। এই গৃহটি সাক্ষাৎপর্বর জন্যই সংগ্রহ করেছিলেন মীরকাশিম। সন্ধ্যার কিছু পূর্বে দুই খেলোয়াড়ের সাক্ষাৎ হল।

সৌজন্য বিনিময়ের পর হলওয়েল বললেন, খোজা পিক্রুসের মুখে আপনার মনোভাবের কথা শুনলাম।

মীরকাশিম বললেন, আমিও পিক্রুসের কথায় বুঝতে পেরেছি আপনার মনের ভাব।

হলওয়েল বললেন, রাজনৈতিক ব্যাপারে কোম্পানি জড়িয়ে পড়তে চায় না। কিন্তু পরিস্থিতি এমন দেখা দিয়েছে যে জড়িয়ে না পড়েও উপায় নেই। আপনি সমস্তই জানেন। মীরজাফরকে আমরা তখ্তে বসিয়েছিলাম দুটি কারণে। তিনি আমাদের স্বার্থ দেখবেন ও সুবে বাংলার প্রজাকে সুখে রাখবেন। নবাব দুটি বিষয়েই চরম ব্যর্থতা দেখিয়েছেন। এক্ষেত্রে—

অস্থায়ী গভর্নর আর কিছু বললেন না।

—এক্ষেত্রে আপনারা তাঁকে আর সমর্থন করতে চাইছেন না।

ঠিক তাই।

—এরপর কাকে আপনারা সমর্থন করবেন ?

হলওয়েল আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে পদচারণা করতে লাগলেন।

এক সময় বললেন, আপনাকে সমর্থন করা যেতে পারে।

মীরকাশিম বললেন নির্বিকার কণ্ঠে, আপনার কথায় সুখী হলাম। আপনারা আমায় সমর্থন করলে আমিও এগিয়ে যাব। তবে একটা কথা আপনাকে সর্বাগ্রে জানিয়ে রাখি সাহেব, একতরফা কোন কাজের আমি পক্ষপাতী নই। আপনারা আমার জন্য যেটুকু করবেন, আমিও আপনাদের জন্য তার চেয়ে বেশী কিছু করব না।

—বেশ তো, ওই ধরনের ভদ্রচুক্তি করে নেওয়া যাবে। আমরা অধিকারের বাইরে তো পা বাড়াই না।

মীরকাশিম দীর্ঘ লয়ে হাসলেন।

—বর্তমানে আপনারা যেখানে দাঁড়িয়ে আছেন, অধিকারের বাইরে পা না বাড়ালে সেখানে আপনারা পৌঁছাতে পারতেন না। মীরজাফরের সঙ্গে আপনাদের যে চুক্তি হয়েছিল, অক্ষরে অক্ষরে পালন করা তো দূরের কথা, তার একটি অনুচ্ছেদকেও আপনারা মান্য করেন নি।

হলওয়েল দেখলেন আলোচনা বাঁকা পথে মোড় নিচ্ছে।

প্রসঙ্গকে আবার তিনি নির্দিষ্ট পথে সরিয়ে আনলেন।

—ও সমস্ত প্রসঙ্গ নিয়ে এখন আলোচনা করে লাভ নেই। ধাপে ধাপে অগ্রসর হওয়াই ভাল। আপনি উপযুক্ত ব্যক্তি, অনুপযুক্ত ব্যক্তিকে ঠিক সরিয়ে আপনি মসনদ অধিকার করবেন এই হল প্রকৃত কথা। আর আমাদের কাজ হল এই মহৎ প্রচেষ্টায় সহযোগিতা করা। এখন বলুন সহযোগিতার মূল্য কত দেবেন?

—কত চান?

—কত দিতে পারেন?

—যত স্থির হবে তার চেয়ে একটি আশরফি আমি বেশী দিতে চাই না।

—বর্তমান নবাব কোম্পানিকে আশাতিরিক্ত ভাবে খুশী করেছিলেন।

—আমিও কোম্পানিকে অখুশী করব না। শুধু অর্থের পরিমান চুক্তি হওয়ার পূর্বে আমার জানা দরকার।

হলওয়েল বুঝতে পারলেন শক্ত প্রতিপক্ষের বিপক্ষে তিনি দণ্ডায়মান। তিনি কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, বলা হল না। পিত্রুস সেই কক্ষে উপস্থিত ছিল। এতক্ষণ কিছু না বলে নীরবে শুনে যাচ্ছিল তুজনের কথা। এবার বললে, আমার ধৃষ্টতা আপনারা ক্ষমা করবেন। একটি কথা না বলে আমি থাকতে পারছি না, যে প্রসঙ্গ নিয়ে আপনারা আলোচনা করছেন, সে আলোচনা করবার পূর্ব্বে চিন্তা করেছেন কি, নবাবের পর মীরনকে তখ্ত না দিয়ে অন্য কাউকে তখ্তে কিভাবে বসানো হবে?

খোজা পিত্রুসের এই তীক্ষ্ণ প্রশ্ন তুজনকেই সচেতন করে তুলল।

মীরন!

মীরনকে তাঁর অধিকার থেকে বঞ্চিত করা তো সহজ হবে না।

সুবে বাংলায় এমন কোন ইংরেজ নেই যে মীরনকে ঘৃণার দৃষ্টিতে দেখত না। হলওয়েল মহাক্রুদ্ধ তাঁর উপর। পলাশীর যুদ্ধের পর বিজয় উৎসবের দিন মীরন তাঁর মুখের গঠন নিয়ে বারংবার কটাক্ষপাত

করেছিলেন। একটি কুৎসিত বাঁদীকে উপহার দিয়ে বলেছিলেন, আজকের রাতে এর সঙ্গসুখে ধন্য হোন।

সেই অপমানের কথা হলওয়েল কোন দিন ভুলবেন না।

বললেন, মীরন কোন সমস্যাই নয়। সে কোনদিন যাতে তখ্‌তের দাবি নিয়ে আভ্যন্তরের সৃষ্টি যাতে না করতে পারে তার ব্যবস্থা আমি করব।

এরপর অনেক আলোচনা হল তিনজনের মধ্যে।

শেষে স্থির হল, হলওয়েল কোম্পানির সমস্ত কাউন্সিলারের মনে মীরকাশিম সম্পর্কে উচ্চ ধারণার ছায়া ফেলবেন। তাঁদের মনে বদ্ধমূল ধারণা করিয়ে দিতে হবে, এরকম যোগ্য ব্যক্তি সুবে বাংলায় দ্বিতীয় নেই। অর্থের তোড়ে কাউন্সিলারদের তিনি ভাসিয়ে দেবেন। এদিকে মীরকাশিমের রংপুরে আর থাকা চলবে না। মুর্শিদাবাদে এসে নিজেকে জনপ্রিয় করে তুলতে হবে নবাবী ফৌজের কাছে। ইত্যাদি অনেক বিষয়ে আলোচনা হল।

এই মন্ত্রণার কথা কিন্তু কারুর কর্ণগোচর হল না। না ইংরেজের না নবাবের।

জানল শুধু তিনজন। তিনটি নিজের নিজের স্বার্থ সম্পর্কে অতিমাত্রায় সচেতন ব্যক্তি।

এদিকে পূর্ণিয়ায় এক বিশ্রী কাণ্ড বাধিয়ে দিয়েছেন খাদেম হোসেন। মীরজাফর এত ঘটা করে সৈন্য সামন্ত দিয়ে যাকে পূর্ণিয়ার ফৌজদার করে পাঠিয়েছিলেন সেই খাদেম হোসেন নবাবকে সম্পূর্ণ অগ্রাহ্য করলেন। তিনি যে নবাবকে অগ্রাহ্য করছেন তার অসংখ্য প্রমাণ মুর্শিদাবাদে এসে পৌছাল।

মীরজাফরের দুর্ভাগ্য তিনি যার উপর নির্ভর করেছেন বা যাকে সাহায্য করেছেন পরে সেই ব্যক্তি তাঁকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করেছে।

খাদেম হোসেনকে ফৌজদার অবশ্য করেছিলেন অনন্যোপায় হয়ে। নবাবের প্রচুর অশান্তি ছিলই, সেই সমস্ত অশান্তির সঙ্গে আরেকটি অশান্তি যোগ হল।

খাদেমের যে বিরাট সাহস ছিল তা নয়, কিঞ্চিৎ বুদ্ধি ছিল। সেই বুদ্ধির জোরেই তিনি বুঝতে পেরেছিলেন, পূর্ণিয়ায় বসে তিনি হাজার আস্ফালন করুন না, দেউলিয়া নবাবের সাধ্য হবে না তাঁকে এসে দমন করবার। নবাবকে অগ্রাহ্য করেই খাদেম ক্ষান্ত হন নি, পূর্ণিয়ার অধিবাসীদের উপর অসম্ভব অত্যাচার চালিয়ে প্রচুর ধনরত্ন সংগ্রহ করে ফেললেন।

এই সমস্ত সংবাদ যখন মুর্শিদাবাদে পৌঁছাল, মীরন নীরব থাকা আর বাঞ্ছনীয় মনে করলেন না। তিনি নবাবকে বোঝালেন, খাদেম হোসেনের শাস্তির ব্যবস্থা না করলে, প্রত্যেক ফৌজদার খাদেমের পথ অনুসরণ করবে। তখন সেই জটিল পরিস্থিতিকে কোনক্রমেই আয়ত্তে আনা যাবে না।

নবাব মীরনকে আদেশ দিলেন খাদেম সম্পর্কে ব্যবস্থা অবলম্বন করতে। অবিলম্বে কৈফিয়ত তলব করা হল খাদেম হোসেনের কাছ থেকে। মুর্শিদাবাদ থেকে যে আদেশপত্র নিয়ে গিয়েছিল তার উপস্থিতিতেই আদেশপত্রটি অপঠিত অবস্থায় খণ্ড খণ্ড করে ফেলা হল। মীরনকে তীব্র অপমানসূচক ভাষায় খাদেম হোসেন জর্জরিত করে তুললেন।

উদ্ধত মীরন যা কোনদিন করেন নি সেই কাজ করতে বাধ্য হলেন এবার। নিজের সামর্থ্য না থাকায় ইংরেজ সেনাপতি কাউলর্ডকে সংবাদ পাঠালেন, তিনি খাদেম হোসেনকে দমন করতে তাঁর সঙ্গে সহযোগিতা করবেন কি না? আয়ারকুট দাক্ষিণাত্য থেকে আসতে না পারায় তাঁর স্থলে প্রধান সেনাপতির পদ দেওয়া হয়েছে কাউলর্ডকে। এই প্রস্তাব পেয়ে কাউলর্ড সানন্দে রাজী হলেন। মুর্শিদাবাদের বাইরে মীরনকে খুব কাছে পাওয়া তাঁর দরকার।

চতুর হলওয়েল কাজ এগিয়ে রেখেছিলেন।

কাউন্সিলারদের কাছে মীরকাশিমের কথা প্রথমে না তুলে মীরনের ঔদ্ধত্য এবং ইংরেজদের হেয়ো করার মনোভাবের কথা তুললেন। সকলেই একথা পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন, তাঁদের স্বেচ্ছাচারিতার প্রধান অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছেন মীরন। নবাবজাদা না থাকলে নবাবকে দিয়ে আরো অনেক কিছু করিয়ে নেওয়া যায়।

মনে মনে সকলেই একমত হলেন। কাউন্সিলে কোন প্রস্তাব গ্রহণ করা হল না। তবে মীরন বেঁচে থাকার অধিকার হারালেন। কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিতে এক অলিখিত আদেশপত্র পৌঁছাল। তবে মীরনের নাগাল পাওয়া সহজ নয়। তিনি ইংরেজদের সযত্নে এড়িয়ে চলেন। তাছাড়া এক নাটকীয় পরিস্থিতির মধ্যে ঘটনাটি সংঘটিত হওয়ার পক্ষপাতী ইংরেজ। তাঁরা স্বাভাবিকভাবেই ধরা ছোঁয়ার বাইরে থাকতে পারবেন।

সুযোগ এল এতদিন পরে।

কাউলর্ড মীরনের প্রস্তাবে সমর্থন জানিয়ে সসৈন্যে যাত্রা করলেন। নবাবজাদার সঙ্গে মিলিত হলেন রাজমহলে। ঘটনা অসম্ভব গম্ভীর রূপ নিচ্ছে দেখে খাদেম হোসেন পূর্ণিয়ায় অপেক্ষা করা আর যুক্তিযুক্ত মনে করলেন না। ধনরত্ন যা ছিল সমস্ত নিয়ে মোগল বাদশাহ শাহ আলামের আশ্রয়ে চললেন।

শাহ আলাম এখন নামেই হিন্দুস্থানের বাদশাহ। কোন প্রান্তের কোন ব্যক্তি তাঁকে মান্য করে চলে না। দিল্লীর তখ্‌তে যে তিনি বসতে পেয়েছেন তাও নয়। তবে সেই কণ্টকপূর্ণ তখ্‌তকে পরিচ্ছন্ন করে তাতে তিনি একদিন বসবেনই এই ধারণায় তিনি দৃঢ়। প্রথমে সুবেদারদের দমন করার কাজ তিনি হাতে নিয়েছেন। তাদের শায়েস্তা করে রাখলে পরবর্তী কালে অনেক গোলমালকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব হবে

বর্তমানে শাহ আলামের ইচ্ছা বঙ্গ বিজয় করা। প্রচুর সৈন্য সামন্ত নিয়ে তিনি পাটনায় উপস্থিত হয়েছেন। পাটনায় তাঁর আগমন সংবাদ পেয়েই খাদেম হোসেন চলেছেন তাঁর আশ্রয়ে।

মীরন ও কাউলর্ড তাঁকে বাধা দিলেন গণ্ডকের তীরে।

প্রচণ্ড যুদ্ধ হল।

খাদেম হোসেন সুবিধা করতে পারলেন না। তাঁর পরিশ্রান্ত অসংখ্য সৈন্য যুদ্ধ ক্ষেত্রের মাটি লাল করে তুলল। আর বীরত্ব প্রদর্শন করতে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ নয়। তিনি রণে ভঙ্গ দিলেন। গোলা, গুলি, কামান ফেলে রেখে হীরা জহরত উটের পিঠে বোঝাই করে খাদেম হোসেন নেপালের তরাই অঞ্চলের দুর্ভেদ্য অরণ্যের মধ্যে মিলিয়ে গেলেন।

মীরন ও কাউলর্ড বহু চেষ্টা করেও তাঁর সন্ধান পেলেন না। খাদেমের জন্য তাঁদের বিশেষ চিন্তা ছিল না। তাঁরা হা হুতাশ করতে লাগলেন হীরা জহরতের জন্য। বিপুল ঐশ্বর্য একটুর জন্য তাঁদের নাগালের বাইরে চলে গেল।

গণ্ডকের তীরে যখন হা হুতাশ চলছে, মুর্শিদাবাদের অবস্থা তখন অন্যরকম। যে অর্ধেক সৈন্য রাজধানীতে ছিল তারা পাওনার দাবিতে প্রাসাদ ঘিরে ফেলল। ভীত মীরজাফর অন্দরমহলে আশ্রয় গ্রহণ করলেন। সৈন্যদের মুখপাত্র হয়ে দৌলত খাঁ নবাবের কাছে সংবাদ পাঠাল, জাহাঁপনা তাদের পাওনা অবিলম্বে না মিটিয়ে দিলে তারা নগরে লুণ্ঠন আরম্ভ করবে। অসহায় মীরজাফর লুণ্ঠনের হাত থেকে নগরকে রক্ষা করার কোন পথ দেখতে পেলেন না। মীরনের অনুপস্থিতি অনুভব করতে লাগলেন তীব্রভাবে। ছোটে নবাব মুর্শিদাবাদে উপস্থিত থাকলে, এই মারমুখী সৈন্যদের কোন প্রকারে নিশ্চয় শান্ত করতে পারতেন।

অনেক চিন্তার পর মীরজাফর স্থির করলেন, তিনি সৈন্যদের কাছে

উপস্থিত হয়ে, অনুনয় করে আরো কিছুদিন সময় চেয়ে নেবেন—এই অবসরে ছোটে নবাবও এসে পড়বেন মুর্শিদাবাদে। তারপর যা হয় স্থির করা যাবে।

বাধা দিলেন মণিবেগম।

বললেন, সৈন্যদের কাছে যাওয়া বুদ্ধিমানের কাজ হবে না জাহাঁপনা।

—এ ছাড়া আর তো কোন পথ নেই বেগম।

—ওরা আপনাকে অপমানিত করতে পারে।

—এতে ধৃষ্টতা প্রকাশ করবার সাহস ওদের হবে না।

মণিবেগম বৃদ্ধের কথায় অবজ্ঞার হাসি হাসলেন।

—ধৃষ্টতা প্রকাশ করতে ওরা তো কুণ্ঠিত হয়নি জাহাঁপনা। প্রাসাদ ঘিরে ফেলে তারা অকথ্য ভাষায় জাহাঁপনাকে গালিগালাজ করে চলেছে। ওদের এই কার্য-কলাপকে নিশ্চয় আপনি নতুন আখ্যা দিতে পারেন না? এই সময় ওদের কাছে গেলে আপনার প্রাণ সংশয় পর্যন্ত হতে পারে।

মণিবেগমের যুক্তিপূর্ণ কথাকে উপেক্ষা করতে পারলেন না মীরজাফর। নিজের জীবনকে অত্যন্ত ভালবাসেন নবাব। মৃত্যুকে আহ্বান করার কোন যুক্তিও নেই তাছাড়া। সুতরাং নিজের ইচ্ছাকে বাতিল করে দিলেন। তখনও একটানা চলেছে প্রবল হট্টগোল ও অশ্রাব্য গালাগালি।

হঠাৎ সমস্ত গোলমাল থেমে গেল।

পরিপূর্ণ নিস্তব্ধতা বিরাজ করতে লাগল।

কি হল? সৈন্যরা কি নগর লুণ্ঠন করতে গেল? তাদের তো সকলরবে যাবার কথা। হঠাৎ এই নীরবতার নিশ্চয় কোন বলিষ্ঠ কারণ আছে। মণিবেগম জানালার ধারে গিয়ে দাঁড়িয়েছিলেন। নবাব উদ্বিগ্ন মনে গিয়ে সেখানে দাঁড়ালেন তাঁর পাশে। যা দেখলেন তা রীতিমতো বিস্ময়কর।

প্রাসাদের সম্মুখে কয়েক দলে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়িয়েছে সৈন্যরা। মীরকাশেমের নির্দেশে দৌলত খাঁ তাদের অর্থ বিতরণ করছে। সমস্ত সৈন্যের মধ্যে অর্থ বিতরিত হবার পর, তারা শান্তিপূর্ণভাবে স্থান ত্যাগ করল। মীরকাশিম অপেক্ষমান শিবিকায় গিয়ে বসলেন।

মণিবেগম হতবুদ্ধি নবাবের দিকে তাকিয়ে বললেন, মীরকাশিমের সম্পর্কে আমার ধারণা বদলে গেল। সে অত্যন্ত চতুর ব্যক্তি।

—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না বেগম ?

—আপনি তো চোখের উপরই দেখলেন, মীরকাশিম সৈন্যদের পাওনা মিটিয়ে দিল।

—তা দেখলাম। আমাকে সাহায্য করতে পারবে না জানিয়েও, আবার সৈন্যদের পাওনা কেন মিটিয়ে দিল বলতো ?

—পাওনা মিটিয়ে দিয়ে সে নিজের ভুলকে সামলে নিল জাহাঁপনা। যে কোন বুদ্ধিমান ব্যক্তি এই কাজই করতো।

—তুমি বলতে চাও কোন বড় পদ লাভ করার জন্য সে এই কাজ করল। কিন্তু আমি তো পূর্বেই তার কাছে প্রস্তাব দিয়েছিলাম, সে অর্থের অস্বচ্ছলতার অজুহাতে আমাকে এড়িয়ে গিয়েছিল।

মণিবেগম জানলার কাছ থেকে সরে এসে বললেন, তখন এড়িয়ে গিয়েছিল তারপরই চিন্তা করে দেখেছে, বড় পদ অধিকারে থাকলে সুবিধা অনেক। অর্থ এবং পদমর্যাদা দুই লাভ করা যায়। ভুল শুধরে নিতে তাই বিলম্ব করে নি। আমি জাহাঁপনাকে পূর্বেই বলেছি, এরা লোভা জানোয়ার।

—সে যাই হোক বেগম, সে আমাকে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলবার অবকাশ দিয়েছে এও কম বড় কথা নয়। আমি আজই মীরকাশিমকে আহ্বান করে দরবারের কোন্ পদটি তার পছন্দ জেনে নেব।

—আহ্বান করার কোন প্রয়োজন নেই জাহাঁপনা। সে নিজেই আসবে। সৈন্যদের পাওনা মিটিয়ে দেওয়ার বিষয় নিয়ে মণিবেগম ও মীরজাফর

যে অর্থই করুক না কেন, প্রকৃত অর্থ তার বিপরীত। সৈন্যদের প্রাসাদ ঘিরে ফেলার সংবাদ মীরকাশিম পেলেন প্রায় সঙ্গে সঙ্গে। এই সুবর্ণ সুযোগকে হাতছাড়া হতে দিলে না। সৈন্যবাহিনীতে জনপ্রিয় হবার এর চেয়ে বড় সুযোগ ভবিষ্যতে নাও আসতে পারে। তিনি কয়েকজন বিশ্বস্ত অনুচর ও অর্থ নিয়ে ঘটনাস্থলে পৌছালেন। তখন সেখানে চরম বিশৃঙ্খলা চলেছে।

মীরকাশিম বিশৃঙ্খলা উপভোগ করলেন কিছুক্ষণ।

তারপর দৌলত খাঁকে আহ্বান করে বললেন, পাওনা আমি মিটিয়ে দেব। কত টাকা পাওনা আছে আমায় জানাও।

দৌলত খাঁ অবাক্। অবশ্য অবিলম্বে সে নিজেকে সামলে নিল। পাওনা নবাব মিটিয়ে দিন বা তাঁর জামাতা মিটিয়ে দিন, কিছু যায় আসে না তাতে। পাওনা মিটে গেলেই হল। এত বড় সুসংবাদ পেয়েও দৌলত খাঁ ফাঁপরে পড়ে গেল। ব্যক্তিগতভাবে সকলেই নিজের নিজের পাওনার কথা জানে, সমস্ত মিলিয়ে টাকার অঙ্ক কত সে সংবাদ কারুর জানা নেই।

অবিলম্বে হিসেবপত্র হল।

মীরকাশিম নগদ তিনলক্ষ টাকা গুণে দিলেন।

এক চালেই অসণ্ডা জনপ্রিয় হয়ে উঠলেন সৈন্যবাহিনীতে।

কাউলর্ড আর গোরা পল্টনের সঙ্গে মীরন ফিরে আসছেন।

মীরনের মনের অবস্থা ভাল নেই। খাদেম হোসেনকে দুনিয়া থেকে বিদায় দিতে পারেন নি, এই দুঃখের চেয়ে বড় দুঃখ হল তার বিপুল ধন-রত্ন হস্তগত হল না।

সৈন্যরা শ্রান্ত হয়ে পড়েছিল। মীরনের সঙ্গে পরামর্শ করে কাউলর্ড বিশ্রামের আদেশ দিলেন। অসংখ্য তাঁবু পড়ল। সৈন্যরা বিশ্রামের

সুযোগ পেয়ে স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল। কয়েকটি সুন্দরীকে মুর্শিদাবাদ থেকে সঙ্গে নিয়ে এসেছিলেন মীরন। এরা না থাকলে যুদ্ধ করার উৎসাহ তিনি পেতেন না।

বিশ্রামের জন্য এখানে যাত্রা ভঙ্গ করার পর নতুনত্বের স্বাদ পাবার জন্য মীরন ব্যস্ত হয়ে পড়লেন। মুর্শিদাবাদ থেকে সঙ্গে করে আনা সুন্দরীদের আর ভাল লাগছে না। অনুচরের। শিকারের সন্ধানে বেরুল। টাকা ছড়ালে অনেক অসম্ভব সম্ভব হয়।

সুতরাং দুস্ট পণ্যা নারীকে সংগ্রহ করা যাবে এ আর বিচিত্র কি।

মীরন সিরাজী সহযোগে কামনার সাগরে অবগাহন করতে লাগলেন।

দিনের আলোর শেষ রেশকে গ্রাস করে তখন সন্ধ্যা নেমেছে। আকাশে ইতস্তত ছড়িয়ে থাকা মেঘও একত্রিত হয়েছে সেই তালে পা মিলিয়ে। গুমগুম শব্দে বৃষ্টির আগমন বার্তা ঘোষিত হতে লাগল।

বিদ্যুৎ ঝলসে উঠছে এখানে ওখানে।

ঝড় এল বলে।

কাউলর্ড তাঁবু থেকে বেরিয়ে আকাশের দিকে তাকালেন। তাঁর মুখের অবস্থাও আকাশের মতো থমথমে। তিনি আকাশের দিক থেকে মুখ নামালেন মীরনের উচ্চ হাসি শুনে। নবাবজাদা নিজের তাঁবুতে নর্ম সহচরীদের কথায় বোধহয় হাসির ফোয়ারা তুললেন।

কাউলর্ডের পাশে এসে দাঁড়িয়েছিল টিলি।

সতৃষ্ণ নয়নে মীরনেব তাঁবুর দিকে তাকিয়ে বললে, নবাবজাদা খুব ভাল ভাবেই সময় কাটাচ্ছেন।

কাউলর্ড অর্থপূর্ণ ভাবে হাসলেন।

—কাটাতে দাও। একটি রাত বইতো নয়।

টিলি সচকিতভাবে তাঁর দিকে তাকাল।

—বৃষ্টি আসছে। ঝড়ও উঠবে। ভালই হল, অবস্থা বিপাকে পড়লে অজুহাতের অভাব হবে না। টিলি—

—বলুন কর্নেল?

—কাউপার মীলার আর রবার্টের বোধহয় এতক্ষণ রাতের আহার শেষ হয়েছে। আমি তাঁবুতে অপেক্ষা করছি। ওদের সঙ্গে নিয়ে এস।

কাউলর্ড তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করলেন।

অল্প সময়ের মধ্যে টিলি তিনজনকে সঙ্গে নিয়ে ফিরে এল। কর্নেলের ইঙ্গিতে চারজন আসন গ্রহণ করল। কাউলর্ড কিছুক্ষণ পদচারণা করবার পর বললেন, তোমরা শ্রান্ত আমি একথা জেনেও আজ রাত্রে তোমাদের বিশ্রাম নেবার অনুমতি দিতে পারছি না।

ভ্রূ কুঁচকে চারজন বসে রইল।

বাইরে তখন বৃষ্টি নেমেছে। ঝড়ও আরম্ভ হয়ে গেছে।

আমাদের কাজের সুবিধার জন্যই বোধহয় এই দুর্যোগ আরম্ভ হল। তোমাদের উপর যে কর্তব্য ন্যস্ত হবে, এমনভাবে সমাধা করবে যাতে কোন রকম ফাঁকি ধরা না পড়ে।

কাউপার বললে, আমরা প্রস্তুত আছি কর্নেল। কি করতে হবে এখন বুঝিয়ে দিন।

কাউলর্ড তাঁবুর পর্দা সরিয়ে দিলেন।

আঙ্গুল নির্দেশ করে বললেন, ওই আলো ঝলমল তাঁবুতে নবাবজাদা দুটি নারীকে নিয়ে নারকীয় লীলা করছেন। উনি জানেন না নিজের জীবনের শেষ রাত্রি উনি অতিবাহিত করছেন। কাল সূর্যোদয় দেখবার অবকাশ আর পাবেন না। কর্নেলের কথা শুনে চারজন ঝটিতে উঠে দাঁড়াল।

কাউলর্ড হাসলেন।

—তোমাদের জায়গায় আমি থাকলে আমিও অবাক্ হতাম। যা হোক, কেন এই ঘটনা ঘটতে চলেছে সে সম্পর্কে আমরা আগ্রহ প্রকাশ করব না। কর্তৃপক্ষের নির্দেশ মান্য করে চলাই হল আমাদের কর্তব্য। কাউপার—

—আমি যা বললাম তার অর্থ নিশ্চয় পরিষ্কার বুঝতে পেরেছো? আমি এখন নিজের তাঁবুতে ফিরে যাচ্ছি। কাউপার, কার্যোদ্ধার হয়ে গেলে সংবাদটি আমায় জানিয়ে আসবে। অত্যন্ত সাবধানতা অবলম্বন করবে তোমরা। নবাবজাদার কোন অনুচর কোন রকম সন্দেহ যেন করতে না পারে।

কাউলর্ড তাঁবু থেকে নিক্রান্ত হলেন।

স্বল্পালোকিত তাঁবুর মধ্যে চারজন পদস্থ ইংরেজ পুরুষ সম্পূর্ণ নীরব রইল কিছুক্ষণ।

নীরবতা ভঙ্গ করল টিলি।

—সময় নষ্ট না করে আমরা পরিকল্পনা স্থির করে নিতে পারি এখন।

বাকী তিনজন টিলির কথা সমর্থন করল।

আলোচনার মাধ্যমে স্থির হয়ে গেল কি ভাবে মীরনকে হত্যা করা হবে। এরপর প্রশ্ন উঠল প্রথম আঘাত হানবে কে? ব্যক্তিগতভাবে মীরনের প্রতি চারজনই বিদ্বেষভাবাপন্ন। সময়ের ব্যবধানে মীরন এদের প্রত্যেককেই অপমানিত করেছেন অতি তুচ্ছ কারণে। কাজেই প্রত্যেকেই প্রথম আঘাত হানবার জন্য ব্যস্ত।

শেষে স্থির হল লটারি করে নেওয়া হোক।

লটারির জন্য এক বিচিত্র উপায় অবলম্বন করা হল। চারটি মোমবাতি জ্বালানো হল।

চারজন খাপ থেকে তলোয়ার খুললেন। মোমবাতি কেটে ফেলার ব্যাপারে যে সবচেয়ে বেশী পারদর্শিতা দেখাতে পারবে, মীরনকে প্রথম আঘাত করবার অধিকার লাভ করবে সে।

কিছু কিছু ব্যবধানে চারটি মোমবাতি জ্বলছে।

কাউপার সতর্কতার সঙ্গে তলোয়ার চালাল। একটি মোমবাতি দ্বিখণ্ডিত হয়ে তাঁবুর এক ধারে গিয়ে পড়ল।

এবার টিলি। সে দীর্ঘকায় ব্যক্তি, ঝুঁকে অস্ত্র হানল। খণ্ডিত হল না মোমবাতি।
মচকানো অবস্থায় সেখানেই পড়ে রইল।
মীলার দুই সঙ্গীর অস্ত্রচালনা একাগ্রভাবে লক্ষ্য করেছিল। সে সবেগে হাত ঘোরাল। মোমবাতি কাটল না। জ্বলন্ত অবস্থায় তাঁবুতে গিয়ে আঘাত করল।
সতর্ক না থাকলে আগুন ধরে যেত তৎক্ষণাৎ।
রবার্ট ব্যস্ততা প্রকাশ করল না। মোমবাতিটি ভাল করে দেখে নিয়ে অত্যন্ত ধীরে অস্ত্র চালাল। তিনজনে লক্ষ্য করল মোমবাতি কাটল না। জ্বলন্ত অবস্থায় খাড়া রইল আগেকার মতো।
টিলি বলল, আঘাত করার প্রথম অধিকার তাহলে কাউপারকেই দিতে হয়। আমাদের চারজনের মধ্যে একমাত্র সে মোমবাতি ভালভাবে কাটতে পেরেছে।
রবার্ট বললো, এ কথার আমি প্রতিবাদ করছি। মোমবাতি কাটায় যদি কেউ পারদর্শিতা দেখিয়ে থাকে তবে সে একমাত্র আমি।
—তুমি !!!
সকলে অবাক্।
কাউপার বললো, তুমি তো মোমবাতি কাটতেই পার নি। এখনও জ্বলছে। —আমার বাহাদুরী ওখানেই। মোমবাতি জ্বলছে ঠিকই তবে কাটা অবস্থায়।
মীলার জ্বলন্ত মোমবাতিটি পরীক্ষা করতেই রবার্টের কথার সত্যতা প্রমাণিত হল। মোমবাতি দ্বিখণ্ডিত হয়েছে কিন্তু পড়ে না গিয়ে পূর্বের মতো জ্বলছে। তিনজনে রবার্টের প্রশংসায় ভেঙে পড়ল।
তখনও ঝড় ও জলের মাতামাতি একই ভাবে।

রাত্রি গভীর হয়েছে।

ঝড়ও ও জলের বিরাম নেই।

নিদ্রার কোলে ঢলে পড়েছে বহু পূর্বেই কয়েক সহস্র গোরা পল্টন ও দেশী সৈন্য। মীরনের আলো ঝলমল তাঁবুতে অন্ধকার নেমেছে। সিরাজীমত্ত, নারীমাংস লোলুপ নবাবজাদা সুপ্তির আশ্রয় গ্রহণ করেছেন বোধহয়।

চারটি ছায়ামূর্তি মীরনের তাঁবুর কাছে এসে দাঁড়াল। বিদ্যুতের আলোয় তাদের চিনে নিতে কষ্ট হয় না। টিলি, কাউপার, মীলার আর রবার্টস। তারা সন্তর্পণে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করল। অন্ধকার। কিছুই দৃষ্টিগোচর হচ্ছে না। অন্ধকারের মধ্যে কয়েক পা এগিয়ে যাবার পর পালঙ্কের সন্ধান পাওয়া গেল। টিলি বাহু স্পর্শ করল রবার্টসের। রবার্টস অনুমানের উপর নির্ভর করে অস্ত্র চালাল।

অস্ত্র চালিয়েই বুঝতে পারল শয্যায় কেউ নেই। দ্রুতপায়ে পিছনে সরে, তাঁবুর পর্দা সরিয়ে দিতেই বিদ্যুতের আলোয় দেখা গেল শয্যায় মীরন নেই। চারজনের চোখে বিস্ময়ের ঢল নামল। কোথায় গেল তাদের শিকার? ধূর্ত মীরন চক্রান্ত ধরে ফেলেছেন নাকি?

চারজনে তাঁবু থেকে বেরিয়ে একটি গাছতলায় গিয়ে দাঁড়াল।

চাপাগলায় পরামর্শ আরম্ভ হল।

মীলার বললো, চক্রান্ত ফাঁস হওয়া অসম্ভব। আমরা পাঁচজন ছাড়া কারুর পক্ষে এই সমস্ত কথা জানার উপায় নেই। আমার ধারণা খাম-খেয়ালী নবাবজাদা অন্য কোন তাঁবুতে আশ্রয় নিয়েছে।

অসম্ভব নয়। চক্রান্ত ফাঁস হয়ে গেলে চুপচাপ বসে থাকবার পাত্র নয় মীরন। এতক্ষণ দেশী সৈন্যদের নিয়ে প্রচণ্ড গোলমাল বাধিয়ে দিতেন। দু'দশটা গোরাপল্টনের প্রাণ যাওয়াও অস্বাভাবিক ছিল না। সে রকম ঘটনা যখন ঘটে নি তখন ধরে নিতে হবে চক্রান্ত ফাঁস হয় নি। খাম-খেয়ালীপনার জন্যই হোক বা অন্য কোন কারণে জন্যই হোক, মীরন অন্যত্র আশ্রয় গ্রহণ করেছেন।

হঠাৎ টিপি বললে, আমি বুঝতে পেরেছি নবাবজাদা কোথায় আছেন।
—কোথায় ?
—ওই দিলির খানি পালে।
গাছটির দক্ষিণ দিকের একটি ছোট তাঁবুর দিকে অঙ্গুল নির্দেশ করল। ওই দিলির খান পালটি খাটানো হয় কাউলর্ডের জন্যে। ছোট তাঁবুতে থাকার অনেক অসুবিধার কথা চিন্তা করে তিনি অন্য তাঁবুতে উঠে যান। দিলির খানি পালটি খালি পড়ে আছে সে কথা সকলেই জানে। এখন ওর মধ্যে থেকে আলোর আভা বেরুচ্ছে দেখে নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া যায়, ওখানে মীরন আছেন। কারণ অন্য কারুর এত সাহস হবে না যে, কাউলর্ডের জন্য নির্দিষ্ট তাঁবুতে গিয়ে রাত কাটাবে।
ওরা দিলির খানি পালের দিকে অগ্রসর হল।
বজ্রপাত হল কোথায়।
দিলির খানি পালের মধ্যে মীরন নিদ্রিত ছিলেন।
ক্লান্ত থাকার দরুন নারী দুটির সঙ্গসুখ খুব বেশীক্ষণ উপভোগ করেন নি। তাদের বিদায় করে দেবার কিছুক্ষণ পর ঝড়ের বেগ আরো প্রবল হল। বড় তাঁবুটি উড়ে যাবার সম্ভাবনা আছে দেখে তিনি দিলির খান পালে চলে এলেন।
তাঁবুটি ছোট এবং বিশেষ কায়দায় বাঁধা। উড়ে যাবার কোন সম্ভাবনাই নেই।
মীরন দিলির খান পালে একা আসেন নি, দুজন অনুচরকে সঙ্গে এনে ছিলেন।
মীরণ নিদ্রিত হয়ে পড়লেও, তারা নিদ্রা যায় নি। সতর্কতার সঙ্গে নবাবজাদাকে পাহারা দিচ্ছিল।
হঠাৎ চারজন ইংরেজকে তাঁবুর মধ্যে প্রবেশ করতে দেখে অনুচর দুজন হতভম্ব। তারপর—তারপর আর কিছু করবার ছিল না। হতভম্ব

মুহূর্তেই মীলার আর টিলি তাদের উপর ঝাঁপিয়ে পড়েছে। অল্প শব্দ তুলে ধস্তাধস্তি হলেও মীরনের নিদ্রা ভঙ্গ হল।

তিনি ভয়ার্ত চোখে পরিস্থিতি হৃদয়ঙ্গম করবার চেষ্টা করতে লাগলেন।

তাঁর গলা চিরে বেরিয়ে এল, একি—তোমরা এখানে কেন—

অনুচর দুটির রক্তাক্ত দেহ ছেড়ে এতক্ষণে উঠে দাঁড়িয়েছে টিলি আর মীলার।

মীরনের আতঙ্কিত কণ্ঠ থেকে তখন আর্ত আস্ফালন ঝরে পড়ছে।

—বেরিয়ে যাও—তোমরা বেরিয়ে যাও এখান থেকে—

আর তিনি কিছু বলতে পারলেন না। রবার্টসের অস্ত্র তাঁর দেহ ভেদ করল। মুহূর্তের মধ্যে শয্যার উপর পড়লেন মীরন। ভলকে ভলকে রক্ত বেরিয়ে আসতে লাগল। আরো দুবার আঘাত এসে পড়ল তাঁর দেহে। তিনি দুহাত বাড়িয়ে কিছু ধরবার চেষ্টা করলেন। তারপর মীরজাফরের নয়নপুত্তলী ছোটে নবাব চিরদিনের মতো স্থির হয়ে গেলেন।

বাইরে তখন মুহুর্মুহুঃ বজ্রাঘাত হচ্ছে।

বৃষ্টি ও ঝড়ের প্রলয় নাচন অব্যাহত।

নবাবী সৈন্যদের নিদ্রাভঙ্গের পূর্বেই কাউলর্ড তাদের সৈন্যাধক্ষ্যদের আহ্বান করলেন। বজ্রাঘাতে মীরনের মৃত্যু হওয়ার সংবাদ তাদের জ্ঞাপন করা হল। তারা দেখল দিলিরখানি পাল অর্ধদগ্ধ। ধোঁয়ার কুণ্ডলী উঠছে তখনও তা থেকে। মীরনের মৃতদেহ অন্য একটি তাঁবুতে এনে ইংরেজরা রেখেছে। মৃতদেহটি কাপড় দিয়ে আচ্ছাদিত। শুধু মুখের উপর কোন আবরণ নেই।

মীরনের অপ্রত্যাশিত মৃত্যুতে নবাবী ফৌজের সেনাপতিরা বিহ্বল হয়ে পড়ল। তখন তাদের এটুকু চিন্তা করবার ক্ষমতা ছিল না যে,

নবাবজাদার মৃত্যু বজ্রাঘাতে নাও হয়ে থাকতে পারে। একজন তৎক্ষণাৎ রওয়ানা হয়ে গেল মুর্শিদাবাদে নবাবকে সংবাদ দেবার জন্য। এই বিহ্বলতার মধ্যেই সমস্ত কিছু করে নিলেন কাউলর্ড।

ছাউনি তোলবার আদেশ দেওয়া হল। ঢাকা অবস্থায় মীরনের মৃতদেহ তোলা হল হাতির পিঠে। বিষণ্ণভাবে সৈন্যরা কুচকাওয়াজ আরম্ভ করল। রাজমহলে পৌঁছে মীরনকে সমাধিস্থ করা হল। কাউলর্ড সকলকে বুঝিয়ে দিলেন, মৃতদেহে পচন আরম্ভ হয়েছে। মুর্শিদাবাদে বয়ে নিয়ে যাওয়া কোনমতেই সম্ভব নয়। সুতরাং রাজমহলে সমাধিস্থ করাই বাঞ্ছনীয়।

যে মীরনের মৃত্যু সংবাদ নিয়ে রওয়ানা হয়েছিল, সে মুর্শিদাবাদে পৌঁছাল গভীর রাত্রে। নবাব এখন নিদ্রিত। অথচ এই সংবাদ পরে জানাবার মত নয়। রাত্রে যে কোন উপায়ে প্রাসাদের কাউকে জানাতেই হবে। সংবাদদাতা প্রাসাদ রক্ষীদের এই দুঃসংবাদ জানিয়ে নিজের কর্তব্য শেষ করল।

মীরজাফর মণিবেগমকে নিজের বাহুপাশে বেঁধে নিদ্রার ঘোরে স্বপ্ন দেখছিলেন। দ্বারে প্রচণ্ড করাঘাত হওয়ায় নিদ্রাভঙ্গ হল। মণি-বেগমও শয্যায় উঠে বসলেন। কার এত স্পর্ধা, এইভাবে করাঘাত করছে দ্বারে ?

মণিবেগম বিরক্তি ও ক্রোধে ভ্রূভঙ্গী করলেন।

শয্যা থেকে নেমে দ্বার উন্মুক্ত করলেন তিনি।

অলিন্দে দাঁড়িয়ে রয়েছে রোরুদ্যমানা সাখান্নম বেগম।

মীরন ও ফতেমার গর্ভধারিণী।

মারজাফর নিজের প্রায় ভুলে যাওয়া পত্নীকে এই মধ্যরাত্রে নাটকীয় ভাবে উপস্থিত হতে দেখে বিলক্ষণ বিরক্ত হলেন। তাঁর ধারণা

হল, কোন অভাব পুরণ করানোর জন্য বোধহয় মায়া কান্না কাঁদতে এসেছে।

তাব্রকণ্ঠে মণিবেগম বললে, কি চাই আপনার? কেন এসেছেন এই অসময়ে বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটাতে?

কান্না জড়িত তীক্ষ্ণ কণ্ঠে সাখান্নম বললেন, তুই চিরবিশ্রাম নিতে পারিস না বেজন্মাত নাচওয়ালী।

মণিবেগম স্তব্ধ হয়ে গেলেন।

তাঁর মুখের উপর কেউ এভাবে কথা বলতে পারে তা কল্পনার অতীত। বিশেষ করে জীর্ণবস্ত্রের মতো নবাব যাকে ত্যাগ করেছেন। যার বাসস্থান এখন প্রৌঢ়া বাঁদীদের মধ্যে নির্দিষ্ট। সে এত সাহস সংগ্রহ করল কোথা থেকে?

নবাব গর্জে উঠলেন, সাখান্নম—

কান্নায় ভেঙে পড়লেন সাখান্নম বেগম।

—ওই নাচওয়ালা আমাদের জীবনের শনি। যবে থেকে ও এসেছে, আপনার জীবনের সব শান্তি নষ্ট হয়ে গেছে। দুর্ভাগ্য জড়িয়ে ধরেছে। ওকে দূর করে দিন।—মীরন—আমার মীরন আর নেই জাহাঁপনা—

নবাব চীৎকার করে উঠলেন।

—কি বললে,—কি বললে তুমি?

কণ্ঠ বুজে গেছে সাখান্নম বেগমের।

আপ্রাণ চেষ্টা করেও তিনি কান্নার বেগ সামলাতে পারছেন না।

—বল—বল বেগম?

—মীরন..........

—কি হয়েছে ছোটে নবাবের?

—সে নেই—সে আমাদের ছেড়ে চলে গেছে জাহাঁপনা।

—না, না—অসম্ভব—। তুমি মিথ্যে কথা বলছো—নিজের ঈর্ষাকে চাপতে না পেরে আমাকে আঘাত দিয়ে প্রতিশোধ নেবার চেষ্টা করছো

অসংলগ্নভাবে কথাগুলি বলতে বলতে নবাব অলিন্দে এলেন।

—কে আছে—সওকত—নাজাম—

দেহরক্ষী খোজারা কুর্নিশ করে এসে দাঁড়াল।

—ছোটে নবাবের কোন সংবাদ তোমরা জান?

তারা নতমুখে নীরব রইল।

—নাজাম, তোমরা নীরব কেন?

—জাহাঁপনা—

—বল—বল—

—হজরত—

—কেন ইতস্তত করছো? বল, কি হয়েছে আমার ছোটে নবাবের?

নাজাম নিজের আড়ষ্টভাব কাটিয়ে, অসীম বলে সাহস সংগ্রহ করে বললে, তাঁকে রাজমহলে মাটি দেওয়া হয়েছে জাহাঁপনা।

মীরজাফর টলে পড়লেন একটি স্তম্ভের উপর।

—কি বললে, মাটি দেওয়া হয়েছে! আমার ছোটে নবাব নেই? উঃ আল্লাহ্—

নবাব পড়ে যেতে খোজারা ত্রস্ত হয়ে উঠল।

মণিবেগম দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলেন।

—আমি সমস্ত হারিয়ে ফেললাম মণিবেগম। বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি আল্লাহ্ আমায় দিয়েছেন। ইয়া পারবরদিগার আমায় তুলে নাও, আমার ছোটে নবাবের কাছে আমায় যেতে দাও।

নবাব মীরজাফর শিশুর মতো আকুল হয়ে কান্নায় ভেঙে পড়লেন।

বৃদ্ধকে সান্ত্বনা জানাবার কোন ভাষা নেই। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব পুত্র শোকে হাহাকার করছেন—স্তব্ধভাবে সকলের করুণ নয়নে এই হৃদয় বিদারক দৃশ্য অবলোকন করা ছাড়া উপায় নেই।

সাখান্নম ও বিলাপ করছেন।

পুত্রশোকা নারীর বিলাপ আরো হৃদয় বিদারক।

মীরনের মৃত্যুর পর পক্ষকাল অতীত হয়েছে।

হঠাৎ ভ্রাতৃবিয়োগে অত্যন্ত শোক পেলেন ফতেমা। মীরকাশিম তাঁকে সান্ত্বনা দিলেন। বললেন, দুঃখ করে কি করবে বেগম। আল্লাহ্ মীরনকে তুলে নিয়েছেন।

মানুষ তো বাধা দিতে পারে না।

সজল চোখে ফতেমা বলেছেন, আমার দৃঢ় বিশ্বাস, ভাইজান বজ্রাঘাতে মারা যান নি।

—তবে—

—তাঁকে হত্যা করা হয়েছে।

চমকে উঠলেন মীরকাশিম।

কোন অসতর্ক মুহূর্তে ইংরেজদের মনোভাবের কথা কি তিনি বলে ফেলেছেন ফতেমাকে? না, তাতো বলেন নি। তবে—

—হত্যা করা হয়েছে কে তোমাকে বললে বেগম?

—আমার মন বলছে।

—মনের মধ্যে এই সমস্ত কথাকে প্রশ্রয় দিও না। অকারণে কেউ নিজের হাত রক্তে রাঙিয়ে তোলে না। মীরনকে হত্যা করার কোন সঙ্গত কারণ থাকা চাই তো!

—কারণের অভাব তো নেই হজরত। ভাইজান কারুর স্বার্থের পথে বিঘ্ন হয়ে দাঁড়িয়ে ছিলেন।

—তুমি কি আমাকে ইঙ্গিত করছো বেগম? নিজের পথ পরিষ্কার করবার জন্য আমি মীরনকে হত্যা করেছি।

অসম্ভব দ্রুত কণ্ঠে ফতেমা বলেছিলেন, আমাকে ভুল বুঝবেন না হজরত। আপনি এই ব্যাপারে জড়িয়ে আছেন আমি কখনো মনে স্থান দিই নি। ভাইজান যদি সত্যই নিহত হয়ে থাকেন তবে তার জন্য দায়ী নাচওয়ালী মণিবেগম।

মীরকাশিম কিছু বললেন না।

বলবেনই বা কি। মীরনের মৃত্যু আকস্মিক হলেও স্তম্ভিত করে দেওয়ার মতো ঘটনা নয়। মীরকাশিম নিশ্চিত ছিলেন একদিন না একদিন ইংরেজ মীরনকে সরিয়ে নিজেদের পথ পরিষ্কার করবেই। তাঁরও পথের কাঁটা সরে যাবে।

তিনি ক্রমেই হৃদয়ঙ্গম করছিলেন, তাঁর জীবনের অরুণোদয় হতে আর বিলম্ব নেই।

মীরকাশিম প্রশ্ন করেছিলেন, এই শোকের সময় তোমার আব্বাজানের কাছে তোমার কি যাওয়া উচিত নয়?

—হীরাঝিল প্রাসাদে যাওয়ার দুর্বার আকাঙ্ক্ষা আমাকে উতলা করে রেখেছে হজরত। তবু আমার যাওয়া হবে না। ওখানে গেলেই নাচওয়ালীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হবে। আমি হিতাহিত জ্ঞান হারিয়ে ফেলব। তারপর—

—থাক, নাই বা গেলে।

—আপনি আব্বাজানের কাছে যান সারতাজ।

—আমি যাব!

—আপনাকে দেখলে তিনি বোধ হয় সান্ত্বনা পাবেন।

নানা কারণে কিন্তু কয়েক দিনের মধ্যে যেতে পারবেন না মীরকাশিম। সন্ধ্যার কিছু পূর্বেই আজ পৌঁছালেন প্রাসাদে। নবাব দরবারে বসছেন না। অন্তত একটি মাস দরবার বসবে না একথাও নিশ্চিত। বৃদ্ধ নবাবের বক্ষের সবকটি অস্থি মীরনের মৃত্যুর সঙ্গে সঙ্গে যেন ভেঙে গেছে।

মন্ত্রণা কক্ষে শ্লথ ভঙ্গীতে পদচারণা করছিলেন মীরজাফর।

তাঁকে আর চিনতে পারা যায় না। মাত্র কদিনেই তিনি অসম্ভব বৃদ্ধ হয়ে পড়েছেন। মাংসল শরীর শীর্ণ হয়ে গেছে। কখনো কখনো দৃষ্টি শক্তি ঝাপসা হয়ে আসছে। স্মরণ পথে জেগে উঠছে কত কথা, কত দৃশ্য। সে দিনের কথা যেন, ছোটে নবাব যেদিন প্রথম দুনিয়ার

আলো দেখলেন। মীরজাফর মুক্ত হস্তে আশরফি বিলিয়ে ছিলেন। নবাব আলীবর্দী এসেছিলেন শুভেচ্ছা জানাতে।

মীরজাফর বলে ছিলেন, নামকরণ আপনি করে দিন জাহাঁপনা।

বিন্দুমাত্র চিন্তা না করে আলীবর্দী বলে ছিলেন, মীরন নামটি তোমার পছন্দ হয়?

—জাহাঁপনার অনুগ্রহ মীরন আজীবন স্মরণ রাখবে।

সেই মীরন—ছোটে নবাব তাঁকে ছেড়ে চলে গেল।

সওকত সসম্মানে এসে জানাল মীরকাশিম জাহাঁপনার সাক্ষাৎপ্রার্থী। মীরজাফর ইঙ্গিতে আদেশ করলেন তাঁকে এখানে নিয়ে আসবার জন্য। মীরকাশিম কুর্নিশ করে এসে দাঁড়ালেন। শ্বশুর ও জামাতার মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হল না। মীরজাফর ক্লান্ত পদে পদচারণা করে চললেন।

শেষে—

—কাশিম—

—জাহাঁপনা—

—ছোটে নবাবের মৃত্যুতে কি সমস্ত মুর্শিদাবাদ মুহ্যমান?

—তাঁর মৃত্যুতে সকলেই কাতর জাহাঁপনা।

—সুবে বাংলার মানুষ আল্লাহ্‌র কাছে দোয়া করুক আমার ছোটে নাবাবের আত্মার জন্যে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে মীরজাফর আবার বললেন, আমি তাকে বাধা দেবার চেষ্টা করেছিলাম, সেদিন সে আমার কথা শোনে নি। ঘসেটি আর আমিনার অভিসম্পাত অক্ষরে অক্ষরে ফলে গেল। আল্লাহ্, পাপ আমিও তো কম করি নি, তুমি আমার মৃত্যু দিলে না কেন?

সেই পৈশাচিক ঘটনার কথা শুনেছিলেন মীরকাশিম।

শুনেছিলেন মীরনের অনুচর কামবক্সের মুখ থেকে।

পলাশীর প্রহসনের পর সিরাজকে মর্মন্তুদভাবে রঙ্গমঞ্চ থেকে বিদায়

দেওয়া হলেও আলীবর্দীর বহু আত্মীয়-পরিজনের কোন ক্ষতি করা হয় নি। মীরজাফর আর রক্তপাত করা পছন্দ করেন নি। মীরন চেয়েছিলেন একে একে সকলকে বিদায় দিতে। নবাবের আপত্তি দেখে কিছুদিন নীরব রইলেন মীরন।

তারপর কাজে নামলেন। তাঁর প্রথম দুই শিকার হলেন আলীবর্দীর দুই কন্যা ঘসেটি ও আমিনা। তাঁদের দুজনকে বন্দী করে মুর্শিদাবাদ থেকে ঢাকায় পাঠানো হল। ওই সঙ্গে আদেশ গেল ঢাকার ফৌজদারের কাছে, দুই ভগ্নীকে যেন কৌতল করা হয়। ফৌজদার ধর্মপ্রাণ ব্যক্তি এই নৃশংস কাজ বিশেষ করে আলীবর্দীর কন্যাদের হত্যা করতে রাজী হল না। নিজের কাজে ইস্তফা দিল। অগত্যা মীরনকে পরিকল্পনা ঢেলে সাজাতে হল। তিনি নতুন আদেশ দিলেন, মুর্শিদাবাদ থেকে লোক যাচ্ছে, বেগমদের তাদের সঙ্গে যেন ফেরত পাঠানো হয়।

মীরনের অনুচরেরা আবার ঘসেটি ও আমিনাকে মুর্শিদাবাদে ফিরিয়ে নিয়ে চলল। কিছুদূর ভেসে আসার পর এক নির্জন স্থানে নৌকা এসে পৌঁছাল। অনুচরদের একজন তাঁদের জানাল, তাঁরা এবার প্রার্থনা সেরে নিন।

কিসের প্রার্থনা? দুজনে অবাক্।

অনুচরটি জানাল, নবাবজাদা মৃত্যুর পরোয়ানা পাঠিয়েছেন। শেষ বারের মতো প্রার্থনা করবার অবকাশ দেওয়া হচ্ছে।

ঘসেটি বেগম সব হারিয়েও বেঁচে থাকতে চান। মৃত্যু নিকটবর্তী জেনে কান্নায় আকুল হয়ে উঠলেন। সিরাজদ্দৌলার গর্ভধারিণী আমিনা সংযম হারালেন না। জ্যেষ্ঠাকে সান্ত্বনা দিয়ে, গঙ্গার জলে পরিষ্কার পরিচ্ছন্ন হয়ে, আল্লাহ্‌কে একাগ্র মনে স্মরণ করলেন। তারপর ঊর্ধ্ব দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, পারবার দিগার, আমরা মীরনকে সস্নেহে লালন পালন করেছি, আজ পর্যন্ত তার কোন ক্ষতি করি নি। তবু সে

আমাদের মৃত্যুর অন্ধকারে ঠেলে দিচ্ছে। তোমার আদেশে বজ্রাঘাতে মীরনের মৃত্যু হোক।

আলীবর্দীর কন্যাদয় এরপর নিষ্ঠুরভাবে নিহত হলেন।

মীরকাশিম ধীর কণ্ঠে বললেন, জাহাঁপনাকে সান্ত্বনা জানাবার সাহস বা ভাষা আমার নেই। তবে বিরাট কর্তব্যের কথা স্মরণ করে তিনি ধৈর্য ধারণ করবেন, এই প্রার্থনা।

—তুমি ঠিকই বলেছো কাশিম। আমি সময় সময় ভুলে যাচ্ছি, আমি শুধু পুত্রের পিতাই নই, বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাবও। অসংখ্য গুরুদায়িত্ব আমার স্কন্ধে।

কিন্তু—কিন্তু আমি যে বড় একা হয়ে গেছি কাশিম।

—আপনার সমস্ত আদেশকে অক্ষরে অক্ষরে পালন করবার জন্য আমি আছি জাহাঁপনা। ছোটে নবাবের অসমাপ্ত কাজ আমি সম্পূর্ণ করব।

মীরজাফর মীরকাশিমের স্কন্ধের উপর হাত রাখলেন।

—আমাকে মিথ্যা স্তোক দিচ্ছ না কাশিম?

—না হজরত। আদেশ হলে, পবিত্র কাবার দিকে তাকিয়ে আমি নিজের অভিপ্রায় ব্যক্ত করতে পারি।

—তোমার প্রতি আমি অনেক অবিচার করেছি কাশিম। আমার এই অসহায় অবস্থায় তুমি সেই অবিচারের প্রতিশোধ নিও না।

সেদিনের দুর্দণ্ড প্রতাপ মীরজাফরের আজকের অসহায় অবস্থা দেখে মীরকাশিমের মনে করুণার উদ্রেক যে হল না তা নয়। পলাশীর প্রান্তের নিষ্ঠুর নায়কের কণ্ঠে কি আকুল কাকুতি।

—জাহাঁপনার প্রতি আমার অবিচল আস্থা না থাকলে, সৈন্যদের পাওনা আমি মিটিয়ে দিতাম না।

মীরজাফর কিছু বলবার পূর্বেই মণিবেগম কক্ষে প্রবেশ করলেন। সূক্ষ্ম নাকাবের আবরণে তাঁর মুখের অর্ধাংশ আবৃত। পূর্বে তিনি কখনো মীরকাশিমের উপস্থিতিতে আত্মপ্রকাশ করেন নি।

আপাদমস্তক মীরকাশিমকে লক্ষ্য করে নিয়ে, তীক্ষ্ণ কণ্ঠে বললেন, তোমার অভিনয় দক্ষতাকে প্রশংসা না করে পারছি না। এতক্ষণ অন্তরালে দাঁড়িয়ে তোমায় অপূর্ব অভিনয় আমি দেখছিলাম।

—বেগম—

মীরজাফরকে গ্রাহ্য না করে মণিবেগম বললেন, পুত্রশোকে কাতর বৃদ্ধের মনে আশার দীপ জ্বালিয়ে নিজের অভিষ্ট সিদ্ধ করতে চাও?

—বেগম, কি বলছো তুমি? কাশিমের আন্তরিকতাকে সন্দেহের দৃষ্টিতে দেখো না।

—শোক আপনার চোখের উপর যবনিকা টেনে দিয়েছে হজরত। আপনি ওর নগ্ন রূপ দেখতে পাচ্ছেন না। আমি পাচ্ছি। আমি বর্তমান থাকতে ছোটে নবাবের স্থান কাশিম আলীকে অধিকার করতে দেব না। অপমানে মীরকাশিমের সমস্ত শরীর কাঁপতে লাগল। মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করল। এখন সংযমের প্রয়োজন। কঠিন বলে তিনি নিজেকে সংযত করলেন।

বললেন মৃদু অথচ দৃঢ় কণ্ঠে, আমি এমন কোন মন্তব্য প্রকাশ করি নি যাতে প্রমাণিত হয় যে আমার মনে বদ অভিসন্ধি আছে।

—প্রকাশ যদি করে ফেলতে তাহলে তোমাকে বড় অভিনেতা বলতাম না। হাসি মাখা কথা দিয়ে তুমি নিজের নোংরা মনকে আড়াল করে রেখেছো।

মীরজাফর বললেন, বেগম, চতুর্দিকে এখন আমাদের শত্রু। এই দুঃসময়ে কাশিমকে আর তুমি—

নবাবকে কথা শেষ করতে দিলেন না মণিবেগম।

—কাশিমকে কি আপনি নিজের মিত্র বলে মনে করেন! সৈন্যরা পাওনার দাবিতে উচ্ছৃঙ্খল হয়ে উঠেছিল। আপনি জামাতার কাছে সাহায্য চেয়েছিলেন। সেদিন নিজেকে কপর্দক শূন্য বলে প্রচার করেছিল এই কাশিম আলী। পরে আপনার মনে প্রভাব বিস্তার

করবার জন্য কপর্দক শূন্য ব্যক্তিটি সৈন্যদের পাওনা মিটিয়ে দিল! আজ আবার এই নাটকীয় আবির্ভাব। আপনার পর তখ্‌তে বসবার দুরাকাঙ্ক্ষা ওকে উন্মাদ করে তুলেছে।
—আমি তো কিছুই বুঝতে পারছি না বেগম।
—আপনাকে সমস্ত বুঝিয়ে বলব। তার পূর্বে এই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিকে এখান থেকে বিদায় দেওয়া প্রয়োজন।
মীরকাশিমের দিকে তাকিয়ে মণিবেগম বললেন, তোমার উপস্থিতি আমাদের বিরক্তিকর মনে হচ্ছে। তুমি এখন বিদায় নিতে পার।
মীরকাশিম বাঙনিষ্পত্তি করলেন না।
কুর্নিশ করে বিদায় নিলেন।
মীরকাশিম নিজের ভবিষ্যৎকে উজ্জ্বল আলোয় আলোকিত করবার জন্য ব্যস্ত ছিলেন ঠিকই, তবু মনের কোণে কিঞ্চিৎ দ্বিধা ছিল। বলতে গেলে মীরনের মৃত্যুর পর সেই দ্বিধা মন জুড়ে বসেছিল। তিনি ছাড়া এখন আর মীরজাফরের অবলম্বন রইল না। সুতরাং চক্রান্তের প্রয়োজন কি?
পরিচ্ছন্ন মন নিয়ে মীরকাশিম গিয়েছিলেন নবাবের কাছে।
মণিবেগমের আবির্ভাবে সমস্ত এলোমেলো হয়ে গেল। অপমানিত হওয়ার সঙ্গে সঙ্গে মন থেকে দ্বিধার মেঘ কেটে গেল। প্রকৃত পক্ষে নিজেকে অপরাধী মনে করতে লাগলেন মীরকাশিম। নবাবের দাক্ষিণ্য লাভ করবার জন্য তিনি কেন লালায়িত হয়ে পড়েছিলেন। তখ্‌ত মুবারক তাঁর চাই। যে কোন উপায়ে তা তিনি অধিকার করবেন, এই হল সার কথা। মীরকাশিম দ্বিগুণ উৎসাহে নিজের পরিকল্পনায় মনোযোগী হলেন।

হলওয়েল নীরবে না থেকে কাজে নেমে পড়েছিলেন। কাউন্সিলের সভ্য এবং প্রধান সেনাপতিকে মীরকাশিমের পক্ষে না এনে ফেলতে

পারলে অর্থপ্রাপ্তির সমস্ত আশা নির্মূল হয়ে যাবে বিবেচনা করে তিনি প্রথমে কাউলর্ডকে এক পত্র পাঠালেন।

পত্রের বিষয়বস্তু হল, মীরজাফরের অপদার্থতা প্রমাণ করা। হলওয়েল লিখলেন, রাজ্যপরিচালনার ব্যাপারে নবাব ব্যর্থতার পরিচয় দিয়েছেন এ সম্পর্কে কারুর দ্বিমত নেই। চতুর্দিকে অরাজকতা চলেছে। এক্ষেত্রে বৃদ্ধ নবাবকে বিশ্রামের অবকাশ দিয়ে, তখ্‌তে একজন উপযুক্ত ব্যক্তিকে বসানোই যুক্তিযুক্ত। উপযুক্ত ব্যক্তি বলতে বর্তমানে আমরা মীরকাশিমকেই দেখতে পাচ্ছি।

পত্রের অন্যান্য অনুচ্ছেদে মীরকাশিমের প্রচুর প্রশংসা এবং গুণাবলী বর্ণনা করেছেন হলওয়েল। কাউলর্ড যখন পত্র পাঠ করছিলেন তখন কাশিমবাজার কুঠিতে রাজা রাজবল্লভ উপস্থিত ছিলেন। কর্নেল সাহেবের মুখের ভাব দেখে তিনি পত্রের বিষয়বস্তু সম্পর্কে আগ্রহ প্রকাশ করলেন।

রাজবল্লভ ইংরেজের আস্থাভাজন ব্যক্তি।

তাঁর কাছে পত্রের মর্ম প্রকাশ করলেন না কাউলর্ড। রাজবল্লভ চতুর হলওয়েলের মনের কথা পরিষ্কার বুঝতে পারলেন। মীরকাশিমকে তখ্‌তে বসবার প্রস্তাবটি আকস্মিক হলেও, এইরকম একটি সম্ভাবনা তার মনের মধ্যে বাসা বেঁধে রয়েছে। অবশ্য তিনি একথা জানেন, একা হলওয়েলের পক্ষে মীরকাশিমকে তখ্‌তে বসানো অসম্ভব। কাউন্সিল সদস্য এবং সেনাপতিদের মতামতের উপরই নির্ভর করবে সমস্ত কিছু।

চিন্তিত কাউলর্ডের মুখের দিকে তাকিয়ে রাজবল্লভ বললেন, হলওয়েল সাহেব চিকিৎসকের পেশা ছেড়ে দিয়ে এখন পুরোদস্তুর রাজনীতিজ্ঞ হয়ে উঠলেন।

—ওঁর প্রস্তাবটি অবশ্য বিবেচনা করবার মতো।

—হলওয়েল সাহেব যে অভিযোগ উত্থাপন করেছেন তা অবশ্য নস্যাৎ করা যায় না। তবে একটা বিষয় আমাকে বিস্মিত করছে।

—কোন্ বিষয়?

—নবাবের পর মীরকাশিমকে তখ্‌তে বসানোর বিষয়।

বিস্মিত কাউলর্ড বললেন, মীরকাশিম লোকটি কি তেমন সুবিধার নয়?

রাজবল্লভ নিজের তূণ থেকে একটি বাণ নিক্ষেপ করলেন।

—মীরকাশিমের ব্যক্তিগত চরিত্র নিয়ে আমার কোন মাথা ব্যথা নেই। আমার প্রশ্ন হচ্ছে কর্নেল সাহেব, সৈহু মিঞা থাকতে মীরজাফরের উত্তরাধিকারী তিনি তো কোন মতে হতে পারেন না।

সৈহু মিঞা মীরজাফরের নাবালক পুত্র।

কাউলর্ড বললেন আপনার এই কথা হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়।

বিজ্ঞের হাসি হাসলেন রাজবল্লভ।

—আপনাদের আমি সদাসর্বদা সুপরামর্শ দিয়েই আসছি। কর্নেল ক্লাইভ আমার মূল্য বুঝতেন। সৈহু মিঞা নাবালক অস্বীকার করি না। একজন উপযুক্ত দেওয়ান নিযুক্ত করে দিলেই কিশোর নবাব ভালভাবেই রাজ্যশাসন করতে পারবেন।

সৈহু মিঞা তখ্‌তে বসলে তিনি যাতে দেওয়ানের পদে বসতে পারেন তার পাকা ব্যবস্থা এখন থেকেই করে রাখলেন রাজবল্লভ। রায়দুর্লভ বা অন্য কেউ যাতে ওই পদ অধিকার করে বসতে না পারে তাই এই সতর্কতা।

কাউলর্ড হলওয়েলকে লিখে জানিয়ে দিলেন, মীরজাফর অযোগ্য জেনেও আমরা তাঁকে তখ্‌তে বসিয়েছিলাম। সুতরাং তাঁকে তখ্‌ত থেকে নামাবার কোন যুক্তি খুঁজে পাওয়া যায় না। নবাবের জামাতা মীরকাশিমকে আপনি যোগ্য ব্যক্তি হিসাবে বর্ণনা করেছেন। তাঁর কোন যোগ্যতার পরিচয় আমি অন্তত পাই নি। তাঁকে সমর্থন করবার প্রশ্ন নিয়ে আলোচনা চালিয়ে যাওয়া সম্পূর্ণ নিরর্থক।

কাউলর্ডের পত্র পড়ে তাঁর ঊর্ধ্বতন কয়েক পুরুষকে গালিগালাজ করলেন হলওয়েল। ইয়র্কসায়ারের এই সৈনিকটির বুদ্ধির ভাণ্ডার যে

শূন্য তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। বৃদ্ধ নবাবকে আঁকড়ে পড়ে থাকলে আর অর্থাগমের সম্ভাবনা নেই, এই অতি সাধারণ কথা কেউ চিন্তা করে দেখছেন।

হলওয়েল পিছিয়ে পড়বার মানুষ নন। আবার নূতন উদ্যমে কাজে নামলেন।

কাউন্সিলের সদস্যদের তিনি একটি কথা ভালরকম বুঝিয়ে দিলেন। সেই বিশেষ কথা আর কিছুই নয়, মীরকাশিম নিজের অপর্যাপ্ত ধনরত্ন ইচ্ছে করলেই দুহাতে বিলিয়ে দিতে পারেন। সেইরকম ইচ্ছে সম্প্রতি তাঁর মনে জেগেছে। সদস্যদের চোখ থেকে লোভ ঝরে পড়লেও কোন মন্তব্য তাঁরা করলেন না।

এই সময় মাদ্রাজের কাজ শেষ করে মনোনীত গভর্নর হেনরী ভ্যান্সিটার্ট কলকাতায় এলেন। নূতন গভর্নর অত্যন্ত সাদা মনের মানুষ। সৎও। তিনি কোন নিয়মের বাইরে যাবেন না। সম্মান হানি করে কোন সর্তও সহজে ভাঙতে চাইবেন না। তাঁর অভিমত হল সততার সঙ্গে কাজ করে যেতে হবে। লাভ হয় ভাল। লোকসান হলেও তা হাসিমুখে সহ্য করতে হবে।

এই রকম সঙ্গীন মুহূর্তে ভ্যান্সিটার্টের মতো ব্যক্তি গভর্নর হয়ে আসায় হলওয়েল বেশ ফাঁপরে পড়লেন। মীরকাশিমের কাছ থেকে ইতিমধ্যে তিনি প্রচুর টাকা পেয়েছেন এবং ভবিষ্যতে প্রচুর পাবার সম্ভাবনা। সুতরাং পিছিয়ে পড়বার কোন প্রশ্নই উঠতে পারে না। কয়েকদিন নীরব থেকে চতুর্দিকের অবস্থা পর্যবেক্ষণ করলেন। তারপর মীরজাফরের বিরুদ্ধে যে খসড়া তৈরি করে রেখেছিলেন—ভ্যান্সিটার্টের হাতে দিলেন হলওয়েল। ঠিক উপযাচক হয়ে যে দিলেন তা নয়। বলতে গেলে ভ্যান্সিটার্ট তাঁর কাছ থেকে চেয়ে নিলেন।

ঘটনাটি ঘটেছিল এইভাবে, ভ্যান্সিটার্ট কলকাতার লোক নন।

ইংলণ্ড থেকে সরাসরি মাদ্রাজেই এসেছিলেন। কাজে নিযুক্ত ছিলেন ওখানেই। সুবে বাংলার আভ্যন্তরীণ রাজনীতির বিষয় বিন্দুমাত্র জ্ঞান ছিল না। প্রথমে তিনি কাগজপত্র উল্টে পাল্টে পরিস্থিতি বোঝবার চেষ্টা করলেন। ব্যর্থকাম হতে হল তাঁকে। কাগজ পত্রে এমন বহু কথা আছে যা বাস্তবতার ক্ষেত্রে অচল। আবার বাস্তবে যা ঘটেছে তার লিখিত কোন দলিল নেই। ভ্যান্সিটার্ট কাউন্সিলারদের কাছ থেকে প্রকৃত তথ্য জেনে নেবার জন্য সচেষ্ট হলেন।

কাউন্সিলাররা তাঁকে গ্রাহ্যের মধ্যে আনলেন না।

ভ্যান্সিটার্টকে অগ্রাহ্য করার দুটি কারণ আছে। প্রথম, তিনি কোম্পানির লোক না হয়েও গভর্নর পদ লাভ করায় সকলে তাঁর প্রতি অসুখী ছিলেন। দ্বিতীয় ক্লাইভের মতো তাঁর ব্যক্তিত্ব ছিল না, অধীনস্থ কর্মচারীদের উপর তিনি কোন দিনই প্রভাব বিস্তার করতে পারবেন না, সকলেই তা অনুমান করে নিয়েছিল।

যদিও ভ্যান্সিটার্টের উচিত ছিল অস্থায়ী গভর্নর হলওয়েলের কাছ থেকে সমস্ত কিছু জেনে নেওয়া। জেনে নিলে আর তাঁকে বিদ্রূপ আর উপেক্ষা সহ্য করতে হত না। হলওয়েলকে তিনি নিম্নশ্রেণীর চিকিৎসক হিসেবে জানতেন। তাঁর প্রতি অবজ্ঞা মিশ্রিত অনুকম্পা ছিল। হলওয়েল অস্থায়ী গভর্নর হওয়া সত্ত্বেও, তাই তাঁর সাহায্য ব্যতিরেকেও ভ্যান্সিটার্ট সমস্ত কাজ গুছিয়ে নিতে পারবেন, এই বিশ্বাস তাঁর দৃঢ় ছিল।

শেষ পর্যন্ত হলওয়েলের সহযোগিতা তাঁকে প্রার্থনা করতে হল।

হলওয়েল খসড়াটি নূতন গভর্নরের হাতে দিয়ে বললেন, আপনি পড়ে দেখুন সুবে বাংলার বর্তমান অবস্থা আপনি উপলব্ধি করতে পারবেন।

ভ্যান্সিটার্ট খসড়াটি পড়লেন।

পড়া শেষ হলে উত্তেজিতভাবে ভ্যান্সিটার্ট তাকালেন হলওয়েলের দিকে। হলওয়েলের মুখ বিকার শূন্য।

—এ সমস্তর অর্থ কি ?

—অর্থ তো পরিষ্কার ভাষায় লেখা আছে।

—আপনি বলতে চান বর্তমান নবাবকে তখ্‌ত থেকে না নামিয়ে দিলে সুবে বাংলায় অরাজকতা দূর হবে না ?

—আমার বক্তব্য তাই বটে।

ভ্যান্সিটার্ট খসড়াটি দলা পাকিয়ে দূরে নিক্ষেপ করলেন।

বললেন দৃঢ়কণ্ঠে, ইংলণ্ড থেকে পরিচালকরা কোন নির্দেশ দেন নি সুতরাং নবাবকে গদিচ্যুত করা কখনই সঙ্গত হবে না।

হলওয়েল ধীর কণ্ঠে বললেন, আমরা ভারতবর্ষে এসে পর্যন্ত কোন ন্যায় সঙ্গত কাজ করেছি কি ?

—আপনি কি বলতে চাইছেন ?

—বলতে চাইলে অনেক কথাই বলা যায়। আপনি ক্রমে সবই বুঝতে পারবেন। উপস্থিত একটি মাত্র বিষয় উল্লেখ করব। বর্তমান নবাবকে যখন তখ্‌তে বসানো হয় তখন কোম্পানির পরিচালকরা কোন নির্দেশ দেন নি। ইংলণ্ড থেকে কি নির্দেশ আসবে তার অপেক্ষাও করেন নি কর্নেল ক্লাইভ। কাজেই বর্তমান নবাবের ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করব আমরা। ইংলণ্ড থেকে আদেশের অপেক্ষা করা সম্পূর্ণ হাস্যকর।

ভ্যান্সিটার্ট চিন্তিত হলেন। হলওয়েলের যুক্তিকে খণ্ডন করবার কোন যুক্তি খুঁজে পেলেন না। তবু কোন অসঙ্গত কাজকে প্রশ্রয় তিনি কখনই দিতে পারেন না।

বললেন নবাবের সঙ্গে সর্ত হয়েছে, সে সর্ত ভাঙবেন কি ভাবে ?

—সমস্ত সর্তের যদি পূর্ণ মর্যাদা আমাদের দিতে হয়, এখানে ব্যবসা করা আমাদের চলতে পারে না। ইতিপূর্বে যে সর্ত ভঙ্গ করি নি

আমরা তা নয়। আপনি বোধ হয় শুনে থাকবেন, পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে শেঠ উমিচাঁদের সঙ্গে সর্ত হয়েছিল জয় লাভ করলে তাঁকে ত্রিশ লক্ষ টাকা দেওয়া হবে। ক্লাইভ সে সর্ত ভঙ্গ করেছিলেন।

ভ্যান্সিটার্ট গম্ভীর মুখে পদচারণা করতে লাগলেন।

তাঁর অনুমান করে নিতে কষ্ট হল না, তিনি বিরাট এক অসৎ পরিবেশের মধ্যে এসে পড়েছেন। যে কোন উপায়ে হোক এই পরিবেশকে সুস্থ করে তুলতে হবে।

হলওয়েল বলে চললেন, আপনি নূতন এসেছেন, ক্রমে বুঝতে পারবেন, নবাবের অবস্থা যদি স্বচ্ছল না হয় ভাল ব্যবসা আমরা করতে পারব না। আগে ইংলণ্ড থেকে মালপত্র কেনার জন্য টাকা আসতো। নবাবকে যবে থেকে আমরা শোষণ করতে আরম্ভ করেছি, টাকা আসা বন্ধ হয়েছে। বর্তমান নবাব কপর্দক শূন্য হয়ে পড়েছেন। আমাদেরও এই বিলে টাকা নেই। মীরকাশিমের অপর্যাপ্ত অর্থের সাহায্য যদি না নেওয়া হয়, এখানকার ব্যবসা আমাদের গুটিয়ে ফেলতে হবে।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে ভ্যান্সিটার্ট শুনলেন।

বললেন, আপনার মতামত আমি শুনলাম। সমস্ত পরিস্থিতি আমি বিবেচনা করব। ভ্যান্সিটার্ট হিসাবপত্র ও তহবিল পরীক্ষা করে দেখলেন হলওয়েলের কথাই ঠিক। কোম্পানির আর্থিক অবস্থা শোচনীয় হয়ে উঠেছে। মীরজাফরের কাছ থেকে প্রচুর অর্থ দোহন করা হয়েছিল। সেই অর্থে কোম্পানি স্বচ্ছন্দে বহুদিন ভালভাবে ব্যবসা চালিয়ে যেতে পারতো। কিন্তু শোচনীয় অস্বচ্ছলতার কারণ হল, আর কোন উপায় না দেখে ক্লাইভ সমস্ত অর্থ পাঠিয়ে দিয়েছিলেন দাক্ষিণাত্যের যুদ্ধে খরচ করবার জন্য।

কোম্পানির পরিচালকরা যুদ্ধবাবদ একটি টাকাও ইংলণ্ড থেকে পাঠান নি। তাঁরা স্থির করে নিয়েছিলেন, যুদ্ধ যখন তাঁদের আদেশে হচ্ছে না তখন কোন দায় দায়িত্বই তাঁরা গ্রহণ করবেন না। এদিকে

ক্লাইভের আমলেই সুবে বাংলায় আয় কমে গিয়েছিল। নবাবের কাছ থেকে যে তিনটি জেলা পাওয়া গিয়েছিল, ভালভাবে খাজনা আদায় হচ্ছিল না সেই সমস্ত জেলা থেকে। নবাবের অবস্থা শোচনীয়। তাঁকে যে নূতন করে দোহন করা হবে সে উপায়ও নেই।

এদিকে খরচ পর্বত প্রমাণ।

গোরা পল্টনদের বেতন বাকী পড়ে যাচ্ছে।

আরেক বিপদ দেখা দিয়েছিল।

বিপদ এবং সমস্যা দুই। মাল কেনবার জন্য ইংলণ্ড থেকে প্রত্যেক বছর বহু টাকা পাঠানো হত। মীরজাফরকে তখ্‌তে বসিয়ে কলকাতায় কোম্পানির অবস্থা আশাতিরিক্ত ভাল হয়ে ওঠায়, ইংলণ্ড থেকে টাকা আসা বন্ধ হল। তাঁরা যুক্তি প্রদর্শন করলেন, নবাবের কাছ থেকে যে টাকা পাওয়া যাচ্ছে, খরচপত্র বাদ দিয়েও, উদবৃত্ত থেকে যাবে প্রচুর টাকা। ওই উদবৃত্ত টাকা দিয়ে মাল কিনে ব্যবসা করার অসুবিধা কোথায় ?

উপেক্ষা করবার মত যুক্তি ছিল না। ভালভাবেই ব্যবসা চলছিল। বিপদ দেখাদিল দাক্ষিণাত্যে যুদ্ধ বেধে যাওয়ায়। ব্যবসা অচল হয়ে উঠল। গভর্নরের পদ গ্রহণ করে ভ্যান্সিটার্টের তাই অন্ধকার দেখা ছাড়া আর কোন উপায় ছিল না।

যা হোক, তিনি একটি পথ আবিষ্কার করলেন।

পথটি হল, শ্রেষ্ঠী জগৎশেঠ মহতাবচাঁদের কাছ থেকে অর্থ সাহায্য নিয়ে বর্তমানের বিপদের বৈতরণী অতিক্রম করবেন। জগৎশেঠ ইংরেজের বন্ধু। অর্থ সাহায্য নিশ্চয় করবেন। শ্রেষ্ঠীকে আহ্বান করা হল। তিনি একাগ্রমনে ঋণের প্রস্তাব শুনলেন। তারপর মৃদু হেসে প্রস্তাবটি প্রত্যাখ্যান করলেন।

দিনকাল বদলে গেছে। এখন ইংরেজদের ঋণ দেওয়া আর ভস্মে ঘি ঢালা এক কথা চতুর জগৎ জগৎশেঠ সবিনয়ে নিজের অসচ্ছলতার

কথা বর্ণনা করলেন। একথাও তিনি জানালেন অর্থ থাকলে এক পাই সুদ না নিয়ে টাকা তিনি স্বচ্ছন্দে কোম্পানিকে দিতে পারতেন।

হলওয়েল ইতিমধ্যে জমি তৈরী করে ফেলেছিলেন।

বারংবার মীরকাশিমের গুণগান করতে থাকায়, কাউন্সিল সদস্যদের মন মীরকাশিমের অনুকূলে গিয়ে পৌঁছাল। তাঁরা চিন্তা করে দেখলেন, নবাবের জামাতাকে সমর্থন করলে, কোম্পানির ব্যবসা বাঁচবে—তাঁরাও ব্যক্তিগতভাবে লাভবান হবেন।

ম্যাওয়ার পরিষ্কারভাবে ভ্যান্সিটার্টকে জানিয়ে দিলেন, শোচনীয় অবস্থা থেকে কোম্পানিকে সচ্ছলতার মধ্যে আনার উপায় রয়েছে আপনি তা গ্রহণ করছেন না। পরিস্থিতি আরো জটিল হয়ে পড়লে জানবেন সমস্ত দায়-দায়িত্ব আপনার একার। আমরা কাউন্সিল সদস্যরা আপনার বিরুদ্ধে ইংলণ্ডে অভিযোগ জানাতে বিন্দুমাত্র ইতস্তত করব না।

ভ্যান্সিটার্ট প্রমাদ গুণলেন।

অগত্যা আপত্তিকর পথটি তাঁকে বেছে নিতে হল।

আহ্বান করতে হল মীরকাশিমকে কলকাতায়। মীরজাফরের চোখ বাঁচিয়ে মীরকাশিম কলকাতায় এলেন। কি করতে হবে না হবে ইত্যাদি হলওয়েল তাঁকে শিখিয়ে রাখলেন। নির্দিষ্ট দিনে কাউন্সিল সদস্যদের সামনে মীরকাশিম উপস্থিত হলেন।

কুশল প্রশ্ন বিনিময়ের পর ভ্যান্সিটার্ট বললেন, আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করতে আমাদের আপত্তি নেই। আমি পরিকল্পনা প্রস্তুত করে রেখেছি। আশা করি আপনি তাতে মত দেবেন।

মীরকাশিম উৎসুকভাবে অপেক্ষা করতে লাগলেন।

—পূর্ব সর্ত অনুসারে অকারণে আমরা মীরজাফরকে গদিচ্যুত করতে পারি না। সুতরাং তিনি নামে মাত্র নবাব হয়ে থাকবেন। তাঁর জীবন অতিবাহিত হোক বিলাস আর নেশায়। প্রকৃত পক্ষে সুবে বাংলাকে

চালিত করবেন আপনি। মীরজাফরের মৃত্যু হলে মসনদে বসতে আপনার আর কোন অসুবিধা হবে না।

—কোম্পানির পাওনা বোধহয় এখনই মিটিয়ে দিতে হবে ?

—নিশ্চয়।

ইংরেজ ধূর্ত।

মীরকাশিমও কম ধূর্ত নয়।

তিনি বললেন, আপনার অপূর্ব পরিকল্পনা আমি গ্রহণ করতে পারলাম না।

ভ্যান্সিটার্ট বিস্মিত কণ্ঠে বললেন, এর চেয়ে ভাল মত আপনি আশা করেছিলেন নাকি ?

—আশা করে অন্যায় কিছু করি নি।

আলোচনা ভেঙে যাবার উপক্রম হল।

হলওয়েল অবস্থা সামলে নেবার চেষ্টা করলেন।

বললেন—ভ্যান্সিটার্টের দিকে তাকিয়ে, ওঁর বক্তব্যও আমাদের শুনতে হবে। তা হয়তো আমাদের কাছে গ্রহণযোগ্য হতে পারে।

—বেশ। আপনি বলুন ?

মীরকাশিম বললেন, মীরজাফর যে আরো বহু বছর জীবিত থাকবেন না, একথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। সুতরাং লক্ষ লক্ষ টাকা এখন কোম্পানিকে দেওয়া চরম মূঢ়তার পরিচয় হবে। তাছাড়া আমি মসনদ অধিকার করতে চাই। কারুর আড়ালে থেকে সুবে বাংলাকে শাসন করার অভিপ্রায় আমার নেই।

মীরকাশিম বললেন, মীরজাফর যে আরো বহু বছর জীবিত থাকবেন না, একথা নিশ্চয় করে বলা যায় না। সুতরাং লক্ষ লক্ষ টাকা এখন কোম্পানিকে দেওয়া মূঢ়তার পরিচয় হবে। তাছাড়া আমি মসনদ অধিকার করতে চাই।

কারুর আড়ালে থেকে সুবে বাংলাকে শাসন করার অভিপ্রায় আমার নেই।

মীরকাশিম থামলেন।

কাউন্সিল সমস্যরা সাগ্রহে তাকিয়ে আছেন তাঁর মুখের দিকে।

—কোম্পানি আমার কাছ থেকে যা দাবি করবেন মিটিয়ে দেব। বর্ধমান, মেদিনীপুর আর চাটগাঁর রাজস্ব কোম্পানি আদায় করবেন তাও আমি লিখে দিতে প্রস্তুত। বিনিময়ে মসনদ আমার চাই।

ভ্যান্সিটার্ট ইতস্তত করতে লাগলেন।

হলওয়েল বললেন, বর্তমান তখ্‌তে বসবার পূর্বে কাউন্সিল সদস্যদের আশাতীত অর্থ দিয়েছিলেন। আপনি ওই সম্পর্কে কিছু চিন্তা করেছেন কি?

—নিশ্চয় চিন্তা করেছি। তালিকা আমার সঙ্গেই আছে। গভর্ণর সাহেব অনুমতি করলে আমি পড়ে শোনাতে পারি।

ভ্যান্সিটার্ট প্রশ্ন করলেন, কিসের তালিকা?

এই অজ্ঞ গভর্ণরের কথায় কাউন্সিল সদস্যরা অত্যন্ত বিরক্ত হলেন।

বিরক্তি চেপে হলওয়েল বললেন, আপনি তালিকাটি পড়বার অনুমতি করলেই সমস্ত কিছু পরিষ্কার হয়ে যাবে।

গভর্ণর অনুমতি দিলেন।

মীরকাশিম তালিকার উপর চোখ বুলিয়ে নিয়ে বললেন, আমার মসনদপ্রাপ্তি সুনিশ্চিত হল, গভর্ণর সাহেব ব্যক্তিগতভাবে পাবেন পাঁচ লক্ষ টাকা। হলওয়েল সাহেব পাবেন দু লক্ষ সত্তর হাজার টাকা। কাউলড সাহেবকে আমি দু লক্ষ দেব। বাকী সদস্যরা প্রত্যেকে এক লক্ষ টাকা পাবেন।

পাওনার তালিকা শুনে ভ্যান্সিটার্ট বেশ উভয় সঙ্কটে পড়ে গেলেন। তিনি সৎপথে থেকে অবশ্য সমস্ত কাজ করতে চান। তবে এতগুলি

টাকা হাতছাড়া হয়ে যাক তাও যেন তাঁর মনঃপুত হচ্ছিল না। কর্নেল ক্লাইভের মতো ব্যক্তিও উৎকোচ নিতে পশ্চাদ্‌পদ হন নি।

ভ্যান্সিটার্ট সদস্যদের দিকে তাকালেন।

তাঁদের দৃষ্টিতে লোভের বন্যা।

কেউই এই অর্থ হাতছাড়া করতে চান না বুঝত পারা গেল।

কিন্তু কিন্তুভাবে ভ্যান্সিটার্ট বললেন, অর্থের লোভে আমরা অন্যায় কিছু করব না। আমাদের প্রধান কর্তব্য হল, কোম্পানির স্বার্থ দেখা ও সুবে বাংলার মঙ্গল চিন্তা করা। সুখের কথা খাঁ সাহেব, কোম্পানিও দেশের স্বার্থ রক্ষার প্রতিশ্রুতি দিচ্ছেন। বর্তমানে যে অরাজকতা চলেছে তাতে তাঁর মতো যোগ্য ব্যক্তি মসনদে বসলে প্রজা সাধারণের মঙ্গলই হবে। তারপর তিনি যদি আমাদের কিছু পুরস্কার দিতে চান, গ্রহণ করতে আমাদের বিন্দুমাত্র আপত্তি হবে না।

গোলমাল চুকে গেল। লোভ শেষ পর্যন্ত সৎ প্রবৃত্তির উপর প্রভাব বিস্তার করল। বলতে গেলে কঠিন সংগ্রামের পর হলওয়েল মীরকাশিমকে জয়যুক্ত করলেন। লোকে জানল অবশ্য তিনি দু লক্ষ সত্তর হাজার টাকা পাচ্ছেন, প্রকৃতপক্ষে তাঁর লাভের অঙ্ক ভ্যান্সিটার্টের অপেক্ষা বেশী।

মীরকাশিম কলকাতায় আর অপেক্ষা করলেন না। রওয়ানা হলেন হুগলীর উদ্দেশ্যে। নবাব হবার পূর্বে তিনি কতকগুলি কাজ গুছিয়ে রাখতে চান। খোজা পিক্রুসের ছোট ভাই গ্রেগারীকে তাঁর পছন্দ হয়েছিল। ওই বলশালী আর্মেনিয়ানের জীবন তিনি ওইভাবে ব্যর্থ হতে দেবেন না। তাঁর বাহিনীতে গ্রেগারীকে নিযুক্ত করবেন অন্যতম সেনাপতিরূপে।

মীরকাশিম দক্ষ জহুরী।

খাঁটি হীরা সহজেই চিনতে পারেন।

হুগলীতে গ্রেগারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে তিনি মুর্শিদাবাদ ফিরবেন।

এবার গ্রেগারী সম্পর্কে বিশদভাবে কিছু বলতে হয়। প্রথমবার মীরকাশিম যখন বন্ধুর সঙ্গে পিক্রুসের দোকানে যান তখন গ্রেগারীর কথা উঠতে পিক্রুস বলেছিল, একা ব্যবসা সামলাতে না পারার দরুন ভাইকে গোয়া থেকে আনিয়ে নিয়েছে। প্রকৃত কথা কিন্তু তা নয়। প্রকৃত ব্যাপার বর্ণনা করতে গেলে অনেক কথাই বলতে হয়।

আর্মেনিয়ার এক ক্ষুদ্র গ্রামে তরুণ গ্রেগারীর দিন শান্তিতে কাটছিল। আফনাসির বিরাট আঙুরের চাষ। বহু লোক কাজ করে সেখানে। গ্রেগারীও কাজ করত। এই আঙুর থেকে বিশেষ এক ধরনের মদ প্রস্তুত করতেন আফনাসি। সেই মদ পান করে রাশিয়ার সম্রাট তৃপ্ত হতেন। তাছাড়া অন্যান্য বহুদেশে তাঁর রপ্তানী ব্যবসা ছিল।

কর্মচারীদের সঙ্গে আফনাসির সম্পর্ক ছিল অত্যন্ত ভাল। সুদর্শন, বলিষ্ঠ গ্রেগারীকে তিনি স্নেহ করতেন। প্রত্যেক দিন দ্বিপ্রহরে কাজ তদারক করতে আসতেন আফনাসি। সঙ্গে থাকতো তাঁর ষোড়শী কন্যা মোভা।

মোভাকে অপর্যাপ্ত সৌন্দর্য দিয়েছেন ঈশ্বর। তার দিকে একবার তাকালে দৃষ্টি সরিয়ে নেওয়া অসম্ভব। তরুণ কর্মীরা অপলকভাবে তাকে দেখতো। দেখতো কোমল ছন্দবদ্ধ যৌবন রক্তাভ ত্বককে ছিন্নভিন্ন করে যেন বেরিয়ে আসতে চাইছে। নীলাভ আঁখি দুটির অতলান্ত রহস্যভেদ করা বোধহয় কারুর পক্ষেই সম্ভব নয়। এই অপরূপ দেহ কোন্ ভাগ্যবান লাভ করবে কারুর জানা নেই।

তবু লালসাসিক্ত হৃদয়ে প্রায় সকলেই সেই অদেখা পুরুষটিকে ঈর্ষা করে। মোভাকে আর সকলের মতো গ্রেগারীও প্রাণ ভরে দেখতো।

তার হৃদয়ে লালসার কোন ছায়া ছিল না। সে শুদ্ধ বিস্ময়ে সৌন্দর্য উপভোগ করতো। সময় এইভাবে কেটে যাচ্ছিল। গ্রেগারী নিজের জন্মদাতা ও গর্ভধারিণীকে হারিয়ে ছিল অল্প বয়সে। নিজের বলতে তার আছে জ্যেষ্ঠ সহোদর। পিক্রুস। কিছুদিন থেকে আর্মেনিয়ায়

নেই। ব্যবসায়ীদের দলে যোগ দিয়ে তিনি গেছেন সোনার দেশ সুদূর হিন্দুস্থানে।

একদিন মোভার সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় হয়ে গেল গ্রেগারীর। শুধু দৃষ্টি বিনিময় নয় কিছু বাক্য বিনিময়ও হল। ঘটনাটি ঘটল বলতে গেলে সম্পূর্ণ আকস্মিকভাবে। কর্ম বিরতির দিন ছিল। গ্রেগারীর নিদ্রা ভঙ্গ হল বেশ বিলম্বে। সমস্ত সপ্তাহের আলস্য এই একটি দিনে শরীরকে সাপটে ধরে।

কিছু করবার নেই অথচ বাড়িতে বসে থাকতে ভাল লাগছে না। গ্রেগারী পাহাড়ের কোল ঘেঁষে আনমনে এগিয়ে চলল। দিন কয়েক আগে তুষারপাত হয়েছিল। এখনও চতুর্দিকে তার নিদর্শন রয়েছে। তুষার যখন প্রকৃতিকে ঢেকে দেয়—সেই সীমাহীন শুভ্রতা দেখতে ভালবাসে গ্রেগারী। তুষারপাতের পর সময় পেলেই তাই পাহাড়ের কোলে কোলে নিজেকে মুক্ত করে দেয়।

পিক্রুস কতবার লোক মুখে সংবাদ পাঠিয়েছে, গ্রেগারী যেন অনিশ্চিত ভবিষ্যৎকে সম্বল করে গ্রামে পড়ে না থাকে। চলে আসে হিন্দুস্থানে। হিন্দুস্থানের পথের ধূলায় ঐশ্বর্য মিশে আছে। বিচক্ষণতার পরিচয় দিয়ে শুধু সংগ্রহ করতে জানা চাই। লোভনীয় প্রলোভনকে উপেক্ষা করে গ্রেগারী গ্রামেই থেকে গেছে। আর কোন কিছুর আকর্ষণে নয়, শুধু এখানকার অপূর্ব নৈসর্গিক দৃশ্যাবলী আর কোথাও দেখতে পাবে না তাই।

গ্রামের অনেকে তাকে বিদ্রূপ করে। তারা বলে, তাদের যদি এরকম সুযোগ সুবিধা থাকতো ঐশ্বর্যের সমুদ্রে অবগাহন করতো। গ্রেগারী বুদ্ধিহীন, নিজের ভবিষ্যৎ উজ্জ্বল করবার বিন্দুমাত্র আগ্রহ নেই। যাকে নিয়ে এত ঠাট্টা বিদ্রূপ সে কারুর কথার প্রতিবাদ করতো না।

চতুর্দিকে চরম নির্জনতা। বেশ কিছু দূর অগ্রসর হবার পর জল-প্রপাতের গুমগুম শব্দ কানে আসতে লাগল। এই জলপ্রপাতটি এই

অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ শোভা। সহস্রধারায় অজস্র জল গম্ভীর শব্দ তুলে ঝরে পড়ছে। তারপর নদীর আকারে বয়ে চলে যাচ্ছে গ্রেগারী তা জানে না। গ্রামের বাইরের পৃথিবীর সঙ্গে তার কোন পরিচয় নেই।

ক্রমে জলপ্রপাতের কাছে এসে পড়ল গ্রেগারী।

একটি পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়িয়ে দেখতে লাগল প্রপাতের রূপ। কতক্ষণ এইভাবে কেটে ছিল গ্রেগারী জানে না। এক সময় অন্য ধারে দৃষ্টি ফেরাতেই হতবাক্ হয়ে গেল। মাত্র হাত কয়েক দূরে প্রপাতের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রয়েছে মোভা।

মোভা এখানে!

সেও কি জলপ্রপাতকে তার মতো ভালবাসে?

আর বোধ হয় গ্রেগারীর এখানে অপেক্ষা করা সঙ্গত নয়। মোভা তাকে দেখে ফেলবার পর ভাবতে পারে, ওকে অনুসরণ করে সে এখানে এসেছে। এই তুচ্ছ ব্যাপার থেকে পরিস্থিতি ঘোরাল হয়ে উঠতে পারে। আফনাসি তাকে সন্দেহের চোখে দেখতে পারেন। বরখাস্ত পর্যন্ত করতে পারেন।

গ্রেগারী ফিরে যাবার জন্য অগ্রসর হয়েছে মাত্র, মোভা তার দিকে ফিরে দাঁড়াল। দৃষ্টি বিনিময় হল দুজনের। গ্রেগারী দ্রুত দৃষ্টি নামিয়ে গ্রামের দিকে ফিরে চলল।

—চলে যাচ্ছেন?

মোভার কণ্ঠ থেকে মিষ্টতা ঝরে পড়ল।

গ্রেগারী কেমন অসহায় বোধ করল। বুকের স্পন্দন দ্রুত হল। উত্তর না দিলে আবার মোভাকে অপমানিত করা হয়। কোন ক্রমে নিজের মনের অবস্থাকে সামলে অসংলগ্ন কণ্ঠে বললে, হ্যাঁ—ফিরে যাচ্ছিলাম—

—এই তো এলেন। ফিরে যাবেন এখুনি?

—না....মানে....

অল্প শব্দ তুলে হাসল মোভা।
—আমি জানি আপনি কেন চলে যাচ্ছেন।
ভীতভাবে মুখ তুলল গ্রেগারী।
—কেন?
আমাকে দেখতে পেয়েই আপনি চলে যাচ্ছেন। বলুন, আমার অনুমান ঠিক কি না।
—আপনি সঠিক অনুমান করেছেন।
—কিন্তু আমি তো আপনাকে যেতে বলি নি।
—আমি একজন নিম্নপদস্থ—
কথা শেষ করতে দিল না মোভা।
আবার হাসল সুন্দর ভঙ্গিমায়।
—আমি আপনার প্রভুকন্যা হওয়ায় আপনি আমার পাশে দাঁড়িয়ে জলপ্রপাতের শোভা দেখলে অপরাধী হবেন! কে বলেছে একথা আপনাকে—
—কেউ বলে নি। আমি—
—আপনি থাকুন এখানে, আমি বরং যাই।
মোভা মন্থর গতিতে স্থান ত্যাগ করল।
মোভাকে গ্রেগারী দেখেছে বহুবার। তবে সে যে এত সপ্রতিভ তার জানা ছিল না। তার মতো নিম্নশ্রেণীর কর্মচারীর সঙ্গে কত আন্তরিকতার সঙ্গে কথা বলল! প্রপাতের সৌন্দর্য দেখা আর হল না। পূর্বের মতো আবার হেলান দিয়ে দাঁড়াল। মোভার চিন্তা গ্রেগারীকে সম্পূর্ণ গ্রাস করল।

দুজনের নিভৃত সাক্ষাতের পর পক্ষকাল অতীত হয়েছে।
ইতিমধ্যে অবশ্য নিয়মিত মোভা আফনাসির সঙ্গে এসেছে কাজ তদারক

করতে। গ্রেগারী মাথা নত করে কাজ করে গেছে। দৃষ্টি বিনিময় হয়ে যেতে পারে এমন কোন সুযোগ সে গ্রহণ করে নি। মোভা অপূর্ব সৌরভ ছড়িয়ে চলে গেছে।

আবার কর্ম্মবিরতির দিন এল।

চঞ্চল হয়ে উঠল গ্রেগারী।

মন দুর্বার বেগে ছুটে যেতে চেয়েছে প্রপাতের ধারে। অনিশ্চয়তা, তবু ক্ষীণ আশা মনকে সরস করে তুলেছে—মোভা আসবে। কিন্তু মোভা যদি আজ তাকে দেখে বিরক্ত বোধ করে? কিংবা উপেক্ষার দৃষ্টি হেনে ফিরে যায় ওখান থেকে।

যা হয় হবে। প্রচুর ইচ্ছে থাকা সত্ত্বেও গত ছুটির দিন যায় নি প্রপাতের কাছে। আজ যাবে।

মোভার না আসার সম্ভাবনাই বেশী। যদি এসে পড়ে, গ্রেগারী নিজেকে সরিয়ে নেবে কোন অন্তরালে। যেখান থেকে প্রাণ ভরে দেখবে মোভাকে।

মেঘলা প্রহর।

প্রপাতের ধারে গিয়ে পৌঁছাল গ্রেগারী। ব্যাকুল দৃষ্টিতে অনুসন্ধান করল মোভার। আসে নি। হয়তো আসবে। গ্রেগারী জানে অলীক কল্পনাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে। অবশ্য আশাকে বুকে বেঁধেই মানুষ বেঁচে থাকে। গ্রেগারী সেই বিশেষ পাথরে হেলান দিয়ে দাঁড়াল।

সময় কেটে চলল।

আশা নিরাশার দোলায় দুলতে লাগল একটি তরুণ হৃদয়।

হঠাৎ মর্ম্মরধ্বনি শুনতে পাওয়া গেল। উৎকর্ণ হল গ্রেগারী। আসছে—মোভা আসছে। ঝরা পাতার উপর দিয়ে গতিতে এগিয়ে আসছে। শব্দ আরো নিকটবর্ত্তী হল। তারপর- ভঙ্গে বেদনা নিয়ে গ্রেগারী দেখল মোভা নয়, দুটি প্রৌঢ়া নারী। সাংসারিক প্রয়োজনে জল নিতে এসেছে।

তারা তাকাল গ্রেগারীর দিকে।

দুজনেই পরিচিতা। গ্রাম সম্পর্কে মাতামহী। ঠাট্টার সম্পর্ক হওয়ায় সুযোগ সুবিধা পেলেই ঠাট্টার ফোয়ারা তোলেন। একজন সুযোগের অপব্যবহার হতে দিলেন না।

বললেন, তন্ময় হয়ে কোন্ পরীকে ধ্যান করছো গ্রেগী?

—এখানে পরী কোথায়? আমি তোমাদের মতো হুরীদের ধ্যান করছিলাম।

দ্বিতীয় প্রৌঢ়া বললেন, খুব কথা শিখেছে আজকাল। সামনের বসন্তে আমার বোনঝি নিনা আসবে। গলায় ঝুলিয়ে দেব। হুরীর জন্য তখন আর প্রপাতের ধারে দাঁড়িয়ে ধ্যান করতে হবে না।

প্রৌঢ়া দুজন পাত্রে জল ভরে নিয়ে গ্রামে ফিরে গেলেন।

আর অপেক্ষা করে লাভ নেই। গ্রামে ফিরে গেলেই হয়। গ্রামের মেয়েরা হয়তো দলে দলে জল ভরতে আসবে। এই সুন্দর সকালে অকারণেই গ্রেগারীর মন তেতো হয়ে উঠল। ঠিক এই সময় তীক্ষ্ণ হাসির শব্দে সে সচকিত হয়ে উঠল। মুখ ফিরিয়ে দেখল মোভা। সহাস্য মুখে মাত্র হাত কয়েক দূরে দাঁড়িয়ে রয়েছে।

—নিনার সঙ্গে একবার আমার আলাপ হয়েছিল। বেশ মেয়ে। আপনার সঙ্গে তাকে সুন্দর মানাবে।

সন্দেহ নেই, আড়ালে দাঁড়িয়ে মোভা শুনেছে কথাটা। গ্রেগারী কিছু বলতে পারল না। শুধু হিল্লোলের বন্যা বয়ে চলল মনের মধ্যে।

মোভা কাছে এগিয়ে এসে বললে, গত ছুটির দিন আসা হয় নি কেন?

—আসি নি মানে........

—আমাকে এত সঙ্কোচ করার তো কারণ নেই। আমার বাবা আপনার কর্তা, আমি নই। সেদিন প্রপাতের ধারে কতক্ষণ বসে রইলাম, আপনি এলেন না।

বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌছাল গ্রেগারী। তারই জন্য মোভা

অপেক্ষা করেছিল? কেন? স্বপ্নেও যে এত সৌভাগ্য আশা করা যায় না। নিজের সঙ্কোচকে প্রবলভাবে দমন করল গ্রেগারী। পরিষ্কার গলায় বললে, আপনি আমার জন্য অপেক্ষা করছিলেন?
মোভাও এক প্রশ্নের অবতারণা করল।
—বিস্ময় প্রকাশ করবার কিছু আছে কি?
—নেই!
—না। গ্রেগারী—
—বলুন?
—আমার ধারণা ছিল পুরুষদের বুদ্ধি খুব তীক্ষ্ণ হয়, সে ভুল ভেঙে গেল। বুঝতে পারেন নি কি, বাবা যখন কাজ তদারক করতে যান আমি প্রত্যহ তাঁর সঙ্গে কেন যাই?
বিহ্বল কণ্ঠে গ্রেগারী বলবার চেষ্টা করল, কেন যান……
—কেন আমি বারংবার একজনের কাছে গিয়ে দাঁড়াই? তার কাজ দেখি?
—আমি—তো কিছুই বুঝতে পারছি না।
হাসল মোভা। প্রাণহীন হাসি।
—এবার আমি যাই।
কথা শেষ করেই দ্রুত পায়ে পাহাড়ের বাঁকে অদৃশ্য হল।
হতবুদ্ধি গ্রেগারী দাঁড়িয়ে রইল শুধু।
কতক্ষণ কেটে গেল। মোভার কথাগুলি গভীরভাবে চিন্তা করতে লাগল। তার মতো অতি সাধারণ মানুষকে সে এই কথাগুলি কেন বলে গেল। আচম্বিতে গ্রেগারীর মনে বিদ্যুৎ খেলে গেল। তবে কি নিজের অজান্তে সে মোভার মনে নিজের স্থান করে নিতে পেরেছে!
না, না অসম্ভব—। অসম্ভব চিন্তাকে প্রশ্রয় দিচ্ছে গ্রেগারী। তাই যদি না হবে তবে ওই কথাগুলি কেন বলে গেল? শুধু তারই জন্য আফনাসির সঙ্গে প্রত্যহ আসে কাজ তদারক করবার সময়, এ কথা

কেন বলল? এখন গ্রেগারীর মনে পড়ছে, সে যেখানে কাজ করে, প্রত্যহ সেখানে এসে দাঁড়ায় মোভা। তারই জন্য যে দাঁড়ায় একথা কে জানতো।

সত্যই কি ভাগ্যবান গ্রেগারী?

গ্রামের সমস্ত পুরুষের কল্পনার বস্তু মোভা তার প্রতি আসক্ত?

সৌন্দর্যময়ী প্রপাতকে আর ভাল লাগল না গ্রেগারীর। সে উদ্‌ভ্রান্ত মন নিয়ে গ্রামে ফিরল। এখন তার করণীয় কি? সে যা চিন্তা করেছে তাই কি ঠিক না, অসমসাহসী হয়ে উঠবে। মোভাকে প্রশ্ন করে জেনে নেবে আসল সত্য।

সমস্ত দিন অস্থির চিন্তার মধ্যে দিয়ে কাটল গ্রেগারীর। সমস্ত রাতও। পরের দিন উৎকণ্ঠা মিশ্রিত আগ্রহ নিয়ে কাজে গেল। নির্ধারিত সময় আফনাসি এলেন কর্মীদের কাজ তদারক করতে। সঙ্গে মোভা নেই।

নেই!! আশ্চর্য—

পরের দিন ওই একই দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। আফনাসি এসেছে, মোভা সঙ্গে আসে নি। তার পরের দিনও না। গ্রেগারী উতলা হল। কেন আসছে না! পর পর কয়েকদিন আরো কেটে গেল, মোভা আসে নি।

ছুটির দিন এল আবার।

মোভা আসবে না প্রপাতের কাছে, স্থির নিশ্চিত হয়েও গ্রেগারী গেল। নির্দিষ্টস্থানে গিয়ে সবিস্ময়ে দেখল, মোভা এসেছে। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে আছে ঝরে-পড়া জলরাশির দিকে। গ্রেগারীর তন্ত্রীতে তন্ত্রীতে ঝঙ্কার উঠল। চেষ্টা করেও নিঃশব্দে গিয়ে দাঁড়াতে পারল না ওর পিছনে। অল্প শব্দ হল।

ঝটিতে ফিরে দাঁড়াল মোভা।

দৃষ্টি বিনিময় হল দুজনের। সঙ্গে সঙ্গে আরক্তিম মুখও নামিয়ে নিল।

কিছু বলতে গিয়েও বলতে পারল না গ্রেগারী। দুজনেই নীরব। প্রগল্‌ভা মোভার সুন্দর ওষ্ঠযুগল এখন কথার ভারে পীড়িত হল না। ওদের নীরবতার সাক্ষী নির্জন বন আর উত্তুঙ্গ পর্বত।

গ্রেগারী নীরবতা ভাঙবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠল। ভাগ্যে যা আছে হবে। তবু নিজের মনের কথা বলবে সে, জেনে নেবে ওর মনের কথা। সঙ্কোচের আবরণকে ছিন্নভিন্ন করে নীরবতা ভঙ্গ করল গ্রেগারী।

—মোভাস্কায়া—

সুন্দরী নারীর দুটি ব্যাকুল আঁখি তার প্রতি নিবদ্ধ হল।

—মোভাস্কায়া—

বহুদূর থেকে কণ্ঠস্বর ভেসে এল।

—মোভাস্কায়া নয়—শুধু মোভা—

—মোভা—

—বল ?

—তুমি আমার মতো একজন নগণ্যকে ভালবাসবে, আমার কল্পনার অতীত ছিল।

—তোমার কল্পনাশক্তি অত্যন্ত দুর্বল।

—কেন—কেন তুমি আমাকে ভালবাসবে ?

মোভার আরক্তিম মুখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

—নিনার মতো মেয়ের হাত থেকে তোমাকে বাঁচাবার জন্যে।

—মোভা—

—বল ?

গ্রেগারী কিছু বললে না। দুহাত দিয়ে নিবিড়ভাবে নিজের কাছে টেনে নিল মোভাকে। ওর নরম দেহে বোধহয় শিহরণ জাগল। কতক্ষণ কেটে গেল এইভাবে।

—এবার ছেড়ে দাও।

—না।

—ছাড়বে না?

—না। আজ আমি ভীষণ বেপরোয়া।

—কেউ এসে পড়বে। গ্রেগ, ছেড়ে দাও আমায়।

নিজের বাহুবন্ধন থেকে মোভাকে মুক্তি দিল গ্রেগারী।

—আমাকে সাহসী পুরুষ বলে এবার তোমার মনে হয়?

—শুধু সাহসিকতা দেখালে, না আন্তরিকতাও আছে?

—আছে। গভীর আন্তরিকতার সঙ্গে দীর্ঘদিন ধরে আমি তোমায় ভালবাসছি।

—অথচ মুখ ফুটে কিছু বলতে পার নি। আমি যদি তোমায় সুযোগ না করে দিতাম গ্রেগ? কি হত?

—কি হত?

—হ্যাঁ। কি হত বল?

—আমি সমস্ত জীবন দূর থেকে তোমার মুখের দিকে তাকিয়েই কাটিয়ে দিতাম। হাসির লহরী তুলল মোভা।

—আমি কি সমস্ত জীবন এ গ্রামে থাকতাম? আমায় চলে যেতে হত না এখান থেকে।

গ্রেগারী সবিস্ময়ে বললে, কেন? তোমায় চলে যেতে হত কেন?

—বাবা আমায় অন্যের হাতে তুলে দিতেন যে।

—তাই তো। তুমি যার ঘর করতে যেতে সে এই গ্রামেরও তো লোক হতে পারতো? তখন আর কোন অসুবিধা হত না আমার।

—তবু মুখে ফুটে আমায় কোন কথা বলতে না।

আবেগ ব্যাকুল কণ্ঠে গ্রেগারী বললে, এত সাহস আমি জীবনে কোনদিন সংগ্রহ করতে পারতাম না। আমার কি আছে বল?

—তোমার কিছু নেই!

—না নেই।

—আছে। তুমি অন্ধ। কখনও নিজের প্রতিবিম্ব দেখেছো দর্পণে?

—দেখেছি। প্রতিদিন দেখি।

—যদি দেখতে, নিজের সম্বন্ধে ধারণা তোমার পাল্টে যেত। তুমি জান না গ্রেগ, তোমার চেয়ে সুন্দর পুরুষ এ গ্রামে নেই। নেই তোমার চেয়ে দক্ষ অসিচালক। নারী পুরুষের কাছ থেকে আর কোন গুণের প্রত্যাশা করে না। প্রাণ খোলা হাসি হাসল গ্রেগারী।

—বেশ মিলেছে আমাদের; তুমি উন্মাদ, আমি নির্বোধ।

—কবিদের মতো তুমি কথাটা বলেছো। ঠিকই বলেছো। তোমাকে দেখে হৃদয় হারিয়ে আমি উন্মাদ, আর তুমি—

—তোমার হৃদয়াবেগকে বুঝতে না পেরে চরম নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিয়েছি। দুজনে হাসির বন্যায় ভাসিয়ে দিলে নির্জন বনভূমি।

সুন্দরভাবে গড়িয়ে চলল দিনগুলি।

সকলের দৃষ্টির অন্তরালে দুটি হৃদয় নিকট থেকে নিকটতর হয়ে চলল। এখন প্রত্যহ অপরাহ্নে দুজনের সাক্ষাৎ হয়। সাক্ষাতের স্থান ওরা পরিবর্তন করেছে।

গ্রেগারী বলেছিল একদিন।

—এই জায়গাটা কিন্তু সাক্ষাতের পক্ষে মোটেই উপযুক্ত নয়।

মোভা বললে, আমিও তোমাকে ওই কথা বলব ভাবছিলাম। যারা জল ভরতে আসে, যে কোন মুহূর্তে আমাদের দেখে ফেলতে পারে।

এখন ওদের সাক্ষাৎ হয় পাহাড়ের আরো গহনে। অরণ্য এখানে নিবিড়। স্থানটির ভাবগম্ভীর পরিবেশ মনকে আকর্ষণ করে। এখান থেকে জলপ্রপাত দেখা যায় না, কানে এসে শুধু বাজে তার বিরামহীন গর্জন।

স্বপ্নের মধ্যে দিয়ে সাতটি মাস কেটে গেল।

সেদিন ছিল রৌদ্র উজ্জ্বল দিন। গ্রেগারীর বিলম্ব হয়ে গিয়েছিল। মোভা এতক্ষণ পৌঁছে গেছে। উৎকণ্ঠার সঙ্গে অপেক্ষা করছে। যতদূর সম্ভব দ্রুত গতিতে সে সাক্ষাতের স্থানে পৌঁছাল।

মোভা আসে নি।

যে পথ ধরে ও প্রতিদিন আসে সেই পথের দিকে তাকিয়ে রইল গ্রেগারী। অপরাহ্ণ সন্ধ্যায় পরিণত হল, তার দৃষ্টি শ্রান্ত হয়ে পড়ল—মোভা এল না। অন্ধকার অরণ্যে আর অপেক্ষা না করে বিমর্ষ গ্রেগারী গ্রামে ফিরে চলল। কি হল মোভার? কোন বিশেষ কারণের দরুন কি আসতে পারল না? না, অসুস্থা হয়ে পড়েছে—অসংখ্য অশুভ চিন্তা তার মনের মধ্যে ওঠা নামা করতে লাগল।

এক সপ্তাহ কেটে গেল এরপর।

মোভার সঙ্গে দেখা হল না গ্রেগারীর।

ও আর আফনাসির সঙ্গে আসে না আঙুর ক্ষেত তদারক করতে। কি হল ওর? গুরুতর কিছু নিশ্চয় ঘটেছে। শেষে গ্রেগারী অসীম সাহসিকতার পরিচয় দেবার জন্য প্রস্তুত হল। মোভার সঙ্গে সে সাক্ষাৎ করবে। যে কোন উপায়ে, যে কোন মূল্যে।

গ্রাম নিশুতি হল ক্রমে।

ঝমঝমে কাজল কালো রাত্রি। গ্রেগারী সন্তর্পণে পথে এসে দাঁড়াল। এখান থেকে আফনাসির গৃহে পৌঁছাতে কিছু সময় নেবে। আকাশে মেঘের ঘনঘটা। বিদ্যুৎ চমকে উঠছে এখানে ওখানে। আকাশের দিকে গ্রেগারী তাকাল। বৃষ্টি নামবে। নামুক। তবু নিজের সঙ্কল্প থেকে চ্যুত হবে না ও।

কনকনে ঠাণ্ডা হাওয়া বইতে আরম্ভ করেছে। বৃষ্টি আরম্ভ হলে এই ঠাণ্ডাতে ভিজতে ভিজতেও গ্রেগারী নিজের গন্তব্যস্থলে পৌঁছে যাবে। কিন্তু যদি তুষারপাত হয় অসুবিধা হবে। গত বৎসর এই সময় পক্ষকালব্যাপী তুষারপাত হয়ে ছিল। ও নিজের জীর্ণ

পশমের অঙ্গাবরণ ভালভাবে গায়ে জড়িয়ে নিয়ে দ্রুত পায়ে এগিয়ে চলল।

দ্রুত পায়ে এগিয়ে চললেও বৃষ্টির হাত থেকে রক্ষা পেল না গ্রেগারী। গন্তব্যস্থলে পৌঁছবার পূর্বেই প্রথমে গুঁড়ি গুঁড়ি বৃষ্টি আরম্ভ হল, তারপর অবিশ্রান্ত ধারায়। সান্ত্বনার কথা তুষারপাত আরম্ভ হয় নি।

পিচ্ছিল পথের উপর দিয়ে দৌড়তে দৌড়তে গ্রেগারী একসময় আফনাসির গৃহের সামনে এসে পৌঁছাল। পাষাণ প্রাচীর দিয়ে বেষ্টিত সুরম্য গৃহটি অভ্যন্তরের অধিবাসীদের মতোই যেন সুপ্তিমগ্ন। প্রবেশ দ্বারের বেষ্টনী দৃঢ়ভাবে যুক্ত। কোন রক্ষী অবশ্য সেখানে নেই। তস্করশূন্য অঞ্চল, তাছাড়া বৃষ্টি হচ্ছে, রক্ষীপ্রবর বোধহয় কোথাও নিদ্রাসুখ উপভোগ করছে।

গ্রেগারী গৃহের পশ্চাদ্‌ভাগে এল।

প্রাচীরের উচ্চতা দশহাতের কম হবে না।

মসৃণ খাড়া প্রাচীর। এই প্রাচীরকে হেলায় অতিক্রম করা একমাত্র সরিসৃপের পক্ষেই সম্ভব। ইতস্তত দৃষ্টি সঞ্চালন করল গ্রেগারী। প্রাচীরের কাছেই দীর্ঘ এক বার্চগাছের সাক্ষাৎ পেল। কাছে বলতে একেবারে গা-লাগা নয়। প্রাচীর এবং গাছের মধ্যেকার ব্যবধান হাত ছয়েক হবেই।

গাছে উঠে প্রাচীরের উপর লাফিয়ে পড়া ছাড়া ভেতরে প্রবেশ করার আর কোন পথ নেই। অবশ্য খুবই বিপজ্জনক কাজ। লক্ষ্যভ্রষ্ট হবার সম্ভাবনাই বেশী। লক্ষ্যভ্রষ্ট হলে গুরুতরভাবে আহত হতে হবে, এমন কি জীবনহানি পর্যন্ত হতে পারে।

তবু এই ঝুঁকি নিতে গ্রেগারী পশ্চাদ্‌পদ হল না।

বার্চগাছ খুবই পলকা। বৃষ্টির জল লেগে পিচ্ছলও হয়েছে। অত্যন্ত সতর্কতার সঙ্গে গাছে উঠল গ্রেগারী। প্রতি মুহূর্তে মনে হচ্ছে পিছলে পড়ে যাবে। কোন রকমে পৌঁছাল প্রাচীর মুখোমুখি।

আরো একধাপ উপরে উঠে ঈশ্বরের নাম স্মরণ করে লাফিয়ে পড়ল। কামানের গোলার মতো বিদ্যুৎবেগে ওর দেহ প্রাচীরের উপর আছড়ে পড়ল।

গ্রেগারী দুহাত দিয়ে ধরতে গেল। ওর চেষ্টা ব্যর্থ হল। প্রাচীরের কোনাচে অংশের আঘাতে ওর দেহ ক্ষত-বিক্ষত হল। গ্রেগারী গড়িয়ে পড়ল। সৌভাগ্য বলতে হবে। গড়িয়ে পড়ল ভেতর দিকেই। লতানে কাঁটা গাছের ঝোপের উপর পড়েছিল।

মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছিল গ্রেগারীর। কিছুক্ষণ কাঁটাঝোপের উপরই পড়ে রইল। তারপর লতার নাগপাশ থেকে বেরিয়ে এল কোন রকমে। তখন ওর শরীরের নানা অংশ থেকে চুইয়ে চুইয়ে রক্ত পড়ছে। বৃষ্টিরও বিরাম নেই।

অন্ধকারের মধ্যেও বাড়িখানা আবছা দেখা যাচ্ছে। প্রেতপুরী বলে মনে হচ্ছে। গ্রেগারীর আগমন সংবাদ কেউ পায় নি। বৃষ্টি না হলে, চন্দ্রালোকিত রাত্রি হলে কি হত বলা যায় না। কয়েক পা এগিয়ে যাবার পর, একটা কথা মনে উদিত হওয়ায় ও থামল। আন্নাসির এই বিশাল আবাসস্থলের কোন কক্ষে মোভা এখন নিদ্রার কোলে অচেতন তাতো ওর জানা নেই। কি ভাবে তার সন্ধান পাবে ?

এই বিশেষ সমস্যার বিষয় ও চিন্তাই করে নি পূর্বে। তখন ওর মনে শুধু স্থান পেয়েছিল যে কোন উপায়ে প্রাচীর লঙ্ঘন করতে পারলেই মনস্কামনা পূর্ণ হবে। এখন বাস্তবের মুখোমুখি দাঁড়িয়ে গ্রেগারী নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগল।

তবু পিছিয়ে যাবার কথা চিন্তা করা যায় না। মোভার সঙ্গে যে কোন উপায়ে সাক্ষাৎ করতেই হবে। ধরা পড়ে যাবার সম্ভাবনা প্রবল। তখন অসীম লাঞ্ছনা ওকে নীরবে সহ্য করতে হবে। যদি হয়, হবে। গ্রেগারী অগ্রসর হল। দ্বিতল গৃহ। দেওয়ালে পাথর বসিয়ে খাঁজ

কেটে শোভাবর্ধন করা হয়েছে। সেই খাঁজে পা দিয়ে নিজের অবসন্ন দেহটাকে ঠেলে নিয়ে চলল উপরের দিকে।

অলিন্দে এসে যখন দাঁড়াল তখন গ্রেগারী হাঁপাচ্ছে। কনকনে ঠাণ্ডার মধ্যে ঘাম দেখা দিয়েছে শরীরে। শুধু ঘাম নয়, বৃষ্টি জলে রক্ত মিশে সমস্ত শরীর মাখামাখি হয়ে গেছে। চোখে অন্ধকার সয়ে গিয়েছিল অনেক আগেই। সারি সারি বন্ধ দরজার দিকে তাকাল গ্রেগারী। এই কক্ষগুলির কোন একটিতে হয়তো মোভা আছে। নরম শয্যায় ঘুমিয়ে আছে সে। শয্যায় আশ্রয় নেবার পূর্বে ওর কথা চিন্তা করছিল কি মোভা? হয়তো করেছিল।

চিন্তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে নিজের সম্মুখস্থ কক্ষের দরজায় মৃদু চাপ দিল। অর্গল বন্ধ ছিল না, খুলে গেল। মৃদু আলোয় কক্ষটি ছায়াময় হয়ে রয়েছে। কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করার প্রয়োজন হল না, অলিন্দ থেকেই গ্রেগারী লক্ষ্য করল শয্যায় গভীর নিদ্রায় নিদ্রিত গৃহকর্তা আফনাসি।

এই সময় অঘটন ঘটল।

একটি কক্ষের দরজা খুলে বেরিয়ে এলেন একজন মহিলা। তাঁর হাতে কারুকার্য খচিত দীপাধার। মহিলাটি বর্ষীয়ান্। কোন বিশেষ প্রয়োজনেই বোধহয় এই সময় তিনি কক্ষ থেকে অলিন্দে এসেছেন। গ্রেগারীর উপর চোখ পড়তেই আর্ত চীৎকার করে উঠলেন তিনি। হাত থেকে দীপাধার খসে পড়ল। ঝন্‌ঝন্ শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল চতুর্দিক।

প্রমাদ গুণল গ্রেগারী।

নিস্তব্ধপুরী জেগে উঠেছে ততক্ষণ। চতুর্দিক থেকে পদশব্দ শ্রুত হচ্ছে। অনেকে মৃদু কোলাহল তুলে, আর্ত চীৎকার আর ঝন্‌ঝন্ শব্দের কারণ অনুসন্ধান করতে ছুটে আসছে। আফনাসির নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল। ভয়ার্তমুখে আলুথালু বেশে তিনিও শয্যা ত্যাগ করলেন। অলিন্দ তখন অন্ধকারে ডুবে রয়েছে।

আফনাসি চীৎকার করে উঠলেন, আলো—আলো—

উপায়ন্ত না দেখে গ্রেগারী একটি কক্ষের মধ্যে প্রবেশ করে আত্মগোপন করল। এদিকে তখন অনেকে একত্রিত হয়েছে অলিন্দে। ভৃত্যরা অনেকগুলি দীপাধার নিয়ে উপস্থিত হয়েছে। প্রৌঢ়া মহিলাটি আর কেউ নয়, গৃহকর্ত্রী। তিনি নিজের অভিজ্ঞতা বর্ণনা করলেন কম্পিত কণ্ঠে।

আফনাসি বললেন, তোমার চোখের ভুল। প্রহরীর সতর্কতা আর উচ্চ প্রাচীর লঙ্ঘন করে কারুর পক্ষে এই দ্বিতলে আসা সম্ভব নয়।

—আমার চোখের ভুল নয়। আমি পরিষ্কারভাবে সেই তস্করকে দেখেছি।

সান্ত্বনার স্বরে আফনাসি বললেন, অসুস্থতার জন্যে তোমার মন দুর্বল হয়ে রয়েছে।

তুমি নিশ্চয় ভুল দেখেছো।

প্রৌঢ়া মহিলা অস্থির কণ্ঠে বললেন, তা হবে। তুমি আমার নিজের চোখকে অবিশ্বাস করতে বলছ, এরপর আর কি বলব।

এই সময় একজন দ্রুতকণ্ঠে বলে উঠল, একি, এখানে এত রক্ত কেন ? রক্ত !!!

আফনাসি নির্দেশিত স্থান দেখে হতবাক্ হলেন। রক্তই তো। শুধু সেখানে নয়, অলিন্দের বেশ কিছু স্থানে রক্তের প্লাবন বয়ে গেছে। আর অবিশ্বাস করার কিছু নেই। পরিষ্কার বুঝতে পারা যাচ্ছে রক্তাক্ত শরীরে এমন কেউ এখানে উপস্থিত ছিল যে এখানে সম্পূর্ণ অবাঞ্ছিত।

এই দুর্ভেদ্য পুরীর মধ্যে প্রবেশ করল কিভাবে !

অদৃশ্যই বা হল কোথায় ?

প্রচণ্ড কোলাহলে নিদ্রাভঙ্গ হয়েছিল, ভয়চকিত মনে মোভাস্কায়া কক্ষের বাইরে এল। তখন অদৃশ্য তস্করের প্রবল অনুসন্ধান চলেছে।

আফনাসি বারংবার গম্ভীর কণ্ঠে ভৃত্যদের আদেশ দিচ্ছেন, উদ্যান ও অন্যান্য অন্ধকারাচ্ছন্ন স্থানগুলি অনুসন্ধান করতে।

মোভাস্কায়া নিজের গর্ভধারিণীর মুখ থেকে ঘটনাটা শুনল। শুনে বিস্মিত কম হল না। অনুসন্ধান করেও কিন্তু তস্করের সন্ধান পাওয়া গেল না। যে পথ দিয়ে এসেছিল সেই পথ দিয়েই সে অদৃশ্য হয়েছে অনুমান করে নেওয়া ছাড়া উপায় নেই। অসতর্ক থাকার দরুন ভৃত্যদের প্রচণ্ড তিরস্কার করলেন আফনাসি। অবশিষ্ট রাত্রি সতর্ক থাকতে নির্দেশ দিতেও ভুললেন না।

মোভাস্কায়া তস্করের কথা চিন্তা করতে করতেই নিজের কক্ষে ফিরে এল।

প্রায় নিভে যাওয়া অবস্থায় রৌপ্যনির্মিত দীপাধারে আলো জ্বলছিল। আলোকে উজ্জ্বল করে দিয়ে সে শয্যায় উপবেশন করল। আর হয়তো ঘুম আসবে না। চিন্তিত মনে সে কিঞ্চিৎ অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল, হঠাৎ মৃদুশব্দে তার চমক ভাঙল।

ঝটিতে চোখ তুলেই সে স্তব্ধ হয়ে গেল, দরজার অর্গল বন্ধ করে গ্রেগারী এগিয়ে আসছে তার দিকে। এই গভীর নিশীথে গ্রেগারী এখানে! তবে কি—চিন্তা করার অবকাশ পেল না মোভাস্কায়া, গ্রেগারী নিজের দুই সবল বাহু দিয়ে তাকে নিবিড়ভাবে বেঁধে ফেলেছে ততক্ষণে। প্রচণ্ড আবেগ দুজনকেই মুগ্ধ করে রাখল। কতক্ষণ কেটে গেল এইভাবে। শেষে—

—গ্রেগ—

—মোভা?

গ্রেগারী নিজের বাহু বন্ধন থেকে মোভাকে মুক্তি দিল।

—এত দুঃসাহসের কাজ করা তোমার উচিত হয় নি।

—উচিত হয় নি জানি কিন্তু না করেও উপায় ছিল না। আমি....

আর কিছু বলতে পারল না গ্রেগারী। নিজের কথা অর্ধসমাপ্ত করেই

মূর্ছিত হয়ে পড়ল। অবিরাম রক্তপাত ও প্রবল উত্তেজনায় শরীর তখন শোচনীয়তার শেষ প্রান্তে গিয়ে উপস্থিত হয়েছিল। মোভা আকস্মিক এই ঘটনায় হতবুদ্ধি হয়ে গেল। পরক্ষণেই নিজেকে সংযত করে, গ্রেগারীর তীক্ষ্ণ সুন্দর মুখের উপর ঝুঁকে পড়ল। দেহ পরীক্ষা করেই বুঝতে পারল ওর গুরুতর আহত হবার বিষয়। লক্ষ্য করল, রক্তে অঙ্গাবরণ লাল হয়ে উঠেছে।

মনের মধ্যে হুহু করে উঠল মোভার। শুধু তার জন্য—শুধু তার জন্য গ্রেগারীর এই অবস্থা। কে যেন বলে উঠল এই সময়—বোধহয় দ্বিতীয় সত্তা, হা-হুতাশ করবার এখন সময় নয়। আহত, মূর্ছিত ওই সাহসী মানুষটির এখন পরিচর্যার প্রয়োজন। সংবিৎ ফিরে পেল মোভা। দ্রুতহাতে সমস্ত ব্যবস্থা সম্পন্ন করল। শীতল জল মুখ ও মাথায় কিছুক্ষণ ছিটিয়ে দিতেই গ্রেগারীর জ্ঞান হল। ইতিমধ্যে ক্ষতস্থানগুলিতে প্রলেপ লাগিয়েছে মোভা।

গ্রেগারীকে চোখ মেলতে দেখে উৎকণ্ঠার স্বরে মোভা বললে, আমার জন্যে তুমি জীবনটাও দিয়ে ফেলতে পার!

গ্রেগারী কিছু বলল না। ম্লান হাসল।

আঙুরের নির্যাস থেকে প্রস্তুত বলকারক সুরা গ্রেগারীকে পান করতে দিল মোভা। এক নিশ্বাসে পাত্র শূন্য করল গ্রেগারী।

—কেমন বোধ করছো?

—ভাল।

—কেন তুমি এইভাবে দুঃসাহসের পরিচয় দিলে?

—বলেছি তো, তোমার জন্যে।

—ওদের হাতে যদি ধরা পড়ে যেতে?

—ওরা আমায় নির্দয়ভাবে প্রহার করত। হত্যা করতেও কুণ্ঠিত হয়তো হত না। আমি সহাস্যে তোমার কথা চিন্তা করতে করতে সেই যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি গ্রহণ করতাম।

মোভা গ্রেগারীর কণ্ঠবেষ্টন করে আবেগরুদ্ধ কণ্ঠে বললে, গ্রেগ—আমার গ্রেগ।

—গৃহের অন্তরালে কেন তুমি নিজেকে আবদ্ধ করে রেখেছো মোভা? আমার বিরহকে দীর্ঘতর করে কি আনন্দ উপভোগ করছো?

—না—না—

—আমার কোন ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হয়েছো?

—না।

—তবে—তবে কেন আমার চোখের আড়ালে থাকার তোমার এই প্রয়াস।

চোখের লবণাক্ত জলে মোভার মুখ সিক্ত হয়ে চলেছে। গ্রেগারীর দেহের উত্তাপের মধ্যে সে নিজেকে ডুবিয়ে রাখল কিছুক্ষণ মূক হয়ে। তারপর বললে শীর্ণ কণ্ঠে, গুস্তাফ আমাকে ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে তোমার কাছ থেকে।

—গুস্তাফ! কে সে?

—তাজিকের একজন সেনাধ্যক্ষ।

—তাজিকের সেনাধ্যক্ষ তোমায় ছিনিয়ে নিয়ে যাচ্ছে। আমার বিষয়টি হৃদয়ঙ্গম করতে বিশেষ অসুবিধা হচ্ছে মোভা।

—আমার পরের বাড়ি যাবার সময় নাকি হয়েছে। পাত্র নির্বাচিত হয়েছে গুস্তাফ। ওই বর্বর তাজিকটার সঙ্গে আমায় জীবন কাটাতে হবে, ভাবতেও শরীর হিম হয়ে যাচ্ছে। তুমি আমার জন্য উতলা হচ্ছ, আমি অনুমান করেছিলাম গ্রেগ। আমি নিরুপায়। আমার পূর্বের স্বাধীনতা আমি হারিয়ে ফেলেছি।

গ্রেগারী স্তব্ধ হয়ে মোভার কথা শুনল।

ও অনুভব করল ভবিষ্যতের সমস্ত রঙীন স্বপ্ন কবরের হিম শীতল গহ্বরে বোধহয় চিরদিনের মত স্থান লাভ করল। গ্রেগারী কল্পনাও করতে পারে নি এত দ্রুত ওদের দুজনের সম্পর্ক শেষ হয়ে যাবে।

হৃদয় মথিত করে দীর্ঘ নিঃশ্বাস বেরিয়ে এল। ভালই হল। মোভাকে আজীবন স্বাচ্ছন্দ দেবার মত ক্ষমতা তো ওর নেই। গুস্তাফের ঘরে গিয়ে মোভার আজকের মনোভাব পরিবর্তিত হবে। বৈভব আর ঐশ্বর্য বিরাগকে রূপান্তরিত করবে অনুরাগে।

—গ্রেগ—

—বল?

—কি চিন্তা করছো?

—চিন্তা করার তো কিছু নেই মোভা। আমার মত অসহায় মানুষ শুধু ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা করতে পারে এখন তোমার আগামী জীবন আনন্দদায়ক হোক, শান্তিময় হোক।

গ্রেগারী এগিয়ে গেল দরজার দিকে।

মোভা দ্রুত পায়ে এগিয়ে গিয়ে পথ রোধ করল ওর।

—কোথায় যাচ্ছ?

—চলে যাচ্ছি। তুমি এখন একটি মানুষের গচ্ছিত সম্পদ। এখানে থেকে তোমাকে আর অপমানিত করতে চাই না।

—চলে যাওয়া তোমার হবে না। ও পথ দিয়ে তো নয়ই। আমাকে তুমি ভুল বুঝো না গ্রেগ। আমি তোমার। জন্ম-জন্মান্তরে আমি তোমার। অনেক দুঃসাহসের পরিচয় তুমি দিয়েছো। পার নাকি আমাকে নিয়ে দূরে, বহু দূরে চলে যেতে।

কথা শেষ করে আকুল আগ্রহে মোভা তাকাল গ্রেগারীর দিকে।

সবিস্ময়ে গ্রেগারী বললে কি বলছো তুমি। সুখ ঐশ্বর্য সমস্ত উপেক্ষা করে অনির্দিষ্টের পথে পাড়ি দেবে?

—সুখ ঐশ্বর্যের বিনিময়ে আমি তোমাকে হারাব, একথা তুমি মনে স্থান দিতে পারলে!

—আমি তোমায় প্রতারিত করতে পারি!

—আমার আর পরীক্ষা নিও না গ্রেগ। সত্যি যদি আমাকে প্রতারিত

কর, আমি দোষারোপ করব না। নিজের ভাগ্যের পরিহাসকে মেনে নেব হাসি মুখে। নদী আর পর্বতের অভাব হবে না, নিজের জীবন দিতেও আমি মমতা বোধ করব না সেদিন।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করল গ্রেগারী।

—তোমার ভালবাসার গভীরতা দেখে আমি স্তব্ধ হয়ে যাচ্ছি মোভা। তবু তোমার প্রস্তাবে আমার পক্ষে সম্মতি দেওয়া সম্ভব নয়। আমি দরিদ্র। অনির্দিষ্ট পথে কোথায় নিয়ে যাব তোমায়?

—দারিদ্রই যদি তোমারও আমার মধ্যে বিরাট ব্যবধান হয়ে থাকে, কেন তুমি আমায় ভালবেসেছিল? দিনের পর দিন রূপ আর ব্যক্তিত্বের মায়াজালে কেন আমায় আচ্ছন্ন করেছিলে? কেন এসেছো এই গভীর নিশীথে নিজের জীবন বিপন্ন করে আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে? কেন—কেন? উত্তর দাও—?

ক্ষীণ কণ্ঠে গ্রেগারী বলল, আমি জানি না—আমি জানি না মোভা দুর্নিবার আকর্ষণ আমাকে এখানে টেনে এনেছে। হয়তো অবচেতন মনে আমি তোমাকে চেয়েছিলাম আজীবনের জন্য এই গ্রামের এক কুঁড়ে ঘরে। অনির্দিষ্ট পথে তোমাকে নিয়ে যাত্রা করার কথা কখনও কল্পনা করি নি। আমার দারিদ্রকে যখন বরণ করতে চেয়েছো তখন বল আর কি কোন পথ খোলা আছে, যে পথ দিয়ে সম্মানজনক ভাবে তোমাকে জয় করে নিয়ে যেতে পারি?

—আছে। কঠিন পথ।

—বল, হয়তো সেই কঠিন পথ আমি অতিক্রম করতে পারব।

—চিরাচরিত প্রথার কথা তো তোমার অজানা নেই। মনোনীত প্রার্থীর সঙ্গে যে কেউ সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হতে পারে। জয়লাভের উপর নির্ভর করে কন্যার অধিকার। গুস্তাফ প্রখ্যাত বীর। তার বিরুদ্ধে জয় লাভ করা সম্পূর্ণ অসম্ভব।

মোভার কণ্ঠে হতাশা ধ্বনিত হল।

গ্রেগারী দৃঢ়তার সঙ্গে বললে, ওই পথই আমাকে অবলম্বন করতে হবে।

—যদি পরাজিত হও?

—মৃত্যু আমাকে গ্রাস করবে।

—গ্রেগ—

—আমাকে বাধা দিও না মোভা। ঈশ্বরের কাছে প্রার্থনা কর আমি যেন জয়লাভ করি।

মোভাকে কিছু বলার অবকাশ দিল না গ্রেগারী। সবলে নিজের কাছে তাকে টেনে নিল। নিবিড় নিস্পেষণে মোভাকে মিলিয়ে ফেলতে চাইল নিজের মধ্যে।

—ভোর হয়ে আসছে। সকলের অগোচরে বাইরে যাবার যদি পথ থাকে, আমায় দেখিয়ে দাও।

ধীর কণ্ঠে মোভা বলল, এস।

অনেক অন্ধকার গলি পথ অতিক্রম করে গুপ্ত দ্বার দিয়ে আফনাসির গৃহের বাইরে এল গ্রেগারী। অন্ধকার তরল হয়ে এসেছে। পূবের আকাশে ভোরের ইশারা। তুষারপাত বন্ধ হয় নি। বিরামহীনভাবে অল্প শব্দ তুলে চতুর্দিক শুভ্র হয়ে চলেছে।

তুষার উপেক্ষা করে গ্রেগারী শ্রান্ত, দুর্বল দেহকে টেনে নিয়ে চলল কুটীরের দিকে। এখন ওর প্রধান কাজ ক্ষতকে নিরাময় করা। তারপর অবিশ্রান্ত ভাবে পরিশ্রম করে নিজেকে প্রস্তুত করে নেওয়া তাজিক সেনাধ্যক্ষ গুস্তাফের বিরুদ্ধে শক্তি পরীক্ষা করার জন্যে।

দুশ্চিন্তা আর পরিশ্রমের মধ্যে দশটি দিন অতিক্রম করেছে।

অসুস্থতার দরুন প্রথম কয়েকদিন কাজে যোগ দেয় নি গ্রেগারী। তারপর প্রতিদিনই চিন্তা করেছে, আফনাসিকে বলবে প্রতিদ্বন্দ্বিতায় নামবার কথা। আফনাসি এসেছেন, কাজ তদারক করে চলে গেছেন।

বলা হয় নি। সহস্র চেষ্টা করেও সঙ্কোচের বেড়াজালকে অতিক্রম করতে পারে নি গ্রেগারী।

আজ দৃঢ়বদ্ধ মনোভাব নিয়ে এসেছে।

সঙ্কোচকে কোন মতেই প্রশ্রয় দেবে না। বলবেই আজ।

সৌভাগ্য বলতে হবে। আফনাসি প্রসঙ্গটি নিজেই উত্থাপন করলেন। কাজ তদারক করে ফিরে যাবার মুখে, কর্মীদের আহ্বান করলেন আঙুর ক্ষেত্রের সম্মুখস্থ খাস জমিতে। সকলে একত্রিত হল।

তিনি সহাস্যে বললেন, তোমাদের একটা শুভ সংবাদ দিতে চাই। আমার কন্যা মোভাস্কায়াকে তোমরা দেখেছো। তার বিবাহের ব্যবস্থা আমি করেছি। তাজিক সেনাধ্যক্ষ গুস্তাফ সুবিখ্যাত যোদ্ধা। তারই হাতে আমি তুলে দেব নিজের মোভাস্কায়াকে। প্রথানুসারে কোন দ্বন্দ্বযুদ্ধের ব্যবস্থা আমি করছি না। কারণ গুস্তাফকে সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করার মত শক্তি এই অঞ্চলে কারুর আছে বলে আমি মনে করি না। আগামীকাল বিবাহপর্ব সমাধা হবে। তোমাদের সকলকে উৎসবে যোগদান করতে আহ্বান জানাচ্ছি।

কর্মীরা সহর্ষে এই প্রস্তাবকে স্বাগত জানাল।

আফনাসি লক্ষ্য করলেন গ্রেগারী এগিয়ে এসেছে কয়েক পা।

—কিছু বলবে?

—হ্যাঁ।

—বল?

গ্রেগারী দৃঢ়কণ্ঠে বললে, আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। তাজিক সেনাধক্ষ্যের বিরুদ্ধে আমি দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে চাই।

এই কথা শুনে আফনাসি হতবাক্ হয়ে গেলেন।

কর্মীদেরও ওই এক অবস্থা।

—তুমি উন্মাদ। যা বললে তার অর্থ তুমি সঠিকভাবে হৃদয়ঙ্গম করতে পার নি।

—বহু চিন্তা করার পর আমি মনস্থির করে ফেলেছি। প্রচলিত প্রথানুসারে আপনি আমাকে অনুমতি দেবেন এই অনুরোধ।

আফনাসি কল্পনাও করতে পারেন নি তাঁর কোন সাধারণ কর্মচারীর কাছ থেকে এই ধরণের অনুরোধ আসতে পারে। তিনি অনুমান করলেন মোভাস্কায়ার সৌন্দর্য তরুণ গ্রেগারীকে অসম্ভব বেপরোয়া করে তুলেছে।

শান্ত কণ্ঠে বললেন, তোমার সাহসিকতাপূর্ণ কথা শুনে আনন্দিত হলাম। কিন্তু তুমি বাস্তব বুদ্ধির পরিচয় দিতে পার নি। গুস্তাফ একজন প্রথম শ্রেণীর বীর। তার বিরুদ্ধে অস্ত্রধারণ করার অর্থ হল নিজের মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করা। একজন অভিজ্ঞ ব্যক্তি হিসেবে তোমাকে বাধা দেওয়া আমার কর্তব্য।

গ্রেগারী স্বাভাবিক কণ্ঠে বললে, গ্রামের সম্মান রক্ষা করার জন্যই আমাকে এই কাজে ব্রতী হতে হচ্ছে। একজন বিদেশী বিনা বাধায় গ্রামের শ্রেষ্ঠ কুমারীকে নিয়ে গেলে চূড়ান্ত কলঙ্কের নজীর থেকে যাবে। গুস্তাফের অস্ত্রাঘাতে যদি আমার মৃত্যু হয়, সে মৃত্যুকে আমি সম্মানজনক বলেই মনে করব। আফনাসি এই যুক্তিকে খণ্ডন করবার মতো কোন কথা খুঁজে পেলেন না। নিজের বক্তব্য সমর্থনের আশায় দৃষ্টিপাত করলেন কর্মচারীবৃন্দের দিকে।

প্রবীণ গুল্‌ফেজ কয়েক পা এগিয়ে এসে বললে, গ্রেগারীর প্রস্তাব সময়োচিত। ওর মত নির্ভিক তরুণকে আমরা হারালেও, গ্রামের সম্মান রক্ষিত হবে। আপনি ওর প্রস্তাবে সম্মত হন।

—তোমাদের সকলেরই বোধহয় এই একমত। বেশ। আমি পরিবারের সকলের সঙ্গে পরামর্শ করে নিজের মত জানাব।

তিনি বিদায় নিলেন।

সন্ধ্যার কিছু পূর্বে আফনাসির কাছ থেকে সংবাদ এল তিনি অনুমতি দিয়েছেন দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হবার জন্যে। সমস্ত রাত্রি আনন্দে বিনিদ্র রইল গ্রেগারী। ও ভাল ভাবেই উপলব্ধি করেছে গুস্তাফকে পরাজিত করা সম্পূর্ণ অসম্ভব। তবু সান্ত্বনার কথা, জীবন দেবে অকারণে নয়, মোভাকে লাভ করবার দুর্নিবার আগ্রহে।

পরের দিন প্রাকৃতিক অবস্থা চমৎকার লক্ষ্য করা গেল।

সমস্ত গ্রামে উত্তেজনা বিরাজ করছিল। কারুর অবিদিত ছিল না গ্রেগারীর দুঃসাহসের কথা। আবাল বৃদ্ধ বনিতা অপেক্ষা করছিল সেই বিশেষ মুহূর্তের জন্য।

সূর্য উদয় হবার কিছুক্ষণের মধ্যেই সদলে গুস্তাফ এসে উপস্থিত হল। বিশাল তার দেহ। কদাকার মুখে উপেক্ষার হাসি বিরাজ করছে। দুই চোখে শ্বাপদের ঝিলিমিলি। বর্ণাঢ্য পোষাকে সজ্জিত তাজিক সেনাধ্যক্ষ চল্লিশটি বসন্ত অতিক্রম করেছে অনুমান করা যায়।

গুস্তাফ ও তার অনুচরবাহিনীকে সাদরে গ্রহণ করলেন আফনাসি।

বললেন সবিনয়ে, আপনারা পরিশ্রান্ত। বিশ্রাম করুন। কথাবার্তা যা হবার তারপর হবে।

উচ্চহাস্যে কক্ষ প্রকম্পিত করল গুস্তাফ।

—আমরা সৈনিক। অল্পে পরিশ্রান্ত আমরা হই না। এখন একটি প্রয়োজনের কথা বলি।

—বলুন?

—গুটি কয়েক সুন্দরী নারী অবিলম্বে সংগ্রহ করে দিতে হবে।

—নারী!!!

—সুন্দরী নারী। অনেক সুখাদ্যের ব্যবস্থা আপনি করেছেন জানি। আমার প্রধান অনুচরবর্গের ওই সুখাদ্যে উদরপূর্তি হতে পারে—মন ভরবে না। মনে রঙীন নেশার জোয়ার বইয়ে দিতে চাই সুন্দরী নারীর ঘনিষ্ঠ সঙ্গ। অবিলম্বে সেই ব্যবস্থা করুন।

তিক্ততায় মন ভরে উঠল আফনাসির। এই কদর্য চরিত্রের মানুষটি তাঁর জামাতা হতে চলেছে। তাঁর এক রাজপুরুষ আত্মীয়র কথায় গুস্তাফকে বিবাহের প্রস্তাব দিয়ে আমন্ত্রণ জানিয়েছিলেন কেন, এই প্রশ্নই তাঁকে বিমর্ষ করে তুলল।

কম্পিত কণ্ঠে আফনাসি বললেন, আপনার অনুরোধ আমার পক্ষে রক্ষা করা সম্ভব হচ্ছে না।

গৃহকর্তার দিকে তির্যক দৃষ্টি হেনে গুস্তাফ বলল, কেন?

—নগরে যা সম্ভব গ্রামে তা সম্ভব নয়।

—নয় কেন?

—আপনি বহুদর্শী ব্যক্তি। আপনার অজানা থাকার কথা নয়, নগরের মতো গ্রামে বারবধূ সুলভ নয়।

একজন অনুচর মন্তব্য করল, বারবধূর প্রয়োজন নেই। গ্রামের বহু সুন্দরী বধূ ও কন্যার প্রাচুর্য আমরা লক্ষ্য করেছি। আপনি বিলম্ব না করে আমাদের তৃষিত মনকে শান্ত করার ব্যবস্থা করুন।

সমস্ত শরীর প্রবল বেগে কম্পিত হতে লাগল আফনাসির। এই লম্পটগুলিই তাজিকস্থানের রক্ষক! সেখানে কি প্রতিটি নারীর সম্মান এরা পথের ধূলার সঙ্গে মিশিয়ে দিয়েছে।

তিনি অসীম বলে নিজেকে সংযত করে, দৃঢ় কণ্ঠে বললেন, অহেতুক অনুরোধ করে আমাকে লজ্জিত করবেন না। আপনাদের প্রস্তাব অনুসারে কাজ করা কোনমতেই আমার পক্ষে সম্ভব হবে না।

আফনাসির কথা শুনে গুস্তাফের কয়েকজন অনুচর কোলাহল করে উঠল।

কি চিন্তা করে গুস্তাফ বললে, আপনার কাছ থেকে এ ধরণের ব্যবহার পাব আশা করি নি। অতিথিবর্গের সমস্ত সুখ সুবিধার উপর দৃষ্টি রাখা হল গৃহকর্তার প্রধান কর্তব্য।—জেরিন, তোমরা আর গোলমাল ক'র না। গৃহকর্তার শিষ্টাচার সম্পর্কে জ্ঞান অত্যন্ত

সঙ্কীর্ণ। গ্রামের মানুষের কাছ থেকে অবশ্য নগরের ভব্যতা আশা করা যায় না।

আফনাসি কিছু বলতে গিয়েও বললেন না।

তার আদেশে খাদ্য ও পানীয় পরিবেশিত হল।

অতিথিরা খাদ্যের প্রতি বিশেষ আগ্রহ প্রকাশ করলেন না। পানীয়ের প্রতি দুর্বলতা অধিকমাত্রায় পরিলক্ষিত হল। কিছুক্ষণের মধ্যেই অতিথিশালা অবগাহন করতে লাগল রঙীন মত্ততায়।

আফনাসি আর অপেক্ষা করা সমীচীন মনে করলেন না। দ্বন্দ্বযুদ্ধ হবার সম্ভাবনা আছে একথা গুস্তাফকে এখনই জানিয়ে রাখা ভাল।

আফনাসি বললেন, একটি বিষয় এখনও আপনাকে জানানো হয় নি—

গুস্তাফ পাত্রের সুরা কণ্ঠে নিঃশেষ করে বললে, কোন্ বিষয়?

—প্রথানুসারে বিবাহ সম্পাদিত হবার পূর্বে আপনাকে একজনের সঙ্গে দ্বন্দ্বযুদ্ধে অবতীর্ণ হতে হবে।

গুস্তাফের রক্তাভ চোখে বিদ্যুতের ঝিলিক খেলে গেল।

—দ্বন্দ্ব যুদ্ধ!

পরমুহূর্তে অট্টহাসিতে তার বিশাল দেহ প্রকম্পিত হল।

—পৃথিবীর মায়া কাটাবার জন্য উন্মুখ কোন্ সে মূর্খ?

—আমার একজন কর্মচারী। গ্রেগারী।

—আমার আপত্তি নেই। অসংখ্য নরহত্যা আমি করেছি। আপনার একজন কর্মচারীকে হত্যা করতে হাত আমার কাঁপবে না। বরং এমন একজন নির্বোধকে পৃথিবী থেকে বিদায় দিতে আমার আনন্দ বোধ হচ্ছে। তাজিক সেনাধ্যক্ষ গুস্তাফের বিরুদ্ধে একজন গ্রামীন অস্ত্রধারণ করতে চায়!

—অপরাহ্ণে প্রতিদ্বন্দ্বীতার ব্যবস্থা হয়েছে।

—আমি প্রস্তুত থাকব।

সূর্য তখন পশ্চিম গগনে।

আফনাসির গৃহের সম্মুখস্থ চারণ ভূমিতে লোকে লোকারণ্য। এখানেই দ্বন্দ্বযুদ্ধের ব্যবস্থা হয়েছে। গ্রামের আবাল বৃদ্ধ বনিতা ভেঙে পড়েছে চারণ ভূমিতে দ্বন্দ্বযুদ্ধ দেখবার জন্যে। তাজিক সেনাপতির বীরত্বের কাহিনী কারুর অজানা নেই। গ্রেগারীর ভবিষ্যত চিন্তা করে অনেকে আক্ষেপ করছে।

একধারের বিশিষ্ট আসনগুলি অধিকার করেছেন আফনাসি পরিবারের সকলে ও অতিথিবর্গ। অনিচ্ছা সত্বেও, ম্রিয়মাণ মুখে মোভা দুরু দুরু বক্ষে দ্বন্দ্বযুদ্ধ অবলোকন করতে এসেছে। গ্রেগারীর ভবিষ্যত চিন্তা করে সে অত্যন্ত উতলা হয়ে আছে। তারই জন্য একটি নিষ্পাপ জীবন অকালে ঝরে পড়বে।

নির্দিষ্ট সময় উপস্থিত হলে গুস্তাফ রণক্ষেত্রে অবতীর্ণ হল। তার দেহ এখন বর্ণাঢ্য পোষাকে আবৃত নয়। বিশাল বক্ষে শোভা পাচ্ছে ধাতু নির্মিত বর্ম। চর্মের বেষ্টনী দিয়ে আবৃত দুই হাত। শিরস্ত্রাণের সঙ্গে যুক্ত লৌহজালিক। তার ভয়াবহ রূপ এই সজ্জায় আরো ভয়াবহ হয়ে উঠেছে।

জনতার জনারণ্য ভেদ করে গুস্তাফের সম্মুখীন হল গ্রেগারী।

তার স্বাস্থ্যপুষ্ট দীর্ঘদেহ হরিতাল বর্ণের মলিন পোষাকে আবৃত। বর্ম বা শিরস্ত্রাণ যথাস্থানে নেই। তবু ওকে দৃঢ়তার প্রতিমূর্তি বলে প্রতীয়মান হচ্ছে। গুস্তাফ নিজের প্রতিপক্ষর জীর্ণ বেশ লক্ষ্য করে, উপেক্ষার হাসি হেসে বিদ্রূপ বর্ষণ করলে।

গ্রেগারী কোন কথা না বলে আক্রমণ করল গুস্তাফকে। নিজের অস্ত্র দিয়ে হেলায় সে আক্রমণ প্রতিরোধ করল গুস্তাফ। অস্ত্রের ঝন ঝনায় ভরে গেল চারণভূমি। একটি দেবভোগ্যা নারীকে লাভ করার জন্য মরণপণ সংগ্রামে ব্রতী হল বিভিন্ন সম্প্রদায়ের দুই প্রার্থী।

কিছুক্ষণের মধ্যেই গুস্তাফ হৃদয়ঙ্গম করল, প্রতিপক্ষকে উপেক্ষার

দৃষ্টিতে দেখতে গেলে নিজের পরাজয়কে আহ্বান করা হবে। অত্যন্ত শক্তিশালী সে। সতর্কতার সঙ্গে গুস্তাফ অস্ত্র চালাল কিন্তু বিপক্ষের দেহস্পর্শ করা সম্ভব হল না।

নিস্তব্ধভাবে জনতা দুজনের অস্ত্র চালনা লক্ষ্য করছে। একজন প্রখ্যাত যোদ্ধার বিরুদ্ধে গ্রেগারীর অসি চালনা নিঃসন্দেহে প্রশংসা-যোগ্য। ক্ষণে ক্ষণে মুখের ভাব পরিবর্তিত হচ্ছে মোভার। কখনও উজ্জ্বল হয়ে উঠেছে কখনও ম্রিয়মাণ হয়ে যাচ্ছে। বক্ষের প্রবল স্পন্দন অস্থিমজ্জা ভেদ করে কানে এসে বাজছে যেন। এই সময় এক অঘটন ঘটল।

কিঞ্চিৎ অসতর্ক হয়ে পড়েছিল গ্রেগারী—এই অসতর্কতার পূর্ণ সুযোগ গ্রহণ করল গুস্তাফ। গ্রেগারী নিক্ষিপ্ত হল বেশ কিছু দূরে। অসি বাহু স্পর্শ করায় ক্ষত সৃষ্টি হয়ে চুইয়ে চুইয়ে পড়তে লাগল রক্ত। মোভার কণ্ঠচিরে আর্তরব বেরিয়ে এল। সহর্ষে চীৎকার করে উঠল গুস্তাফের অনুচরবর্গ।

অজস্র অন্ধকার গ্রেগারীর দৃষ্টিকে অন্ধ করে দিল। ক্ষণিকের জন্য—পরমুহূর্তে অসীম বলে দুর্বলতা জয় করে ভূমিশয্যা ত্যাগ করে উঠে দাঁড়াল গ্রেগারী। গুস্তাফ বোধ করি নিশ্চিত হয়েছিল, প্রতিপক্ষকে পরাজিত করা সম্পর্কে। একটি আহত মানুষ কতক্ষণ অস্ত্র চালিয়ে যেতে পারে।

আবার আরম্ভ হল অস্ত্রের ঝনৎকার।

কতক্ষণ এইভাবে চলল তার হিসেব কেউ রাখে নি। আহত গ্রেগারী মরিয়া হয়ে যুদ্ধ করে চলেছে। ওর অসীম মনবল আর শক্তির পরিচয় পেয়ে অত্যন্ত অস্থিরতা বোধ করতে লাগল গুস্তাফ। তার বিশাল দেহে শ্রান্তি নেমে আসছে ঘর্মাক্ত কলেবর গুস্তাফের অস্থিরতার এও অন্যতম কারণ।

তারপর—

তারপর সেই সঙ্গীন মুহূর্ত এগিয়ে এল।

অবিশাস্য ঘটনা ঘটে গেল। পরিশ্রান্ত গুস্তাফের পক্ষে নিজের শরীরকে স্থির রাখা অসম্ভব হয়ে পড়েছিল। একটি প্রতিআঘাত প্রতিহত করে টলে গিয়েছিল একধারে—সেই ক্ষণটিকে পরিপূর্ণ ভাবে গ্রহণ করল গ্রেগারী।

তার উদ্ধত অসি গুস্তাফের বাহুভেদ করল।

রক্তাক্ত কলেবর তাজিক সেনাপতি ভূমিশয্যা গ্রহণ করল।

উৎকট উল্লাসে অর্থহীন চীৎকার করে উঠল গ্রেগারী। গ্রামের জনগণের সমবেত আনন্দ কলরবে ওর চীৎকার ডুবে গেল। তখনও ক্ষতস্থান থেকে অবিরল ধারায় রক্তপাত হয়ে চলেছে। টলায়মান দেহ নিয়ে কম্পিত পায়ে গ্রেগারী এগিয়ে চলল মোভার দিকে। আনন্দ অশ্রুতে মোভার সুন্দর মুখশ্রী পরিব্যাপ্ত হয়ে উঠেছে। স্থান কালের কথা বিস্মৃত হয়ে সে নিজের দুই বাহুবিস্তার করে দ্রুত ধাবিত হল নিজের প্রেমাস্পদের দিকে।

বহু সহস্র দৃষ্টি দুই প্রেমিকের মিলন দেখে অভিভূত হল। গ্রেগারী নিজের রক্তাক্ত বাহুর মধ্যে মোভাকে নিবিড় ভাবে গ্রহণ করেছে তখন।

এর পরের ঘটনা অত্যন্ত দ্রুত ঘটল।

বলকারক পানীয়, সুচিকিৎসা এবং মোভার পরিচর্যার গুণে অল্পক্ষণের মধ্যেই গ্রেগারী সুস্থ হয়ে উঠল। এখন আর কারুর অজানা নেই ওদের দুজনের প্রণয় কাহিনী। গ্রেগারীর বিশ্রাম কক্ষে আফনাসি এলেন। ভাবী জামাতার বীরত্বের প্রশংসা করলেন তিনি। প্রথমে ওর শক্তিকে উপেক্ষার দৃষ্টিতে দেখেছিলেন বলে কিঞ্চিৎ আপেক্ষা করলেন।

পরিশেষে বললেন, গুটিকয়েক প্রয়োজনীয় কথা আমি এখুনি বলতে' চাই।

—বলুন ?

—আজ রাত্রে তোমাদের বিবাহপর্ব সম্পন্ন করবার ইচ্ছে আমার ছিল। কিন্তু এই পরিস্থিতি শুভকাজে অন্তরায় হয়ে দাঁড়িয়েছে। আমি বিশ্বস্ত-সূত্রে সংবাদ পেয়েছি, আহত গুস্তাফ দ্রুতগামী অশ্বে একজন অনুচরকে পাঠিয়েছে এখানে বহু সংখ্যক সৈন্যকে আনায়ন করতে। তার উদ্দেশ্য তোমাকে হত্যা করা আর মোভাকে অপহরণ করে নিয়ে যাওয়া।

মোভা ও গ্রেগারী এই কথা শুনে স্তব্ধ হয়ে গেল।

আফনাসি বললেন, আজ রাত্রেই তোমাদের এই গ্রাম ত্যাগ করতে হবে। একজন সাহসী অনুচর তোমাদের বিপজ্জনক স্থানের সীমা অতিক্রম করে দিয়ে আসবে।

—ক্রুদ্ধ গুস্তাফ যদি আপনার উপর অত্যাচার করে ?

—অসম্ভব নয়। শিকার হাতছাড়া হয়ে গেছে, দেখলে সে রাগে অন্ধ হয়ে যেতে পারে। তবু তোমাদের এখানে অপেক্ষা করা চলবে না। অবশ্য আমি সাহায্যের আবেদন্ জানিয়ে চতুর্দিকে সংবাদ পাঠিয়েছি। তোমরা প্রস্তুত হয়ে নাও।

তিনি কক্ষ থেকে নিস্ক্রান্ত হলেন।

ঝিল্লিমুখর গভীর রাত্রে আফনাসি পরিবারের সকলের কাছ থেকে বিদায় নিল মোভা ও গ্রেগারী। ওদের পথ দেখিয়ে নিয়ে চলল পুস্কাস। পুস্কাস আফনাসির অত্যন্ত বিশ্বাসভাজন কর্মচারী। তিনটি অশ্ব সুপ্তিমগ্ন গ্রামকে পিছনে ফেলে অন্ধকারের মধ্যে বিলীন হয়ে গেল।

এরপর কেটে গেছে কত দিন, কত মাস।

বসরা বন্দরে এসে উপস্থিত হয়েছে মোভা ও গ্রেগারী।

গ্রাম থেকে যাত্রা করবার পূর্বে অজস্র অর্থ পাথেয় হিসেবে আফনাসি

ওদের দিয়েছিলেন। কাজেই পথে কোন অভাব অনুভূত হয় নি। আর্মেনিয়ারই অন্যত্র কোথাও গিয়ে বাসা বাঁধবে। সম্মানজনক একটি কর্মও সংগ্রহ করে নেবে। কার্যক্ষেত্রে কিন্তু তা সম্ভব হল না। কারণ জার শাসিত সমস্ত অঞ্চলে বিভীষিকার রাজত্ব চলেছে। অভুক্ত নরনারী একমুঠো অন্নের জন্য হাহাকার করছে। এখানে কর্মের সংস্থান হওয়া অত্যন্ত দুরূহ ব্যাপার।

চিন্তিত গ্রেগারী প্রশ্ন করল পত্নীকে, এখন আমার কর্তব্য কি?

ইতিমধ্যে ওদের দুজনের বিবাহ সম্পন্ন হয়েছিল একটি গির্জায়।

মোভা বললে, পথে যখন নেমে পড়েছো তখন আর্মেনিয়া বা রাশিয়ায় থাকবার জন্য তুমি এত উদ্‌গ্রীব কেন?

—কোথায় যাব বল?

—শুনেছি বসরা, বোগদাদ এই সমস্ত খলিফা শাসিত এশিয়ার নগরগুলি সমৃদ্ধশালী। ওখানকার অধিবাসীরা বিদেশীদের মান্য করে। খলিফা তাদের উপযুক্ত কর্মে নিযুক্ত করেন। চল, আমরা ওই সমস্ত সমৃদ্ধশালী নগরগুলির কোন একটিতে যাই।

মোভার প্রস্তাবে সম্মত হল গ্রেগারী।

যথা সময় উপস্থিত হল বসরায়। এত সুসজ্জিত নগর ইতিপূর্বে দেখে নি। তারা মুগ্ধ হল। সৌভাগ্যক্রমে কয়েকজন আর্মানি বণিকের মধ্যে একজন বললে, খলিফার সৈন্য বাহিনীতে বহু বিদেশী আছে। তিনি আপনাকে সাদরে গ্রহণ করবেন সন্দেহ নেই। তবে—

—আবার তবে কিসের?

—খলিফার সম্মুখে উপস্থিত হয়ে নিজের আবেদন নিবেদন করবার সুযোগ আপনি সহজে পাবেন না। এই সুযোগের জন্য আপনাকে একটি বৎসর অপেক্ষা করতে হবে। অবশ্য খলিফার সম্মুখে উপস্থিত হবার সঙ্গে সঙ্গে আপনি কর্মে নিযুক্ত হবেন সন্দেহ নেই।

গ্রেগারী অত্যন্ত চিন্তিত হয়ে পড়ল।

আরেকজন বণিক বললে, এখানে সময় নষ্ট না করে আপাত হিন্দুস্থানে চলে যেতে পারেন। ওখানকার গোয়া বন্দরটি অত্যন্ত সমৃদ্ধশালী ও পর্তুগীজ অধিকৃত। পর্তুগীজরা ওখানে আর্মানিদের সম্মানের চোখে দেখে থাকে। মোভার সঙ্গে আলোচনা করে হিন্দুস্থানে যাওয়াই স্থির করল গ্রেগারী। মাতৃভূমি থেকে এতদূর যখন এসে পড়েছে তখন হিন্দুস্থানে যেতে বাধা নেই। তাছাড়া ওখানে গ্রেগারী জ্যেষ্ঠ খোজা পিত্রুস রয়েছে।

দীর্ঘদিন জলপথে অতিক্রম করে তারা গোয়ায় পৌঁছাল।

আর্মানিদের আড্ডায় অনুসন্ধান করতেই সন্ধান পাওয়া গেল খোজা পিত্রুসের। জানা গেল, সে আজকাল এখানে থাকে না। সুবে বাংলায় কাপড়ের ব্যবসা করছে। তবে মসৃণ শিল্ক কেনার উদ্দেশ্য নিয়ে সম্প্রতি কালিকটে গেছে। গোয়া হয়ে বাংলায় ফিরবে এই রকম কথা স্থির হয়ে আছে।

বাসস্থানের ব্যবস্থা করে গ্রেগারী গেল গভর্নরের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। গোয়ার গভর্নর আলভারেজ ওর পরিচয় পেয়ে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। বললেন, তোমার বিরুদ্ধে একটি অভিযোগ পূর্বেই আমার হস্তগত হয়েছে।

—অভিযোগ! গ্রেগারীর বিস্ময়ের সীমা থাকে না।

—তাজিকস্থানের সেনাধ্যক্ষ গুস্তাফ আমার বন্ধু। সে সংবাদ পাঠিয়েছে তুমি তার ভাবী পত্নীকে অন্যায় ভাবে অপহরণ করে এবং তাকে গুরুতর আহত করে হিন্দুস্থানের পথে পাড়ি দিয়েছো।

—আমি তাকে দ্বন্দ্ব যুদ্ধে পরাজিত করেছি ইয়োর এক্সেলেন্সি। অন্যায় কোন কাজ করি নি।

—ন্যায় অন্যায়ের বিচার আমি করব। তবে তোমাকে আমি বন্দী করব না। গোয়ার মধ্যেই তোমার গতিবিধি সীমাবদ্ধ থাকবে। অনুমান করছি এক মাসের মধ্যেই গুস্তাফের কোন অনুচর এসে পড়বে।

তখন তোমার প্রকাশ্যে বিচার হবে। যাও—গোয়ার বাইরে পালাবার চেষ্টা করলে গুরুতর শাস্তি পেতে হবে তোমাকে।

বিমর্ষ মনে অস্থায়ী আবাসে ফিরে এল গ্রেগারী।

সমস্ত শুনে মোভা অত্যন্ত বিমর্ষ হয়ে পড়ল।

শেষ পর্যন্ত অবশ্য গুরুতর কিছু ঘটল না। বিপদের হাত থেকে ওরা পরিত্রাণ পেল খোজা পিদ্রুসের সহযোগিতায়। দিন দশেক পরে খোজা পিদ্রুস কালিকট থেকে ফিরল গোয়ায়। আর্মানি মহল থেকেই সংবাদ সংগ্রহ করল গ্রেগারী এখানে এসেছে।

দীর্ঘদিন পরে সাক্ষাৎ হল দুজনের।

মোভাকে দেখে খুশী হল পিদ্রুস। কুশল বিনিময়ের পর গ্রেগারী সমস্ত ঘটনা বর্ণনা করল। একাগ্র মনে শুনে গেল পিদ্রুস।

তারপর স্বাভাবিক কণ্ঠে বললে, একটি সহজ বিষয় নিয়ে তোমরা অনর্থক চিন্তিত হয়ে রয়েছো। এখানকার গভর্নর তোমার কিছুই করতে পারবে না।

—কি ভাবে ?

—এখান থেকে তোমারা আমার সঙ্গে সুবে বাংলায় চলে যাবে। ইংরেজের সঙ্গে পর্তুগীজদের সম্পর্ক ভাল নয়। ওখানে গিয়ে পৌঁছাতে পারলে গোয়ার গভর্নরের সাধ্য হবে না তোমার কিছু করতে পারে।

—একজন সৈনিক আমার গতিবিধির উপর দৃষ্টি রেখেছে, লক্ষ্য করছি। এদের দৃষ্টি এড়িয়ে কি ভাবে আমরা গোয়া ত্যাগ করব ?

—কৌশল অবলম্বন করতে হবে। তুমি চিন্তিত হয়ো না। আমি সমস্ত কিছুর সমাধান করে দিচ্ছি।

সেইদিন গভীর রাত্রে খোজা পিদ্রুস গ্রেগারী ও মোভাকে সকলের দৃষ্টি বাঁচিয়ে বাংলার পথে নিয়ে চলল। গোয়া ছাড়িয়ে মাইল ত্রিশেক এগিয়ে যাবার পর গ্রেগারী প্রশ্ন করল, যে সৈনিকটি আমাদের উপর দৃষ্টি রেখেছিল তার কি হল ?

মৃদু হেসে পিক্রুস বললে, তার মৃতদেহ এখন সমুদ্রের জলে ভাসছে।

—নিহত হয়েছে ?

—হ্যাঁ। অর্থ দিয়ে বশ করেছিলাম তিনজন তেলেঙ্গীকে। তারা আমাদের পথ পরিষ্কার করবার জন্য সৈনিকটিকে হত্যা করেছে। শোন গ্রেগী, বাংলায় গিয়ে কিছুদিন তোমাকে ধৈর্য ধারণ করতে হবে। অস্ত্র নিয়ে মাতামাতি করা চলবে না। আমার ব্যবসায় তুমি গিয়ে এখন যোগ দেবে। যথা সময় আমি তোমাকে যোগ্য কর্মে নিযুক্ত করে দেব।

গ্রেগারী এই কথায় সমর্থন জানাল।

সোনার বাংলার উদ্দেশ্যে বায়ুবেগে ছুটে চলল তিনটি অশ্ব।

মীরকাশিমের প্রস্তাব শুনে গ্রেগারী স্তম্ভিত হয়ে গেল।

কিছুক্ষণ নির্বাক থাকার পর বললে, আপনার বাহিনীর সেনাধ্যক্ষের পদ আমাকে দিতে চাইছেন।

—অবশ্য আমি যদি মসনদে আসীন হতে পারি।

অল্প হেসে মীরকাশিম কথা কটি বললেন।

খোজা পিক্রুস বললে, বাংলার মসনদে আপনি আসীন হচ্ছেন, এ সম্পর্কে বিন্দুমাত্র সন্দেহের অবকাশ নেই।

মীরকাশিম কিছু না বলে হাসির জের টেনে চললেন।

গ্রেগারী বললে, আমাকে বিন্দুমাত্র পরীক্ষা না করে এই গুরুদায়িত্ব দেবেন ?

—আল্লাহ্ আমাকে অনেক কিছু থেকে বঞ্চিত করলেও, মানুষ চিনে নেবার অদ্ভুত ক্ষমতা দিয়েছেন। সেই ক্ষমতার জোরেই পরিষ্কার বুঝতে পারছি, তুমি একজন আদর্শ সেনাধ্যক্ষ হিসেবে খ্যাতিমান হবে।

গ্রেগারী নতজানু হয়ে মীরকাশিমকে অভিবাদন করল।

—তোমার নতুন জীবন আরম্ভ হল গ্রেগারী। এমন কি যে নামে তুমি এতদিন পরিচিত ছিলে তাও তোমাকে ত্যাগ করতে হবে। আজ থেকে তোমার নতুন নামকরণ হল, গুরগিন খাঁ।

মীরকাশিম আসন ত্যাগ করে এগিয়ে গেলেন।

দ্বারপ্রান্তে পৌঁছে ঘুরে দাঁড়িয়ে বললেন, গুরগিন খাঁ—

—ইয়োর এক্সেলেন্সি—

—তুমি প্রস্তুত থাকবে। আমার নির্দেশ পাওয়ামাত্র যাত্রা করবে মুর্শিদাবাদ। তিনি নিষ্ক্রান্ত হলেন।

এদিকে—

ভ্যান্সিটার্ট বিলক্ষণ অসুবিধায় পড়ে গেলেন। তাঁর ধারণা ছিল হলওয়েল যখন অগ্রণী হয়ে সমস্ত কিছু করলেন তখন তিনি মুর্শিদাবাদে গিয়ে মীরজাফরের সঙ্গে কথাবার্তা বলে মীরকাশিমের তখ্‌ত পাবার পথ আরো সুগম করে দেবেন। এই ধারণা শুধু ভ্যান্সিটার্টের নয়; কাউন্সিলের অন্যান্য সদস্যদেরও ছিল।

কার্যক্ষেত্রে কিন্তু সেরকম কিছু ঘটল না। হলওয়েল পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন, কাউন্সিল সদস্যদের সম্মুখে তিনি মীরকাশিমকে উপস্থিত করেছেন। কথাবার্তা যা স্থির হবার তা হয়ে গেছে। সুতরাং তাঁর আর কোন দায়িত্ব নেই। তিনি নিজের পাওনা গণ্ডা বুঝে নিয়েছেন, এবার এদেশের মায়া কাটিয়ে ইংলণ্ড ফিরে যাবেন, বাকী জীবন শান্তিতে কাটাবার জন্য।

উপায়ান্তর না থাকায় এই দুরূহ কাজটি নিজের সম্পন্ন করবার জন্য অগ্রসর হলেন ভ্যান্সিটার্ট। হেষ্টিংস প্রমুখ কয়েকজন কাউন্সিলার পরামর্শ দিলেন, একা না গিয়ে, সঙ্গে একদল সেপাই-পল্টন নিয়ে যেতে। যে কোন মুহূর্তে এই সেপাই-পল্টনের প্রয়োজন হতে পারে মুর্শিদাবাদে।

ভ্যান্সিটার্ট চিন্তিত কণ্ঠে বললেন, আমাকে সেপাই-পল্টন নিয়ে যেতে

দেখে নবাব বিব্রত হতে পারেন। সুস্থ পরিবেশে আলোচনা অগ্রসর হবার সম্ভাবনা কম।

হেষ্টিংস বললেন, কিঞ্চিৎ কৌশল অবলম্বন করতে হবে। নবাবকে জানিয়ে দিতে হবে, কর্নেল কাউলর্ড পাটনায় চলেছেন সৈন্য নিয়ে বিদ্রোহ দমন করতে, গভর্নর মুর্শিদাবাদে আসছেন, কাজেই তাঁকে পৌঁছে দেবার উদ্দেশ্যে এই পথ ঘুরে সৈন্যরা চলেছে।

এই পরামর্শই স্থির রইল।

যথাসময় গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট ও সেনাধ্যক্ষ কাউলর্ড সসৈন্যে মুর্শিদাবাদে পৌঁছালেন। মুরাদবাগে সিরাজউদ্দৌলায় একটি বিলাস ভবনে গিয়ে উঠলেন। তাঁদের আগমন বার্তা নবাবের কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হল। ওই সঙ্গে সৈন্য আনার কৈফিয়তও জানিয়ে দেওয়া হল।

ষড়যন্ত্রের বিন্দুমাত্র আঁচ পান নি মীরজাফর।

কিঞ্চিৎ তীক্ষ্ণ বুদ্ধি থাকলেই নবাবের কাছে কিছুই অজ্ঞাত থাকত না। গুপ্তচর মুখে যথাসময় তিনি সমস্ত কিছু অবগত হতেন। কিন্তু রাজ্য পরিচালনা করতে গেলে যে সমস্ত গুণাবলী থাকা প্রয়োজন, যে সমস্ত পরিকল্পনা নিয়ে অগ্রসর হলে রাজ্য সুষ্ঠুভাবে পরিচালিত হতে পারে বা বাস্তব দৃষ্টিভঙ্গীর পরিচয় দিয়ে কোম্পানি ও প্রজাপুঞ্জের অন্তস্থলকে হৃদয়ঙ্গম করা ইত্যাদি বিষয়ে সম্পূর্ণ ব্যর্থতার পরিচয় তিনি দিয়েছিলেন। তাঁর গুপ্তচর বাহিনাই ছিল না।

পরের দিন সৌজন্যতা প্রকাশ করবার জন্য নবাব এলেন মুরাদবাগ প্রাসাদে। আদর আপ্যায়নের ত্রুটি হল না। প্রথমে লঘুছন্দেই কথাবার্তা অগ্রসর হল। ক্লাইভের মতো বাকপটু ছিলেন না ভ্যান্সিটার্ট। আসল কথা তিনি কোনক্রমে উত্থাপন করতে পারছিলেন না।

পাটনার বিদ্রোহর কথা উঠল ক্রমে।

এই সূত্রে কথাটা প্রাথমিকভাবে তুললেন ভ্যান্সিটার্ট।

বললেন, পাটনায় রামনারায়ণ যা অবস্থা করে তুলেছেন তাতে নবাবের

সম্মান যে শুধু আহত হয়েছে তা নয়, দৃঢ় হস্তে তিনি রাজ্য পরিচালনা করার ব্যাপারে ব্যর্থ হয়েছেন তাও প্রকট হয়ে পড়েছে।

মীরজাফরের মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। তিনি ঢোক গিলে নীরব রইলেন। ইংরেজ গভর্নরের মুখের উপর কিছু বলার সাধ্য তাঁর কোথায়?

ভ্যান্সিটার্ট থামলেন না। বলেই চললেন, পাটনা দূরের সুবা। সেখানকার কথা না হয় ছেড়েই দেওয়া গেল। নিকটবর্তী স্থানগুলি—ঢাকা, রংপুর, ফরিদপুর এমন কি এই মুর্শিদাবাদেও আপনার শাসনের গুণে প্রজাপুঞ্জ চরম দুর্গতির সম্মুখীন। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা। কি বর্হিবিষয়, কি আভ্যন্তরিণ বিষয়—আপনার এই ব্যর্থতা আমরা কল্পনা করি নি। আপনার সঙ্গে আমাদের যখন চুক্তি হয়, সমস্ত ক্ষেত্রে আপনি দৃঢ়তার পরিচয় দেবেন এবং পরামর্শ নিয়ে চলবেন আমাদের, এই রকম কথা স্থির হয়েছিল, কিন্তু—। প্রকৃতপক্ষে এই কথাগুলি বলতেই আমি কলকাতা থেকে মুর্শিদাবাদ ছুটে এসেছি।

খুশীমনে মুরাদবাগ প্রাসাদে এসেছিলেন মীরজাফর। এখন রাজ্যের অন্ধকার তাঁর মনে স্থান লাভ করল। তিনি কল্পনাও করতে পারেন নি। তাঁকে এই সমস্ত কড়া কথা শোনাতে গভর্নর সাহেব এখানে এসেছেন। তিনি বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাব, ইচ্ছে করলেই ওই সমস্ত কথার উত্তরে বলতে পারেন, তোমরা পলাশীর প্রান্তরকে রক্তাক্ত করে আমাকে তখ্‌ত মুবারকে বসিয়েছ। আমি ধনরত্ন উজাড় করে দিয়েছি তোমাদের। এখন এ রাজ্যের অধিশ্বর আমি। যে ভাবেই রাজ্য শাসন করি না কেন সে দায়দায়িত্ব আমার—কোন বেনিয়া কোম্পানির নির্দেশিত পথ ধরে অগ্রসর হবার যুক্তিকে আমি গ্রাহ্য করি না।

কিন্তু এই সমস্ত কথা বলতে পারেন না মীরজাফর। বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার নবাব হয়েও বলতে পারেন না। এক এক সময় তাঁর

নিজেরই মনে হয়, হয়তো আল্লাহর উপর ইংরেজদের স্থান দিয়ে বসে আছেন।

তিনি অসংলগ্ন কণ্ঠে বললেন, এই সামান্য কারণে গভর্নর সাহেব এতদূর কষ্ট করে আসবেন আমি কল্পনা করতে পারি নি। পত্র দিয়ে জানালে আর পথের ক্লেশ সহ্য করতে হত না।

—কারণটি সামান্য নয়। আপনি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখুন।

মীরজাফর বিদায় নেবার জন্য প্রস্তুত হলেন।

বললেন, আমি নিশ্চয় গভীরভাবে সমস্ত কিছু চিন্তা করে দেখব। আগামীকাল আবার আমাদের আলাপ-আলোচনা হবে।

পরের দিনও আসল বিষয় নিয়ে কোন কথাবার্তাই হল না। ভ্যান্সিটার্ট বলি বলি করেও কিছুই বলতে পারলেন না। তাঁর মন এই বিকারের জন্য দায়ী বলা বাহুল্য। দিন কাটল বহু সুন্দরীর ছন্দবদ্ধ নৃত্য দেখে ও খানাপিনা করে। সন্ধ্যার পর মীরজাফর বিদায় নিলেন বেশ হৃষ্টচিত্তেই কারণ তাঁর ধারণা হল গভর্নর সাহেবের মনে যে ঘোলা জল জমেছিল, আজকের আনন্দ উৎসবের জোয়ারে তা ভেসে গেছে।

নবাব বিদায় নেবার পর কাউলর্ড বললেন, আপনি অনর্থক সময় নষ্ট করছেন। প্রকৃত কথা আজই আপনার উচিত ছিল নবাবকে জানিয়ে দেওয়া।

—কয়েকবার চেষ্টা আমি করেছিলাম—ভ্যান্সিটার্ট বললেন, উৎসব মত্ত নবাবের মনে কষ্ট দেওয়া হবে বিবেচনা করেই বলতে পারলাম না।

—এই সমস্ত মনোবিকারকে আমাদের জয় করা উচিত। এই দেশে আমরা অর্থ উপার্জন করতে এসেছি মিঃ গভর্নর। মীরজাফরের সময় ফুরিয়ে গেছে। নতুন রক্ত আসছে বাংলার মসনদে। অর্থের বিনিময়ে আমরা তাকে সাহায্য করব।

—আপনি প্রথমে মীরকাশিমের অনুকূলে ছিলেন না।

—ছিলাম না ঠিকই। পরে আমার মন পরিবর্তিত হয়েছে। কাউন্সিল মীরকাশিমের অনুকূলে রায় দিয়েছে। যাক, ও নিয়ে কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। আগামীকাল আপনি পরিস্থিতি সরল করে দিন। নিজে বলতে না পারেন, বক্তব্য লিখে জানান নবাবকে।

তৃতীয় দিন মীরজাফর মুরাদবাগ প্রাসাদে আসবার পর ভ্যান্সিটার্ট গোটা তিনেক ফার্সীতে লিখিত অভিযোগ-পত্র তাঁর হাতে তুলে দিলেন। অনেক ভেবে-চিন্তে গভর্নর স্থির করেছিলেন কাউন্সিলের কথা মতোই কাজ করবেন। গুছিয়ে সমস্ত কথা বলতে তিনি প্রবল অসুবিধা বোধ করবেন—লিখে জানানোই ভাল। তারপর কথাবার্তা বলতে অসুবিধা হবে না।

মীরজাফরের অভিযোগ পত্রগুলি পড়তে পড়তে চোখ ঝাপসা হয়ে এল। অংসখ্য অভিযোগ উত্থাপিত হবার পর তাঁকে জানানো হয়েছে, বৃদ্ধ হয়ে পড়ায় রাজকার্য চালানো তাঁর পক্ষে অসম্ভব হয়ে উঠেছে। সুতরাং তাঁর কোন তরুণ আত্মীয়ের অনুকূলে মসনদ ত্যাগ করবার অনুরোধ জানাচ্ছেন কাউন্সিলের সমস্ত সভ্য।

কিছুক্ষণ মাথা নত করে বসে রইলেন মীরজাফর। চোখের জলকে সামলালেন। উদ্বেল কান্নাকে চাপবার চেষ্টা করলেন বোধ হয়। ক্লাইভের কথা তাঁর মনে পড়ল। ক্লাইভ বাংলায় উপস্থিত থাকলে তাঁকে এই দুর্যোগের মুখোমুখি দাঁড়াতে হত না নিশ্চয়।

মাথা তুললেন তিনি।

—আপনারা এইভাবে চুক্তি ভঙ্গ করবেন আমি কখনো চিন্তাও করি নি। আমার পক্ষ থেকে এমন কোন কাজ হয় নি যাতে কোম্পানির স্বার্থে ঘা লাগে। বরং আপনাদের স্বার্থের প্রতি অতিমাত্রায় দৃষ্টি দেওয়ায় হিন্দু মুসলমানের চোখে আমি বিরাগভাজন হয়েছি।

—আমাদের ভুল বুঝবেন না ইয়োর এক্সেলেন্সি। আপনার বয়স ও আপনার স্বাস্থ্য আপনাকে অপটু করে তুলছে। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা দেখা দিয়েছে। আপনার সেনা বাহিনীর প্রতিটি সৈন্য আপনার বিরুদ্ধ মনোভাবাপন্ন। যে কোন দিন বিদ্রোহর আগুন জ্বলে উঠতে পারে। এক্ষেত্রে আপনার উচিত কোন কর্মঠ ব্যক্তিকে মসনদ ছেড়ে দেওয়া।

কুর্শির একপাশ চেপে ধরে নিশ্চুপ রইলেন মীরজাফর।

—বলুন, চুপ করে থাকবেন না।

—কি বলব ?

—কি বলবেন আপনার তা অজানা নয়।

—আজকের মতো আমায় ক্ষমা করুন গভর্নর সাহেব। আমি অত্যন্ত ক্লান্ত বোধ করছি। প্রাসাদে ফিরতে চাই।

ভ্যান্সিটার্ট বললেন, মুর্শিদাবাদে আমি আর সময় নষ্ট করতে চাই না। আপনার উত্তর বিলম্বে পেলে আমার অসুবিধা হবে।

আমাকে চিন্তা করতে দিন, পরামর্শ করতে দিন।

আবার অসহায় কণ্ঠে বললেন, কার সঙ্গে পরামর্শ করব ? আমার মীরন আমাকে ছেড়ে চলে গেছে। সে যদি আজ জীবিত থাকত। আপনারা তাকে হত্যা করেছেন—সে স্পষ্ট বক্তা ছিল, আপনাদের কাজের অন্তরায় সৃষ্টি করছিল—আমি জানি পথের কাঁটাকে আপনারা সরিয়ে দিয়েছেন। আমি অন্ধ, আমি নির্বোধ, আপনাদের উপর বিশ্বাস রেখে সর্বনাশের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছি।

এতগুলি কথা ইংরেজের মুখের উপর আর কখনো উচ্চারণ করেন নি মীরজাফর। আজ যে বলতে পারলেন তা শুধু তারা তাঁর চরম স্বার্থে আঘাত হানতে উদ্যত হয়েছে বলেই। ভ্যান্সিটার্ট দেখলেন কথাবার্তার গতি অন্যধারে মোড় নিচ্ছে। এইভাবে চলতে থাকলে শুধু কথা বাড়বে, কাজের কাজ কিছুই হবে না।

তিনি বললেন, আমাদের উপর মিথ্যা দোষারোপ করছেন। তাছাড়া ও প্রসঙ্গ তুলে এখন লাভও নেই। আপনি নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কাতর হবেন না। মসনদ গেলেও, নতুন নবাবকে বলে মোটা অর্থের মাসিক ব্যবস্থা আমরা নিশ্চয় করে দেবো।

—আজকের মতো আমায় রেহাই দিতেই হবে।

তিনি বিদায় সম্ভাষণ পর্যন্ত না জানিয়ে বিদায় নিলেন।

প্রাসাদে ফিরে এলেন মীরজাফর। চিন্তার তলহীন সমুদ্রে ক্রমেই যেতে লাগলেন। স্থূলবুদ্ধি নিয়েও তিনি এখন বুঝতে পেরেছেন তাঁর জামাতা মীরকাশিম এই ষড়যন্ত্রের মূলে আছে। তার টাকার অভাব নেই, সে ইংরেজদের সহজেই খুশী করতে পেরেছে।

মণিবেগমকে কোন কথা বললেন না তিনি।

বলে লাভ কি?

মীরকাশিমও ফতেমাকে কিছু বলেন নি।

ঘুণাক্ষরে জানতে দেন নি তাঁর স্বপ্ন সাফল্যের দ্বারদেশে। জানতে না দেওয়ার কোন গূঢ় অর্থ নেই। শুধু বেগমের মনে চমক লাগাবার জন্য তিনি অপেক্ষা করছেন। শেষ মুহূর্তে বলবেন, তোমার সারতাজ স্বরে বাংলার তাজ মাথায় দিতে চলেছে।

সেই মুহূর্ত উপস্থিত হয়েছে বর্তমানে।

জ্যোতিষীদের বিদায় দিয়ে মীরকাশিম অন্দরে এলেন।

বিশ্রাম কক্ষে প্রবেশ করে মৃদুকণ্ঠে আহ্বান করলেন, বেগম—

ফতেমা ধপধপে সাদা একটি পারাবতের কণ্ঠে ক্ষুদ্রাকৃত মুক্তার মালা পরাচ্ছিলেন। স্বামীর আহ্বানে সচকিত হতেই হাত শিথিল হয়ে গেল, গবাক্ষ পথ দিয়ে পারাবতটি অদৃশ্য হল সেই মুহূর্তে।

ফতেমা অনুযোগ ভরা কণ্ঠে বললেন, আপনার আহ্বানে ভয় পেয়ে আমার গুলনার উড়ে গেল সারতাজ।

মৃদু হাসলেন মীরকাশিম। কয়েক পা এগিয়ে এসে পত্নীর স্কন্ধ স্পর্শ করলেন।

—তোমার গুলনার ফিরে আসবে।

—যদি না আসে।

—মায়া কাটানো এত সহজ নয় ফতেমা। তোমার গুলনার আসবে। আবার ফিরে আসবে দেখো।

স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে বিচিত্র এক সুরে ফতেমা বললেন, দুনিয়ায় এখনও সত্যিই কি মমতা বলে কিছু আছে হজরত? যদি থাকবে তবে আব্বাজান আমাকে এতদূরে ঠেলে রেখেছেন কেন? তিনি আমায় কত ভালবাসতেন, আমার উপর তাঁর প্রগাঢ় মমতা ছিল।

—তুমি ঠিকই বলেছো বেগম। অনেক মনোবিকারকে আমরা ক্রমে ঝেড়ে ফেলে দিচ্ছি। ক্রমে এমন দিন আসবে যেদিন মানুষ পশুর চেয়ে অধম হয়ে যাবে। বেগম—

—সারতাজ—

—তুমি তোমার আব্বাজানকে অত্যন্ত শ্রদ্ধা কর বেগম?

ভ্রূকুঞ্চিত করে ফতেমা বললেন, আমি তাঁকে ঘৃণা করি সারতাজ—আপনি তো জানেন আমি তাঁকে ঘৃণা করি। যবে থেকে মণিবেগমের সমস্ত নক্কারজনক কাজের সহায়ক হয়ে উঠেছেন, সেইদিন থেকে তিনি আমার ঘৃণার পাত্র।

—চিরদিন উনি এমন ছিলেন না বোধহয়?

—না। উনি স্নেহশীল পিতা ছিলেন। তারপর এল ওই নাচওয়ালী, আমাদের সমস্ত সুখ-আনন্দ ছত্রখান হয়ে গেল।—ওই দেখুন গুলনার আবার এসেছে।

মীরকাশিম দেখলেন গবাক্ষের উপর এসে বসেছে পারাবতটি। তার গলায় মুক্তার মালা।

সকৌতুকে উনি প্রশ্ন করলেন, তোমার গুলনার এখনও অনূঢ়া?

—না। ওর সঙ্গী হল ইসরার।

ফতেমার কথা শেষ হবার পরই ইসরার এসে বসল গুলনারের পাশে। দুজনে কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইদলেন পারাবত যুগলের দিকে।

একসময় মীরকাশিম বললেন, এই অসময়ে তোমার কাছে কেন এলাম বলতে পার?

—অসময়ে....হয়েতো....

—আমি এসেছি তোমাকে এমন একটি কথা বলতে যা শোনবার জন্য তুমি হয়তো বহুদিন থেকে অপেক্ষা করছো।

ফতেমা সাগ্রহে তাকিয়ে রইলেন মীরকাশিমের দিকে।

—তুমি তো জানো বেগম, আমার জীবনে কোন মধ্যপথ নেই। হয় নবাবী নয় ফকিরি। ফকির হয়ে দ্বাবে দ্বারে ঘুরে বেড়ানো আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। স্থির করেছি নবাবী করব। বাংলা বিহার উড়িষ্যার জনগণ আমাকে কুর্নিশ করবে।

—সে শুভদিনের জন্য আমি আকুল হয়ে অপেক্ষা করছি হজরত।

—সে শুভদিনের আর বিলম্ব নেই ফতেমা। মাত্র একটি দিন। তরপরই তখ্‌ত মুবারকে তুমি আমাকে আসীন দেখতে পাবে।

—আর একটি দিন !!!

—হ্যাঁ বেগম।

নিজের কাছে বেগমকে আকর্ষণ করলেন মীরকাশিম।

—এই শুভ সংবাদ দিতেই আমি অসময় তোমার কাছে এসেছি। আমার পরিকল্পনা অনুসারে কাজ সন্তোষজনকভাবেই অগ্রসর হচ্ছে। গভর্নর আজই তোমার আব্বাজানকে শেষ কথা জানিয়ে দেবেন।

মীরকাশিম অনুভব করলেন, তাঁর দুবাহুর মধ্যে ফতেমার দেহ কেঁপে উঠল। পরমুহূর্তে বেগম কান্নায় ভেঙে পড়লেন তাঁর বুকে।

আনন্দে এই অশ্রুপাত?

না, পিতার ভবিষ্যৎ চিন্তায় ব্যথাবিদ্ধ মনের বিকাশ?

—বেগম।

—সারতাজ—।

—ফকিরি না করে আমি নবাবী করতে চলেছি, এতে কি তুমি সুখী নও?

অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে ফতেমা বললেন, আমি সুখী। আমার চেয়ে সুখী বাংলা-বিহার-উড়িষ্যায় আজ আর কেউ নেই সারতাজ।

—তবে এই অশ্রু কেন বেগম?

—আবেগকে প্রশমিত করবার এর চেয়ে ভাল পথ আর নেই। আপনি আমার আবেগ মিশ্রিত আনন্দের পরিমাপ করতে পারবেন না।

মীরকাশিম আর কিছু বললেন না। স্ত্রীর মনের ভাব অন্তর দিয়ে অনুভব করবার চেষ্টা করতে লাগলেন। আবেগ প্রশমিত হবার পর ফতেমা বললেন, আব্বাজানের কি হবে?

—কি হওয়া উচিত?

—আপনি আব্বাজানকে হত্যা করবেন সারতাজ?

পলাশীর যুদ্ধে সিরাজের চরম দুর্ভাগ্য-সূচিত হবার পর তোমার আব্বাজান তাঁকে বাঁচার অধিকার দেন নি। সেদিন তিনি বলেছিলেন, পরাজিত শত্রুকে জীবন্ত রাখা ও বিষধর সর্পের সঙ্গে এক কক্ষে বাস করা—সমান ভয়াবহ।

—হজরত—

—তোমার কণ্ঠে কাতরতার আভাষ পাচ্ছি বেগম!

—তিনি আমার জন্মদাতা। আপনার কাছ থেকে তাঁর জীবন আমি ভিক্ষা চাইছি হজরত।

ফতেমা নতজানু হলেন।

পত্নীর মুখের দিকে তাকিয়ে উচ্চহাস্য হাসলেন মীরকাশিম। নতজানু অবস্থা থেকে ফতেমাকে তুলে বললেন, তোমার সরস মনের পরিচয় আরেকবার পেলাম। সহস্র অপরাধে অপরাধী হলেও জাফার আলী

তোমার জন্মদাতা একথা আমি ভুলে যাইনি ফতেমা। আমি তোমাকে পরীক্ষা করছিলাম মাত্র। তাঁকে হত্যা করা হবে না। গভর্নর সাহেবের সঙ্গে কথা হয়েছে, তিনি ইংরেজের আশ্রয়ে থাকবেন কলকাতায়। তাঁর জীবন ধারণের ও আমোদ-আহ্লাদের সমস্ত ব্যয়ভার আমি বহন করব।

স্বস্তির নিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন ফতেমা।

তাঁর স্বামীর মতো বিবেচক স্বামী আর কোন নারীর আছে কিনা গভীরভাবে চিন্তা করতে আগ্রহ হতে লাগল তাঁর।

—কি চিন্তা করছ বেগম?

—ভাগ্যের বিচিত্র গতির কথা মনে পড়ছে হজরত।

—ভাগ্যকে বিশ্বাস করা ছাড়া আমাদের আর কোন পথ নেই। ও সমস্ত গুরুগম্ভীর কথা এখন থাক। রোবাই শুনবে বেগম?

—রোবাই— ?

—বহুদিন তোমাকে রোবাই শোনাই নি। শুনবে—

—শুনব।

পরের দিন মীরজাফর কথা দিয়েও মুরাদবাগ প্রাসাদে এলেন না। বহুক্ষণ অপেক্ষা করে থাকার পর ভ্যান্সিটার্ট তাকালেন কাউলর্ডের দিকে। অর্থাৎ সমস্ত দিক বাঁচিয়ে এখন তাদের কি করণীয়।

কাউলর্ড বললেন, আপনি কেন এত ইতস্তত করছেন আমি বুঝতে পারছি না। পল্টন মার্চ করিয়ে দিন। জাফার আলী পালাবার পথ পাবে না।

—আমি তাড়াতাড়ি রক্তপাতের মধ্যে যেতে চাইছি না কর্নেল। ভ্যান্সিটার্ট শান্তিপ্রিয় মানুষ। তিনি চিন্তা করে রেখেছেন, কোন রকম গোলমাল না করে যদি সমস্ত বিষয়টি সমাধান হয়ে যায় তবে গোলমালের মধ্যে গিয়ে লাভ কি।

—রক্তপাতের কোন প্রশ্নই ওঠে না। হুমকি প্রদর্শনেই: সমস্ত কাজ সমাধা হবে বলে আমি মনে করি।

—আপনি হয়তো ঠিকই বলছেন। তবু নবাবকে আরো একটা সুযোগ আমায় দিতেই হবে।

—কি ধরনের সুযোগ দিতে চান?

—চব্বিশ ঘণ্টা সময় আমি তাঁকে দেব। এই সময়ের মধ্যে মীরকাশিমের অনুকূলে তাঁকে মসনদ ত্যাগ করতে হবে।

চব্বিশ ঘণ্টা সময় দেওয়ার কথা মীরজাফরকে জানিয়ে দেওয়া হল। কাজের কাজ কিছুই হল না। চব্বিশটি ঘণ্টা অতিক্রম করল, মীরজাফর ইংরেজের ডাকে সাড়া দিলেন না। প্রাসাদে যে তিনি নিশ্চেষ্টভাবে বসে রইলেন তা নয়, জর্জিয়ান সুন্দরীদের মনোলোভা নৃত্য অবলোকন করে চললেন ঘণ্টার পর ঘণ্টা।

হিন্দুদের আজ শ্রেষ্ঠ উৎসবের দিন। আজ বিজয়া দশমী। হিন্দু অমাত্যরা সিদ্ধির নেশায় বুঁদ হয়ে বসে আছেন নৃত্যের আসরে। অসংলগ্নকণ্ঠে নূপুরের ছন্দকে প্রশংসা করছেন কেউ কেউ। নবাবও আজ আকণ্ঠ সিদ্ধি পান করেছেন। রক্তাভ দৃষ্টি তুলছেন নর্তকীদের দিকে। তাদের রূপ সুধাও পান করছেন বোধহয়।

সন্ধ্যা উত্তীর্ণ হবার পর নবাব নৃত্যের আসর ত্যাগ করলেন। চলে গেলেন নিজের মহলে। শয়নকক্ষে প্রবেশ করে দেখলেন, উদ্বিগ্ন মুখে দাঁড়িয়ে রয়েছেন তাঁর আদরের মণিবেগম।

নবাবের কাছে এগিয়ে গিয়ে মণিবেগম বললেন, বড়ই অশুভ সংবাদ কানে এসেছে মালেক।

গম্ভীর কণ্ঠে মীরজাফর বললেন, কোন অশুভ সংবাদ তুমি শুনেছো?

—কাশেম আলী আপনার বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত। মসনদের লোভে অর্থ দিয়ে সে ইংরেজদের দলে টেনেছে। শেঠেরাও তার পক্ষে। এই ভয়াবহ সংবাদ সত্য হজরত?

—কে তোমায় এই সমস্ত সংবাদ দিয়েছে বেগম ?

—বাঁদী শুনে এসেছে মীর্জা শামসুদ্দিনের কাছ থেকে।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন নবাব।

—শামসুদ্দিন! যে আমায় প্রকাশ্য দরবারে ক্লাইভের গর্দভ বলেছিল? সে তো বলবেই বেগম : শামসুদ্দিনের মতো লোকেরাই তো এখন লাভবান হবে। ওরা প্রচার চালিয়ে যাচ্ছে মীরকাশিমের পক্ষে—মীরকাশিম ওদের সোনায় মুড়ে দেবে।

—কথাটা তাহলে ভুল নয়?

—আর কি শুনেছে তোমার বাঁদী? ফতেমা তার আব্বাজানের বিরুদ্ধে কতটা প্রতিহিংসাপরায়ণ হয়ে পড়েছে সে সম্পর্কে কিছু শুনেছে সে?

—হজরত—মালেক—

—আমি ক্লান্ত—আমি ভীষণ ক্লান্ত। আমি একা থাকতে চাই। আর কোন প্রশ্ন ক'রো না মণিবেগম। আমাকে কিছুক্ষণ একা থাকতে দাও।

মণিবেগম আর কিছু বললেন না। তিনি যা শুনেছেন তা যে বর্ণে বর্ণে সত্য সে সম্বন্ধে তাঁর কোন সন্দেহ রইল না। অন্ধকারাচ্ছন্ন মন নিয়ে তিনি কক্ষান্তরে গেলেন।

রাত্রি গভীর।

ঘুমের আবরণে ঢাকা পড়ে আছে মুর্শিদাবাদ। প্রাসাদও নিস্তব্ধ। নবাব নিজের শয্যায় অকাতরে নিদ্রিত। বহুক্ষণ দু'চোখের পাতা এক করতে পারেন নি মণিবেগম। অজস্র চিন্তা তাঁকে বিভ্রান্ত করে রেখেছিল। তারপর একসময় ক্লান্ত হয়ে নিদ্রিত হয়ে পড়েছিলেন। কতক্ষণ নিদ্রিত ছিলেন তার হিসেব মণিবেগম রাখেন নি। কিসের

শব্দে আচমকা তাঁর নিদ্রাভঙ্গ হল। শয্যায় উঠে বসে উৎকর্ণ হবার প্রয়োজন হল, পরিষ্কার কোলাহলের শব্দ শুনতে পাওয়া গেল।

কিসের কোলাহল। এই গভীর রাত্রে প্রাসাদের নিকট কোনরকম কোলাহল হওয়া তো উচিত নয়। গভীর আগ্রহ নিয়ে শয্যা থেকে নামলের মণিবেগম। গবাক্ষের নিকট গিয়ে স্তব্ধ হয়ে গেলেন তিনি। এই মহল থেকেই দরবার-গৃহের অনেকখানি দেখা যায়। মণিবেগম দেখলেন, দরবার আলোকমালায় সজ্জিত। অমাত্যবর্গ যাওয়া আসা করছেন। এমন কি ইংরেজ সৈনিক পুরুষদের কর্মব্যস্ততাও তাঁর দৃষ্টি এড়িয়ে গেল না।

নবাব তখনও নিদ্রিত।

মণিবেগম বাঁদীর মুখ থেকে যা শুনেছেন তাহলে তা মিথ্যে নয়। মীর-কাশিম নিজের স্বরূপ শেষ পর্যন্ত প্রকাশ করেছেন। অভিশপ্ত তখ্‌ত মুবারক তাঁকেও হাতছানি দিয়ে ডেকেছে।—প্রাসাদ কি ঘেরাও করেছে ইংরেজ সৈন্য? দরবারে কি অকৃতজ্ঞ মীরকাশিমের অভিষেক হচ্ছে?

মণিবেগম কক্ষে আর অপেক্ষা করলেন না। প্রকৃত ঘটনা পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুসন্ধান করবার জন্য দ্রুত প্রস্থান করলেন। নবাবের নিদ্রাভঙ্গ হল। কোলাহলের শব্দে বিহ্বল হয়ে তিনি গবাক্ষের কাছে গেলেন। সেখান থেকে পরিষ্কার দেখতে পেলেন কর্মব্যস্ত দরবার।

টলে পড়ে যাচ্ছিলেন মীরজাফর। কোনরকমে সামলে নিলেন। বুকের মধ্যে হাহাকার করে উঠল। ইংরেজ শেষ পর্যন্ত তাঁকে ত্যাগ করল। তাঁর মসনদের বিলাসকে ভেঙ্গে চুরমার করে দিয়ে কাশেম আলীর পক্ষ নিল।

অসহায় মীরজাফরের মন কান্নায় ভেঙে পড়তে চাইছে। তিনি দ্রুত সরে এলেন গবাক্ষের কাছ থেকে। মণিমাণিক্য খচিত তাজ রাখা ছিল একটি পাত্রের উপর। তাজটি তুলে নিয়ে সাপটে ধরলেন

তিনি। স্বপ্ন দিয়ে ঘেরা এই তাজের প্রতি তাঁর কত মমতা—এই মমতার বস্তুটি এখন হাসমাতউদ্দৌলা মীরজাফর আলীর পরিবর্তে কাশেম আলীর শিরে শোভা পাবে।

বাইরে ইংরেজ সৈন্যরা ড্রাম বাজাতে আরম্ভ করেছে। প্রাসাদের চতুর্দিক থেকে বাজনার শব্দ আসছে। সৈন্যরা প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে সন্দেহ নেই। মীরজাফরের সমস্ত শরীর থরথর করে কাঁপতে আরম্ভ করেছে। তাঁর জীবনের উপর যবনিকা পড়তে বোধ হয় অধিক বিলম্ব নেই।

তাঁর আদরের ছোটে নবাব মীরন তাঁকে ছেড়ে চলে গেছে। মসনদ থেকে তিনি উৎখাত হলেন। জীবনও যাবে। মৃত্যুর পদধ্বনি যেন তিনি শুনতে পাচ্ছেন। আর্তকণ্ঠে চীৎকার করে উঠলেন মীরজাফর, মণিবেগম—মণিবেগম—

কোথায় মণিবেগম। কোন সাড়া পাওয়া গেল না।

কণ্ঠকে আরো উচ্চগ্রামে তুলে আহ্বান করলেন।

কেউ এল না।

সকলেই কি তাঁকে মৃত্যুর কোলে ফেলে চলে গেছে!

সকলেই প্রাসাদ থেকে দূর দূরান্তরে চলে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করেছে মীরকাশিমের শানিত চক্ষু থেকে। তাঁর কথা কেউ মনে রাখে নি। প্রতিদিন সহস্র বার যাঁকে কুর্নিশ করেছে, সদা সর্বদা তটস্থ থেকেছে—সেই তারা তাঁকে মৃত্যুর কোলে ফেলে নিরাপদ আশ্রয়ে চলে গেছে। বেইমান। মণিবেগমও কি ছিন্ন বস্ত্রের মতো তাঁকে পরিত্যাগ করে গেলেন? হয়তো—।

দিশেহারা মীরজাফর এই সময় কার পদশব্দ শুনতে পেলেন।

আসছে—মীরকাশিমের প্রেরিত মৃত্যুদূত এগিয়ে আসছে। না—না—না, মৃত্যুকে ভয় করেন মীরজাফর। তিনি জীবিত থাকতে চান, ভোগ লালসার মধ্যে আরো দীর্ঘদিন জীবিত থাকতে চান।

চীৎকার করে উঠলেন মীরজাফর।

—কে, কে এগিয়ে আসছে? আমি সুবে বাংলার নবাব আদেশ দিচ্ছি, ফিরে যাও—ফিরে যাও তুমি। এই গভীর রাত্রে আমার বিশ্রামের ব্যাঘাত ঘটিও না।

মীর্জা শামসুদ্দিন তাঁকে এসে কুর্নিশ করল।

—কে মীর্জা! মীরকাশিম তোমায় পাঠিয়েছে মীর্জা?

—আমি আপনার গোলাম জাহাঁপনা।

—গোলাম! আমাকে বিদ্রূপ করতে এসেছো? কেনই বা বিদ্রূপ করবে না। বৃদ্ধ, হতভাগ্য জাফার আলী মুর্শিদাবাদের প্রতিটি মানুষের এখন বিদ্রূপের পাত্র।

—আমাকে ভুল বুঝবেন না জাহাঁপনা। মীরকাশিমের নির্দেশে ইংরেজ সৈন্য প্রাসাদ ঘিরে ফেলেছে। চতুর্দিকে বিশৃঙ্খলা। এখনও হয়তো অবসর আছে হজরত। বাহিনীতে এমন কিছু সৈন্য আছে যারা আপনার জন্য প্রাণ দিতে পারে। আদেশ করুন তাদের নিয়ে আমি ঝাঁপিয়ে পড়ি।

মীরজাফরের চোখে অশ্রুর প্লাবন নামল।

—এখনও এমন কিছু লোক আছে যারা আমার জন্যে প্রাণ দিতে পারে। তুমিও! তোমাকে আমি ভুল বুঝেছিলাম মীর্জা। তোমার উপর বিরক্ত হয়েছিলাম সেদিন। তুমি আমায় ক্লাইভের গর্দভ বলেছিলে। সেদিন বিদ্রূপের অর্থ করতে পারি নি। আজ মনে হচ্ছে তখ্‌ত বসবার পর সমস্ত কাজ আমি গর্দভের মতোই করেছি।

—আদেশ করুন মালেক?

—আদেশ! কোন ফল হবে না মীর্জা, অনর্থক রক্ত ব্যয় হবে। এই বিপদের সময় তুমি যে সাহায্য করতে এসেছো এজন্য আমি কৃতজ্ঞ। যাও এখানে অপেক্ষা করে নিজের মৃত্যুকে আহ্বান ক'রো না।

মীর্জা শামসুদ্দিন কুর্নিশ করে বিদায় নিল।

ইংরেজরা ড্রাম বাজিয়ে মার্চ করছে। ছন্দবদ্ধ শব্দ ক্রমেই দ্রুত হচ্ছে। রক্তলোলুপ বেনিয়া ইংরেজ। দীর্ঘনিঃশ্বাস মোচন করলেন মীরজাফর। ওদের সাহায্য নিয়ে তিনি সিরাজকে পর্যুদস্ত করেছিলেন। আবার ওদেরই সাহায্যে মীরকাশিম তাঁকে করায়ত্ত করার জন্য এগিয়ে আসছে। বিচিত্র পরিহাস। এইভাবেই বোধহয় ভাগ্যের পাশা উল্টে যায়।

মীরজাফর অস্থিরভাবে পদচারণা করতে লাগলেন। মর্মন্তুদ ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে অস্থিরতার শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছালেন। এই সময় তাঁর মনে হল, প্রচণ্ড অট্টহাসিতে কে যেন খান খান হয়ে যাচ্ছে। কে? সিরাজ! বাংলার বৃদ্ধ নবাব নিমীলিত চক্ষে যেন দেখলেন, দ্বারপ্রান্তে রক্তাক্ত কলেবর বাংলার প্রাক্তন তরুণ নবাব সিরাজ এসে দাঁড়িয়েছেন। দুর্নিবার আবেগে হেসে চলেছেন তিনি। একসময় হাসি সংবরণ করে মনে হল তিনি যেন বলছেন, জাফর আলী, আজ তুমি বুঝতে পেরেছো কি, মানুষ নিজের জীবনকে কত ভালবাসে? কত মায়া? সেদিন আমিও বাঁচতে চেয়েছিলাম। পলাশীর প্রান্তে বিশ্বাসঘাতকতা করে যেদিন তুমি বাংলার স্বাধীনতাকে ইংরেজের হাতে বিকিয়ে দিলে—সেদিন আমি তোমার কাছ থেকে কিছু চাই নি, মণি-মাণিক্য, হীরা-জহরত, জায়গীর, কিছুই না। চেয়েছিলাম শুধু নিজের জীবন। নতজানু হয়ে সকাতরে বলেছিলাম, আমায় বাঁচতে দাও—বাঁচতে দাও আমায়। সেদিন তুমি হেসেছিলে। উপেক্ষার হাসি হেসে পদাঘাতে আমায় দূরে নিক্ষেপ করেছিলে। আলীবর্দির অতি আদরের সিরাজের জীবন তুমি নিভিয়ে দিয়েছিলে, নিজের কদর্য খেয়ালের বশবর্তী হয়ে।

আজ! আজ আমি হাসছি। জীবনের পরপারে এসেও তোমার দুরবস্থা দেখে আমি হাসছি। মহম্মদী বেগের মতো নরঘাতকের অভাব নেই দুনিয়ায়। তুমি কি সেই নিষ্ঠুর নরঘাতকের পদধ্বনি শুনতে পাচ্ছ? নিষ্কণ্টক হবার জন্য মীরকাশিম তাকে পাঠিয়েছে তোমার

বিরুদ্ধে। মহম্মদীবেগের তীক্ষ্ণ অস্ত্র যখন আমার পঞ্জর ভেদ করেছিল, রক্তাক্ত কলেবরে আমি প্রাচীরে প্রাচীরে প্রতিহত হয়েছিলাম বাঁচার আকুল আগ্রহ নিয়ে। তুমিও—রক্তস্নাত অবস্থায় যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু বরণ করবে। বিশ্বাসঘাতকতার উপযুক্ত পুরস্কার আল্লাহ্ তোমায় দেবেন।

আর্তকণ্ঠে মীরজাফর বললেন, আমায় তুমি ক্ষমা কর সিরাজ। আমি পাপী—মহাপাপী। ইবলিসের প্রভাবে আমি পলাশীর প্রান্তে জ্ঞানহারা হয়েছিলাম। তোমার রক্তে আমার দু'হাত রঞ্জিত। বিশ্বাস কর, আজীবন আমি এরকম ছিলাম না। তোমার শ্রদ্ধেয় পিতামহ আলীবর্দি খাঁ-ই আমাকে বিশ্বাসঘাতকের পাঠ দিয়েছেন।

—বেইমান—প্রাতঃস্মরণীয় নামকে কলঙ্কিত ক'রো না।

—কলঙ্কিত করি নি। সে চিত্র আজও আমার মনের মধ্যে উজ্জ্বল হয়ে আছে। আলীবর্দি তখন বাংলার সেনাপতি। আমি তাঁর সহচর। কৌশলে তিনি নবাব সরফরাজ খাঁকে গিরিয়ায় নিয়ে গেলেন। নিষ্ঠুর ভাবে তাঁকে হত্যা করে তখ্ত মুবারক অধিকার করলেন। সেইদিন থেকে আমার মনেও...

মীরজাফরকে কথা শেষ করতে দিলেন না সিরাজ। উচ্চহাস্যে চতুর্দিক প্রকম্পিত করে বললেন, চমৎকার তোমার যুক্তি জাফার আলি। আলীবর্দির দৃষ্টান্ত অনুসরণ করে বিশ্বাসঘাতক হতে পারলে, প্রজাপালক তো হতে পারলে না। ধিক তোমার মানব জন্ম।

—আমি অপদার্থ, আমি নরকের কীট। আজ আমার কিছুই চাই না, শুধু বাঁচতে চাই, তুমি যেমন চেয়েছিলে। তখ্ত, তাজ গেছে, যাক। জায়গীর, ধনরত্ন, সুন্দরী নারী কিছুতেই আমার আসক্তি নেই। আমি শুধু বুক ভরে নিশ্বাস নিয়ে, এই দুনিয়ায় আরো কিছুদিন কাটিয়ে যেতে চাই।

—বাঁচতে চাও। ঘাতকের খড়্গকে তোমারও এত ভয়। আমার কাছে

কাতরতা প্রকাশ করে লাভ নেই। মীরকাশিমের কাছে যাও। তার মতো মহানুভব মানুষ সুবে বাংলায় আর নেই। কাতরতা দেখে সে হয়তো তোমায় ক্ষমা করতে পারে। জাফার আলি এখন বুঝতে পারছ কি, জীবন নেওয়া কত সহজ, আর জীবন দেওয়া কত শক্ত?

দ্রুতপায়ে সিরাজের দিকে এগোলেন মীরজাফর। কিন্তু দ্বারের নিকটবর্তী হবার পূর্বেই কিসে প্রতিহিত হয়ে ভূমিশয্যা গ্রহণ করলেন। যন্ত্রনায় আর্তনাদ করে উঠলেন বৃদ্ধ নবাব। ঠিক সেই মুহূর্তে কক্ষে প্রবেশ করলেন মণিবেগম। মীরজাফরকে ওইভাবে শায়িত দেখে দ্রুত কণ্ঠে বললেন, জাহাঁপনা, একি—সিরাজ এসেছিল বেগম।

—সিরাজ।

—সেই সিরাজ যাকে আমি নিষ্ঠুরভাবে হত্যা করেছি।

—আপনি স্বপ্ন দেখছেন হজরত। নষ্ট করার মতো সময় এখন আর নেই। আসুন, আমরা গুপ্ত দ্বার দিয়ে প্রাসাদ ত্যাগ করি।

—কোথায় যাব?

—এমন কোথাও যেখানে মীরকাশিমের প্রতিহিংসার আগুনের আঁচ আমাদের দেহ স্পর্শ না করে।

—তেমন স্থান সুবে বাংলায় নেই বেগম। যেখানেই যাই না কেন, ছায়ার মতো মৃত্যু আমাদের অনুসরণ করবেই।

মণিবেগম আর কিছু বলবার অবকাশ পেলেন না। অলিন্দ ভারী বুটের শব্দে মুখরিত হয়ে উঠল। একজন ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ অসংকোচে কক্ষে প্রবেশ করল। অভিবাদন করে বললে, ইওর এক্সেলেন্সি, এই প্রাসাদ ত্যাগ করবার সময় আপনার উপস্থিত হয়েছে।

—কিন্তু—মীরজাফর বললেন, আমি বাঁচতে চাই সাহেব। আমার বেঁচে থাকার কোন ব্যবস্থা করে দিতে পার?

—আপনার সামনে দুটি পথ খোলা আছে ইওর এক্সেলেন্সি। উভয় ক্ষেত্রেই আপনার জীবন হানি ঘটবে না এ বিশ্বাস আমার আছে।

—কোন্ পথ?

—প্রথম, আমাদের আশ্রয়ে কলকাতায় গিয়ে থাকতে পারেন। দ্বিতীয়, নতুন নবাবের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা করে এখানেই থেকে যেতে পারেন।

মণিবেগম বললেন, মীরকাশিমের কাছে আশ্রয় প্রার্থনা আর মৃত্যুকে আমন্ত্রণ করা একই কথা। হাতের মুঠোয় পেলে সে আমাদের নিষ্ঠুর-ভাবে হত্যা করবে।

এই সময় তীক্ষ্ণ নারী কণ্ঠে কে বলে উঠল, তুমি ভুলে যাচ্ছ নাচওয়ালী মুন্নিবাঈ, মীরকাশিম—মীরকাশিম, মীরকাশিম মীরজাফর নয়। কথার মূল্য সে দিতে জানে। ইংরেজদের পূর্বেই জানিয়ে দিয়েছে, প্রাক্তন নবাব সম্পর্কে সে নির্লিপ্ত থাকবে।

সকলে দেখলেন, দ্বারপ্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছেন ফতেমা।

এক মুহূর্তে মণিবেগমের সমস্ত রক্ত হিম হয়ে গেল যেন।

কম্পিত কণ্ঠে মীরজাফর বললেন, ফতেমা, বেটি আমার—

—ওকথা উচ্চারণ করবেন না। আপনার সঙ্গে সম্পর্ক রাখতে আমি ঘৃণা বোধ করি।

—ঘৃণা! আমি তোমার জন্মদাতা ফতেমা।

—আমার দুর্ভাগ্য। আপনার মতো দেশদ্রোহী, অপদার্থ, নাচওয়ালীর ক্রীড়নক আমার জন্মদাতা, শিরায় শিরায় বইছে ওই ক্লেদাক্ত রক্ত মনে উদয় হলেই নিজেকেও অপরাধী বলে মনে হয়। নাচওয়ালী মুন্নিবাঈ, নীরব কেন? কল্পনাও করতে পার নি বোধহয় তোমার সাধের বেগম-গিরি এইভাবে শেষ হয়ে যাবে।

মণিবেগম নিজেকে ফিরে পেয়েছিলেন। আড়ষ্টভাব কেটে গিয়েছিল। তিনি বললেন, ইংরেজদের আশ্রয়ে আমরা চলে যাব স্থির করেছি। অনর্থক কথা বাড়িয়ে পরিস্থিতি আর ঘোরাল করতে চাই না।

—চলে যাবে।—কয়েক পা এগিয়ে ফতেমা বললেন, তোমার স্বামীর

জীবন দান করেছেন আমার স্বামী। তোমার নয়। তুমি কোথায় যাবে? যদি তোমাকে অর্ধদগ্ধ করে ফেলে রাখা হয়? মুন্নিবাঈ, তিল তিল করে অনুভব করবে মৃত্যুর জ্বালাময় অনুভূতি।
ভয়ার্তকণ্ঠে মণিবেগম বললেন, আমায় হত্যা করবে?
—ইচ্ছে করলেই করতে পারি। তোমার ব্যবহার আমার মনে আগুন জ্বালিয়ে রেখেছে। মনে পড়ে মুন্নিবাঈ, এই কক্ষে আমি সেদিন এসেছিলাম প্রার্থনা নিয়ে, তুমি চূড়ান্ত অপমান করে আমায় বহিষ্কৃত করেছিলে। সেদিন কল্পনাও করতে পার নি বোধহয় যে তোমার ভাগ্যাকাশে কালো মেঘ জমছে।
কণ্ঠে মিনতি ঢেলে দিয়ে মীরজাফর বললেন, আমার জীবন ভিক্ষা যখন দিলে, মণিবেগমের জীবন নিও না ফতেমা। মণিবেগমের সাহচর্য না পেলে একটি দিনও আমি জীবিত থাকব না।
ফতেমা হাসলেন। শ্লেষের হাসি।
—ভয় নেই, একটি নাচওয়ালীকে হত্যা করে আমার স্বামী নিজের হাত কলঙ্কিত করবেন না। যান, ইংরেজের আশ্রয়ে গিয়ে মুন্নিবাঈকে নিয়ে নিজের নারকীয় জীবন দীর্ঘতর করুন।
ফতেমা আর অপেক্ষা করলেন না।
ঘৃণার দৃষ্টি হেনে স্থান ত্যাগ করলেন।
এতক্ষণ স্তব্ধভাবে দাঁড়িয়েছিল ইংরেজ সেনাধ্যক্ষ। ফতেমা প্রস্থান করবার পর বললে, ইয়োর এক্সেলেন্সি, সময় নষ্ট করে আর লাভ নেই। এবার প্রাসাদ ত্যাগ করতে হবে।
সেনাধ্যক্ষকে অনুসরণ করলেন মীরজাফর ও মণিবেগম।

দরবারগৃহ লোকে লোকারণ্য।
আমীর ওমরাহবর্গ আসন গ্রহণ করেছেন আসন গ্রহণ করেছেন

হিন্দু অমাত্যগণ। শ্রেষ্ঠীরা আছেন। গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট ও কর্নেল কাউলর্ড জমকাল পোষাকে বিশিষ্ট আসনে উপবিষ্ট রয়েছেন। একদল ইংরেজ পল্টন সারিবদ্ধ ভাবে দাঁড়িয়ে দরবারের শোভা বর্ধন করছে।

নূতন নবাব মীরকাশিমের আজ অভিষেক।

নকীবের হাঁক শোনা গেল। কলগুঞ্জন মুখরিত দরবারগৃহ নিস্তব্ধ হয়ে গেল সঙ্গে সঙ্গে। নকীব হাঁকছে. হুঁশিয়ার, নবাব নাসির উলমুলক ইমতিয়াজদৌলা মীর মহম্মদ কাশেম আলী খাঁ নসরত জঙ্গ বাহাদুর। মীরকাশিম দরবারে প্রবেশ করলেন।

বহুমূল্য পোষাক ও তাজে শোভমান তিনি। দৃঢ় পদে মীরকাশিম তখ্‌ত মুবারকের দিকে অগ্রসর হলেন। হস্তীদন্ত নির্মিত চারটি স্তম্ভের উপর স্বর্ণখচিত চন্দ্রাতপ, চন্দ্রাতপের ছায়ায় তখ্‌ত শোভা পাচ্ছে। এই বিশেষত্ব বর্জিত তখ্‌তের দিকে দৃষ্টিপাত করলে কল্পনা করতে কষ্ট হয়, এই তখ্‌তের জন্য দীর্ঘদিন ধরে রক্তের ছিনিমিনি খেলা চলছে।

সোপান অতিক্রম করে তখ্‌তে উপবেশন করবার পূর্বে মীরকাশিম থামলেন। বহুবার দেখা তখ্‌ত মুবারকের দিকে নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন। একদিকে লিখিত রয়েছে, এই পরম পবিত্র তখ্‌ত সুবে বিহারের অন্তর্গত মুঙ্গের নগরে ১০৫২ সালের ২৭শে সাবান তারিখে দাসানুদাস খাজা নজর বোখারী কর্তৃক নির্মিত।

লিখিত অংশের উপর মীরকাশিমের দৃষ্টি নেই। তিনি দেখছেন মসনদ। তখ্‌তের উপর বহুমূল্য রত্নখচিত রক্তাম্বর যে মসনদ পাতা রয়েছে তিনি তাকিয়ে আছেন সেই দিকে। তাঁর মনে হচ্ছে ওই মসনদ রক্তাম্বর ছিল না, সিরাজের রক্তে রাঙা হয়ে উঠেছে।

এই বিশেষ মুহূর্তে তখ্‌ত মুবারকের বিচিত্র ইতিহাসের কথা স্মরণ পথে উদয় হচ্ছে মীরকাশিমের। সেই ব্রাহ্মণ ক্রীতদাসের কথা মনে পড়ছে; মুসলমান ধর্ম গ্রহণ করে, মুর্শিদকুলী খাঁ নাম নিয়ে যিনি বাদশাহ আওরঙ্গজেবের অনুগ্রহে ধন্য হয়ে এই নগর পত্তন করেছিলেন।

উপবেশন করেছিলেন এই তখ্ত মুবারকে। তারপর অনেক উত্থান পতনের ইতিহাসকে পিছনে ফেলে মসনদ অধিকার করবার আপ্রাণ চেষ্টা করলেন সুজা খাঁ। কিন্তু তাঁর চেষ্টা সফল হল না। তখ্তের অধিকারী হলেন তাঁরই পুত্র সরফরাজ। এই সময় বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে অবতরণ করলেন আলিবর্দি। আলিবর্দির শৌর্য্য ও কর্ম-কুশলতায় মুগ্ধ হয়ে সরফরাজ তাঁকে পাটনার সুবেদারের পদ দিলেন। কৃতজ্ঞতার মূল্য দিতেও পশ্চাদ্পদ হলেন না আলিবর্দি খাঁ, অন্নদাতাকে কুটিল কৌশলে হত্যা করে তখ্ত মুবারক অধিকার করলেন। তারপর—

না, আর চিন্তা করবেন না মীরকাশিম। দ্বিধাও করবেন না। তিনি তখ্তে আরোহণ করলেন। নবাব উপবেশন করার পরই, দণ্ডায়মান আমীর ওমরাহ্ হিন্দু অমাত্য ও ইংরেজ পুরুষরা আসন গ্রহণ করলেন। মাত্র তিন বছর পূর্বে এই দরবার কক্ষে মীরজাফরের অভিষেক সম্পন্ন হয়েছিল। আজ যাঁরা এখানে উপস্থিত আছেন, সেদিন প্রায় সকলেই উপস্থিত ছিলেন। নতমস্তকে আনুগত্য জানিয়েছিলেন মীরজাফরকে। আজ তাঁরাই মীরকাশিমের অনুগ্রহ পাবার জন্য লালায়িত।

মানুষের মনের গতি বিচিত্র।

মীরজাফরের পরিণতি নিয়ে কারুর দুশ্চিন্তা নেই। যেন অতি সাধারণ একটি ঘটনা ঘটেছে। নিত্য নূতনকে অভিবাদন জানাতেই এঁরা অভ্যস্ত। আন্তরিকতার প্রশ্ন এখানে গৌণ। এই মুহূর্তে অনেকেই হয়তো চিন্তা করছেন, এমন দিন সুদূর পরাহত নয় যেদিন মীরকাশিমের দিন ফুরিয়ে যাবে। তাঁরা আবার অভিবাদন জানাবেন, অনুগ্রহ ভিক্ষা করবেন নূতন কোন নবাবের কাছে।

নবাব সময়োচিত ভাষণ দিলেন। শ্রেষ্ঠীদের বললেন, আপনাদের সহযোগিতা আমার কাম্য। বাংলার শাসন ব্যবস্থাকে দৃঢ়হাতে পরিচালিত করবার যে প্রতিজ্ঞা নিয়ে আমি তখ্ত অধিকার করেছি,

আপনাদের পূর্ণ সহযোগিতা না পেলে তা কখনই সফল হতে পারে না। তবু একটি কথা আমি জানিয়ে রাখা প্রয়োজন মনে করি, সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকালে ও প্রাক্তন নবাবের রাজত্বকালে আপনারা মিশ্র মনোভাবের পরিচয় দিয়েছেন। সুবে বাংলার তাতে মঙ্গল হয় নি। অরাজকতা ও বিশৃঙ্খলার নিকটবর্তী হয়েছি আমরা। সুতরাং এখনই আপনারা জানিয়ে দিন আমায় সহযোগিতা করবেন কি বিপক্ষে যাবেন।

শ্রেষ্ঠীবর্গ নিজেদের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় করলেন।

জগৎশেঠ আসন ত্যাগ করে বললেন, সুবে বাংলার সেবায় আমরা পুরুষানুক্রমে নিয়োজিত আছি। ভবিষ্যতে নিজেদের শক্তিসামর্থ্য দিয়ে জাহাঁপনাকে সাহায্য করা আমরা কর্তব্য বলে মনে করব।

—উত্তম। স্মরণ রাখবেন প্রবঞ্চকদের আমি ঘৃণা করি। কঠোর শাস্তির হাত থেকে পরিত্রাণ পাবার কোন সুযোগ আমি দেব না।

ভ্যান্সিটার্ট উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, ইয়োর এক্সেলেন্সি, আমি কিছু বলতে চাই।

—বলুন ?

—নবাব জাফার আলীর অক্ষম শাসনের জন্য দেশে অরাজকতা আরম্ভ হয়েছে। এই কারণেই আমরা আপনার সঙ্গে সহযোগিতা করেছি। বাংলার মসনদের অধিকারী আপনি হয়েছেন। আমাদের কোম্প্যানি আপনার শাসন ব্যবস্থার উপর হস্তক্ষেপ করবে না। তবে আপনি জাফার আলীর মতো সমস্ত বিষয় আমাদের সঙ্গে পরামর্শ করে কাজ করবেন আশা করি।

মীরকাশিম ভ্রূকুঞ্চিত করলেন।

—তা হবার নয় গভর্নর সাহেব। কাশিম আলী নবাবী করতে এসেছে, ইংরেজ কোম্পানির গোলামী করতে নয়।

দরবারগৃহের প্রতিটি মানুষ স্তব্ধ হয়ে গেলেন এই কথা শুনে। স্পষ্টভাবে প্রথম দিনই নবাব এই দুঃসাহসিক মত প্রকাশ করবেন

কেউ কল্পনা করেন নি। শ্রেষ্ঠীবর্গ বিমর্ষ হয়ে পড়লেন। ভ্যান্সিটার্ট কিছু বলতে গিয়েও বললেন না। ক্ষুণ্ণ মনে আসন গ্রহণ করলেন।
মীরকাশিম পরিষ্কার বুঝতে পারলেন সকলের মনোভাব।
তিনি বললেন, আজকের মতো দরবার শেষ হল।
বাংলার ঐতিহাসিক সংক্ষিপ্ত অভিষেক দরবারের পরিসমাপ্তি ঘোষণা করে নবাব মীরকাশিম জেনানা মহলে চলে গেলেন। এখন তিনি তাঁর প্রিয়তমাকে রোবাই পড়ে শোনাবেন।

দিন দুয়েক লাগল অভিষেকের উৎসব শেষ হতে। আর কেউ তখ্‌তে বসলে উৎসবের জের চলত পক্ষকাল ধরে। কিন্তু সে মেজাজের মানুষ মীরকাশিম নন। নৃত্য গীত তিনি পছন্দ করেন না। এমন কি অভিষেকে কোন উৎসব করবার অভিপ্রায় তাঁর ছিল না। নৃত্য গীত বর্জিত সংক্ষিপ্ত অনুষ্ঠানের মধ্যে শেষ হবে অভিষেক-পর্ব এই তাঁর মনোগত ইচ্ছে ছিল।
কিন্তু ফতেমার অনুরোধ উপেক্ষা করতে পারলেন না।
অনুযোগ মিশ্রিত কণ্ঠে ফতেমা বললেন, অভিষেকে উৎসবের ব্যবস্থা না হলে আমার বহুদিনের একটা ইচ্ছে অপূর্ণ থেকে যাবে হজরত।
কাজেই উৎসবের ব্যবস্থা হল। তবে মাত্র দুদিনের জন্য।
উৎসব অন্তে মীরকাশিম কাজে নামলেন। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পেরেছিলেন প্রচুর অর্থ সংগ্রহ করতে না পারলে তখ্‌তের উপর নিজের দাবিকে দীর্ঘদিন স্থায়ী করা যাবে না। নবাবী ফৌজের বহুদিনের মাইনে বাকী তা প্রথমে চুকিয়ে দিতে হবে। সর্ত অনুসারে ইংরেজদের প্রচুর অর্থ তো দিতেই হবে, উপরন্তু মীরজাফর যে বিপুল অঙ্ক বাকী রেখেছেন তাও দিতে হবে কোম্পানিকে।
তখ্‌ত অধিকার করবার দ্বিতীয় দিন তিনি নবাবী তোষাখানায়

গিয়েছিলেন। তাঁর বিশ্বাস ছিল মোটা অঙ্কের অর্থই পাওয়া যাবে সেখানে, কিন্তু তাঁকে নিরাশ হতে হল। তোষাখানায় পাওয়া গেল মাত্র কয়েক হাজার টাকা ও কিছু মূল্যবান তৈজসপত্র। বুঝতে পারা যায় মীরজাফর নিজের খেয়াল খুশীতে হাজার হাজার আশরফি ব্যয় করে গেছেন।

নিরাশায় ভেঙে পড়লে চলবে না। সমস্ত কিছু ধীর স্থিরভাবে সামলে নিতে হবে। তিনি নিজের ব্যক্তিগত অর্থ দিয়ে কিছু সময়ের জন্য পাওনাদারদের শান্ত করলেন। তারপর চিন্তা করতে লাগলেন প্রচুর অর্থ সংগৃহীত হয় কি ভাবে। প্রচুর চিন্তা করবার পর তিনি আহ্বান করলেন ইব্রাহিমকে। সে দীর্ঘদিন থেকে অর্থদপ্তরের সঙ্গে যুক্ত আছে এবং হিসাবপত্রের ব্যাপারে অত্যন্ত পাকা লোক। ইব্রাহিমকে নিজের মনোগত ইচ্ছে জানিয়ে তিনি জানতে চাইলেন, অর্থ সংগ্রহের কোন পথ সে সংগ্রহ করতে পারে কি না?

ইব্রাহিম ইতস্তত করে বললে, পথ অবশ্যই আছে জাহাঁপনা। আপনি হয়তো সে পথে অর্থ সংগ্রহ করা বাঞ্ছনীয় মনে করবেন না।

—যে কোন পথ দিয়েই অর্থ আসুক না কেন তা আমায় গ্রহণ করতে হবে ইব্রাহিম। তুমি বিন্দুমাত্র সঙ্কোচ না করে তোমার পরিকল্পনা আমায় জানাও।

—প্রাক্তন নবাবের আমলে তাঁর বিশ্বাসী কর্মচারীরা প্রচুর অর্থ আত্মসাৎ করে বসে আছে। জাহাঁপনা, কিঞ্চিৎ বলপ্রয়োগ করলে ওই অর্থ সহজেই তোষাখানায় সংগৃহীত হতে পারে।

মীরকাশিম চিন্তা করে দেখলেন ইব্রাহিমের প্রস্তাব সময়োচিত।

তিনি বললেন, তোমার প্রস্তাব গ্রহণযোগ্য বলেই মনে হচ্ছে। অবিলম্বে তুমি অসৎ উপায়ে অর্থ সংগ্রহকারীদের একটি তালিকা প্রস্তুত করে আমায় দাও। ইব্রাহিম কুর্নিশ জানিয়ে বিদায় নিল।

এবার আরম্ভ হল মীরকাশিমের অর্থ সংগ্রহের খেলা।

মীরজাফরের শাসনকার্যে শৈথিল্য ও অপরিণামদর্শিতার জন্য কয়েকজন নিম্নপদস্থ কর্মচারী যোগ্য ব্যক্তিদের পরিবর্তে দরবারের উচ্চ পদগুলি অনায়াসে অধিকার করেছিল। কিনুরাম, মুন্নালাল ও চুনিলাল—অযোগ্য ব্যক্তিদের মধ্যে প্রধান ছিল। এই তিন ব্যক্তি ভৃত্য হিসাবে নিজেদের কর্মজীবন আরম্ভ করেছিল। পরবর্তিকালে তারা মীরজাফরের প্রভূত প্রশ্রয় পেয়ে মন্ত্রী পর্যায়ে গিয়ে পৌঁছাল। মীরজাফর ত্রিমূর্তিকে অত্যন্ত বিশ্বাস করতেন। বিশ্বাসের পরিপূর্ণ মর্যাদা তারা দিয়েছিল—প্রচুর ধনরত্ন ও আশরফি কুক্ষিগত করে তোষাখানাকে শূন্য করে তুলেছিল।

নবাব কেনারাম, মুন্নালাল ও চুনিলালকে আহ্বান করে জানিয়ে দিলেন তারা অসৎ উপায়ে যে অর্থ সংগ্রহ করেছে তা যেন অবিলম্বে নবাব সরকারে জমা দেওয়া হয়। তারা প্রমাদ গুণল। তবু স্বাভাবিক কণ্ঠেই তারা জানাল, তাদের হাত দিয়ে সরকারের হাজার হাজার টাকা আনাগোনা করেছে ঠিকই; তবে সমস্তই খরচ খরচা হয়েছে কিংবা তোষাখানায় জমা হয়েছে। নিজেদের জন্য তারা একটি আধলাও সংগ্রহ করে নি।

মীরকাশিম ও প্রসঙ্গে আর কিছু না বলে, তাদের কয়েদখানায় নিয়ে যাবার আদেশ দিলেন। তাদের গৃহখানা তল্লাস করে পর্যাপ্ত অর্থ পাওয়া গেল। নবাব আলীবর্দীর আমলের ধনী পুরনো কর্মচারীরা—যাঁরা অবসর জীবন যাপন করছিলেন তাঁদেরও রেহাই দিলেন না মীরকাশিম। হাজার হাজার কালো টাকা তোষাখানায় জমা হতে লাগল।

এই সূত্রে আরেকটি কাজ মীরকাশিম করলেন। সংগঠন করলেন গুপ্তচর বাহিনী। এই গুপ্তচরদের কাজ হল, সংবাদ সংগ্রহ করা, রাজ্যের কোন্ কোন্ ব্যক্তি অন্যায়ভাবে নবাব সরকারের অর্থ আত্মসাৎ করেছে। এই উপায় অবলম্বন করায় তোষাখানা পূর্ণ হতে চলল।

একমাত্র দরিদ্র ছাড়া অর্থ সংগ্রহের ব্যাপারে মীরকাশিম সমাজের আর কোন স্তরের মানুষকে রেহাই দিল না।

মুর্শিদাবাদের উপর তখন সন্ধ্যা নেমে আসছে।

মেঘ মেদুর সন্ধ্যা।

রাজধানীর জীবনস্রোত প্রবল আলোড়নে বয়ে চলেছে। কোন বিদেশী এসে বিন্দুমাত্র ধারণা করতে পারবে না, সম্প্রতি বিরাট এক রাজনৈতিক পরিবর্তন এখানে ঘটে গেছে। যেমনটি ছিল মুর্শিদাবাদ ঠিক তেমনি আছে। কখন শান্তিপূর্ণভাবে যে রাষ্ট্রবিপ্লব ঘটে গেছে তা যেন জানা নেই প্রাচ্যের এই বিরাট নগরীর।

গোধূলির শেষ রেশ মিলিয়ে গিয়ে প্রগাঢ় সন্ধ্যা নামল।

রসিক নাগরিকরা উত্তম বেশভূষায় সজ্জিত হয়ে মুর্শিদাবাদের সুবিখ্যাত বারবধূর পল্লীতে চলেছে। এই পল্লীর আয়তন যে কোন ছোটখাট নগরের সমান। এখানে লোহিত সাগরীয় অঞ্চলের সুন্দরী থেকে আরম্ভ করে সুদূর জর্জিয়া দেশের পিঙ্গল নয়না সুন্দরী—সকল দেশের সকল শ্রেণীর বারবধূর সাক্ষাৎ পাওয়া যাবে। হিন্দুস্থানের সমস্ত অঞ্চলের ধনীব্যক্তিরা সুযোগ-সুবিধা পেলেই এখানে পদার্পণ করেন মনের ও দেহের ক্ষুধা মেটাতে। বিনিময়ে বিলিয়ে দিয়ে যান হীরাজহরত ও আশরফি!

এই অঞ্চলের শ্রেষ্ঠ গৃহটির নাম হল মায়ফিল।

মায়ফিল নির্মাণ করিয়েছিলেন মীরজাফরের আদরের ছোটে নাবাব। ঢাকার এক অর্থশালী ব্যক্তির পত্নী ছিল মোহনাজ। মীরন কোন রাজ কার্যেই গিয়েছিলেন ঢাকায়। আতিথ্য গ্রহণ করেছিলেন সেই ধনী ব্যক্তিটির গৃহে। কিভাবে যে পর্দাশীলা মোহনাজের সঙ্গে মীরনের সাক্ষাৎ হয়েছিল তা জানা যায় না।

তবে সেই সাক্ষাৎ যে একটি পরিবারের সমস্ত সুখ শান্তিকে তছনছ করে দিয়েছিল তাতে সন্দেহ নেই। কাজ শেষ করে মীরন মুর্শিদাবাদে ফিরে যাবার এক মাস পরেই, দুর্বৃত্ত কর্তৃক নিহত হলেন ঢাকার ওই ধনী ব্যক্তিটি এবং লুণ্ঠিত হল মোহনাজ। নবাবজাদা যে এই চক্রান্তের নায়ক তা ঢাকার কোন মানুষের পক্ষে বুঝে ওঠা সম্ভব হল না।

বারবধূ পল্লীতে একটি সুরম্য গৃহ ক্রয় করে রেখেছিলেন মীরন। মোহনাজকে ওখানে এনেই তোলা হল। গৃহটির নামকরণ হল মায়ফিল। প্রথম কয়েক দিন মোহনাজ স্বামীর কথা চিন্তা করে চোখের জল ফেলেছিল। তারপর চোখের জল মুছে তাকে মীরনের অঙ্কশায়িনী হতে হয়েছিল।

মাস আটেক বলতে গেলে প্রতিদিন যাতায়াত করতেন মায়ফিলে মীরন। মোহনাজের সঙ্গে তাঁর সময় কাটত রাত্রি দ্বিতীয় বা তৃতীয় প্রহর পর্যন্ত, তারপর তিনি প্রাসাদে ফিরে যেতেন।

অকস্মাৎ মীরনের মৃত্যুতে সমস্ত ওলট-পালট হয়ে গেল। মোহনাজের অবস্থা অত্যন্ত অসহায় হয়ে পড়বার কথা। কিন্তু কার্য্যক্ষেত্রে তা হল না। এই আট মাসেই নিজেকে সে প্রস্তুত করে নিয়েছিল। ফলাও ব্যবসা ফেঁদে বসল। অনেক পতঙ্গ তার রূপের আগুনে নিজেদের নিশ্চিহ্ন করল। আরো পতঙ্গ এল—তারাও গেল। দুহাতে অর্থ উপার্জন করল মোহনাজ। এই সময় ইব্রাহিম পৌঁছাল মায়ফিলে।

মীরজাফরের কর্মচারীদের মধ্যে সে কোন উচ্চপদের অধিকারী নয়। তবে নবাবের দামাদ মীরকাশিমের প্রিয়পাত্র। সুতরাং তার অর্থের অভাব নেই। মোহনাজ তাকে সাদরে গ্রহণ করল। দ্বিতীয় ব্যক্তির প্রবেশ নিষিদ্ধ হল মায়ফিলে। ভাগ্য ভাল বলতে হবে, এই সময় মীরকাশিম তখ্‌ত অধিকার করলেন। ইব্রাহিম মোহনাজের দৃষ্টির সামনে অনেক রঙান স্বপ্ন তুলে ধরল। কথা দিল মহরমের পর শাদী করবে ওকে।

প্রফুল্ল মনেই ইব্রাহিম মায়ফিলে প্রবেশ করল।

শয়নকক্ষে ছিল না মোহনাজ। তার সন্ধান পাওয়া গেল স্বল্পালোকিত অলিন্দে। ইব্রাহিম বিস্মিত হল। এই সময় প্রতিদিন ও অপরূপ সাজে সজ্জিত হয়ে তার জন্য অপেক্ষা করে। আজ অন্ধকার অলিন্দে কিসের চিন্তায় বিভোর হয়েছে মোহনাজ?

—জানেমান—। মৃদু কণ্ঠে আহ্বান করল ইব্রাহিম।

—কে?

চমকে মুখে ফেরাল মোহনাজ।

—আমি ইব্রাহিম। এই অন্ধকার অলিন্দে দাঁড়িয়ে কার চিন্তায় বিভোর রয়েছ। জানেমান? আমার আসতে তো বিলম্ব হয় নি।

—আমার ভাল লাগছে না আজ কিছু।

—শরীর খারাপ?

—না। মন।

ইব্রাহিম এগিয়ে গিয়ে মোহনাজকে আকর্ষণ করল। সরে গেল সে। কিঞ্চিৎ ক্ষুণ্ণ হল ইব্রাহিম।

—কোন নতুন নওজওয়ান তোমার মনে রং ধরাল নাকি?

—না।

—তবে?

মোহনাজ আলোকিত কক্ষের দিকে এগিয়ে গেল।

ইব্রাহিম ওর মুখের দিকে তাকিয়ে দেখল, সুন্দর মুখে বিষাদের ছায়া।

—কিছু বলছো না যে? কি হয়েছে মেরিজান? আমায় খুলে বল, হয়তো মুশকিল আসান আমিই করতে পারি।

—তুমিই মুশকিল বাধিয়েছো—আসান না করলে আমার সর্বনাশ হয়ে যাবে।

ইব্রাহিমের কৌতূহল উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পাচ্ছিল।

সে মোহনাজকে শয্যার উপর নিয়ে গিয়ে বসাল।

—আমি কৌতূহল দমন করতে পারছি না। কি হয়েছে বল? তোমাকে কি ধরনের মুশকিলে ফেলেছি আমি?

মোহনাজের দুচোখ ছল-ছলিয়ে উঠল।

—আমার সমস্ত অর্থ নবাব সরকার বাজেয়াপ্ত করে নেবে।

—সে কি!

—তুমি বিস্মিত হয়ো না ইব্রাহিম। এরজন্য সম্পূর্ণ দায়ী তুমি ছাড়া আর কেউ নয়।

—আমি! একথা বলছো কেন?

মুখ তুলল মোহনাজ।

হীরের নাকছাবি উজ্জ্বল আলোয় ঝিকিয়ে উঠল।

—তার আগে তুমি বল বিপদ থেকে আমায় উদ্ধার করবে কিনা?

—শোভান আল্লাহ মেরিজান, কি বলছো তুমি! যে কোন বিপদ থেকে তোমায় উদ্ধার করা আমার প্রধান কর্তব্য।

—নবাবকে তুমি পরামর্শ দিয়েছিলে, ধনীদের সঞ্চিত সমস্ত অর্থ গ্রহণ করবার। গতকাল তিনি আদেশ জারি করেছেন, নবাব সরকারের বহু অর্থ মীরজাফর ও মীরনের মারফত আমাদের কাছে এসেছে। সুতরাং অবিলম্বে সেই অর্থ নবাব গ্রহণ করতে চান। তোমার পরামর্শের দরুনই আজ আমি দরিদ্র হতে চলেছি। ভ্রূকুঞ্চিত করে কিছুক্ষণ ঝলমলে ঝাড়লণ্ঠনের দিকে তাকিয়ে রইল ইব্রাহিম অর্থ গৃধ্নু নবাবের কথা চিন্তা করে মন তিক্ত হয়ে উঠল।

—নবাবের দৃষ্টি তোমাদের উপর যখন পড়েছে তখন রেহাই পাওয়া কঠিন। বিলোল কটাক্ষ হেনে মনের মধ্যে জ্বালা ধরিয়ে পরিত্রাণ পাওয়ার উপায় এখানে নেই। নিজের বেগম ছাড়া অন্য নারী সম্পর্কে সম্পূর্ণ নিরাশক্ত নবাব। তবে আংশিকভাবে যাতে রক্ষা পাও তার ব্যবস্থা করে দেওয়া যায়।

—আংশিকভাবে!

হাসল ইব্রাহিম।

—সম্পূর্ণ বেহাত হয়ে যাওয়ার চেয়ে আংশিকভাবে রক্ষা পাওয়া মন্দের ভাল নয় কি? তোমাদের এই অঞ্চলে কারুর গৃহ খানা-তল্লাস হয়েছে?

—হয়েছে। তিনচারজনকে নিঃস্ব করে দিয়ে গেছে।

—কালই হয়তো নবাবের লোক তোমার কাছে পৌঁছাবে। তার আগেই তোমার কাজ গুছিয়ে রাখতে হবে। আর্জি পেশ করবে নবাবের কাছে। তাতে লেখা থাকবে, তুমি ভদ্র ঘরের বধূ ছিলে। মীরন তোমার স্বামীকে হত্যা করে তোমায় এই পেশায় নামিয়েছে। তারপর নিজের সোনার গহনা, হীরা জহরতের তালিকা দিয়ে জানাবে, সমস্তই হজরতের। তিনি গ্রহণ করলে ক্ষুব্ধ হবার কোন কারণ নেই। তবে কানিজের ভবিষ্যতের সমস্ত ব্যবস্থা জাহাঁপনা করে দেবেন এই মিনতি। দেখবে এতেই কাজ হবে।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে মোহনাজ বললে, কি যে সুবিধা আমি বুঝে উঠতে পারছি না। নবাব আমার সমস্ত সোনাদানা বাজেয়াপ্ত করে বলবেন, একটি পেশায় তো নিযুক্ত রয়েছো। জীবিকানির্বাহ করতে তোমার তো কোন অসুবিধা হবার কথা নয়।

—তা তিনি বলবেন না। কারণ নবাবকে আমি তোমার চেয়ে ভাল করে চিনি। দুটি কারণে তোমার সম্পর্কে তাঁর মনে সহানুভূতি জাগবে। প্রথম, মীরন কর্তৃক তুমি অত্যাচারিতা। দ্বিতীয়, সৎসাহসের পরিচয় দিয়ে তুমি নিজের সামর্থ্যের তালিকা তাঁর কাছে পেশ করেছো। বলা বাহুল্য তোমার অস্থাবর সম্পত্তির পুঙ্খানুপুঙ্খ তালিকা তুমি দেবে না।

বিলম্ব না করে আর্জির খসড়া তৈরি করল ইব্রাহিম।

সেদিন আর কোন রসের কথা হল না। কামনার সাগরে অবগাহন করবার ইচ্ছাও হল না দুজনের। মীরকাশিম সমস্ত তাল কেটে

দিয়েছেন। চিন্তিত মনে ইব্রাহিম যখন মায়ফিল থেকে বিদায় নিল তখন বৃষ্টি আরম্ভ হয়ে গেছে।

সৌভাগ্যক্রমে মোহনাজের অস্থাবর সম্পত্তি মীরকাশিম গ্রহণ করলেন না। আর্জির ভাষা এবং ইব্রাহিমের কূট কৌশলে বিভ্রান্ত হয়ে তিনি ওই বারাঙ্গনাকে রেহাই দিলেন। অবশ্য আর কেউ রক্ষা পেল না। বারবধূ পল্লী থেকে, কয়েক লক্ষ আশরফি সংগৃহীত হল। গহনাও পাওয়া গেল প্রচুর।

নবাবকে অভিসম্পাত দিতে দিতে বারনারীরা ঈর্ষাকাতর দৃষ্টিতে মায়ফিলের দিকে দৃষ্টিপাত করতে লাগল। মোহনাজ কি উপায়ে রক্ষা পেল তা জানবার জন্য অনেকে কৌতূহলের শেষ প্রান্তে গিয়ে পৌঁছাল। তবে কেউ কেউ অনুমান করল মীরকাশিমের প্রিয়পাত্র মোহনাজের নাগর ইব্রাহিম এই বিপদের মেঘ কাটিয়ে দিয়েছে।

এক সপ্তাহ পর ইব্রাহিম গেল মায়ফিলে।

অনুযোগ ভরা কণ্ঠে মোহনাজ বললে, কদিন এলে না কেন? ঘরের বিবি আটকে রেখেছিল?

—বিবির সাধ্য কি আমায় আটকে রাখে। নবাব আমায় এক গুরু দায়িত্ব দিয়েছিলেন। সেই কাজ শেষ করতে বিলম্ব হয়ে গেল।

মোহনাজ ইব্রাহিমের বাহুবন্ধনে ধরা পড়ল।

—কাজের মানুষ আমার।

—আমার দিলরুবা।

—তোমাকে ধন্যবাদ জানবার মতো ভাষা আমার নেই। তোমার বুদ্ধিতে আমার সব রক্ষা পেয়ে গেল।

—তখন তুমি তো আমার পরিকল্পনার উপর আস্থা রাখতে পারছিলে না।

—ভুলে যেও না আমি নারী। তোমার মতো তীক্ষ্ণবুদ্ধি পাবো কোথা থেকে বল ?

—তুমি বারাঙ্গনা নও, তুমি ফারিস্তা। আমার জীবনের অনেক অন্ধকারকে দূর করে দিয়েছো তোমার সোনার হাতে প্রদীপ জ্বালিয়ে।

—আমাকে লজ্জা দিও না ইব্রাহিম।

—তোমার লজ্জাবনত মুখ দেখে আমি প্রথম দিন আত্মহারা হয়ে পড়েছিলাম। মীরনকে দোষ দেওয়া যায় না। আমারই মতো অবস্থায় পড়ে সে তোমার স্বামীকে হত্যা করেছিল। আমি তার জায়গায় থাকলে হয়তো, জ্ঞানশূন্য হয়ে ঢাকার অর্ধেক মানুষকে হত্যা করে বসতাম।

মৃদু হেসে মোহনাজ ইব্রাহিমের দেহে মিশে যেতে চাইল।

—একটা কথা বলব ?

—বল ?

—লজ্জা করছে বলতে ?

—আমার কাছে তোমার লজ্জা। বল নাজ ?

মোহনাজ সরে এল ইব্রাহিমের কাছ থেকে।

শয্যায় গিয়ে বসে, মুখ অন্যধারে ফিরিয়ে বললে, মহরমের এখন অনেক বিলম্ব নয় কি ?

—মহরম! ও শাদীর কথা বলছো ? আর একটু ধৈর্য ধরতে হবে আমাদের। দেখতে দেখতে কটা মাস কেটে যাবে।

—তখনও আমায় এই মায়ফিলে থাকতে হবে ?

—না, না—। তুমি হবে আলী ইব্রাহিমের পত্নী। তখন তোমায় কি মানায় এই কদর্য পল্লীতে। তুমি যাবে আমার সুরম্য গৃহে। তবে তোমাকে একটা কাজ করতে হবে আমাদের শাদীর আগে।

—কি কাজ ?

ইব্রাহিম গালিচায় মোড়া কক্ষে কয়েকবার পদচারণা করে বললে,

তুমি নিশ্চয় চাইবে তোমার স্বামী রাজ্যের শ্রেষ্ঠতম পদটির অধিকারী হোক।

মোহনাজ গ্রীবা হেলিয়ে হাসল।

—আগে প্রধান উজীরের পদ ছিল শ্রেষ্ঠতম ও লোভনীয়। মীরকাশিম প্রধান উজীরের পদের চেয়ে প্রধান সেনাপতির পদকে প্রাধান্য দিয়েছেন অধিক। আমি নবাব বাহিনীর প্রধান সেনাধ্যক্ষ্যের পদটি লাভ করতে চাই।

—নবাবের তুমি প্রিয়পাত্র। পদটি প্রার্থনা করলেই হয়তো তুমি পাবে।

—উপায় নেই।—দুঃখিতভাবে মাথা নেড়ে ইব্রাহিম বললে, নবাবের আরেক প্রিয়পাত্র ওই পদটি অধিকার করে বসে আছে। অবশ্য তাকে সরিয়ে দিতে পারলে আমার সম্ভাবনা উজ্জ্বল।

—কে সেই ব্যক্তি ইব্রাহিম?

—গুরগিন খাঁ। মুসলমানী নামের ছদ্মবেশে একজন আর্মেনিয়ান। না, তোমার সাহায্যেই পথের কাঁটা দূর করব স্থির করেছি।

সবিস্ময়ে মোহনাজ বললে,—এবিষয়ে আমি তোমাকে কি সাহায্য করতে পারি?

—পার—একমাত্র তুমিই পার। তোমার রূপের ছটায় গুরগিনকে তুমি পাগল করে দিতে পার। তারপর তার অযোগ্যতা প্রমাণ করতে অসুবিধা হবে না।

—আমি.......

—শেষ বারের মতো, এই শেষবারের মতো ঝলসে ওঠো মেরিজান! দুর্দান্ত মীরনকে তুমি উন্মাদ করে তুলেছিলে, আর ওই আর্মেনিয়ানকে হাতের মুঠোয় আনতে পারবে না? আমি জানি তুমি পারবে। কার্যোদ্ধার যখন হয়ে যাবে তখন তুমি আর মোহনাজবাঈ নেই—প্রধান সেনাধ্যক্ষ আলী ইব্রাহিমের পত্নী, একজন সম্মানিতা মহিলা।

মোহনাজ বহুক্ষণ গবাক্ষের দিকে তাকিয়ে রইল। গবাক্ষ অতিক্রম করে ওর দৃষ্টি কোন্ সুদূরে চলে গেছে ইব্রাহিম জানে না।

এক সময় বললে ও, আমার অমত নেই। কি উপায়ে আমি ওই ফিরিঙ্গীর সঙ্গে পরিচিত হব তুমি বলে দাও?

ইব্রাহিম স্বস্তির নিঃশ্বাস ফেলল।

—বলছি। সমস্ত শুনলে তুমি বুঝতে পারবে কত সরল আমার পরিকল্পনা। এরপর মধ্যরাত্রি পর্যন্ত ওদের পরামর্শ সভা স্থায়ী হল।

তখ্তে বসবার সঙ্গে সঙ্গে হুগলীতে সংবাদ পাঠিয়েছিলেন মীরকাশিম। গুরগিন শুধু মোভাকে নিয়ে যে মুর্শিদাবাদে এল তা নয়, তার সঙ্গে এল একদল আর্মেনিয়ান। এরা নবাববাহিনীতে যোগ দেবে। নবাব গুরগিনকে সমাদরে গ্রহণ করলেন। তার উত্তম বাসস্থানের ব্যবস্থা হল। একদল আর্মেনিয়ান যুবককে সঙ্গে নিয়ে আসবার জন্য তার দূরদৃষ্টতার প্রশংসা করলেন মীরকাশিম। স্বদেশীদের তিনি অবিশ্বাসের চোখে দেখেন। বাহিনীতে তিনি অধিক সংখ্যক বিদেশী সৈন্য নিয়োগ করারই মনস্থ করেছেন।

বলা বাহুল্য গুরগিন প্রধান সেনাধ্যক্ষের পদ লাভ করেছে।

এই নিয়োগে অমাত্যবর্গের মধ্যে কিঞ্চিৎ অসন্তোষ দেখা দিয়েছে সন্দেহ নেই। নবাবের পরই মর্যাদার দিক থেকে প্রধান সেনাধ্যক্ষের স্থান। অথচ সেই পদটি অধিকার করে বসল একজন বিদেশী। মুর্শিদাবাদে নবাব সরকার পত্তনকারী মুর্শিদকুলী খাঁর আমল থেকে আরম্ভ করে আজ পর্যন্ত এই ধরনের বিষদৃশ ব্যতিক্রম দৃষ্টিগোচর হয় নি। মীরকাশিম সকলের মনের ভাব বুঝলেন কিন্তু গ্রাহ্য করলেন না। অটল রইলেন নিজের মনোনয়নে।

গুরগিনের দিন কাটছিল নিরুপদ্রবে।

মনের মতো কাজ পেয়ে সে খুশী।

সময় সময় মোভা বলে, এমনদিন আমাদের আসবে কল্পনাও করতে পারি নি।

—সমস্তই ঈশ্বরের অনুগ্রহ। কত দুঃখ কষ্ট সহ্য করে আমরা এই বিরাট জনপদে এসে পড়েছি। একটি বিশিষ্ট রাজ্যের সৈনাধ্যক্ষের পদ লাভ করেছি। ঈশ্বরের অনুগ্রহ ছাড়া কি?

—সেদিনের কথা তোমার মনে পড়ে গ্রেগ?

—কোন্ দিনের কথা মোভা?

—সেই বৃষ্টিঝরা হিম শীতল রাতের কথা? তুমি অসমসাহসের পরিচয় দিয়ে ক্ষত-বিক্ষত শরীরে আমার শয়নকক্ষে গিয়েছিলে—

—মনে পড়ে। সে রাতের কথা ভুলে যাবার নয়। সেই রাতেই বোধহয় সন্দেহাতীতভাবে প্রমাণ করেছি তোমার প্রতি আমার ভালবাসা কত গভীর। তুমি কি আমারই মতো গভীরভাবে ভালবাস আমাকে?

—না—না—

মোভার কণ্ঠে অভিমানের সুর।

—সত্যকে মিথ্যার রূপ দিচ্ছ তুমি।

—তবে কেন অসঙ্গত প্রশ্ন করছো?

—কেনর সঙ্গত উত্তর নেই।

—নেই?

—না। যদিও আমি জানি ভালবাসার প্রতিযোগিতায় নামতে গিয়ে আমাকে কোন স্বার্থত্যাগ করতে হয় নি। তুমি নিজের সমস্ত সুখ আনন্দ নষ্ট করে অনির্দিষ্ট ভবিষ্যৎ বেছে নিয়েছিলে। তোমার স্বার্থত্যাগ অনেক। তুমিও জানো, আমিও জানি, এই প্রতিযোগিতায় আমি হেরে গেছি। তবুও প্রশ্ন করে জানতে ইচ্ছে হয়।

মোভা হেসেছে।

—তোমার কথাবার্তা শায়ারদের মতো। সেনাপতির গাম্ভীর্যকে তুমি হারিয়ে ফেল।

—তুমি আমার ভালবাসা দেখেছো। এবার আমার কর্তব্য দেখবে। নবাবকে কথা দিয়েছি প্রথম শ্রেণীর বাহিনী তাঁকে গড়ে দেব। সতত আর কর্তব্যে অটল থেকে আমায় এই কাজ করে যেতে হবে।

—তুমি পারবে গ্রেগ।

—প্রেরণা দেবার জন্য তুমি রয়েছো, পারব বই কি।

হুগলী থাকাকালে গুরগিন ফার্সী শিখেছিল ভালভাবে। এখন এই শিক্ষায় তার উপকার হচ্ছে প্রভূত। ফার্সী না জানা থাকলে কথাবার্তা বলতে বা বুঝতে অত্যন্ত অসুবিধা হয়। প্রাণ ঢেলে ইউরোপীয় প্রথায় সৈন্যবাহিনীকে শিক্ষা দিতে লাগল গুরগিন। মীরকাশিম তার কাজ কর্ম দেখে অত্যন্ত সন্তুষ্ট হলেন।

এই সময় আরো একজন শক্তিমান ইউরোপীয়কে তিনি দলে পেয়েছিলেন, তার নাম সমরু। সমরু অবশ্য প্রকৃত নাম নয়—প্রকৃত নাম হল, ওয়াল্টার রাইনহার্ড। বহু যুগ ধরে ইউরোপের অসংখ্য পুরুষকে হাতছানি দিয়ে ডেকেছে এই বিচিত্র দেশ হিন্দুস্থান। এখানে এসেছে কেউ মণি-মাণিক্যের লোভে, কেউ এসেছে ব্যবসার পাকচক্রে এদেশের মানুষকে জড়িয়ে ফেলতে, আবার কেউ এসেছে এই বিরাট দেশকে আন্তরিকভাবে জানবার আগ্রহ নিয়ে।

জার্মান সীমান্তের এক ক্ষুদ্র গ্রামে রাইনহার্ডের জন্ম হয়েছিল। কিশোর বয়সে সেই ক্ষুদ্র গ্রামে বসেই বিরাট দেশ হিন্দুস্থানে যাবার স্বপ্ন সে দেখেছিল। মণি-মাণিক্য সংগ্রহ করবার আগ্রহ তার ছিল না, ছিল না ব্যবসা করার চিন্তা। প্রথম সুযোগেই তরুণ রাইনহার্ড হিন্দুস্থানকে জানবার আগ্রহ নিয়ে যাত্রা করল।

রাইনহার্ড যখন হিন্দুস্থানে পৌঁছাল তখন এখানকার রাজনৈতিক পরিস্থিতি বেশ গোলমেলে। এই দেশে আধিপত্য বিস্তার করবার

জন্য ইংরেজ ও ফরাসীরা পরস্পরের মধ্যে যুদ্ধ আরম্ভ করে দিয়েছিল। জীবিকা অর্জনের জন্য অর্থ চাই, কপর্দক শূন্য রাইনহার্ড। অনন্যোপায় হয়ে করমণ্ডল উপকূলে অবস্থিত ফরাসী বাহিনীতে যোগ দিল।

কিছুদিন ওই বাহিনীতে থাকার পর রাইনহার্ড সকলের অগোচরে করমণ্ডল উপকূল ত্যাগ করল। পদব্রজেই অনেক জনপদ অতিক্রম করে এসে পৌছাল কলকাতায়। ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির কয়েকজন কর্মচারীর সঙ্গে আলাপ হতে বিলম্ব হল না। এই আলাপের জোরেই কোম্পানির বাহিনীতে যোগদান করল। রাইনহার্ডের গায়ের রং ছিল অপেক্ষাকৃত কালো, মুখশ্রী ছিল ভয়াবহ। সহ-কর্মীরা তাকে সাম্বার বলে ডাকতে আরম্ভ করে। পরবর্তী কালে সাম্বার থেকেই সে সমরু নামে খ্যাতি লাভ করে।

ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানির সৈন্য বাহিনীতেও সমরু বেশীদিন থাকতে পারল না নানা কারণে। ইংরেজদের আশ্রয় ছেড়ে সে একদিন যাত্রা করল ফরাসীদের কাছে চন্দননগরে। চন্দননগরে উপস্থিত হওয়ার দরুন এক মস্ত ঝুঁকি নিতে হল সমরুকে। কারণ সে ফরাসী বাহিনী থেকে পালিয়ে গিয়ে ইংরেজদের সঙ্গে যোগ দিয়েছিল। অগত্যা নাম বদলে আবার ফরাসী বাহিনীতে যোগ দিল। ফরাসী গভর্নরের তখন লোকের প্রয়োজন। খোঁজখবর না নিয়েই তিনি তাঁকে দলভুক্ত করে নিলেন।

ফরাসীরা শেষ রক্ষা করতে পারল না।

পরাজিত হল তারা। ইংরেজরা চন্দননগর অধিকার করল। ফরাসীদের রক্তে লাল হয়ে উঠল বাংলার মাটি। অবশ্য কিছু সংখ্যক ইউরোপীয় সৈন্য ইংরেজদের হাত থেকে পালিয়ে আত্মরক্ষা করতে সমর্থ হল। সমরু তাদের মধ্যে অন্যতম পলায়মান ওই সমস্ত সৈন্য অনন্যোপায় হয়ে মুর্শিদাবাদে চলে আসে। নবাব সিরাজদ্দৌলা সকলকে গ্রহণ করেন সাগ্রহে। সুতরাং সিরাজ ও মীরজাফরের পতনের পর

মীরকাশিমের বাহিনীতে যোগ দিতে বিন্দুমাত্র অসুবিধা হল না সমরুর। আরেকজন আর্মেনিয়ান জেনারেল আছে বাহিনীতে। গুরগিন তাকে সংগ্রহ করেছে। নাম মার্কার। এই তিন ইউরোপীয় বীরকে পেয়ে মীরকাশিম নিশ্চিন্ত হয়েছেন। কখনও যদি ইংরেজদের বিরুদ্ধে যুদ্ধে নামতে হয়, তিনি যে জয় লাভ করবেন তাতে তাঁর বিন্দু মাত্র সন্দেহ নেই।

নির্বিবাদে দিন কেটে যাচ্ছিল।

গোলন্দাজ সৈন্যদের শিক্ষা দেবার জন্য দিন নির্দিষ্ট ছিল বুধ ও বৃহস্পতি বার। শিক্ষার ভার গ্রহণ করেছিল স্বয়ং গুরগিন। সেদিন বুধবার। শিক্ষা দেওয়ার জন্য যথা নিয়মে উপস্থিত হয়ে গুরগিন এক বিচিত্র সংবাদ শুনল। শুনল তার অন্যতম সহকারী জয়রাম ছাউনি থেকে অদৃশ্য হয়েছে।

গতকাল থেকে তাকে পাওয়া যাচ্ছে না। গুরগিন বিশেষ চিন্তিত হল। কারণ এখন দিনকাল খুব খারাপ। নবাবের গোলন্দাজ বাহিনী কত-খানি শক্তি সঞ্চয় করেছে তা জানবার জন্য ইংরেজ যদি কৌশলে তাকে ভাঙিয়ে নিয়ে গিয়ে থাকে তবে বিস্ময় প্রকাশের অবকাশ নেই। মীরজাফরের মতো মীরকাশিম তাদের বাধ্য নন। ঠোকাঠুকি একদিন লাগবেই। পূর্বাহ্নেই সংবাদ সংগ্রহ করে রাখা তাদের পক্ষে বিচিত্র নয়।

মহড়া শেষ হবার পর চিন্তিত হয়ে গুরগিন ছাউনিতে ফিরল। জয়রামের সঙ্গে একই তাঁবুতে যারা থাকত তাদের আহ্বান করল। জয়রামের সম্পর্কে আশাপ্রদ কিছুই বলতে পারল না তারা। শুধু জানাল, কাল সকাল থেকে তার সন্ধান পাওয়া যাচ্ছে না।

ঘটনাস্থলে ইব্রাহিম উপস্থিত ছিল।

সে চিন্তিত গুরগিনের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, সত্যি, চিন্তার কথা। এ সম্পর্কে অনুসন্ধান হওয়া প্রয়োজন।

—আপনার সঙ্গে আমি একমত। সে যে বদ মতলব নিয়ে গা ঢাকা দেয় নি তা কে বলতে পারে। কিভাবে তার সম্পর্কে অনুসন্ধান চালান যেতে পারে বলুন তো ?

—জয়রামকে আমি চিনি। তার মতো ভদ্র ও বিনয়ী ছেলে গোলন্দাজ বাহিনীতে দ্বিতীয় নেই। তবে মানুষের মনের গতির কথা কিছুই বলা যায় না। অনেক নিষ্পাপ মনকে লোভ বিষাক্ত করে দিয়েছে। তার সম্পর্কে অনুসন্ধান করবার একটি মাত্র পথ খোলা আছে আমি দেখতে পাচ্ছি।

—কোন্ পথ ?

—জয়রাম এই নগরেরই অধিবাসী। তার বাড়িতে গিয়ে অনুসন্ধান করা।

—সে নগরের কোন্ অঞ্চলের অধিবাসী তাকি কেউ জানে ?

—আমি জানি। জোড়ামন্দির অঞ্চলে তার বাড়ি।

ঘটনাটি আপাত দৃষ্টিতে নিরিহ মনে হলেও, গুরগিন উপেক্ষা করতে পারল না। স্বয়ং অনুসন্ধান করার আগ্রহ দেখা দিল তার। দুনিয়ায় এত বেইমান বোধহয় কোথাও নেই, যত বাংলায় আছে। সুতরাং—

ইব্রাহিম জয়রামের বাসগৃহ দেখিয়ে দিল গুরগিনকে।

হিন্দু অঞ্চলের একটি ছোটখাট বাড়ি। নির্জন পরিবেশ। নগরের প্রচণ্ড কোলাহল এখানে নেই। নেই পথে সর্বজাতির প্রবল জনস্রোত। তখন সন্ধ্যা সমাগত। গুরগিন দ্বারে করাঘাত করল গিয়ে। কোন সাড়া নেই। আবার করাঘাত করল। কোনো সাড়া পাওয়া গেল না।

কেউ নেই নাকি ?

তাই বা কি ভাবে হবে। দ্বার রুদ্ধ ভিতর দিক থেকে। কেউ নিশ্চয় আছে। এবার প্রবল বেগে দ্বারে করাঘাত করল। দ্বার খুলল না বটে, গবাক্ষ উন্মুক্ত হল। একটি সুন্দরী নারীর মুখ ভেসে উঠল সেখানে।

কুণ্ঠিত কণ্ঠে সে প্রশ্ন করল, কাকে চাই ?

গুরগিন অনুভব করল সুন্দরীর নারীর কণ্ঠে কুণ্ঠা থাকলেও লজ্জা বা সঙ্কোচের কোন জড়তা নেই। বিস্মিত হল কিঞ্চিৎ, হিন্দু বা মুসলমান নারী অপরিচিত পুরুষের সামনে আসতে চায় না। বিশেষ করে তার মতো বিদেশীর সামনে তো নয়ই। অথচ—

—জয়রাম আছে ?

—না।

—সে কোথায় ?

—তিনি সৈন্যদের ছাউনিতে থাকেন।

—জয়রাম আমার অধীনস্থ সৈনিক। গতকাল থেকে তাকে ছাউনিতে পাওয়া যাচ্ছে না।

আমি অনুসন্ধান করতে এসেছিলাম, সে কোন কারণে এখানে এসেছে কিনা।

নারীর দুচোখে এবার ব্যাকুলতার ছায়া দেখতে পাওয়া গেল।

—পাওয়া যাচ্ছে না ! কোথায় গেলেন তিনি ? তাঁর যে অনেক শত্রু।

—শত্রু ! জয়রাম আপনার কে হয় ?

—আমার বড় ভাই। তিনি ছাড়া আমার কেউ নেই। তাঁর কিছু হলে আমি অনাথ হয়ে যাব।

ব্যাকুল চোখ দুটি দিয়ে এবার অশ্রু নামল।

বিব্রত হল গুরগিন। এখানে অপেক্ষা করা যুক্তিসঙ্গত নয় বিবেচনা করে ফিরে গেল। পরের দিন জয়রাম সম্পর্কে আরো গুরুতর সংবাদ পাওয়া গেল। অশ্বশালার একজন কর্মচারী আবদুল্লাহ্—তার কাছ থেকে জানা গেল, জয়রামকে কয়েকবার দেখেছে কাশিমবাজারের ইংরেজ কুঠিতে যেতে।

তৃতীয় দিন ওই সম্পর্কেই আলোচনা হচ্ছিল গুরগিন ও ইব্রাহিমের মধ্যে। ইব্রাহিম বললে, লোকটা একেবারে হাওয়ায় মিশে গেল।

—তাই তো দেখছি। নবাবকে ঘটনাটা জানানোই বোধহয় সঙ্গত হবে।
—ও কাজ এখন করবেন না। তিনি এখন অনেক বড় বড় বিষয় নিয়ে চিন্তা করছেন। এই ঘটনা তাঁকে বিভ্রান্ত করে তুলবে। জয়রাম প্রকৃতই কোন গুরুতর কাজে লিপ্ত আছে কিনা সঠিকভাবে একথা না জেনে জাহাঁপনাকে কিছু বলা ঠিক হবে না।
—কিন্তু জয়রাম সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হওয়া যাবে কিভাবে?
—আমার ধারণা সেদিন মেয়েটি আপনাকে মিথ্যা কথা বলেছে। সে হয়তো সমস্তই জানে। আবার সে যে কিছুই জানে না এমনও যে না হতে পারে তা নয়। যা হোক, ওর উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখুন। আসল সত্যের সন্ধান পেলেও পেতে পারেন।
—আপনার যুক্তি মন্দ নয়। ওই পথ ধরে আমি সহজেই অগ্রসর হতে পারি। মেয়েটিকে সেদিন অত্যন্ত সপ্রতিভভাবে কথা বলতে দেখেছিলাম। কোন বিদেশীর সামনে এদেশীয় কোন মেয়ের এতখানি সপ্রতিভতা বিস্ময়কর।
মৃদু হেসে ইব্রাহিম বললে, প্রকৃত কথা হল, মেয়েটি অনেক পুরুষের সঙ্গে কথা বলতে অভ্যস্ত ছিল। বর্ধমানের জমিদারের নর্তকীর দলের সঙ্গেও ছিল যুক্ত। আরো কিছুক্ষণ কথাবার্তা হবার পর ইব্রাহিম বিদায় নিল।
ইব্রাহিম বিদায় নেবার কিছুক্ষণ পর এক নাটকীয় ঘটনা ঘটল।
রক্ষী এসে জানাল একটি নারী জেনারেলের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চায়।
নারী !!!
এই ছাউনিতে এসেছে তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে!
—এখানে পাঠিয়ে দাও।
ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে এল অপরূপ লাবণ্যময়ী এক নারী। গুরগিন জয়রামের সহোদরাকে চিনতে পারল। গবাক্ষের মধ্যে দিয়ে সেদিন দেখেছিল, সেদিন এই জ্বালাময়ী রূপ সঠিকভাবে প্রত্যক্ষ করে নি—

এখন চকিতে তার মনে উদয় হল ঈশ্বরের কত অপূর্ব সৃষ্টিই আছে এই দুনিয়ায়।

রুদ্ধকণ্ঠে সে বললে, সাহেব, আমার ভাই-এর কোন সন্ধান পাওয়া গেল ?

—আপনি এখানে এলেন কেন ?

—না এসে উপায় ছিল না। আমার মনের অবস্থা আপনি বুঝবেন না। কোন সন্ধান পাওয়া গেল তার ?

—না।

—কিন্তু........

—আপনি সত্যি তার সম্বন্ধে কিছুই জানেন না।

—আপনি বিচিত্র কথা বলছেন। তার সন্ধান যদি আমার জানাই থাকবে তবে এই ছাউনির মধ্যে আসব কেন লজ্জা সরমকে পরিহার করে।

অনিচ্ছা সত্ত্বেও যুবতীর মুখের দিকে তাকাল গুরগিন। অনিন্দ্যসুন্দর মুখের কোথাও আবিলতার চিহ্ন নেই। বরং উৎকণ্ঠার ছায়া পরিস্ফুট।

—জয়রামের জন্য আমরাও চিন্তিত। অনুসন্ধান চলেছে। তবে স্বেচ্ছায় যদি সে কোথাও গিয়ে লুকিয়ে থেকে থাকে, তার সন্ধান পাওয়া কঠিন হবে।

—স্বেচ্ছায় সে কেন লুকিয়ে থাকবে ?

—কেনর উত্তর দেওয়া এখন কঠিন। আপনি ফিরে যান। জয়রামের সংবাদ পাওয়া গেলে আপনাকে জানানো হবে।

যুবতী কি বলতে গিয়েও বললে না। দৃষ্টি নত করে, আরক্ত মুখে ধীর পদক্ষেপে বেরিয়ে গেল ছাউনি থেকে। গুরগিন অস্থিরচিত্তে পদচারণা আরম্ভ করল। অসংখ্য চিন্তা সরিসৃপের মতো পাক খেয়ে চলল তার মনের মধ্যে। জয়রামের কার্যকলাপ সন্দেহজনক সন্দেহ নেই—কিন্তু

ওই যুবতী, মনে হয় তার চারপাশ ঘিরে যেন রয়েছে গভীর রহস্যের বেড়াজাল।

প্রকৃতই সেকি তার সহোদরের জন্য কাতর? না, কোন কারণে ছলনার আশ্রয় নিচ্ছে?

পরের দিন গুরগিন গেল জয়রামের বাড়িতে।

লোকের সাহায্যে জয়রামের অনুসন্ধান চলেছে। সুফল পাওয়া যায় নি। গুরগিন স্থির করেছে স্বয়ং অনুসন্ধান করে দেখবে কয়েকদিন, তারপর সমস্ত ঘটনা নবাবের কর্ণগোচর করবে।

আজ অপেক্ষা করতে হল না। করাঘাত করতেই দ্বার খুলে গেল। ম্লান হেসে যুবতী তাকে অভ্যর্থনা করল। ইতস্তত করে গুরগিন প্রবেশ করল ভিতরে। বৈভব বর্জিত পরিচ্ছন্ন কক্ষ। স্তিমিত আলোয় মায়াময় বলে মনে হচ্ছে চতুর্দিক।

—আমার কি সৌভাগ্য। আপনার মতো মান্যমান অতিথিকে আজ কাছে পেয়েছি।

—জয়রামের কোন সন্ধান পাওয়া যায় নি।

—যায় নি। যুবতী নির্বাক রইল ক্ষণকাল।—তার সন্ধান বোধ হয় কোনদিন পাওয়া যাবে না।

—কেন!

—তার শত্রুর অভাব নেই। কেউ তাকে হয়তো গুমখুন করেছে।

—খুন! জয়রাম এত শত্রুই বা সৃষ্টি করল কিভাবে!

কান্নায় ভেঙে পড়ল যুবতী।

মুখে আঁচল দিয়ে বহু কষ্টে কান্নার বেগ সংবরণ করে, অশ্রুজড়িত কণ্ঠে বললে, আমার জন্যে। আমার এই কাল-রূপ তার বিপদ ডেকে এনেছে সাহেব। মুর্শিদাবাদে লোভী মানুষের সংখ্যা অল্প নেই।

তারা আমাকে পঙ্কিল পথে নামাবার জন্যে তৎপর হয়েছে, আমার প্রশ্রয়ে, আমার জ্যেষ্ঠ জয়রাম বাধা দিয়েছে তাদের। শত্রুর সংখ্যা বেড়ে গেছে। তারাই আজ আমাকে অসহায় করে ছেড়ে দিল দুনিয়ায়।

গুরগিন দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করল।

—জয়রাম যদি সত্যি প্রাণ দিয়ে থাকে দুঃখের কথা। আপনাকে সমবেদনা···

—সমবেদনায় ক্ষতিপূরণ হয় না। সারাটা জীবন আমাকে পুরুষের লোভাতুর দৃষ্টিতে মোড়া পথ দিয়ে এগিয়ে যেতে হচ্ছে। শুনবেন, শুনবেন আমার সেই ক্ষুদ্র ব্যর্থতার ইতিহাস।

গুরগিন কিছু বলল না। নীরব রইল।

নীরবতা সম্মতির লক্ষণ বিবেচনা করে বোধহয় যুবতী আরম্ভ করল। বলতে আরম্ভ করল একজন বিদেশী জেনারেলের সামনে সম্পূর্ণ নিঃশঙ্ক চিত্তে, যৌবনে পা দেবার পূর্ব থেকে লোভের দৃষ্টি আমাকে অনুসরণ করছে। দরিদ্র পরিবারে আমার জন্ম। মুখ বুজে সমস্ত সহ্য করা ছাড়া আমার উপায় ছিল না। পিতার মৃত্যু হল এই সময়। জয়রাম তখন রাজসাহীতে কর্মে নিযুক্ত। বিবাহের বয়স হয়েছিল অথচ বিবাহ হচ্ছিল না। সকলেই আমায় শয্যাসঙ্গিনী করে আমার রূপকে নিঙড়ে পান করবার জন্য লালায়িত—বিবাহ করে দায়িত্ব নিতে প্রস্তুত নয়। এক বর্ষীয়ান আত্মীয়া আমায় চাকরি করবার পরামর্শ দিলেন। নর্তকীর কাজ। আমি চিন্তা করে দেখলাম নিজেকে শক্ত করে রাখতে পারলে কোন কাজই অসম্মানজনক নয়। নৃত্যে আমার পারদর্শিতা ছিল। রাজী হলাম। আমার কর্মজীবন আরম্ভ হল, বর্ধমানের এক জমিদারের অন্যতম নর্তকী হিসেবে।

দিন আমার ভালই কাটছিল। আমরা কয়েকজন সমবেত নৃত্যে তৃপ্ত করতাম বৃদ্ধ জমিদারকে। তিনি পাত্রের পর পাত্র সবার নিঃশেষ

করতেন আর আমাদের বাহবা দিতেন। দিন একই ভাবে কাটল না। বাংলার বাইরে কোথায় যেন বিশেষ কাজে গিয়েছিলেন তরুণ জমিদার নন্দন। তিনি ফিরে এলেন একদিন। সংবাদ পেলাম প্রতিদিন একটি করে নর্তকীকে তিনি রাতের সহচরী হিসেবে বেছে নিচ্ছেন। লক্ষ্য করলাম সকলেই জমিদার নন্দনের অনুগ্রহ পাবার জন্য প্রতিযোগিতা আরম্ভ করে দিয়েছে। আমার ভয় হল। আমারও ডাক একদিন নিশ্চয় পড়বে। পড়লও। অনিচ্ছার সঙ্গে, দুরু দুরু বক্ষে গেলাম তাঁর বিলাস কক্ষে।

তিনি আমার আপাদমস্তক দেখে নিয়ে হায়নার মতো হাসলেন। উৎকট লোভ ঝরে পড়তে লাগল চোখ মুখ দিয়ে। তিনি ধীর পদক্ষেপে আমার দিকে এগিয়ে আসতে আসতে বললেন, আমার কাছে প্রত্যহ একজন করে আসছে। কিন্তু তুমি সকলের সৌন্দর্যকে ছাপিয়ে গেছো। কোথায় ছিলে এতদিন মুখ লুকিয়ে?

কিছু বললাম না। পিছিয়ে গেলাম।

—পিছিয়ে যেও না সুন্দরী। এগিয়ে এস। আজকের রাতকে পরিপূর্ণ করে তোল।

কাতর কণ্ঠে বললাম, আমায় রেহাই দিন।

—রেহাই দেব। নর্তকীর এই কাতরতা হাস্যকর বটে।

—নর্তকীর পেশা আমি গ্রহণ করেছি জীবিকানির্বাহ করবার জন্যে, নিজের সম্ভ্রম নষ্ট করবার জন্যে নয়।

—সম্ভ্রম!—তিনি হাসলেন। আমার মনে হল ক্ষুধার্ত ব্যাঘ্র গর্জন করে উঠল।

—নর্তকীর আবার সম্ভ্রম। তুমি আমার চোখে নেশা ধরিয়ে দিয়েছো। শুধু আজকের রাতের জন্য নয়, তোমাকে আমি পেতে চাই রাতের পর রাতে জন্য। এগিয়ে এস। নিজের ভবিষ্যৎকে রঙীন করে তোল।

—আপনার আমন্ত্রণে আমার আপত্তি নেই। আমাকে বিয়ে করুন। আমাকে মর্যাদা দিয়ে সমস্ত জীবন নিজের কাছে রাখুন।

—নর্তকীকে বিয়ে করব। অনেক নতুন কথা তুমি আমাকে শোনাচ্ছ। মনকে তেতো করে দিও না। কাছে এস।

তিনি নিজেই এগিয়ে এলেন। সাপটে ধরলেন আমাকে। এক জ্বালাময় অনুভূতি আমার মনের মধ্যে ঝড় তুলল। প্রস্তুত হয়েই গিয়েছিলাম। ওড়নার আড়াল থেকে অস্ত্র সমেত হাত বার করে বসিয়ে দিলাম ক্লেদাক্ত পশুর দেহে। আমাকে ছেড়ে নিদারুণ আহত জমিদার নন্দন গড়িয়ে পড়ল।

আমি রাত্রের মসিকৃষ্ণ অন্ধকারে মিলিয়ে গেলাম। তারপর মানুষের চোখ বাঁচিয়ে বিপদসঙ্কুল অরণ্যের মধ্যে দিয়ে কিভাবে যে বর্ধমান থেকে মুর্শিদাবাদে এসেছিলাম তা জানেন একমাত্র ঈশ্বর। এখানে এসে আমার অবস্থা কি হয়েছিল আগেই বলেছি।

যুবতী নিজের কাহিনী শেষ করল।

গুরগিন কেমন সহানুভূতি বোধ করতে লাগল। যে মনোভাব নিয়ে এখানে এসেছিল তা তিরোহিত হয়ে যাচ্ছে ক্রমে। তবু তার মুখের দিকে তাকাল না। মনের আকাশে ফুটিয়ে তুলতে চেষ্টা করল মোভার মুখ।

—আপনার কাহিনী শুনে ব্যথিত হলাম। এবার আমি বিদায় নেব।

—কিন্তু আমার কি হবে? আমার মতো অভাগিনীদের জন্য নবাব সরকার কি কিছুই করতে পারেন না।

—নবাব সরকার থেকে কিছু আর্থিক সহযোগিতা পাবার ব্যবস্থা করে দেবার দেষ্টা করব। আজ আমায় বিদায় দিন।

অতিথি সৎকারের ব্যবস্থা না করে আপনাকে বিদায় আমি দিতে পারি না। বসুন।

অনিচ্ছা সত্বেও গুরগিনকে অপেক্ষা করতে হল। যুবতী কক্ষান্তরে গেল। পাত্র পূর্ণ করে নিয়ে এল লোহিত বর্ণের পানীয়।

—আমি সরাবে অভ্যস্ত নই।

—সরাব নয়। বাংলার এক পুষ্টিকর পানীয়। পান করে দেখুন। আস্বাদ জীবনে ভুলতে পারবেন না।

গুরগিন আর দ্বিধা করল না। যুবতীর হাত থেকে পাত্র নিয়ে এক নিঃশ্বাসে পান করল। সুস্বাদু। কিন্তু একি মাথার মধ্যে ঝিমঝিম করছে কেন? দেহে যেন অবসাদের ঢল নামল। সুস্বাদু পানীয়ের পরিবর্তে জোরাল সরাব পান করল না তো।

স্খলিত কণ্ঠে গুরগিন বললে, কি পান করলাম? মনে হচ্ছে…

—সরাব নয়। পেস্তা আর গোলমরিচ দিয়ে প্রস্তুত এই পানীয় কিছু জোরাল।

—আমার কেমন অবসাদ আসছে। আমি…

যুবতা তার নিকটবর্তী হয়ে বললে, আমার দিকে তাকিয়ে দেখ।

—তোমার দিকে?

—হ্যাঁ।

মোহাচ্ছন্নের মতো গুরগিন তাকাল যুবতীর সুন্দর মুখের দিকে।

—তুমি সুন্দর। তোমার মতো সুন্দর ভারতীয় মেয়ে আমি দেখি নি।

—অনেক ফিরিঙ্গী আমি দেখেছি, তোমার মতো সুশ্রী মুখ আর সুঠাম দেহধারী আমার চোখে পড়ে নি।

—নিজের অজ্ঞাতেই গুরগিন যুবতীর বাহু স্পর্শ করল।

—তোমার নাম কি?

—ভদ্রা।

—ভদ্রা! মোভার মতোই মিষ্টি ছোট্ট নাম।

—মোভা কে?

—কেউ নয়। ভদ্রা—

—বল সাহেব?

—আমি আর্মেনিয়ান জন গ্রেগারী, তোমার দেহ স্পর্শ করলাম। বর্ধমানের সেই জমিদার পুত্রের মতো আমাকেও আহত করবে না তো?

—না সাহেব।

—সাহেব নয়, আমাকে গ্রেগ বলে ডাক। না, না গ্রেগ নয়—গুরগিন। আমায় তুমি গুরগিন বলে ডাকতে পার।

ভদ্রার মুখে হাসি।

এই হাসি একমাত্র বিজয়িনী নারীরাই হাসতে পারে।

সন্ধ্যা গভীর রাতে পরিণত হয়েছে।

নেশা টুটে যাবার পর বিদায় নিয়েছে গুরগিন। দ্বারে করাঘাত হল।

—কে?

—আমি ইব্রাহিম।

দরজা খুলে দিল ভদ্রারূপী মোহনাজ।

—মেরিজান, অশান্ত পাখিকে খাঁচায় পুরতে পেরেছো?

মোহনাজ হাসির তরঙ্গ তুলল।

—পাখি নয়, বল পশুরাজ। তাকে আমি শৃঙ্খলিত করতে পেরেছি।

—জানতাম তুমি পারবে। মৃত্যুর পর আল্লাহ্ তোমায় বেহেস্তে জায়গা দেবেন।

—মৃত্যুর পর আমি বেহেস্তে যাব কিনা তা নিয়ে কোন দুশ্চিন্তা আমার নেই। চিন্তা বর্তমানকে নিয়েই।

—কেন? বর্তমান তো তোমার পক্ষে। বেশ সুচারুরূপেই তো পরিকল্পনা এগিয়ে চলেছে।

—তা অবশ্য চলেছে। কিন্তু জয়রাম যদি এসে পড়ে। সমস্ত জানাজানি হয়ে যাবে। নবাব আদেশ দেবেন আমাকে গুলির মুখে দাঁড়াতে।

ইব্রাহিম উপেক্ষাসূচক শব্দ করল।
—একেই বলে নারীর বুদ্ধি। তার ব্যবস্থা না করেই কি কাজে নেমেছি। জয়রাম কোনদিন আসবে না আমাদের বিরক্ত করতে।
—বাংলার বাইরে তাকে পাঠিয়ে দিয়েছো! কোথায়?
—শুধু বাংলার বাইরে নয়, দুনিয়ার বাইরে পাঠিয়ে দিয়েছি তাকে। জয়রামের গলিত শব এখন গৃধের আহার যোগাচ্ছে।
মোহনাজ কিছু বলতে পারল না। তাকিয়ে রইল ইব্রাহিমের নির্বিকার মুখের দিকে।
—কি দেখছো?
—দেখছি না, চিন্তা করছি—তুমি কত নিষ্ঠুর।
—নিষ্ঠুরতার এখন তুমি কি দেখলে জানেমান। প্রয়োজন বোধে আমি আরো অনেক বেশী নিষ্ঠুর হতে পারব।
কথা শেষ করে ইব্রাহিম পাশের কক্ষ থেকে সরাবের পাত্র নিয়ে এল। নীরবে পান করল কিছুক্ষণ।
—তোমার রূপ গুরগিনের চোখ ধাঁধিয়ে দিয়েছে।
—বোধহয়। আর্মেনিয়ান জেনারেলের জন্য দুঃখ হয়।
—কেন, দুঃখ কেন হয় তোমার?
মোহনাজ দ্রুতকণ্ঠে বললে, আমি একাজ করতে পারব না ইব্রাহিম। একজন নিরপরাধ মানুষের সর্বনাশ আমি করতে পারব না।
—আমার পথের প্রতিবন্ধক হয়ে থাকাই তার সবচেয়ে বড় অপরাধ।
—তোমার পদমর্যাদা কিছু কম নয়। নাইবা হলে প্রধান সেনাধ্যক্ষ। আল্লাহ্‌র দরবারে এই পাপের বিচার হবে না ভাবছো?
তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে মোহনাজকে দেখে নিল ইব্রাহিম।
—তত্ত্বকথা আমায় শুনিও না মোহনাজবাঈ। তোমার মতের পরিবর্তন কেন হয়েছে বুঝতে পেরেছি। তুমিও ওই আর্মেনী ফিরিঙ্গীটার রূপে মুগ্ধ হয়েছ। ওই বিকারকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলতে হবে। দিন

কেনবার এই হল উপযুক্ত সময় বুলবুলে দিল। বন্দুকের গুলি আর সুযোগ হাত ফসকে বেরিয়ে গেলে তাকে ধরা যায় না।

মোহনাজ কিছু বলল না।

সরাবের পাত্র শেষ করে ইব্রাহিম আবার বললে, যা স্থির করেছিলাম সেভাবে আর অগ্রসর হওয়া চলবে না। পরিকল্পনা কিঞ্চিৎ রদবদল করতে হচ্ছে। গুরগিন খাঁর আর বেঁচে থাকা চলবে না। এখন পরিষ্কার বুঝতে পারছি তাকে পথ থেকে সরাতে না পারলে অনেক বিঘ্ন উপস্থিত হবে।

—মেরে ফেলবে গুরগিনকে ?

—হ্যাঁ জানেমান, মেরে ফেলব তাকে। তার মৃত্যু চাও না বোধহয় ? অনেকের হৃদয় নিয়ে তো ছিনিমিনি খেললে, তবে কেন আলেয়ার পিছনে ছুটছো ? শোন মোহনাজ, গুরগিন তোমার হাতেই মারা পড়বে।

—আমার হাতে ! আমি তাকে হত্যা করব ?

—উপায় নেই, এই কঠিন কাজ তোমাকেই করতে হবে। আপত্তি করে যে কোন ফল হবে না সে কথা তোমার অজানা নয়।

মোহনাজ চিন্তিত মুখে নীরব রইল কিছুক্ষণ।

—তুমি যেমন সেনাধ্যক্ষ হবার জন্য আকুল, আমি তেমনি সামাজিক প্রতিষ্ঠা পাবার জন্য ব্যাকুল। শাদীর জন্য মহরম পর্যন্ত অপেক্ষা করা চলবে না।

—তাই হবে। গুরগিনের মৃত্যু ও আমাদের শাদীর মধ্যে ব্যবধান থাকবে মাত্র একটি দিনের। কি ভাবে কাজ সমাধা করতে হবে মনোযোগ দিয়ে শোন, আমি নিশ্চিত গুরগিন আবার আসবে এখানে। আমি তীব্র বিষ তোমায় দিয়ে যাব। তুমি পানীয়ের সঙ্গে মিশিয়ে তাকে খেতে দেবে। পানীয় গ্রহণ করবার পর ধীরে ধীরে ঘুমিয়ে পড়বে ফিরিঙ্গী কুত্তা। সে ঘুম আর ভাঙবে না।

—আমার কি হবে তারপর ?

—তুমি মায়ফিলে ফিরে যাবে। গুরগিনের মৃত্যুকে কেন্দ্র করে হৈহৈ পড়ে যাবে। নবাব হত্যাকারীকে খুঁজে বার করবার জন্য পুরস্কার ঘোষণা করবেন। অথচ কেউ জানতে পারবে না তোমার কার্যকলাপের কথা।

ইব্রাহিম নিজের দুবাহু বিস্তার করে এগিয়ে গেল মোহনাজের দিকে।

গুরগিন স্থির করে ফেলেছিল ভদ্রার ওখানে আর যাবে না। সহানুভূতি মনকে ক্রমেই দুর্বল করে দেয়। তারপর এই দুর্বলতা চরম বিপদের মুখোমুখি দাঁড় করিয়ে দেয়। মোভার প্রতি বিশ্বাসঘাতকতা করবে না গুরগিন।

তৃতীয় দিন কিন্তু না গিয়ে উপায় রইল না।

গুরগিন সংবাদ পেল, গত রাত্রে জয়রাম তার বাড়িতে গিয়েছিল। ভোরে আবার ফিরে গেছে। কাশিমবাজার ইংরেজ কুঠির দিকেই গেছে। সংবাদটি অত্যন্ত বাস্তবতার সঙ্গে ইব্রাহিম লোক মারফত গুরগিনের গোচর করল। সুতরাং অনুসন্ধানের জন্য তৎপর হতে হল তাকে।

ভদ্রার বাড়ি গেল গুরগিন।

ভদ্রা সহাস্যে স্বাগত জানিয়ে বললে, আমি জানতাম তুমি নিশ্চয় আসবে।

—তোমার কথাবার্তা আমার উপর আর প্রভাববিস্তার করতে পারবে না। জয়রাম মরে নি। সংবাদ পেয়েছি, গতকাল সে এখানে এসেছিল। সত্যিকথা খুলে বল, নইলে তোমার উপর উৎপীড়ন হতে পারে।

ভদ্রার হাসি বিস্তার লাভ করল।

—তুমি একজন দুর্দান্ত সেনাপতি, অথচ নারীর কারসাজি ধরতে পারলে না।

—কারসাজি!

—কারসাজি ছাড়া কিছুই নয়। তোমাকে এখানে আনবার জন্য মিথ্যা সংবাদ কাউকে দিয়ে পরিবেশন করাতে হয়েছে। আমার ব্যবহারে ক্ষুণ্ণ হলে গুরগিন?

—আমাকে ডাকিয়ে পাঠাবার উদ্দেশ্য কি?

—তুমি ছাড়া এখন আমার গতি নেই। গুরগিন, তুমি আমায় বিয়ে করবে?

গুরগিন কয়েক পা পিছিয়ে গেল।

—না, সম্ভব নয়।

—আমি নারী হয়ে যে প্রস্তাব করলাম পুরুষ হয়ে তুমি তা গ্রহণ করতে পারলে না। আমি নবযৌবনা, আমি সুশ্রী—

—অস্বীকার করছি না। তোমার মতো নারীকে লাভ করবার জন্যে যে কোন পুরুষ বহু যুগ ধরে সাধনা করতে পারে। আমি নিরুপায় ভদ্রা। আমি বিবাহিত—এক স্ত্রী বর্তমান থাকতে আবার দ্বিতীয় স্ত্রী গ্রহণ করি না।

দ্বারের দিকে সে এগিয়ে গেল।

ভদ্রা পথ রোধ করল।

—আমার মনকে ভেঙে দিয়ে তুমি চলে যাবে?

—উপায় নেই—উপায় নেই। আমায় যেতে দাও—

—চলে যেও। আর এস না এখানে কোনদিন। তবে যাবার আগে শেষবারের মতো অতিথি সৎকারের সুযোগ আমায় দাও। আমার হাতে তৈরি সেই পানীয় গ্রহণ করে যাও। আপত্তি ক'রো না।

নেশাযুক্ত পানীয় গ্রহণ করতে আপত্তি থাকলেও আপত্তি করল না গুরগিন। ভদ্রা পাত্রপূর্ণ করে পানীয় নিয়ে এল। বাক্যব্যয় না করে

পাত্র হাতে নিল গুরগিন। পাত্র মুখের কাছে তুলতে গিয়ে তার দৃষ্টি পড়ল ভদ্রার মুখের উপর। উৎকণ্ঠার অন্ধকার ভদ্রার মুখের উপর নেমে এসেছে। বিন্দু বিন্দু ঘাম দেখা দিয়েছে।

একি! তুমি কি অসুস্থতা বোধ করছো?

—না।

পানীয়ের পাত্র গুরগিনের মুখের নিকটবর্তী হল।

চীৎকার করে উঠল ভদ্রা, মুখে দিও না, দোহাই তোমার মুখে দিও না।

—কেন?

—আমি বিষ মিশিয়ে দিয়েছি।

স্তম্ভিত গুরগিন পাত্রের পতন রোধ করতে পারল না। কাঁচের পান পাত্র ঝনঝন শব্দ তুলে সহস্র টুকরো হয়ে গেল। লোহিত পানীয় ছড়িয়ে গিয়ে পিচ্ছিল করে তুলল কক্ষতল।

ভদ্রা আবার বললে, পানীয়তে আমি বিষ মিশিয়ে দিয়েছিলাম গুরগিন।

—কেন তুমি একাজ করেছিলে ভদ্রা?

—তোমাকে হত্যা করবার জন্যে। তোমাকে যা বলেছি, সমস্ত মিথ্যা বলেছি। আমার নাম ভদ্রা নয়, মুর্শিদাবাদের লাস্যময়ী বারমুখ্যা আমি। আমি মোহনাজবাঈ, ঢাকা থেকে মীরন কর্তৃক লুণ্ঠিতা।

গুরগিন যেন স্বপ্ন দেখছে।

এই সুন্দর নারীটি তাকে হত্যা করার ষড়যন্ত্র করেছে!!!

কেন? কেন?

—আমি তো তোমার কোন ক্ষতি করি নি। তবে তুমি আমায় কেন হত্যা করতে চেয়েছিলে?

—তুমি আমার ক্ষতি কর নি কিন্তু একজনের উন্নতির পথে প্রতিবন্ধক হয়ে রয়েছো। আলী ইব্রাহিম প্রধান সেনাধ্যক্ষ হতে চায়। আমি তার নর্মসহচরী—তাকে সমর্থন না জানিয়ে তো আমার উপায় নেই।

দ্রুতচিন্তা করতে লাগল গুরগিন। জয়রাম সম্পর্কে ইব্রাহিমের ব্যস্ততার কারণ এখন তার হৃদয়ঙ্গম হল। দুনিয়া থেকে তাকে সরিয়ে দেবার জন্যে এত বড় ষড়যন্ত্র গড়ে উঠেছে, আশ্চর্যের বিষয় তার মতো সতর্ক মানুষও বিন্দুমাত্র বুঝতে পারে নি। তার তো অজানা ছিল না, সুন্দর মুখ নিত্য কত অঘটন ঘটাচ্ছে।

অস্ত্রের উপর হাত রেখে গুরগিন বললে, আমাকে হত্যা করাই যখন স্থির করেছিলে, তবে বাঁচালে কেন? আবার কোন নূতন খেলা আরম্ভ করলে?

কান্নায় ভেঙে পড়ল মোহনাজ।

—আমার এই দেহ নিয়ে অনেক পুরুষ খেলা করেছে, তাদের কাউকে হৃদয় দিতে পারি নি। প্রথম দর্শনেই আমি তোমাকে হৃদয় দিয়ে বসে আছি গুরগিন। আমার এই ক্ষতবিক্ষত, পঙ্কলিপ্ত দেহ তোমার মতো পুরুষ গ্রহণ করবে না জানি, তবু নিজেকে সংবরণ করতে পারি নি।

গুরগিন অগ্রসর হল।

—প্রচুর ঘৃণা নিয়ে তুমি এখান থেকে চলে যাচ্ছ। যাবার আগে শুধু একটি কাজ করে যাও।

থামল গুরগিন।

—কোন্ কাজ?

—একটি ফুৎকারে আমি নিজের বর্তমান ও ভবিষ্যতের সমস্ত আলো নিভিয়ে ফেলেছি। ষড়যন্ত্র করবার জন্য নবাবের হাতে আমার শাস্তি অপেক্ষা করছে। শাস্তি নিতে আমার কুণ্ঠা নেই। শুধু তোমার হাত থেকে মৃত্যু কামনা করি। শাস্তি দাও গুরগিন। তোমার ওই অস্ত্র আমার কলিজা ভেদ করুক।

মোহনাজ নতজানু হল।

গুরগিনের মন উদ্বেল হয়ে উঠল। দৃঢ়তার সঙ্গে নিজের মনের ভাবকে দমন করে তাকাল মোহনাজের মুখের দিকে। তারপর দ্রুতপায়ে

কক্ষ ত্যাগ করল। নিজের অপরিণামদর্শিতার জন্য নিজেকে ধিক্কার দিতে দিতে অশ্বারোহণ করে ধাবিত হল।

সন্ধ্যা উত্তরে গেছে কিছুক্ষণ পূর্বে মাত্র। গুরগিন নিজের গৃহে পৌঁছাল। অনভ্যস্ত উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করল, মোভা—মোভা—

কোন কাজে ব্যস্ত ছিল মোভা। চীৎকার শুনে ছুটে এসে দেখল, বিপর্যস্ত মুখের অবস্থা নিয়ে দাঁড়িয়ে আছে ওর স্বামী।

—কি হয়েছে গ্রেগ?

গুরগিন মোভাকে নিজের সবল বাহুবন্ধনে নিষ্পেষিত করে বললে, আমি তোমার সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করতে চলেছিলাম মোভা। আমাকে শাস্তি দাও।

—কি হয়েছে খুলে বল?

—তোমার গ্রেগ ষড়যন্ত্রে জড়িয়ে পড়ে একটি নারীর সঙ্গে পরিচিত হয়েছিল। তার সম্পর্কে দুর্বলতাও এসেছিল মনে। কিন্তু বিশ্বাস কর, তোমাকে উপেক্ষা করার মনোভাব আমার ছিল না। সংবিৎ ফিরে পেতেই তোমার কাছে ছুটে এসেছি। আমাকে শাস্তি দাও—শুধু ঘৃণা করো না।

মোভা স্বামীর বুকে মুখ ডুবিয়ে অস্ফুট কণ্ঠে বললে, গ্রেগ—আমার গ্রেগ।

এদিকে—

গুরগিন চলে গেছে। নতজানু অবস্থায় মোহনাজ কান্নার বেগ সংবরণ করবার চেষ্টা করছে। উন্মুক্ত দ্বার অতিক্রম করে ইব্রাহিম কক্ষে প্রবেশ করল। দ্বার বন্ধ করে দিল। শব্দে চমকে মুখ তুলল মোহনাজ।

উঠে দাঁড়িয়ে বললে, গুরগিন খাঁ এসেছিল।

—জানি।

—তাকে আমি হত্যা করতে পারি নি ইব্রাহিম।

-জানি।
—জান তুমি!
—এও জানি তোমার হৃদয়াবেগকে উপেক্ষা করে সে চলে গেছে।
বিস্মিত কণ্ঠে মোহনাজ বললে, তুমি জানলে কি ভাবে এসমস্ত কথা।
ইব্রাহিম মোহনাজের মুখোমুখি এসে দাঁড়াল।
—গুরগিনের সংযমকে প্রশংসা করতে হয়। তোমার অতুলনীয় রূপকে উপেক্ষা করে চলে যেতে পেরেছে। মেরিজান, আমার চোখকে সহজে ফাঁকি দেওয়া যায় না। তোমার সেদিনের কথাবার্তা শুনে বুঝতে পেরেছিলাম, ওই শয়তানের বাচ্চাকে তুমি হত্যা করতে পারবে না। আমার অনুমান মিথ্যে হয় নি। গবাক্ষের অপর প্রান্তে দাঁড়িয়ে আমি সমস্ত শুনেছি।
—চেষ্টা করেছিলাম, শেষ রক্ষা করতে পারলাম না।
ইব্রাহিমের মুখে হিংস্র হাসি খেলে গেল।
—চেষ্টা করেও তুমি একজনকে হত্যা করতে পারলে না, অনায়াসে আমি তা সম্পন্ন করব।
গুরগিনকে নিজে হাতে হত্যা করবে তুমি?
—না।
উৎকণ্ঠায় মোহনাজের কণ্ঠ কেঁপে উঠল।
—তবে....
—তোমাকে। সূর্যের আলো দেখার অবকাশ তুমি আর পাবে না বুলবুল।
—আমাকে•••মোহনাজের কণ্ঠ চিরে আর্তরব বেরিয়ে এল, আমি তো তোমার ভবিষ্যতের অন্তরায় নয়, আমাকে হত্যা করবে কেন?
ইব্রাহিমের মুখে হিংস্র হাসি বিস্তার লাভ করল।
—তুমি আমার সর্বনাশ করেছো। গুরগিনের বিরুদ্ধে আমি ষড়যন্ত্র করছি একথা জানিয়ে দিয়েছো তাকে। নবাব আমাকে রেহাই দেবেন না।

—আমাকে হত্যা করলে কি তুমি নবাবের হাত থেকে রেহাই পাবে?

—নিশ্চয় পাব। আমার বিরুদ্ধে তুমি হলে সবচেয়ে বড় সাক্ষী। সাক্ষী না থাকলে গুরগিন প্রমাণ করতে পারবে না আমার অপরাধ।

অশ্রুর বন্যা নামল মোহনাজের দুচোখ দিয়ে।

করুণ কণ্ঠে মিনতিতে ভেঙে পড়ল, আমার মুখ থেকে তোমার বিরুদ্ধে কেউ একটি কথাও শুনতে পাবে না। তোমার পত্নী নয়, আজীবন তোমার বাঁদী হয়ে থাকব। আমায় হত্যা ক'রো না ইব্রাহিম।

—জানেমান, মৃত্যুকে এত ভয় পাও তুমি? কিঞ্চিৎ সহানুভূতি যে তোমার জন্যে না হচ্ছে তা নয়। অসংখ্য নিশীথে তোমার উষ্ণস্পর্শ আমাকে বেহেস্তের দ্বার প্রান্তে নিয়ে গেছে। কোন নারী এত সুখ আমায় দিতে পারে নি। তবু আমি নিরুপায়।

ইব্রাহিম কোষ থেকে অস্ত্র উন্মুক্ত করল।

দ্রুত পিছিয়ে গেল মোহনাজ।

—ক্ষমা কর—ক্ষমা কর ইব্রাহিম। আমায় হত্যা ক'রো না, আর কিছুদিন আমায় বাঁচতে দাও।

ইব্রাহিম এগিয়ে চলেছে।

—তোমায় বলেছিলাম, প্রয়োজন বোধে আমি আরো নিষ্ঠুর হতে পারি।

—কে আছো, বাঁচাও, বাঁচাও আমায়—

—কেউ তোমাকে বাঁচাতে আসবে না। আল্লাহ্‌কে স্মরণ কর মেরিজান।

—আমায় হত্যা ক'রো না, ইব্রাহিম আমায়...

মোহনাজ কথা শেষ করতে পারল না। ইব্রাহিমের তীক্ষ্ণ অস্ত্র তার পঞ্জরে ভেদ করল। দাঁড়িয়ে থাকার ব্যর্থ চেষ্টা করে গড়িয়ে পড়ল লাস্যময়ী বারমুখ্যা। রক্তের প্রস্রবন দেখা দিল। অসহ্য যন্ত্রণায় সমস্ত শরীর কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করল। উন্মেলিত দুচোখের দৃষ্টি অর্থহীন।

ইব্রাহিম আবার আঘাত হানল। দ্বিতীয় আঘাতের পর ধীরে ধীরে নিস্তেজ হয়ে গেল, তারপর চিরদিনের মতো স্তব্ধ হয়ে গেল মোহনাজ। মীরনের প্রেয়সী কোনদিন চিন্তা করে নি তার মৃত্যু এইভাবে হবে। মৃতদেহের উপর উপেক্ষার দৃষ্টি হেনে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল ইব্রাহিম।

গুরগিন ষড়যন্ত্রের কথা প্রকাশ করে নি। কোন উদ্দেশ্য নিয়ে যে প্রকাশ করে নি তা নয়, যদি নিজের কথা প্রমাণ করতে না পেরে নবাবের সামনে হাস্যাস্পদ হয়, এই কথা চিন্তা করেই প্রকাশ করে নি। ইব্রাহিমের সঙ্গে তার সাক্ষাৎ হয়েছে। লক্ষ্য করেছে তৎপরতার সঙ্গে তাকে এড়িয়ে গেছে ওই ধুরন্ধর ব্যক্তিটি।
নবাবকে ষড়যন্ত্রের বিষয় কিছু না বললেও, ইব্রাহিমের বিরুদ্ধে কলকাঠি কিছু নাড়ল। মোহনাজের মৃত্যুর এক সপ্তাহ পরে ইব্রাহিম আদেশ পেল, ওকে মুর্শিদাবাদ ত্যাগ করতে হবে। তকি খাঁ অশ্বারোহী বাহিনী নিয়ে বীরভূমে অবস্থান করছে। তকি খাঁর অধীনস্থ কর্মচারী হয়ে ওকে যেতে হবে সেখানে। অনিচ্ছা সত্ত্বেও ইব্রাহিমকে যাত্রা করতে হল।

মীরকাশিম তখ্‌তে বসবার মাস দুয়েকের মধ্যেই মোটামুটি গুছিয়ে নিলেন। তোষাখানা হীরা জহরত ও আশরফিতে পূর্ণ হয়ে উঠল। এবার ইংরেজদের সঙ্গে স্থায়ী একটা ব্যবস্থা না করে নিলেই নয়। তবে তার আগে বাংলার জমিদারদের শায়েস্তা করা প্রয়োজন। অন্যায় উপায়ে প্রচুর সম্পদ এই সমস্ত জমিদারবর্গ সঞ্চয় করেছে সন্দেহ নেই। তিনি কালবিলম্ব না করে প্রত্যেকের খাজনা দ্বিগুণ করে দিলেন।

যারা আপত্তি জানাল, তাদের পরিষ্কারভাবে জানিয়ে দেওয়া হল, নবাবের আদেশ মান্য না করলে, জমিদারী কেড়ে নেওয়া হবে।
আপত্তির কথা সকলকে ভুলে যেতে হল। মীরজাফরের আমল হলে এই হুমকিকে উপেক্ষা করা যেত, মীরকাশিম অন্য ধাতুর মানুষ: সুতরাং—। ইংরেজদের প্রতি মীরকাশিম এবার দৃষ্টি দিলেন। সমস্ত ঋণ অবশ্য শোধ হয়ে গিয়েছিল। তবুও তিনি জানেন ইংরেজের অর্থ শোষণের হাত থেকে তাঁর রেহাই পাওয়া কঠিন। দেশীয় সৈন্যের যে বাহিনী তাঁর আছে—শক্তিশালী নয়। অস্ত্র-শস্ত্রও আশানুরূপ নেই। রাজ্য রক্ষার জন্য ইচ্ছা না থাকলেও ইংরেজের সহযোগিতা আবশ্যক।
সুতরাং কোম্পানিকে অর্থ প্রদান করতেই হবে। দিনে দিনে তাদের দাবি যে আকাশ স্পর্শ করবে তাতে বিন্দুমাত্র সন্দেহ নেই। অনেক চিন্তার পর মীরকাশিম পরিত্রাণের উপায় স্থির করলেন। ঋণের অর্থ পরিশোধ করতে না পারায় সময় সময় মীরজাফর নদীয়া বর্ধমান প্রভৃতি স্থানের কর আদায়ের অধিকার ইংরেজদের দিতেন। মীরকাশিম এই উপায়েই কোম্পানির ভবিষ্যৎ আদায়ের পথ রোধ করলেন। শুধু পরিকল্পনাটি কিঞ্চিৎ প্রসারিত হল।
তিনি কোম্পানির সঙ্গে কথাবার্তা বলে, মীরজাফরের মতো সময় সময় নয়, বর্ধমান, মেদিনীপুর ও চট্টগ্রামের চিরস্থায়ী বন্দোবস্ত দিলেন। স্থির হল, এই তিনটি জেলার সমস্ত আয় ইংরেজরা গ্রহণ করবে এবং সমস্ত রকম সামরিক সহযোগিতা তারা নবাবকে দিতে থাকবে। অবশ্য যুদ্ধের সময় রসদের ব্যয় নবাব বহন করবেন।
এই চুক্তিতে উভয় পক্ষেরই লাভ হল।
বর্গীর হাঙ্গামায় মেদিনীপুর ও বর্ধমান ছারখার হয়ে গিয়েছিল। চতুর্দিকে ত্রাস বিরাজ করায় গ্রামগুলি জনশূন্য হয়ে পড়েছিল—শস্য ক্ষেত্র

পরিণত হয়েছিল নিবিড় অরণ্যে। অভাব অভিযোগ উত্থাপন করে ওখানকার জমিদারবর্গ নিয়মিত কর দিতে নারাজ ছিলেন। চট্টগ্রামের অবস্থা আরো শোচনীয়। মগ আর পর্তুগীজ দস্যুরা হাহাকার সৃষ্টি করে রেখেছে সেখানে। অপর্যাপ্ত সৈন্য মোতায়েন করেও তাদের দমন করা যাচ্ছে না। উপরন্তু এই সমস্ত সৈন্যের জন্য অজস্র অর্থ ব্যয় হয়ে যাচ্ছিল। সুতরাং এই তিনটি জেলা ইংরেজদের সমর্পণ করে, সম্মানজনক চুক্তি সম্পাদন হওয়ায় মীরকাশিমের লাভ বই ক্ষতি হল না। এবং তাঁর ধারণা হল, এই চুক্তির ফলে তিনি বাংলা বিহার উড়িষ্যার অবশিষ্টাংশ ইংরেজের কবল থেকে উদ্ধার করতে পারলেন।

কোম্পানির লাভ হল, ব্যবসাদার নাম ঘুচিয়ে এবার জমিদার হল।।

ইংরেজদের সঙ্গে এই চুক্তি সম্পাদিত হবার পরও মীরকাশিম সময় শান্তিতে অতিবাহিত করতে পারলেন না। তাঁর শিয়রে তখন শমন। হিন্দুস্থানের বাদশাহ শাহ আলম দ্রুতগতিতে এগিয়ে আসছেন সোনার বাংলা গ্রাস করতে। অবশ্য শাহ আলম নামেই হিন্দুস্থানের বাদশা। বর্তমানে দিল্লী-আগ্রা শত্রু কবলিত। তিনি রাজধানী থেকে বিতাড়িত হয়ে, অনেক পথে বিপথে ঘুরে সসৈন্যে বিহারের দিকে ধাবিত হন।

তাঁর এই অগ্রগতি সিরাজদ্দৌলার রাজত্বকালেই সূচিত হয়। মীর-কাশিম যখন তখ্‌তে আরোহণ করেন তখন বিহারের অধিকাংশ স্থান শাহ আলমের করতলগত। তিনি বিহার বাংলাকে সম্পূর্ণ আয়ত্তে এনে, নিশ্চিন্ত চিত্তে দিল্লীর দিকে অগ্রসর হয়ে শত্রুর কবল থেকে সিংহাসন ছিনিয়ে নেবার মনস্থ করেছেন।

তরুণ মোগল শাহজাদা রণকুশলী ও বিচক্ষণ ব্যক্তি। বিহারের অধিকাংশ স্থান অধিকার করে তিনি দীর্ঘদিন অবস্থান করছেন। ধনী ব্যক্তি এবং জমিদারবর্গ তাঁর পক্ষভুক্ত হয়েছেন। এতদিন পরে তিনি বাংলার দিকে দৃষ্টি দিলেন। দিল্লীর তখ্‌ত তাঁর অধিকারের বাইরে

থাকলেও, তখ্‌তের প্রকৃত দাবিদার তিনি, সুতরাং সুবে বাংলার নবাবদের উচিত তাঁকে বার্ষিক নজরানা প্রদান করা। কিন্তু তাঁরা তা করেন নি। শাহ আলম বাংলা অভিযানের পরিকল্পনা করলেন তিনটি কারণে। প্রথম বাংলাকে পদানত করতে পারলে, তাঁর যশ চতুর্দিক পরিব্যাপ্ত হবে। দ্বিতীয় প্রচুর অর্থলাভ করবেন তিনি। বাদশাহী পুনরুদ্ধার করতে গেলে অর্থের প্রয়োজনের অনিবার্যতাকে অস্বীকার করা যায় না। তৃতীয়, নবাবী বাহিনীকে দলভুক্ত করে নিজের শক্তিকে অতিমাত্রায় বৃদ্ধি করে নেওয়া।

চর মুখে শাহজাদার মনোভাবের কথা অবগত হলেন মীরকাশিম। দুশ্চিন্তায় বহু রজনী বিনিদ্রভাবে কাটল। শেষে ইংরেজ সেনাপতির সঙ্গে পরামর্শ করে শাহআলমকে বিহারেই বাধা দেওয়া স্থির হল।

কাউলর্ড মাদ্রাজে চলে গিয়েছিলেন। মেজর কারনেক তখন কোম্পানির সৈন্যদলের অধিনায়ক। তিনি সসৈন্যে যাত্রা করলেন প্রবল প্রতিপক্ষকে বাধা দিতে। এবং তিনি অচিরেই পাটনার নিকটবর্তী হলেন। কারনেকের আগমন সংবাদ শাহ আলমের অজানা রইল না। তিনি গোরা পল্টন ও দেশী সৈন্যকে আর অগ্রসর হতে না দিয়ে পথ রোধ করলেন।

প্রবল যুদ্ধ হল।

মোগল বাদশাহের দুর্ভাগ্য, প্রতিপক্ষকে যখন বেশ কাহিল করে এনেছেন, ঠিক এই সময় একটি গোলা তাঁর হাওদার কাছে এসে পড়ল। মাহুত মাংসপিণ্ডর আকার নিয়ে কোথায় ছিটকে পড়ল। অল্পের জন্য শাহ আলমের জীবন রক্ষা পেলেও রণহস্তীকে যুদ্ধক্ষেত্রে সামলে রাখা গেল না। যন্ত্রণা কাতর বিশাল জীবটি দ্রুত যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করল শাহ আলমকে নিয়ে। তাঁর অধীনস্থ সৈন্যরাও আর অপেক্ষা করল না। অধিনায়ককে পৃষ্ঠপ্রদর্শন করতে দেখে তারাও তাঁর পদাঙ্ক অনুসরণ করল। কারনেক জয়লাভ করলেন।

মাইল কয়েক দূরে গিয়ে ভাগ্যকে ধিক্কার দিতে দিতে শাহ আলম আবার সৈন্যদের একত্রিত করলেন। ছাউনি ফেলে বিশ্রাম নিতে লাগলেন। কয়েকদিনের মধ্যেই আবার ইংরেজদের আক্রমণ করবেন এই তাঁর ইচ্ছে। কারনেক তখন অন্য পরিকল্পনা করেছেন। তিনি জানতেন মোগলরা আবার আক্রমণ করবে। তাঁর সৈন্যরা শ্রান্ত হয়ে পড়েছে। অনর্থক রক্ত ক্ষয় হবে। পরাজিতও হতে পারেন। সুতরাং বর্তমানে সন্ধি করাই যুক্তিযুক্ত।

কারনেক দূত হিসেবে পাঠালেন রাজা সিতাব রায়কে।

সিতাব রায় যথানিয়মে সম্মান প্রদর্শন করে বিনীতভাবে সন্ধির প্রস্তাব দিলেন। ইংরেজ যুদ্ধের চেয়ে শান্তি বেশী পছন্দ করে তাও জানালেন। বর্তমানে ইংরেজের সঙ্গে শাহ আলমের সন্ধি করতে আপত্তি ছিল না কিন্তু মন্ত্রণাদাতারা তাঁর মনকে সন্ধির প্রতিকূলে নিয়ে গেল।

সন্ধি হল না।

আবার উভয় পক্ষের সাজসাজ রব পড়ে গেল। কিন্তু শেষ পর্যন্ত যুদ্ধ হল না। শাহ আলম নিজের অন্যতম মন্ত্রণাদাতা কামগড় খাঁকে বরখাস্ত করলেন। তিনি ক্রমেই বুঝতে পারছিলেন, এই লোকটির জন্য তাঁকে বহু অসুবিধা ভোগ করতে হচ্ছে। এবং এও বুঝতে পেরেছিলেন, ইংরেজ পল্টনের বিরুদ্ধে যুদ্ধ করে তিনি জয়লাভ করতে পারবেন না।

সন্ধির প্রস্তাব পাঠালেন।

মেজর কারনেক প্রস্তাব গ্রহণ করলেন। তখ্‌ত হীন, রাজধানী হীন মোগল বাদশাকে চূড়ান্ত সম্মান প্রদর্শন করে নিজের অস্থায়ী আবাসে নিয়ে এলেন। স্থির হল শাহ আলম পাটনায় যাবেন, সেখানেই কথাবার্তা হবে।

শাহ আলম মিশ্র মনোভাব নিয়ে পাটনায় এলেন।

মুর্শিদাবাদে নিশ্চিন্ত মনে আছেন মীরকাশিম।

মোটামুটিভাবে সমস্ত ঝামেলা তিনি অল্পদিনের মধ্যেই মিটিয়ে ফেলেছেন। তাঁর প্রেরিত সৈন্য শাহ আলমকে পরাজিত করে এখানে বেঁধে আনতে পারলেই ষোলকলা পূর্ণ হয়। তারপর একটি মাত্র কাজ বাকী থাকবে, তা হল ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানিকে বাংলার রাজনৈতিক ব্যাপারে হস্তক্ষেপ করা থেকে বিরত রাখা। কাজটি কিঞ্চিৎ কঠিন সন্দেহ নেই—ক্রমেই বুঝতে পারা যাচ্ছে, কোম্পানি ব্যবসা করার মনোভাবকে ত্যাগ করে, শাসনদণ্ড তুলে নেবার জন্য সচেষ্ট হচ্ছে। তবু মীরকাশিম আপ্রাণভাবে এই গতিকে রোধ করবেন।

এক অজানা কারণেই মীরকাশিমের আজ দরবারে মন বসল না।

অসময়ে দরবার ভঙ্গ করে মসনদ থেকে নেমে আসছেন, গুরগিন খাঁ এগিয়ে এসে কুর্নিশ জানিয়ে প্রশ্ন করলে, জাহাঁপনার শরীর কি আজ সুস্থ নেই ?

মৃদু হেসে নবাব উত্তর দিলেন, শরীর আমার সুস্থ আছে গুরগিন। মনও। কেন জানি না হঠাৎ মনে হল আজ আর দরবারে থাকব না।

—বিশেষ কুচকাওয়াজের ব্যবস্থা করব কি ?

—না। বুধবার দিন আমি গোলন্দাজদের শিক্ষণ পদ্ধতি পরিদর্শন করতে আসব।

—যথা আজ্ঞা।

মীরকাশিম কিছুদূর অগ্রসর হয়ে আহ্বান করলেন, গুরগিন—

গুরগিন দ্রুতপায়ে তাঁর কাছে উপস্থিত হল।

নবাব নিম্নকণ্ঠে বললেন, শ্রেষ্ঠীদের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছো তো ?

—আমি সতর্ক আছি জাহাঁপনা।

—ওরা নিকৃষ্ট জীব। সুবে বাংলার সবচেয়ে বড় শত্রু।

তিনি আর অপেক্ষা করলেন না। দরবার ত্যাগ করলেন।

নবাব অন্দরে প্রবেশ করে দেখলেন, ফতেমা মনোনিবেশ সহকারে একটি পুস্তক পাঠ করছেন। স্বামীর এই অসময় আগমনে ফতেমা সচকিত হলেন। পুস্তক রেখে সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে তাকালেন।

সহাস্যে মীরকাশিম বললেন, তোমার জন্য বোধহয় মন আকুল হয়ে উঠেছিল। দরবার শেষ করে চলে এলাম।

ফতেমা হাসলেন।

—কি পড়ছিলে ?

—মোগলদের কাহিনী।

মীরকাশিম উপবেশন করলেন।

—মোগলদের বীরত্বের কাহিনী লোকগাথায় পরিণত হয়েছে। বাবরের কথা আমি যখনই চিন্তা করেছি, বিস্ময়ে হতবাক্ হয়ে গেছি বেগম। বৃদ্ধ বয়সে এই বিরাট দেশকে হেলায় তিনি জয় করেছিলেন।

ফতেমা স্বামীর নিকটবর্তী হয়ে বললেন, শুধু বীর নয়, মোগল সম্রাটবর্গ মহানুভবও ছিলেন।

—ছিলেন বই কি। আকবরের মহানুভবতা নিয়ে এইদেশে আর কোন নৃপতি জন্মগ্রহণ করবেন কিনা সন্দেহ। আজকের শাহ আলমকে দেখে কল্পনা করা যায় না তাঁর পূর্বপুরুষরা কত মহান ছিলেন। আজ সে বৈভব নেই, নেই সেই গরিমা। আল্লাহ্‌র বিচারে এই রকমই হয়।—মোগল কাহিনীর কোন্ অংশ এখন পাঠ করছো বেগম ?

—জাহানারার প্রেম উপাখ্যান পড়ছি হুজরত।

—জাহানারা।—মীরকাশিম দৃপ্তকণ্ঠে বললেন, শাহজাহানের ওই আদরিণী কন্যার দৌলতেই হিন্দুস্থানে আমাদের সৌভাগ্যের সূচনা হয়েছে। সে কাহিনী তো তোমায় বলেছি। আমার পূর্বপুরুষ আরিফ খাঁ অগ্নিদগ্ধা জাহানারাকে সুস্থা করে না তুলতে পারলে আমরা ঐশ্বর্যের অধিকারী হতে পারতাম না। আজ সুবে বাংলার নবাবী করার সৌভাগ্য আমার হত না। আমি হতাম দিল্লী বা আগ্রার কোন

ভিস্তিওয়ালা। ঈশ্বরের উদ্দেশ্যে নতি জানিয়ে ফতেমা বললেন, শাহজাহানের হাত দিয়ে আল্লাহ্‌ আপনাদের জয়টিকা পরিয়ে দিয়েছিলেন।

—জাহানারার প্রেম কাহিনী পড়ছিলে বেগম। প্রেমাস্পদটি কে?

—রাওছত্রশাল। বুন্দেলার মহারাজা।

—ও কাহিনী শোনার আগ্রহ আমারও হচ্ছে। তুমি পড়, আমি শুনি।

—আপনার মূল্যবান সময়....

—নষ্ট হবে না। আমার আজকের সমস্ত সময় তোমাকে দান করলাম। ফতেমা পুস্তক তুলে নিলেন। সময় সময় মীরকাশিম অত্যন্ত খামখেয়ালী হয়ে উঠেন তিনি লক্ষ্য করেছেন। কাহিনী পাঠ করতে আরম্ভ করলেন। তন্ময় হয়ে শুনতে লাগলেন নবাব। কাহিনী এক সময় শেষ হল।

দীর্ঘনিশ্বাস ত্যাগ করে মীরকাশিম বললেন, মোগলকুমারীদের জীবনের সবচেয়ে বড় অভিশাপ, তাঁরা শাদী করার অনুমতি পেতেন না। রাও ছত্রশালের সঙ্গে যদি জাহানারার মিলন হত আমি অন্তত খুশী হতাম বেগম।

—আমিও। সমস্ত থেকেও কিছু ছিল না। কি করুণ জীবন ছিল তাঁর।

—ভাগ্যের পরিহাস তো ওখানেই। নামকরা কবি হব এই ছিল আমার বাল্যজীবনের স্বপ্ন, হয়ে গেলাম নবাব। আবার হয়তো ফকির হয়ে যাব। প্রাচুর্য থাকা সত্ত্বেও জাহানারা আর দশজন নারীর মতো স্বামী চেয়েছিলেন, সংসার চেয়েছিলেন। শাসনকে উপেক্ষা করে শেষ পর্যন্ত হয়তো ছত্রশালের জীবনের সঙ্গে নিজেকে বেঁধে ফেলতেন। কিন্তু পারলেন না। যুদ্ধক্ষেত্রে প্রাণ দিলেন রাও ছত্রশাল। ভাগ্য নিদারুণভাবে তাঁকে পরিহাস করল।

দুজনের কথাবার্তা আর অগ্রসর হল না। বাঁদী এসে সংবাদ দিল

নজাফ খাঁ হজরতের দর্শনপ্রার্থী। এই অসময়ে নজাফ খাঁর আগমনে চিন্তিত নবাব তাঁর অন্যতম সেনানায়ককে দর্শন দিলেন।

কুর্নিশ করে নজাফ খাঁ বললে, দূত সংবাদ এনেছে। বিহারে আমরা জয়লাভ করেছি জাহাঁপনা।

অসহ্য আনন্দ মীরকাশিমকে উতলা করে তুলল। তিনি নিজের ভাবাবেগকে সংযত করে বললেন, সুসংবাদ। শাহজাদাকে বন্দী করা হয়েছে।

—মেজর কারনেক শাহজাদার সঙ্গে সন্ধি করেছেন জাহাঁপনা।

—তুমি আমাকে বিচিত্র কথা শোনালে নজাফ খাঁ। পরাজিত করার পর রাজ্যহারা শাহ আলমের সঙ্গে সন্ধি করার কোন প্রশ্ন উঠতে পারে না। তাঁকে বন্দী করে মুর্শিদাবাদে নিয়ে আসা উচিত ছিল কারনেকের।

নজাফ খাঁ ঘটনাস্থলে উপস্থিত ছিল না। ক্লান্ত দূতের মুখে সংবাদ পেয়েই শুভসংবাদ নবাবের গোচরে আনবার জন্য তৎপর হয়েছে। তাঁর কথায় উত্তর দেবার মতো উত্তর তার ছিল। তবু নীরব রইল।

নবাব আবার প্রশ্ন করলেন শাহ আলম এখন কোথায়?

—পাটনায়।

—পাটনায় কেন?

—তাঁকে সসম্মানে পাটনায় নিয়ে যাওয়া হয়েছে। তিনি মেজর কারনেকের আতিথ্য গ্রহণ করেছেন।

জয়ের সংবাদ পেয়ে যে আনন্দ অনুভব করেছিলেন, এই সংবাদ শোনার সঙ্গে সঙ্গে তা দূরীভূত হল। কাল-বিলম্ব না করে মনস্থির করে ফেললেন মীরকাশিম। এখুনি পাটনার পথে যাত্রা করতে না পারলে পরিস্থিতি আরো ঘোরাল হয়ে উঠতে পারে।

তিনি গম্ভীর কণ্ঠে বললেন, আমি আজই পাটনা যাত্রা করতে চাই নজাফ। অবিলম্বে যাত্রার আয়োজন কর।

এই আদেশ শুনে নজাফ খাঁ অতিমাত্রায় বিস্মিত হলেও, মুখে সে ভাব প্রকাশ না করে আদেশ পালন করবার জন্য তৎপর হল।

নবাব মহা চিন্তিত হয়ে পড়লেন। ইংরেজদের শাহ আলমকে পাটনায় আমন্ত্রণ করে নিয়ে গিয়ে আদর-আপ্যায়ন করাকে সুনজরে দেখলেন না। কারণ একটি ধারণা তাঁর মনে ক্রমেই বদ্ধমূল হয়ে যাচ্ছিল, ইংরেজের অসাধ্য কিছু নেই—বাংলা-বিহার-উড়িষ্যার সুবেদারী এই সুযোগে হয়তো শাহ আলমের কাছ থেকে লিখিয়ে নেবার চেষ্টা করছে ইষ্ট ইণ্ডিয়া কোম্পানি। নইলে পরাজিত শত্রুকে আদর আপ্যায়নের বন্যায় বইয়ে দেওয়ার আর কোন সঙ্গত অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না।

সুতরাং তিনি মুর্শিদাবাদে স্থির থাকতে পারেন না। সমস্ত বিষয়টি পুঙ্খানুপুঙ্খ অনুধাবন করবার জন্য পাটনা যাত্রা করলেন।

পাটনার নিকটে বৈকুণ্ঠপুর।

নবাব বৈকুণ্ঠপুর পৌঁছবার পর মেজর কারনেক তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করলেন। কুর্নিশ করে সবিনয়ে মেজর বললেন, এতখানি পথের কষ্ট সহ্য করে ইয়োর এক্সেলেন্সি এখানে আসবেন আমরা চিন্তা করতে পারি নি।

গম্ভীর কণ্ঠে মীরকাশিম বললেন, আমার এই পথশ্রমের জন্য আপনি ছাড়া আর কেউ দায়ী নয়।

—ইয়োর এক্সেলেন্সি—

—আপনার কার্যকলাপ আমাকে এখানে আসতে বাধ্য করল মেজর সাহেব।

—আমি মোগল বাদশাহকে পরাজিত করেছি ইয়োর এক্সেলেন্সি। পুরস্কার আশা করি, তিরস্কার নয়।

—আপনি আমার আদেশ অনুসারে কাজ করেন নি। শাহ আলম পরাজিত হলে তাকে বন্দী করবেন এই স্থির ছিল। আমার

জমতে তাঁর সঙ্গে সম্মানজনক চুক্তি করে, তাঁকে আদর-আপ্যায়ন প্রদর্শন করবেন তা নিশ্চয় স্থির ছিল না? কারনেক ইতস্তত করতে লাগলেন।।

মীরকাশিম বলে চললেন, আপনি আমার অধীনস্থ কর্মচারী নন আমি জানি। আমার এও অজানা নয় যে, যে কোন বিষয়ে স্বাধীনভাবে কাজ করবার ক্ষমতা আপনার আছে। তবে এই ক্ষেত্রে, আমাকে অতিক্রম করে রাজনৈতিক বিষয়ে কোন কিছু করবার অধিকার আপনার নেই। ভুলে যাবেন না, এই যুদ্ধের সমস্ত ব্যয় বহন করেছি আমি! ইংরেজপল্টনদের মাসিক অর্থ প্রদান করতে হচ্ছে আমাকে। সুতরাং আপনি আমার সঙ্গে পরামর্শ না করে, শাহ আলমকে পাটনায় নিয়ে এলেন কোন্ যুক্তিতে?

মেজর কারনেক ক্লাইভের অন্তরঙ্গ বন্ধু ছিলেন। মীরজাফরের দোষ ত্রুটি থাকা সত্ত্বেও তাঁর স্থানে মীরকাশিমের আগমন কারনেক পছন্দ করে নি। কাজেই তার মনোভাব নূতন নবাবের অনুকূলে নয়। কিন্তু বর্তমান পরিস্থিতিতে জোরাল কণ্ঠে তাঁর বিশেষ বলার উপায় কিছু ছিল না।

তিনি বললেন, আপনার আদেশকে অমান্য করবার মনোভাব নিয়ে আমি কিছু করি নি। শাহ আলম দিল্লীর তখ্তের প্রকৃত দাবিদার। সাধারণ প্রতিপক্ষর মতো হিন্দুস্থানের শাহানশাহকে বন্দী করার অর্থ হল একটি বিরাট ঐতিহ্যকে অবমাননা করা। এই কারণেই আমি তাঁকে যোগ্য সম্মান দিয়ে পাটনায় নিয়ে গেছি।

কারনেকের উত্তর শুনে কিছুক্ষণ স্তব্ধ হয়ে রইলেন মীরকাশিম।

—যোগ্য ব্যক্তিকে আমি সম্মান প্রদর্শন করি না একথা মনে স্থান দেবেন না। তবে সেই যোগ্য ব্যক্তি যদি শত্রু হয় তবে কিঞ্চিৎ চিন্তার কারণ হয়ে পড়ে নাকি? শাহ আলমকে নিয়ে কি করতে চান?

—তাঁর ভবিষ্যৎ নিয়ে ইয়োর এক্সেলেন্সি চিন্তা করবেন।

—আপনার মতামত শুনতে চাই।

—আমার মতামত গ্রহণ করলে সুবে বাংলার মঙ্গল হবে। শাহ আলম ক্রমেই শক্তি সঞ্চয় করছেন। অযোধ্যার নবাব ও মহারাষ্ট্র শক্তি তাঁর পক্ষ অবলম্বন করবে সন্দেহ নেই। হিন্দুস্থানের বাদশাহর আসন তিনি গ্রহণ করতে পারবেন। কাজেই এখন তাঁর কোন ক্ষতি সাধন করলে অযোধ্যার নবাব ও মহারাষ্ট্র শক্তিকে শত্রু হিসাবে বরণ করা হবে। ইয়োর এক্সেলেন্সি নিশ্চয় এই গুরুদায়িত্ব গ্রহণ করা যুক্তিসঙ্গত মনে করবেন না।

মীরকাশিম মনে মনে কারনেকের যুক্তিকে সমর্থন করলেন।

—আপনার আর কিছু বক্তব্য আছে?

—আছে।

—বলুন?

কারনেক অনুমান করল তার কথা শুনে নবাব দ্বিধাগ্রস্ত হয়েছেন।

—শাহ আলমকে যখন আমরা দিল্লীর বাদশাহ হিসেবে স্বীকার করে নিচ্ছি তখন নবাবী ফরমান ইয়োর এক্সেলেন্সি তাঁর কাছ থেকে গ্রহণ করবেন। বাদশাহের কাছ থেকে ফরমান গ্রহণ না করলে ভবিষ্যতে গুরুতর গোলমাল হওয়ার সম্ভাবনা পূর্বতন নবাবরা ফরমান গ্রহণ করেছিলেন।

এই যুক্তিও অকাট্য। বাংলা যখন দিল্লীর বাদশাহর অধীন তখন ফরমান না গ্রহণ করলে মসনদের ন্যায্য দাবিদার হওয়া যায় না। মুর্শিদকুলী খাঁর আমল থেকেই এই নিয়ম প্রচলিত আছে। বার্ষিক খাজনার বিনিময়ে বাদশাহ বহিঃশত্রুর হাত থেকে সুবে বাংলাকে রক্ষা করবেন।

চিন্তিত কণ্ঠে মীরকাশিম বললেন, আপনি বলতে চান, এই অবসরে বাদশাহর কাছ থেকে ফরমান গ্রহণ করলে ভাল হয়?

—ইয়োর এক্সেলেন্সির অনুমান যথার্থ।

—এই মুহূর্তে কিছু স্থির করে নেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব নয়। সমস্ত বিষয়টি গভীরভাবে চিন্তা করে দেখা প্রয়োজন।

মীরকাশিম কারনেককে বিদায় দিলেন।

গভীর রাত্রি পর্যন্ত চিন্তা করে মীরকাশিম নিজের ভবিষ্যৎ স্থির করলেন। পরের দিন পাটনার বৈকুণ্ঠপুরে ইংরেজ কুঠির পরিচালক ম্যাগুয়ারকে আহ্বান করে জানিয়ে দিলেন, তিনি বাদশাহর সঙ্গে সাক্ষাৎ করে কথাবার্তা বলতে প্রস্তুত আছেন।

মীরকাশিম নিজের সৈন্য-সামন্ত নিয়ে পাটনায় পৌঁছলেন। নগরে প্রবেশ করলেন না। উপকণ্ঠে জাফার খাঁর উদ্যানে আশ্রয় গ্রহণ করলেন।

॥ তিন ॥

ইংরেজ কুঠিতে সোরগোল পড়ে গেছে।

আজ এখানে হিন্দুস্থানের বাদশাহ ও সুবে বাংলার নবাবের সাক্ষাৎ হবে। চতুর্দিকে সাজ-সজ্জার কাজ চলেছে। বিরাট একটি কক্ষকে বিশেষভাবে সজ্জিত করা হচ্ছে। কক্ষতলে মূল্যবান গালিচা পেতে দেওয়া হয়েছে। সুদৃশ্য রেশমের আচ্ছাদন দিয়ে ঢেকে ফেলা হয়েছে। চতুর্দিক। গবাক্ষে শোভা পাচ্ছে ইংলণ্ডে প্রস্তুত মনোরম কিংখাবের পর্দা।

এই কক্ষে দরবার বসবে।

সমস্যা দেখা দিল বাদশাহর আসনের।

অনেক অনুসন্ধান করেও তখ্‌তের আকারের কিছুই পাওয়া গেল না। অথচ পাওয়া না গেলেই নয়। বাদশাহর যোগ্য আসন চাই বই কি। ম্যাগুয়ার চিন্তিত হলেন। কলকাতা হলে এই সমস্যা দেখা দিত না। শেষ পর্যন্ত অনন্যোপায় হয়ে যে আসবাবের উপর খাদ্য গ্রহণ করেন, তারই উপর মখমলের আস্তরন দিয়ে বাদশাহর আসন তৈরী করা হল। ম্যাগুয়ার সিভিলিয়ানদের আদেশ দিয়ে রাখলেন, সকলে রুচিকর পোষাকে সজ্জিত হয়ে থাকবেন।

যথাসময় শাহ আলম সুসজ্জিত অবস্থায় পাত্র-মিত্রদের সঙ্গে নিয়ে এলেন। নকিব তাঁর পরিচয় দিতে দিতে এগিয়ে চলল। রোশনচৌকির সুর চতুর্দিকের বাতাসকে মিষ্টি করে তুলল। জঙ্গী প্রথায় ইংরেজ সৈন্য তাঁকে স্বাগত জানাল। অল্প সময়ের মধ্যেই ইংরেজদের পাটনার কুঠিতে বাদশাহী আমেজের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল পূর্ণমাত্রায়।

শাহআলম আসন গ্রহণ করলেন।

সমস্ত সিভিলিয়ান সমেত ম্যাগুয়ার ও কারনেক কুর্নিশ করে বাদশাহকে সম্মান প্রদর্শন করলেন। ইংরেজ পল্টন দরবার গৃহের দুপাশে সারিবদ্ধভাবে দাঁড়াল। মারকাশিম এলেন। তিনি একা আসেন নি। সঙ্গে এনেছিলেন নিজের কয়েকজন বিশ্বস্ত কর্মচারীকে।

প্রথানুসারে দ্বারপ্রান্ত থেকেই কুর্নিশ জানাতে জানতে বাদশাহর নিকট এগিয়ে এলেন মীরকাশিম। এক সহস্র এক আশরফি নজর প্রদান করলেন। তারপর ইঙ্গিত করতেই তাঁর অনুচরবর্গ অসংখ্য উপহার সামগ্রী এনে রাখল।

বিনীতকণ্ঠে মীরকাশিম বললেন, এই যৎসামান্য উপহার গ্রহণ করে আমায় অনুগৃহীত করুন আলীজা।

শাহ আলম উপহার সামগ্রী দেখে তুষ্ট হলেন।

লঘুকণ্ঠে নবাবকে ধন্যবাদ জানালেন। তারপর একপ্রস্থ দামী খেলাত প্রদান করলেন। কক্ষান্তরে গিয়ে মীরকাশিম পোষাক পরিবর্তন করে এলেন। কুশল প্রশ্ন বিনিময় হল বাদশাহ ও নবাবের মধ্যে।

তারপর নবাব সুবেদারীর ফরমান প্রার্থনা করলেন।

শাহ আলম বললেন, নিশ্চয়, সুবেদারীর ফরমান আপনি পাবেন বই কি। তবে রাজস্ব সম্পর্কে কথাবার্তা আগে শেষ করা চাই।

মীরকাশিম বিপন্ন বোধ করলেন। তিনি হিসাবী ও সঞ্চয়ী। কথায় কথায় অর্থ বর্ষণ করার তিনি পক্ষপাতি নন। তিনি অকপটে নিজের মনের ভাব প্রকাশ করলেন। যার সারমর্ম হল, কোম্পানি তাঁকে মসনদে বসিয়েছে। বিনিময়ে লক্ষ লক্ষ টাকা তিনি দিয়েছেন। এমন কি ফৌজের খরচখরচা বাবদ তিনটি জেলা তাঁকে ইংরেজের হাতে তুলে দিতে হয়েছে। বর্তমানে তাঁর আর্থিক অবস্থা বিশেষ আশাপ্রদ নয়। এক্ষেত্রে রাজস্ব প্রদান করা তার পক্ষে অত্যন্ত কষ্টকর।

বাদশাহ তাঁর কথা গ্রাহ্য করলেন না। পরিষ্কার জানিয়ে দিলেন রাজস্ব সম্পর্কে পাকা কথা না হলে ফরমান দেওয়া সম্ভব হবে না।

ম্যাগুয়ারের মধ্যস্থতায় অনেক কথা হল। উপায়ান্তর না দেখে রাজস্ব দিতে রাজি হতে হল নবাবকে। দরদস্তুর চলল কিছুক্ষণ। শেষে বার্ষিক চব্বিশ লাখ টাকায় রফা হল। বাদশাহ ফরমান দিতে আর অস্বীকার করলেন না। ফরমান তৈরি করে তাঁর কাছে পাঠিয়ে দেওয়া হবে জানালেন। ওই সঙ্গে সাত হাজারী মনসবদারের পদ দেওয়া হল সুবে বাংলার নবাবকে। তাঁর সম্পূর্ণ নাম হল তখন, নবাব আলীজা-নশীন উল-মূলক ইমতিয়াজউদ্দৌলা মীর মুহম্মদ কাশেম আলী খাঁ নসরতজঙ্গ বাহাদুর।

সভা ভঙ্গ হল।

শাহ আলম ফিরে গেলেন কেল্লায়। মীরকাশিম জাফার খাঁর উদ্যানের উদ্দেশ্যে রওয়ানা হলেন। কয়েকদিন দরবার করবার পর শেষ পর্যন্ত সত্যিই ফরমান পাওয়া গেল। মীরকাশিম পাটনায় আর অপেক্ষা করলেন না। মুর্শিদাবাদে যে ফিরে গেলেন তাও নয়। সকলকে হতবাক্ করে দিয়ে পৌঁছলেন মুঙ্গেরে।

মুর্শিদাবাদে থাকার চেয়ে মুঙ্গেরে নিজের রাজধানী স্থানান্তরিত করা তিনি বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। ইংরেজদের কাছ থেকে তিনি কিছু দূরেই থাকতে চাইছিলেন। পাটনায় আসবার সময় মুঙ্গেরে দুর্গটি সংস্কার করাবার বন্দোবস্ত করে গিয়েছিলেন। সিরাজের বিরুদ্ধে চক্রান্তকারীদের অন্যতম গোলাম হোসেনের অধিকারে ছিল এই দুর্গ। তাঁকে নাম মাত্র জানিয়ে দুর্গটি নবাব অধিকার করলেন। অনিচ্ছা থাকলেও গোলাম হোসেন কিছু বলতে পারলেন না।

কেল্লাটিকে সম্পূর্ণ নতুনভাবে সাজানো হল। গুরগিনের তদারকে তৈরি হল সৈনিকদের জন্য বিশেষ আবাসস্থল। মুঙ্গেরের কাছেই পর্বতবিশিষ্ট স্থানে গুরগিনের জন্য মনোরম একটি গৃহ নির্মাণ করিয়ে দিলেন নবাব।

রাজধানী হওয়ার পক্ষে মুর্শিদাবাদের চেয়ে মুঙ্গের বহু বিষয়ে শ্রেষ্ঠ।

পর্বত ও বিশাল গঙ্গা নগরটিকে বেষ্টন করে আছে। শত্রু পক্ষের দুর্গ অধিকার করা রীতিমতো কষ্টকর। এই সমস্ত সুবিধার কথা বিবেচনা করেই শাহজাহানের দ্বিতীয় পুত্র শুজা এখানে দুর্গ নির্মাণ করিয়েছিলেন। তখ্‌ত ইয়া তখ্‌তা এই প্রতিজ্ঞা নিয়ে যখন চার শাহজাদা রক্তের নেশায় মাতাল হয়ে উঠলেন তখন চারজনের একজন বাংলার সুবেদার শুজা রাজমহল রাজধানী হওয়া সত্ত্বেও মুঙ্গেরে অবস্থান করেছিলেন এবং এখান থেকেই সৈন্য সংগ্রহ করে যাত্রা করেছিলেন আওরঙ্গজেবের বিরুদ্ধে।

মীরকাশিম মুঙ্গেরে গিয়ে বসলেন কায়েমীভাবে।

তাঁর চরিত্রে বিলাসিতার স্থান ছিল না। গভীরভাবে মনোনিবেশ করলেন রাজ্য পরিচালনায়। সপ্তাহে দুটি দিন নির্দিষ্ট হল বিচারের জন্য। অতি সামান্য অপরাধের বিচারও নবাব করতেন। অপ-রাধীদের প্রতি বিন্দুমাত্র দুর্বলতা তিনি প্রকাশ করতেন না। কঠিন শাস্তি দেওয়া হত।

এই সময়ই ইংরেজদের সঙ্গে তাঁর বিবাদ আরম্ভ হল। পাটনায় কুঠির অধিনায়ক হয়ে ম্যাগুয়ারের স্থলে এসেছিলেন এলিস। ক্রূরকর্মা এলিস নানা ব্যাপারে নবাবকে অসুবিধায় ফেলবার চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু তার জের দীর্ঘদিন টানতে দেওয়া হয় নি। গোলমাল বাধল ব্যবসার শুল্ক আদায়ের সূত্র ধরে।

মীরজাফরকে মসনদে বসাবার পূর্বে চতুর ক্লাইভ তাঁকে দিয়ে বিশেষ একটি সর্ত করিয়ে নিয়েছিলেন, কোম্পানি বিনা শুল্কে ব্যবসা করবে সুবে বাংলায়। এই সর্তে মত দিয়ে মীরজাফর নবাব সরকারের আয় বহুলাংশে কমিয়ে দিয়েছিলেন। বাঙালী ব্যবসাদাররা প্রভূত ক্ষতির মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়াল। তখনও কোন প্রতিবাদ ওঠে নি। কারণ কোম্পানি গুটিকয়েক জিনিসের মাত্র ব্যবসা করত।

কিন্তু দিন এগিয়ে যাবার সঙ্গে সঙ্গে পরিস্থিতি ঘোরাল হয়ে উঠল।

কোম্পানির কর্মচারীরা কোম্পানির দস্তক দেখিয়ে বিনা শুল্কে ব্যবসা করতে আরম্ভ করলেন। তাঁরা সমস্ত দেশীমালের কারবার করেন। প্রচুর অর্থ আয় হয়—নবাব এই আয় থেকে পান না এক কপর্দক। স্থানীয় ব্যবসাদারদের ব্যবসা উঠে যাবার উপক্রম হল।

এই বেআইনী ব্যবসার বিরুদ্ধে মীরকাশিমের কাছে অসংখ্য আবেদন পৌছাল। ইংরেজ ব্যবসাদারদের নবাব সরকারের কর্মচারীদের উপর অত্যাচারের কাহিনীও তিনি শুনলেন। আর নীরব থাকা বুদ্ধিমানের কাজ নয়। মীরজাফরের মতো তিনি বিপুল ক্ষতি সহ্য করা বাঞ্ছনীয় মনে করলেন না।

মীরকাশিম ভ্যান্সিটার্টকে পত্র দিলেন। পত্রে লিখলেন, কোম্পানিকে বিনা শুল্কে ব্যবসা করবার অধিকার দেওয়া হয়েছিল। যদিও জাফার আলী একটি অন্যায় সর্ত অনুমোদন করেছিলেন, তবু কোম্পানি যদি ব্যবসা করতেন আমি কোন আপত্তি করতাম না। কিন্তু বর্তমানে কোম্পানির দস্তক দেখিয়ে কলকাতার প্রতিটি ইংরেজ বিনা শুল্কে ব্যবসা করতে নেমে পড়েছেন। আমার প্রজা এবং কর্মচারীদের উপর অন্যায় জুলুম করছেন। অবিলম্বে এই বেআইনী ব্যবসা বন্ধ করে না দিলে আমাকে এই সম্পর্কে অন্য সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হবে।

নবাবের পত্র পৌছানো মাত্র হৈচৈ পড়ে গেল কাউন্সিলারদের মধ্যে। মীরকাশিমের ঊর্ধ্বতন চোদ্দপুরুষকে নরকস্থ করতে তাঁরা ছাড়লেন না। এই দলে অবশ্য ভ্যান্সিটার্টও হেষ্টিংস ছিলেন না। তাঁরা দুজনে কাউন্সিলারদের বোঝাবার চেষ্টা করলেন, আমাদের ব্যক্তিগতভাবে বিনা শুল্কে ব্যবসা করবার অধিকার দেওয়া হয় নি। ব্যবসা করবার অধিকার আছে কোম্পানির। সুতরাং আমার এই বেআইনী কাজের প্রতিবাদ করবার ক্ষমতা নবাবের আছে।

প্রচুর বাদ্ বিতণ্ডার পর স্থির হল, ভ্যান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস মুঙ্গেরে

যাবেন এই বিষয় নিয়ে কথাবার্তা বলতে। যে কোন উপায়ে নবাবকে কাউন্সিলারদের পক্ষে আনবার জন্য দুজনে আপ্রাণ চেষ্টা করবেন।

শীত পড়ার মুখে দুজনে পৌঁছলেন মুঙ্গেরে।

নবাব সমাদরের সঙ্গে গ্রহণ করলেন গভর্নর ও কাউন্সিলারকে। মূল্যবান উপহার সামগ্রী দিলেন তাঁদের। আমোদ-আহ্লাদের মধ্যে দিয়েই কেটে গেল কয়েকদিন। শেষে আসল বিষয় নিয়ে আলোচনা আরম্ভ করলেন ভ্যান্সিটার্ট। আলোচনার সূত্রপাতেই নবাব বললেন, ইংরেজ কর্মচারীদের নিজস্ব ব্যবসা করাকে আমি পছন্দ করি না। আমাকে ক্ষতি সহ্য করতে হচ্ছে। সমস্ত ব্যবসা বন্ধ হোক এই আমার ইচ্ছে।

ভ্যান্সিটার্ট সবিনয়ে জানালেন, ইয়োর এক্সেলেন্সি ক্ষতিগ্রস্ত হচ্ছেন আমাদের অজানা নয়। কয়েকজন উগ্র স্বভাবের কাউন্সিলার অশিষ্ট ব্যবহার করছেন সাধারণ মানুষের সঙ্গে সন্দেহ নেই। তবে ব্যবসা সম্পূর্ণভাবে তুলে দেওয়া কষ্টকর।

—কেন?

—ইয়োর এক্সেলেন্সি বুদ্ধিমান ব্যক্তি। বেআইনীভাবে হলেও, এই দীর্ঘ সময়ে ইংরেজরা সমস্ত স্তরের ব্যবসার বেড়াজালে সুবে বাংলাকে জড়িয়ে ধরেছে। এখন তারা হঠাৎ সরে গেলে হুলুস্থুল পড়ে যাবে। খাদ্যসামগ্রী এককণা পাওয়া যাবে না কোথাও। ইয়োর এক্সেলেন্সি অত্যন্ত অসুবিধায় পড়ে যাবেন।

হেষ্টিংস ইংরেজদের ব্যবসা তুলে দিলে আর কোন্ কোন্ বিষয়ে অসুবিধা দেখা দেবে তাও জানালেন সবিস্তারে।

মীরকাশিম চিন্তা করলেন কিছুক্ষণ।

—কিন্তু—তিনি বললেন, বাঙালী ব্যবসাদাররা আপনাদের জন্য ব্যবসা তুলে দিতে বাধ্য হোক তাতো আমি বরদাস্ত করব না।

—স্থানীয় ব্যবসাদারদের আমরা তো বাধা দিচ্ছি না ইয়োর এক্সেলেন্সি স্বচ্ছন্দে তারা ব্যবসা করতে পারে।

—স্বচ্ছন্দে তারা যদি ব্যবসাই করতে পারতো, এই গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়তো তাহলে হত না।

—তারা যদি ব্যবসা চালাতে না পারে, তার জন্য আমরা দায়ী নই। আমাদের অপরাধী সাব্যস্ত করলে অবিচার করা হয়ে ইয়োর এক্সেলেন্সি।

মীরকাশিম আসন ত্যাগ করে পদচারণা করতে লাগলেন।

—দায়ী সম্পূর্ণ আপনারা।

—আমরা!

—ভুলে যাবেন না গভর্নর সাহেব, আপনারা বিনা শুল্কে ব্যবসা করছেন। আমার প্রজাদের শুল্ক দিতে হয়, তারপর আছে আপনাদের জোর জুলুম।

ভ্যান্সিটার্ট নীরব রইলেন।

হেস্টিংসও কিছু বলতে পারলেন না।

—এরপর আমি যদি কিছু কঠোর হই, নিশ্চয় আমাকে দোষ দেওয়া যায় না?

ভ্যান্সিটার্ট ইতস্তত করে বললেন, এখন আমাদের কি করতে বলেন?

—শুল্ক দিতে হবে।

—কিন্তু প্রাক্তন নবাব....

—আপনি বর্তমান নবাবের সঙ্গে কথা বলছেন। প্রাক্তন নবাবের সঙ্গে আপনাদের যে চুক্তি হয়েছিল তার বাধ্যবাধকতা আমার উপর প্রয়োজ্য নয়।

—ইয়োর এক্সেলেন্সি আমরা বিদেশী বণিক, আমাদের প্রতি সুবিচার করবেন এই অনুরোধ।

মীরকাশিম উচ্চহাস্যে কক্ষ প্রকম্পিত করলেন।

—বণিক। বণিক আর আপনারা রইলেন কোথায়? এখন আপনারাই বাংলার দণ্ডমুণ্ডের অধিকর্তা। প্রয়োজন বোধে তখ্‌তে কাউকে বসাচ্ছেন, কাউকে নামাচ্ছেন। তার জ্বলন্ত উদাহরণ আপনাদের সামনে, এই কাশিম আলী।

মীরকাশিমের কথায় ভ্যান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস দুজনেই অত্যন্ত বিব্রত হয়ে পড়ছিলেন। আত্মপক্ষ সমর্থন করবার মতো কোন পথ তাঁদের সামনে উন্মুক্ত ছিল না।

হেষ্টিংস বললেন, শুল্ক দিয়ে ব্যবসা করতে গেলে আমাদের ব্যবসা উঠিয়ে দিতে হবে ইয়োর এক্সেলেন্সি।

—বেশ তো, উঠিয়ে দিন।

—তা তো সম্ভব নয়।

—তাহলে যা সম্ভব তাই করুন।

এরপর অনেক বিনয় আর প্রার্থনার পর স্থির হল, পুরো শুল্ক দিতে হবে না ইংরাজদের। তাঁরা দেশী মালের পাইকারী দরের উপর নবাবকে শতকরা নটাকা হারে মাসুল দেবেন। কোম্পানির কর্মচারীরা ব্যক্তিগত ব্যবসায় কোম্পানির দস্তক ব্যবহার করতে পারবেন না। কলকাতার কর্মচারীদের ভ্যান্সিটার্টের স্বাক্ষর করা দস্তক নিয়ে ব্যবসায় নামতে হবে। ব্যবসার ক্রয়-বিক্রয়ের ব্যাপারে ইংরেজরা বাঙালীদের উপর জোরজুলুম খাটাতে পারবেন না। জোরজুলুম করলে নবাবের ফৌজদার তাঁদের শাস্তির বিধান করবেন।

চুক্তি স্বাক্ষরিত হল।

মীরকাশিম নিশ্চিন্ত হলেন। অনেকদিনের ক্ষতিকারক একটি সর্তকে এই চুক্তির দ্বারা মোটামুটি ভেঙে ফেলা হল। তোষাখানায় মোটা আয়েরও ব্যবস্থা হল। ভ্যান্সিটার্ট এবং হেষ্টিংসও খুশী হলেন। পরিস্থিতি ঘোরাল না হয়ে উঠে সমাধানের আকার নিল এও কম কথা নয়।

ভ্যান্সিটার্ট কলকাতায় ফিরে গেলেন।

তিনি নিশ্চিন্ত ছিলেন, তাঁর ও নবাবের মধ্যে যে চুক্তি হল সকলে এই ব্যবস্থা স্বাগত জানাবে। কার্যক্ষেত্রে বিপরীত দৃশ্যের অবতারণা হল। চুক্তির সারমর্ম শুনে কাউন্সিলাররা রাগে আত্মহারা হয়ে পড়লেন। গভর্নরকে প্রকাশ্যে বিদ্রূপ এবং গালিগালাজ করতে অনেকে পশ্চাদ্‌পদ হলেন না।

ভ্যান্সিটার্ট হতভম্ব।

হেস্টিংসের অবস্থাও তথৈবচ।

অনন্যোপায় হয়ে ভ্যান্সিটার্টকে কাউন্সিলের অধিবেশন আহ্বান করতে হল। চুক্তিটি বাতিল করে দিলেন সভ্যরা। স্থির হল পূর্বেকার ব্যবস্থাই চলতে থাকবে, অর্থাৎ কোম্পানির দস্তক সভ্যরা ব্যবহার করবেন, এক কপর্দক মাসুল দেবেন না, নবাবের ফৌজদাররা তাঁদের জুলুম বন্ধ করতে পারবে না।

সভ্যদের বোঝাবার চেষ্টার করেও হেস্টিংস বিফল হলেন।

ভ্যান্সিটার্ট নীরবে সহ্য করলেন প্রচণ্ড অপমান।

চুক্তি নাকচ করার কথা মীরকাশিম জানতে পারলেন যথাসময়ে তখ্‌ত অন্য কারুর অধিকারে থাকলে পরিস্থিতি কি দাঁড়াত বলা যায় না। মীরকাশিম এই অপমান নীরবেই সহ্য করলেন। পার্শ্বচরদের কাছে একটি মন্তব্যও করলেন না। দুটি রাত্রি চিন্তা করলেন গভীরভাবে। চিন্তার ফসল ফলতে বিলম্ব হল না। অপমানের প্রতিশোধ নেবার জন্য তিনি তৎপর হলেন।

প্রথমে জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, স্বরূপচাঁদ প্রভৃতি শ্রেষ্ঠীবর্গকে মুঙ্গেরে আনিয়ে নিলেন সপরিবারে। তাঁরা আসতে চান নি। গুরগিন তাঁদের ইঙ্গিতে জানিয়ে দিল, স্বেচ্ছায় না গেলে বলপ্রয়োগ করা হতে পারে। উপায়ান্তর না থাকায় তাঁরা চলে এলেন।

মীরকাশিম চর-মুখে সংবাদ পেয়েছিলেন। শ্রেষ্ঠীবর্গ আবার রাজনীতিতে নামবার চেষ্টা করছেন। সিরাজদ্দৌলার বিরুদ্ধে এঁরা যেমন ষড়যন্ত্র পাকিয়ে তুলেছিলেন, মীরকাশিমের বিরুদ্ধে যে সেই রকম চেষ্টায় নেই তা এখন হলফ করে বলা যায় না। সুতরাং ইংরেজদের বিপাকে ফেলার আগে এঁদের কাছে এনে রাখাই শ্রেয় মনে করলেন নবাব।

দরবার বসেছে।

আমীর ওমরাহ ও হিন্দু অমাত্যরা আসন গ্রহণ করেছেন। শ্রেষ্ঠীরাও নিজের নিজের আসনে বিষণ্ণবদনে উপবিষ্ট। নকিবের হাঁক শোনা গেল। নবাব দরবারে এলেন। মসনদে বসলেন। মুঙ্গেরে তিনি সমস্ত প্রয়োজনীয় সামগ্রী মুর্শিদাবাদ থেকে আনিয়েছেন, শুধু একটি বাদে। সেই বাদ দেওয়া বিশেষ বস্তুটির জন্য তাঁকে কম পরিশ্রম করতে হয় নি। অর্থ ব্যয়ও করেছেন জলের মতো। তখ্‌ত মুবারক। মুঙ্গেরে প্রস্তুত সেই ঐতিহাসিক তখ্‌ত মুর্শিদাবাদেই রয়ে গেছে। কেন যে আনিয়ে নেওয়া হয় নি নবাব নিজেও জানেন না। এখন ব্যবহার করছেন একটি অলঙ্কৃত বহুমূল্য নূতন তখ্‌ত।

নবাব বিশাল দরবার গৃহের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিয়ে, শ্রেষ্ঠীদের উপর দৃষ্টি স্থির করলেন। তাঁদের বিষণ্ণমুখ তাঁকে আনন্দিত করে তুলল। সকৌতুকে প্রশ্ন করলেন, আপনারা কি অসুস্থ ?

প্রশ্নের গূঢ় অর্থ বুঝতে পেরে চতুর জগৎশেঠ অমায়িকভাবে হেসে বললেন, আমরা সম্পূর্ণ সুস্থ আছি হজরত।

সুস্থ আছেন, আশ্বস্ত হলাম। মুখের অবস্থা দেখে মনে হয়েছিল বুঝি সুস্থ নেই। আপনারা অসুস্থ হয়ে পড়লে আবার সুবে বাংলা অন্ধকার হয়ে যাবে।

রাজবল্লভ বললেন, জাহাঁপনা আমাদের সঙ্গে রহস্য করছেন ?

—মানী ব্যক্তিদের সঙ্গে রহস্য করা কি চলে।

রায়দুর্লভ বললেন, সুবে বাংলার উজ্জ্বল ভাস্কর হলেন আপনি জাহাঁপনা। আমরা নিভে যাওয়া নক্ষত্র মাত্র।

—চমৎকার। উপমাটি আপনি চমৎকার দিয়েছেন। অর্থ উপার্জনের ফিকির-ফন্দীর কথা সবসময় না চিন্তা করে কবিতা লিখলে পারতেন। নামকরা কবি হিসেবে লোক আপনাকে মান্য করত।

রায়দুর্লভ হাসবার চেষ্টা করলেন।

আর কেউ কোন মন্তব্য করতে সাহসী হলেন না। নবাবের প্রত্যেক কথার অর্থ বুঝতে পারা যায় না সব সময়। কান পেতে শুনে যাওয়াই ভাল, প্রয়োজনের অতিরিক্ত কিছু বলে বিপদ ডেকে আনার কোন অর্থ নেই।

মীরকাশিম আবার বললেন, এই উজ্জ্বল ভাস্করকে মেঘে ঢেকে দিতে পারলেই আপনারা খুশী হন আমি তা জানি।

স্বরূপচাঁদ নীরব ছিলেন।

এবার দ্রুতকণ্ঠে বললেন, আমাদের প্রতি অবিচার করবেন না জাহাঁপনা। আপনি দীর্ঘদিন তখ্‌তের অধিকারী হয়ে প্রজাপালন করুন, আমরা অন্তর দিয়ে তা কামনা করি।

—সুখী হলাম। আপনাদের মতো অনুগত প্রজালাভ করে আমি ধন্য।

দরবারস্থ আর সকলের মুখে হাসির ঝিলিক খেলল।

নজাফ খাঁ দরবারে প্রবেশ করে কুর্নিশ করল।

—বন্দেগী জাহাঁপনা।

—কি সংবাদ নজাফ ?

—চর-মুখে গুরুতর সংবাদ এসেছে হজরত।

নজাফ খাঁর ইতস্তত ভাব লক্ষ্য করে নবাব বললেন, তুমি এখানেই তোমার বক্তব্য পেশ কর।

—কলকাতা থেকে কোম্পানির ত্রিশখানা বজরা পাটনার পথে রওয়ানা হয়েছে। গোলাবারুদ পাঠানো হচ্ছে এলিসের কাছে।

মীরকাশিম মসনদ ছেড়ে উঠে দাঁড়ালেন।

নজাফ খাঁর নিকটবর্তী হয়ে বললেন, সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত?

—নিশ্চিত হুজরত।

—ইংরেজ প্রস্তুত হচ্ছে। আমার সঙ্গে মানিয়ে চলতে চায় না। তারা ভুলে যাচ্ছে আমি মীরজাফর নই—আমি মীরকাশিম। নজাফ—

—হুজরত—

—বজরাগুলি এখন কোথায়?

—এখন বোধ হয় পাকুড় অতিক্রম করেছে জাহাঁপনা।

গম্ভীর কণ্ঠে মীরকাশিম বললেন, মুঙ্গের অতিক্রম করে যেন যেতে না পারে, এই আমার আদেশ। গোলা-বারুদ অস্ত্র যা পাবে বাজেয়াপ্ত করবে। বন্দী করবে নৌকার সমস্ত রক্ষীকে।

—বান্দা আদেশ পালন করবে জাহাঁপনা।

—যাও। তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রাখ গিয়ে বজরাগুলির উপর।

নজাফ খাঁ বিদায় নেবার পর মীরকাশিম শ্রেষ্ঠীদের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনাদের মিত্ররা গোলমাল পাকিয়ে তুলতে চায়। সন্ধি ভঙ্গ করা বোধহয় তাদের চরিত্র-গত বৈশিষ্ট্য। আপনারা কি বলেন?

রাজা রাজবল্লভ বললেন, জাফার আলীকে কেন্দ্র করে ইংরেজের সঙ্গে আমাদের সখ্যতা গড়ে উঠেছিল—সে কথা তুলে আমাদের আর লজ্জা দেবেন না জাহাঁপনা। বর্তমানে আমরা সুবে বাংলার নবাবের দাসানুদাস।

—লজ্জাবোধটুকু এখনও আছে আপনাদের? শুনুন রাজা সাহেব, স্বার্থের জন্য বন্ধুত্ব এক জিনিস আর দাসত্ব করার ভান করে বেই-

মানির চিন্তা করা আরেক জিনিস। জগৎশেঠ বললেন, একটি প্রার্থনা ছিল জনাব।

—প্রার্থনা! আপনার মতো ধনকুবেরের প্রার্থনা কি এই দরিদ্র নবাব পূর্ণ করতে পারবে? বলুন?

—রাজনীতি থেকে আমি বিদায় নিয়েছি। বাংলার নবাবদের সেবা কম দিন হল করছি না। এবার আমার অবসর যাপনের অনুমতি দিন।

—বর্তমানে অবসর যাপনের সুযোগই তো আমি আপনাদের দিয়েছি। মুঙ্গেরের জল-হাওয়া ভাল। উত্তর বাহিনী গঙ্গা রয়েছে। অবসর যাপনের এর চেয়ে ভাল স্থান আপনি পাবেন কোথায়?

—বহুদিন বাংলায় রইলাম। শেষ জীবনের কটাদিন দেশে গিয়ে কাটাতে চাই।

—দেশ!

—আমার দেশ মাড়োয়ার, জাহাঁপনা।

মীরকাশিম সশ্লেষে বললেন, আমি সময় সময় ভুলে যাই শ্রেষ্ঠী জগৎশেঠ যে আপনি বাঙালী নন।

—আমারও একটি প্রার্থনা ছিল হজরত।

রায়দুর্লভ বিনীত কণ্ঠে বললেন।

নবাবের কণ্ঠে বিস্ময়, আপনারও প্রার্থনা আছে?

—অতি তুচ্ছ প্রার্থনা।

—বলুন?

—এই রাজনৈতিক আবর্তের মধ্যে থেকে আমার মন বিষয়ে উঠেছে। বয়স তো কম হল না। এখন ধর্মকর্মে মন না দিলে কবে দেব? আমাকে কাশী যাবার অনুমতি দিন গঙ্গার তীরে বসে বিশ্বনাথের নাম ভজন করেই বাকী জীবন কাটিয়ে দিতে পারব।

—আপনি তো বাঙালী?

—হ্যাঁ জাহাঁপনা।

—তবে শেষ জীবন বিদেশে গিয়ে কাটাবেন কেন? বাংলাদেশে কালীঘাট রয়েছে। গঙ্গাও আছে সেখানে। মন্দিরের চত্বরে বসে কালী নামও তো ভজন করা যায়। রায়দুর্লভ হাসবার চেষ্টা করে বললেন, জাহাঁপনা যথার্থই বলেছেন। তবে বিশ্বনাথ আমায় টানছেন, তাছাড়া আজকাল কালীঘাট কলকাতার মধ্যে, কলকাতায় থাকলেই রাজনীতি আমার পিছু ছাড়বে না।

—রাজনীতি থেকে অবসর নেবার জন্য খুবই উতলা হয়ে পড়েছেন দেখছি। রাজা রাজবল্লভ—

—আজ্ঞা করুন হজরত—

—শ্রেষ্ঠী স্বরূপচাঁদ—

—জাহাঁপনা।

—আপনারা দুজনও কি জীবনের বাকী কটা দিন দেব সেবায় অতিবাহিত করবার জন্য ব্যাকুল হয়ে উঠেছেন?

রাজবল্লভ ও স্বরূপচাঁদ একই সঙ্গে বললেন, হজরত আমাদের মনের কথা বলেছেন।

—দেবসেবা নিশ্চয় আপনারা মুঙ্গেরে করতে পারবেন না?

—মুঙ্গেরে.......ইতস্তত করে স্বরূপচাঁদ বললেন, এখানে পূজা অর্চনা করার বহু অসুবিধা আছে।

মীরকাশিম অন্যান্য অমাত্যদের দিকে দৃষ্টিপাত করে বললেন, আপনারা কেউ আমায় বুঝিয়ে বলতে পারেন, মুঙ্গেরে হিন্দু বা মুসলমানের ঈশ্বরের আরাধনা করার কি অসুবিধা আছে?

তাহেব আলী উঠে দাঁড়িয়ে বললেন, মুসলমানদের কোন অসুবিধা নেই জাহাঁপনা। শান্তিতে আল্লাহ্‌র আরাধনা করার উপযুক্ত স্থান।

—রূপলালজী, আপনাদের কোন অসুবিধা আছে?

প্রবীন রূপলাল বললেন, মুঙ্গেরকে সুবে বাংলার রাজধানী করে

জাহাঁপনা বিজ্ঞতার পরিচয় দিয়েছেন। আমাদের বাহান্ন পীঠের একটি পীঠ এই নগর। পূজা অর্চনার কোন অসুবিধা নেই।

মীরকাশিম আবার ফিরে গেলেন মসনদে।

বললেন, আমাকে যতটা বুদ্ধিহীন আপনারা মনে করেন আমি ঠিক ততটা নই। শ্রেষ্ঠী জগৎশেঠ, রাজা রাজবল্লভ, ধর্মের দোহাই দিয়ে আপনারা আমার হাত থেকে পিছলে বেরিয়ে যাবার যে চেষ্টা করছেন তা কোনদিনই কার্যকরী হবে না।

—আমরা নিতান্তই ধর্মের জন্য…কথা শেষ করতে পারলেন না রায়দুর্লভ।

—থাক, থাক আর নিজেদের হাস্যাস্পদ করবেন না। আমি সবই বুঝতে পেরেছি। তবে এখানে আমি আপনাদের ধর্মাচরণে বাধা দেব না। পাঞ্জা পাবেন। ওই পাঞ্জার সাহায্যে কেল্লা থেকে বেরিয়ে গঙ্গাস্নান করে আসতে পারবেন।

বাংলার ধনকুবেরবর্গ আর কিছু বললেন না।

নতমস্তকে আসনে উপবিষ্ট রইলেন।

এরপর মীরকাশিম গুটিকয়েক বৈষয়িক কাজ সম্পন্ন করলেন।

দরবার ভঙ্গের সময় উপস্থিত হল। আজ বহুক্ষণ নবাব দরবারে রইলেন। শেঠেদের দুরাবস্থা সভাসদ্‌রা প্রচুর উপভোগ করেছেন। সভা ভঙ্গের পর কাহিনীটি চতুর্দিকে চাউর করার জন্য অনেকে ব্যস্ত।

মীর মুনশি বললে, আজ আর কোন বৈষয়িক কাজ নেই হজরত। এখন শুধু কয়েকজন ব্যবসায়ী আবেদন জানাবার জন্য অপেক্ষা করছে।

মীরকাশিম বললেন, ব্যবসায়ীরা কি আবেদন নিয়ে এসেছে আমি অনুমান করেছি। তাদের সুবিধার্থেই আজ এক ঐতিহাসিক ঘোষণা আমি করব। আপনারা সকলে শুনুন, এই মুহূর্ত থেকে দুবছরের জন্য দেশী বাণিজ্যের উপর থেকে শুল্ক তুলে নিলাম। আমার প্রজারা

কোম্পানির সঙ্গে বিনা শুল্কে ব্যবসায়িক প্রতিযোগিতায় নামুক এই আমার ইচ্ছে।

এই ঘোষণা এতই আকস্মিক যে সকলেই হতবাক্ হয়ে গিয়েছিলেন। পরমুহূর্তে প্রবল হর্ষধ্বনিতে পূর্ণ হল দরবারগৃহ। অনেকে আল্লাহ্ ও মহেশ্বরের কাছে নবাবের দীর্ঘজীবন কামনা করতে লাগলেন।

শেঠেদের হৃদয় কন্দর মথিত করে দীর্ঘনিশ্বাস বেরিয়ে এল। তাঁরা কেউ কল্পনা করতে পারেন নি, ইংরেজদের চুক্তি ভঙ্গের জন্য নবাব এই দুঃসাহসিক পরিকল্পনা গ্রহণ করবেন। অত্যন্ত অস্বোয়াস্তি ও বিরক্ত বোধ করতে লাগলেন পলাশীর চক্রান্তকারীরা।

সভা আবার নিস্তব্ধ হল।

নবাব গম্ভীরকণ্ঠে আহ্বান করলেন, তকী খাঁ—

তকী খাঁ কুর্নিশ করে দণ্ডায়মান হল।

—জাহাঁপনা—

—অবিলম্বে নগরে-বন্দরে, গ্রামে-মোকামে প্রচার করে দাও আমার আদেশ। সকলে যেন নবোদ্যমে ব্যবসার কাজে মনোনিবেশ করে।

—হজরতের আদেশ অবিলম্বে পালিত হবে।

শেঠেদের দিকে তাকিয়ে নবাব বললেন, এতদিন পর আপনারা নিশ্চয় স্বীকার করবেন, আমি একজন প্রজাপালক নবাব।

রাজবল্লভ বললেন, বহুদিন পূর্ব থেকে আমরা জানি আপনি একজন প্রজাপালক নরপতি। তবে ...

—তবে প্রজাদের উপর থেকে ব্যবসার শুল্ক তুলে নিয়ে বিচক্ষণতার পরিচয় দিচ্ছি না এই কথাই বলতে চাইছেন কি?

—নবাব সরকারের লক্ষ লক্ষ টাকা ক্ষতি হবে জাহাঁপনা।

—হবে বই কি।

রায়দুর্লভ বললেন, এই সঙ্কটের সময় এত টাকার ক্ষতি....

—আমার পক্ষে সহ্য করা কষ্টকর হবে জানি।—নবাব মৃদু হেসে

বললেন, আপনারা আমার পাশে যখন রয়েছেন তখন ক্ষতি পূরণ হতে তো বিলম্ব হবে না।

জগৎশেঠ বললেন, এই শুল্ক মুকুবের ব্যাপারে আমরা কি করতে পারি ?

আমার তোষাখানা ভরে দিতে পারেন। প্রজাদের কাছ থেকে শুল্ক বাবদ যে টাকা আমি পেতাম, এখন আপনারা তা পূরণ করে দেবেন।

শ্রেষ্ঠীরা চোখে অন্ধকার দেখলেন।

রাজবল্লভ কম্পিত কণ্ঠে বললেন, গোস্তাকি মাফ করবেন জাহাঁপনা। নবাব সরকারে আমাদের বহু লক্ষ টাকা বাকী। আমাদেরও অনটন চলেছে। বর্তমানে আমাদের এমন অবস্থা নেই যে........

—আমাকে টাকা যোগান দিতে পারেন। আপনাদের অনটন দূর করবার জন্য বাকী টাকাটা আমি দিয়ে দিলে বরং ভাল হয়, কি বলেন ?

স্বরূপচাঁদ বললেন, আরেকটি বিষয় বিবেচনা করার রয়েছে। এই শুল্ক তুলে দিলে ইংরেজদের প্রভূত ক্ষতি হবে। ইংরেজ শক্তিকে শত্রু হিসেবে আহ্বান করবার মতো সময় বোধহয় এখন নয়।

—নয় কেন ? সভাস্থ আপনারা সকলে শুনে রাখুন, ইংরেজ যদি এই শুল্ক তুলে দেবার বিষয়ে জটিলতা সৃষ্টি করে, আমি তাদের ক্ষমা করব না। আমার শিক্ষিত সৈন্যদল আছে, গোলা-বারুদ, অস্ত্রসস্ত্র কিছুরই অভাব নেই। বলিষ্ঠ পদক্ষেপে যুদ্ধ ক্ষেত্রের দিকে অগ্রসর হবার মতো মনোবলও আছে। আজ এই বিশেষ মুহূর্তে আমি আপনাদের কাছে আবেদন জানাচ্ছি, সেই রক্তিম দিন যদি আসে, ব্যক্তিগত স্বার্থের কথা ভুলে আমার পাশে এসে দাঁড়াবেন। তখন হয়তো পলাশীর কলঙ্ক মোচন করবার সম্পূর্ণ অবকাশ আমরা পাব।

নবাব আর কিছু বললেন না।

দৃঢ়পদে দরবার ত্যাগ করলেন।

জগৎশেঠ বললেন, ব্যাপার বিশেষ সুবিধার বুঝছি না।

স্বরূপচাঁদ বললেন, এরকম একরোখা লোক কে জানত। আগে জানলে…

—আঃ, কি করছেন আপনারা। আসুন।—রাজবল্লভ দ্রুত অথচ নিম্ন কণ্ঠে বললেন, চতুর্দিকে চর ঘুরছে। এখানে কোন মন্তব্য না করাই ভাল। তাঁরা দরবার ত্যাগ করবার জন্য অগ্রসর হলেন।

দেশী ব্যবসাদারদের উপর থেকে শুল্ক তুলে নেওয়ার পরই ইংরেজদের গুরুতর পরিস্থিতির মুখো-মুখি গিয়ে দাঁড়াতে হল। প্রতিটি ব্যবসায় বাঙালীদের হস্তক্ষেপের ফলে অপর্যাপ্ত অর্থের ক্ষতি হয়ে গেল। নবাবের কোন এলাকার মধ্যে কোম্পানির কর্মচারীদের ব্যবসা করার অনুমতি দেওয়া হল না। কেউ কেউ চেষ্টা করতে গিয়ে ফৌজদারের অনুচরদের হাতে লাঞ্ছিত হল।

কলকাতায় ইংরেজ মহলে হাহাকার পড়ে গেল।

দ্রুত আহূত হল কাউন্সিলের অধিবেশন। সভ্যরা নবাবের কাজকে অন্যায় বলে সোরগোল তুললেন। প্রচুর বাদ্‌বিতণ্ডা হল। নবাব নিজের আদেশ তুলে না দিলে বাংলায় কোম্পানির কোন কর্মচারীর পক্ষে ব্যবসা করা সম্ভব হবে না—ভ্যান্সিটার্টকে বলা হল আশু ব্যবস্থা গ্রহণ করতে।

ভ্যান্সিটার্ট বললেন, চুক্তি নাকচ করে দিলে পরিস্থিতি বাঁকা-পথ নিতে পারে আপনাদের পূর্বেই জানিয়েছিলাম। আপনারা তখন আমার যুক্তি গ্রাহ্য করলে এই ফল ভোগ করতে হত না।

—যা হবার হয়ে গেছে—ল্যাসিংটন বললেন, আপনি এখন যে কোন উপায়ে নবাবের আদেশকে বাতিল করবার ব্যবস্থা করুন।

—আমার কিছুই করবার নেই। নবাব নিজের এলাকায় যে কোন আদেশ দিতে পারেন, তা বাতিল করে দেবার ক্ষমতা কারুর নেই। বরং পূর্ব চুক্তিতে ফিরে গিয়ে তাঁকে অনুরোধ করা যেতে পারে আদেশটি পুনরায় বিবেচনা করবার জন্য।

—ন টাকা হারে সুদ দিতে আমরা প্রস্তুত নই।

—আমার কিছু বলবার রইল না।

পার্কিনস বিদ্রূপ করে উঠল।

—আপনার যে কিছু বলার নেই আমরা জানি। শুধু জানতাম না এত খোলাখুলিভাবে ইবলিশের বাচ্চা নবাবকে সমর্থন করবেন।

হেস্টিংস বললেন, গভর্নরের সঙ্গে সংযত ভাষায় কথা বলুন। রাজনীতির আপনি কিছুই জানেন না।

আবার গোলমাল চলল কিছুক্ষণ।

বহু আলাপ আলোচনার পর স্থির হল, নবাবের কাছে দুজন সদস্যকে পাঠান হবে এই বিষয় সম্পর্কে আলোচনা করতে।

মুঙ্গেরে যাবার জন্য মনোনীত হলেন পিটার এমিয়ট এবং উইলিয়াম হে। এঁরা দুজনই বহুদিন বাংলায় আছেন। এখানকার রাজনীতি সম্পর্কে ওয়াকিবহাল। কাউন্সিলাররা এক অজানা কারণেই নিশ্চিত হয়ে পড়লেন, এঁরা দুজন নবাবের মত পরিবর্তন করে পূর্বেকার অবস্থা ফিরিয়ে আনতে পারবেন।

হে ও এমিয়ট কাল বিলম্ব না করে মুঙ্গেরে যাত্রা করলেন।

মন্ত্রণাকক্ষ।

মীরকাশিম পদচারণা করছেন। জগৎশেঠ, রাজবল্লভ প্রমুখ শ্রেষ্ঠীরা রয়েছেন সেখানে। নজাফ খাঁ নতমস্তকে দণ্ডায়মান। নবাব একসময় পদচারণা বন্ধ করে আসন গ্রহণ করলেন।

বললেন গম্ভীর কণ্ঠে, তোমরা যখন বজরাগুলি ঘিরে ফেললে, ওরা গুলি চালিয়েছিল?

নজাফ খাঁ বললে, হ্যাঁ মালেক।

—সাহস ক্রমে গগনস্পর্শী হয়ে উঠছে। তারপর—

—বজরাগুলিকে আমরা প্রথমে আক্রমণ করতে চাই নি হজরত। লাল-দরওয়াজার ঘাট অতিক্রম করবার সময় আপনার আদেশ অনুসারে কোম্পানির বজরাগুলিকে ঘাটে আসবার অনুরোধ করি। আমার অনুরোধ অগ্রাহ্য করে অগ্রসর হতে থাকে। সুজাঘাটে তাদের প্রতিরোধ করা হয়। ইংরেজরা গুলি চালায় মালেক। আমাদের পক্ষের হরিপাল ও আনোয়ার আহত হয়েছে। তোপ দিয়ে বজরাগুলিকে উড়িয়ে দেবার হুকুম দিতে তারা ঘাটে এসেছে।

—বজরাগুলিতে খানাতল্লাস চালাও। গোলাবারুদে ভরা আছে ওই ত্রিশখানা জলযান। আপনারা কি বলেন শ্রেষ্ঠী জগৎশেঠ মহতাপচাঁদ?

জগৎশেঠের মুখের উপর ত্রৈলোক্য হাসি খেলে গেল।

—জাহাঁপনা বজরাগুলির পথ রোধ করেছেন, আমাদের আর কি বলবার থাকতে পারে। তবে—

—তবে?

—অনুসন্ধান করে দেখা যাবে হয়তো সন্দেহজনক কিছুই নেই।

—নেই।

—নুন, চাল আর গোলমরিচ আছে। পাটনার কুঠিতে পাঠানো হচ্ছে ব্যবসার জন্য।

—অসম্ভব নয়। তবু অনুসন্ধান করে দেখতে হবে। নজাফ খাঁ, আদেশ পালিত হোক।

—জাহাঁপনা।

কুর্নিশ করে নজাফ খাঁ নিষ্ক্রান্ত হল।

নবাব শ্রেষ্ঠীদের উদ্দেশ্য করে কিছু বলতে যাচ্ছিলেন, গুরগিন খাঁ মন্ত্রণাকক্ষে এসে জানাল, হে ও এমিয়টসাহেব জাহাঁপনার সাক্ষাৎ প্রার্থী।

নবাবের ইঙ্গিত পেয়ে গুরগিন প্রস্থান করল। অল্পক্ষণ পর কক্ষে প্রবেশ করলেন এমিয়ট ও হে। দুজনে একই সঙ্গে কুর্নিশ জানালেন। শ্রেষ্ঠীদের মধ্যে চাঞ্চল্য দেখা দিল। বহুদিন পরে হঠাৎ পুরাতন বন্ধুদের সাক্ষাৎ পেলে মন আনচান করে ওঠা স্বাভাবিক।

আগন্তুক দুজনকে সম্পূর্ণ উপেক্ষা করে মীরকাশিম জগৎশেঠের দিকে তাকিয়ে বললেন, আপনারা কেমন যেন অস্থির হয়ে উঠেছেন বলে মনে হচ্ছে।

জগৎশেঠের মুখে হাসির প্রলেপ পড়ল।

—সাহেবরা আমাদের অনেকদিনের পরিচিত। তাঁদের দেখেই····

—পুরানো বন্ধুদের আলিঙ্গন পাবার জন্য ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন বোধহয় ?

শ্রেষ্ঠীরা নীরব রইলেন।

মীরকাশিম এমিয়ট ও হে'র দিকে তাকালেন।

নিস্পৃহ কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, আপনারা হঠাৎ কলকাতা থেকে এখানে এলেন যে ?

হে বললেন, আমাদের আগমন সংবাদ ইয়োর এক্সেলেন্সির কাছে পূর্বেই পাঠান হয়েছিল।

—আপনারা আসছেন আমি সংবাদ পেয়েছি। ভ্রমণের উদ্দেশ্য নিয়ে আসছেন না কোন বিশেষ প্রয়োজন আছে, সে সম্পর্কে আমি সম্পূর্ণ অন্ধকারে।

—প্রয়োজনেই আমরা এসেছি ইয়োর এক্সেলেন্সি।

—তাওতো বটে। প্রয়োজনের বাইরে ইংরেজরা যে পা বাড়ায় না সময় সময় একথা আমার স্মরণ থাকে না।

এমিয়ট বললেন, কাউন্সিলারদের মুখপাত্র হয়ে আমরা দুজন এসেছি আপনার কাছে শান্তির প্রস্তাব নিয়ে।

—শান্তির প্রস্তাব!

উচ্চহাস্যে সকলকে সচকিত করে তুললেন মীরকাশিম।

—আপনাদের সঙ্গে যুদ্ধ হল না অথচ শান্তির প্রস্তাব নিয়ে এসেছেন। ধুরন্ধর ইংরেজদের মতিভ্রম হচ্ছে ক্রমে—?

হে বললেন, ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করেই আমরা আজ ওই প্রস্তাব নিয়ে এসেছি ইয়োর এক্সেলেন্সি।

—আপনাদের কথা শুনে খার্তুমের এক ফকিরের কথা মনে পড়ে যাচ্ছে।—মীরকাশিমের কণ্ঠে বিদ্রূপের আমেজ, সে জীবন্ত কবরের মধ্যে প্রবেশ করেছিল। তার যুক্তি ছিল, একদিন যখন মৃত্যুবরণ করতেই হবে তখন কবরে আশ্রয় নিলে ক্ষতি কি! যুদ্ধের নাম গন্ধ নেই, আপনারা এসেছেন সন্ধির প্রস্তাব নিয়ে। যাক, যা বলতে এসেছেন এবার পরিষ্কার করে বলুন।

এমিয়ট বললেন, ইয়োর এক্সেলেন্সি আপনার রাজত্বে আমরা শান্তিতে ব্যবসা করতে চাই। কিন্তু বর্তমানে আমাদের হাজার হাজার টাকার ক্ষতি হয়ে যাচ্ছে।

—ক্ষতির জন্য দায়ী কি আমি? ব্যবসায় লাভ যেমন হয়, লোকসানের জন্য তেমনই প্রস্তুত থাকতে হয়। কোম্পানি বহু লাভ করেছে কিছুদিন লোকসান সহ্য করলে বিশেষ ক্ষতি হবে না।

—দেশী ব্যবসাদারদের উপর থেকে শুল্ক তুলে নেওয়ায় আমাদের এই অসুবিধার মুখোমুখি দাঁড়াতে হয়েছে। কাউন্সিলারদের অনুরোধ—

এমিয়টকে কথা শেষ করতে দিলেন না মীরকাশিম।

—ওই বিষয় নিয়ে অনুরোধ করতে এসে কত নির্লজ্জতার পরিচয় দিচ্ছেন তা কি আপনারা জানেন সাহেব। চুক্তি হয়েছিল। ভ্যান্সিটার্টও হেস্টিংস এসে চুক্তি করে গিয়েছিলেন, শতকরা ন'টাকা

হারে শুল্ক দেবেন আপনারা, কোম্পানির দস্তক কেউ ব্যক্তিগত ভাবে ব্যবহার করবেন না। আপনারা সে চুক্তি মানলেন না। সুবে বাংলাকে অরাজক করে তুলেছেন। এরপরও এসেছেন অনুরোধ নিয়ে।

—শুল্ক তুলে নেওয়ায় নবাব সরকারের ক্ষতি হচ্ছে।

—আমার ক্ষতি হচ্ছে সে জন্য আপনাদের তো চিন্তিত হবার কোন কারণ নেই। কোম্পানি বিনা শুল্ক দিয়ে ব্যবসা করেছে, অল্প মূল্যের জিনিসকে চতুর্গুণ মূল্যে বিক্রী করেছে—সে ক্ষতি সহ্য করেছি। সুতরাং দরিদ্র প্রজাদের মুখ চেয়ে এ ক্ষতি সহ্য করব না কেন?

হে এবং এমিয়ট দুজনেই নবাবের কথাবার্তায় অধৈর্য হয়ে পড়ছিলেন। মীরজাফরকে তাঁরা সকলে মিলে তখ্‌ত থেকে নামিয়ে মীরকাশিমকে ওই আসনে বসাবার জন্য যখন নিশ্চিত হয়েছিলেন তখন কেউ কল্পনাও করেন নি ইনি কোম্পানির খেলার পুতুল হবেন না।

হে বললেন, প্রজাদের সুবিধার জন্য যতটা না হোক আমাদের অসুবিধায় ফেলবার জন্যই শুল্ক রহিত আপনি করেছেন।

—যদি তাই করে থাকি অন্যায় কিছু করেছি কি? আপনারা কি বলেন?

নবাব শ্রেষ্ঠীদের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন।

রাজবল্লভ বিব্রত ভাবকে কোন ক্রমে দমন করে বললেন, হুজুরতের বিবেচনা বোধকে আমরা সব সময় প্রশংসার চক্ষে দেখে থাকি।

—সাহেব, আপনাদের বন্ধুর কথা শুনেছেন?

—ওঁরা আপনার বন্দী।

—বন্দী নয়। প্রয়োজনের খাতিরে ওঁদের মুর্শিদাবাদ থেকে এখানে আনিয়েছি। আশা করি আপনাদের বক্তব্য শেষ হয়েছে?

—আমরা শান্তি চাই ইয়োর এক্সেলেন্সি। আপনার ও আমাদের মধ্যেকার সম্পর্ক সহযোগীতামূলক হোক এই আকাঙ্খা সমস্ত কাউন্সিলারের। এক্ষেত্রে……

—আমি আমাদের শেষ কথা ভ্যান্সিটার্টকে জানিয়ে দিয়েছি। ন'টাকা হারে শুল্ক দিলে আমি সন্তুষ্ট নতুবা ইংরেজদের সঙ্গে আমার সম্পর্ক নিশ্চিতরূপে অবনতি ঘটবে। তিনি অভিজ্ঞ ব্যক্তি আমার সঙ্গে চুক্তি করতে দ্বিধা করেন নি।

এমিয়ট বললেন, গভর্নরের কার্যকলাপকে আমরা মূল্য দেব না। আপনি তাঁকে প্রচুর অর্থ দিয়েছেন, তিনি আপনার পক্ষ অবলম্বন করবেনই।

ঝলসে উঠলেন মীরকাশিম।

—অর্থ আমার কাছ থেকে নেয় নি কে? মাংসখণ্ড লাভের জন্য কুকুর যেমন হিতাহিত জ্ঞান শূন্য হয়ে পড়ে, আপনারাও অর্থের লোভে সেই স্তরে নেমে এসেছিলেন। আমি বিলিয়েছি—দুহাত ভরে বিলিয়েছি। স্বদেশে পাঠিয়েছেন সেই অর্থ, আবার এই দেশে প্রমদাও ক্রয় করেছেন। একা ভ্যান্সিটার্টকে দোষী করে নিজেদের হাস্যাস্পদ করে তুলবেন না।

—ইয়োর এক্সেলেন্সি আমাদের কোন আবেদন গ্রাহ্য করবেন না, স্থির নিশ্চিত হয়ে রয়েছেন বুঝতে পারছি। এক্ষেত্রে আমাদের আর এখানে অপেক্ষা করে লাভ নেই, এখুনি কলকাতা যাত্রা করতে চাই।

মীরকাশিম বললেন, এসে যখন পড়েছেন, এক সঙ্গে দুজনের কলকাতা ফেরা হবে না। সপ্রশ্ন দৃষ্টিতে দুজনে তাকালেন নবাবের দিকে। একজনকে এখানে থাকতে হবে জামিন হিসেবে!

—জামিন!

—হ্যাঁ। আপনাদের ত্রিশখানা বজরা পাটনার পথে যাচ্ছে। সেগুলি অনুসন্ধান করে দেখবার আদেশ দিয়েছি।

হে বললেন, ব্যবসার মালপত্র নিয়ে আমাদের অসংখ্য বজরা কলকাতা ও পাটনার পথে যাওয়া আসা করছে। বজরাগুলিকে কেন আটক করা হয়েছে আমাদের ধারণার অতীত ইয়োর এক্সেলেন্সি।

—আমি সংবাদ পেয়েছি বজরাগুলি অস্ত্রশস্ত্র বয়ে নিয়ে চলেছে এলিসের কাছে। সুতরাং অনুসন্ধান করে দেখার আদেশ দিতে আমি বাধ্য হয়েছি। আপনারা একজন ইচ্ছে করলেই কলকাতা রওয়ানা হতে পারেন। অনুসন্ধান শেষ না হওয়া পর্যন্ত এখানে অপেক্ষা করতে হবে আরেকজনকে।

কক্ষের অপর প্রান্তে গিয়ে দুজনের নিম্ন কণ্ঠে আলোচনা হল।

আলোচনা শেষ করে এমিয়ট এগিয়ে এসে বললেন, আমি কলকাতায় ফিরে যাচ্ছি কাউন্সিলে সমস্ত কথা জানাতে। হে এখানে থাকবে।

—আমার আপত্তি নেই।

নজাফ খাঁ কক্ষে প্রবেশ করে কুর্নিশ করল।

—হজরত—

—কি সংবাদ নজাফ?

—বজরাগুলি অস্ত্রসস্ত্র পরিপূর্ণ হজরত।

মীরকাশিম ঝটিতে আসন ত্যাগ করলেন। তাঁর মুখমণ্ডল রক্তবর্ণ ধারণ করল। অসীম বলে নিজের উত্তেজনা দমন করবার চেষ্টা করলেন তিনি।

তীক্ষ্ণকণ্ঠে বললেন, অস্ত্রসস্ত্র বাজেয়াপ্ত কর। বন্দী কর ওই সমস্ত ইংরেজ ব্যবসাদারদের। আগুন ধরিয়ে দাও বজরাগুলিতে।

তিনি ফিরে দাঁড়ালেন এমিয়ট আর হে'র দিকে।

—আপনারা শান্তির প্রস্তাব নিয়ে এসেছিলেন? চমৎকার! মুখে শান্তির বুলি আর আড়ালে অস্ত্রসজ্জা! আমাকে নির্বোধ মনে করে আপনারা ভুল করেছেন। সহস্র সতর্ক চক্ষু আমার চতুর্দিকে। বেনিয়া ইংরেজের রাজদণ্ড অধিকার করবার লালসা আমি লক্ষ্য করছি।

তাঁর কথা শেষ হবার পরই দ্রুতপায়ে গুরগিন কক্ষে প্রবেশ করে, কুর্নিশ জানিয়ে বললে, সর্বনাশ হয়েছে হজরত। পাটনায়—

—কি হয়েছে পাটনায়?

—চর-মুখে এইমাত্র সংবাদ এসেছে দুর্বৃত্ত এলিস অতর্কিতে পাটনা আক্রমণ করে দুর্গ দখল করেছে।

—দুর্গ দখল করেছে! গুরগিন—

—জাহাঁপনা।

—এই সংবাদের সত্যতা সম্পর্কে তুমি নিশ্চিত গুরগিন।

—নিশ্চিত জাহাঁপনা। সংবাদদাতা আমাদেরই একান্ত বিশ্বাসী নিয়ামত খাঁ। শুধু দুর্গই অধিকার করে নি এলিস। পাটনার নাগরিকদের উপর অকথ্য অত্যাচার চালিয়েছে। বহু সহস্র মানুষ জীবন দিয়েছে ইংরেজের অস্ত্রাঘাতে। দাউদাউ করে নগর জ্বলছে জাহাঁপনা।

—জ্বলছে! শুধু পাটনা জ্বলছে না গুরগিন। অগ্নিবলয়ে নিমজ্জিত হয়েছে আমার অন্তস্থল। আমি পরিষ্কার দেখতে পাচ্ছি, সুবে বাংলার সমস্ত শান্তিকে লেলিহানের জঠরে নিক্ষেপ করাই ইংরেজের উদ্দেশ্য।

দীর্ঘলয়ে উচ্চহাস্য করলেন মীরকাশিম। হাসির প্রতিটি তরঙ্গ ক্ষোভ আর ক্রোধে মূর্ত হয়ে উঠল। দুই চোখ দিয়ে ঠিকরে বেরিয়ে এলো আগুনের ঝলক।

—গুরগিন খাঁ—

—জাহাঁপনা।

—বন্দী কর এই দুই বেইমান ইংরেজকে। সুবে বাংলায় যেখানে যত ইংরেজ কুঠী আছে সব অবরোধ কর। যেখানে যত ইংরেজ বেনিয়া আছে সকলকে বন্দী কর। নির্বিচারে অত্যাচার চালাও। ইংরেজের রক্ত কত লাল আমি দেখতে চাই। চাই পাটনা হত্যাকাণ্ডের সমুচিত প্রতিশোধ।

মীরকাশিমের প্রতিভূ হিসেবে পাটনার শাসন ব্যবস্থা পরিচালনা করছিলেন মীর মেহেদী। তিনি সম্পূর্ণ নিরুদ্বেগে ছিলেন। কোন রকম আক্রমণের আশঙ্কা তাঁর মনে স্থান পাবার কথাও নয়। অথচ সেই অচিন্তনীয় ঘটনাই ঘটে গেল। গভীর রাত্রে নিদ্রিত নবাব সেনার উপর অতর্কিতে আক্রমণ চালাল এলিস।

প্রস্তুত হবার বিন্দুমাত্র অবকাশ পায় নি নবাব বাহিনী।

পাটনার পথে পথে রক্তের স্রোত বইয়ে দিয়েছে দুর্দ্দান্ত এ'লিস, নগরের ধনাঢ্য ব্যক্তিদের গৃহগুলি নির্বিচারে লুণ্ঠিত হয়েছে। কিন্তু বিস্ময়ের বিষয় এই শোচনীয় পরিস্থিতির মধ্যেও একজন হিন্দু ও একজন মুসলমান যে বীরত্বের পরিচয় দিল তা অতুলনীয়।

হিন্দু সেনানায়ক লাল সিংহ ছত্রভঙ্গ সৈন্যদের সংগৃহীত করে প্রাণপণে দুর্গ রক্ষা করবার জন্য সচেষ্ট হল। মহম্মদ আমীন তখন আরেক পরিকল্পনা গ্রহণ করেছে। চেহেল সেতুন প্রাসাদে আহত ইংরেজগণ আশ্রয় গ্রহণ করেছিল তাদের তত্ত্বাবধানে ছিলেন ডাক্তার ফুলারটন।

ইংরেজ সৈন্যদের সমস্ত সতর্কতাকে ব্যর্থ করে দিয়ে আমীন চেহেল সেতুন প্রাসাদ আক্রমণ করল। এলিস এই আক্রমণকে ছিন্নভিন্ন করে দেবার পূর্বেই মীরকাশিমের সুযোগ্য সেনানায়ক মার্কার সসৈন্যে নগরের দ্বারপ্রান্তে এসে উপস্থিত হল। কোম্পানির কর্মচারীদের উপর দৃষ্টি রাখবার জন্য নবাব মার্কারকে পাটনার নিকটেই অবস্থান করবার আদেশ দিয়েছিলেন।

মার্কারের প্রচণ্ড আক্রমণ সহ্য করবার ক্ষমতা এলিসের ছিল না। অচিরেই নগর শত্রু মুক্ত হল। মীর নাসীরকে নগর রক্ষার কাজে নিযুক্ত করে মার্কার ধাবিত হল ইংরেজ কুঠি আক্রমণ করতে। চারদিন অবরুদ্ধ অবস্থায় ইংরেজদের কুঠির মধ্যে থাকতে হল। অনন্যোপায় এলিস নৌকা যোগে পলায়ন করবার মনস্থ করলেন।

কিন্তু ইংরেজদের এই পরিকল্পনা কার্যকরী হল না।

গঙ্গার পথে কিছুদূর অগ্রসর হবার পরই এলিস দেখলেন, পথ রোধ করে নৌকার ব্যূহ রচনা করেছে মার্কারের সৈন্যদল। সম্মুখ যুদ্ধে অবতীর্ণ হওয়া ছাড়া আর কোন পথ খোলা ছিল না।

যুদ্ধ হল।

শোচনীয় ভাবে পরাজিত হলেন এলিস। ইংরেজের রক্তে লাল হয়ে গেল পুণ্যঃসলিলা গঙ্গা। চার পাঁচ জন ছাড়া আর সকলেই বন্দী হল। এলিস নিজের নির্বুদ্ধিতার ফল চূড়ান্তভাবে উপলব্ধি করলেন।

মুঙ্গেরে এই জয়ের সংবাদ যখন পৌছাল তখন নবাব দরবার ত্যাগ করে মহলে প্রস্থান করেছেন। নজাফ খাঁ গিয়ে তাঁকে এই শুভ সংবাদ পরিবেশন করল। হৃষ্টচিত্তে মীরকাশিম ফতেমার নিকটবর্তী হলেন। প্রবল আকর্ষণে তাঁকে নিজের বাহুবন্ধনে আবদ্ধ করে মৃদুকণ্ঠে বললেন, বেগম, রোবাই শুনবে?

মীরকাশিম যখন সুবে বাংলায় সুশাসন প্রবর্তিত করবার জন্য দিবারাত্রি চেষ্টা করছেন তখন প্রাক্তন নবাব মীরজাফর কলকাতায় তাঁর চিৎপুরের গৃহে অহিফেনের নেশায় বুঁদ হয়ে দিন অতিবাহিত করছেন। আজ তাঁকে দেখলে এ ধারণা কোন মতেই মনে বদ্ধমূল হয় না, ইনিই নবাব আলিবর্দীর বাহিনীর প্রধান সেনাধক্ষ্য ছিলেন—ইনি ছিলেন সুবে বাংলার মসনদের অধিকারী।

ক্ষমতা অধিকার করবার লোভ হয়তো তাঁর মন থেকে তিরোহিত হয়েছে। কারণ তিনি নিশ্চিত ভাবে জেনে ফেলেছেন লোভের সফল রূপ দেবার ক্ষমতা তাঁর আর নেই। মনের পরিবর্তনও হয়েছে অনেক। সময় সময় মক্কায় যাবার প্রবল আগ্রহ মনকে নাড়া দেয়।

বলেন মণিবেগমকে, জীবনে অনেক পাপ করেছি বেগম। লিখে

রাখলে অনেকের অর্ধেক জীবন কেটে যেত পড়ে শেষ করতে। আমার সমস্ত পাপকে আমি ভুলে যেতে পারি—পারি না শুধু পলাশীর পর যে নির্মম রক্তলোলুপতার পরিচয় দিয়েছি। সিরাজকে জীবিত রাখতে কি পারতাম না? মক্কায় কাবার প্রান্তে পৌঁছে আল্লার স্মরণ নিলে এই পাপের কি স্খলন হবে না বেগম?

কখনও বলেন, মীরকাশিমের মহত্বের তুলনা নেই। তার প্রতি অনেক অবিচার করেছি। সে আমাকে জীবন্ত কবরস্থ করতে পারতো। আমার এই স্থবির দেহ থেকে মাংসখণ্ড কর্তন করে ক্ষুধার্ত কুকুরের আহারের প্রয়োজন মেটাতে পারত। সে তা করে নি, সে এমন কাজে ব্রতী হয়েছে যা আমি করতে পারতাম—করি নি। কাশেম আলী হয়ত পারবে বেনিয়া ইংরেজের হাত থেকে সুবে বাংলাকে রক্ষা করতে।

মণিবেগম ভ্রূ ভঙ্গী করেছেন।

তাঁর সুন্দর গ্রীবা, নির্মমভাবে হেলিয়ে কিছু বলতে গিয়েও বলেন নি। স্থান ত্যাগ করেছেন বিরক্ত চিত্তে। আজকাল প্রায়ই মীরজাফরকে সহ্য করা তাঁর অসম্ভব হয়ে পড়ছে। এই কদাকার, কুষ্ঠ রোগাক্রান্ত বৃদ্ধের অঙ্কশায়িনী একদিন তিনি স্বেচ্ছায় হয়েছিলেন, আজ সে কথা স্মরণ পথে উদয় হলে দুর্নিবার ঘৃণা মনকে তিক্ত করে তোলে।

তীক্ষ্ণ বুদ্ধির অধিকারিণী মণিবেগম।

নিজের মনের ভাব বিন্দুমাত্র তিনি প্রকাশ করেন না। তুচ্ছ মনোবিকারকে প্রশ্রয় দিয়ে, পারিবারিক অশান্তিকে দীর্ঘতর করে নিজের ভবিষ্যতকে তিনি নষ্ট করতে চান না। মণিবেগমকে এখন দুটি কাজ সম্পন্ন করতে হবে। তাঁর ওই দুটি কাজ সম্পন্ন করতে গিয়ে যদি সমস্ত অর্থ, নিজের যৌবন পুষ্ট অনিন্দ্য দেহ নষ্ট করতে হয়, হবে। কোন মূল্যেই তিনি পশ্চাদ্‌পদ হবেন না।

যার জন্য মণিবেগম আপ্রাণ চেষ্টা করবেন, সেই দুটি কাজ হল,

ফতেমার অপমানের প্রতিশোধ নিয়ে মীরকাশিমকে ক্ষমতাচ্যুত করা এবং নিজের কিশোর পুত্রকে বাংলার মসনদের অধিকারী করা।

চিন্তিতা মণিবেগম বহু বিনিদ্র রজনী অতিবাহিত করেছেন। কাজ দুটি সম্পন্ন করা যে সহজ সাধ্য নয় বিলক্ষণ জানেন তিনি। নিজের মনের মধ্যে কাজ দুটির সাফল্য সম্পর্কে অনেক পরীক্ষা নিরীক্ষা চালালেন। শেষ পর্যন্ত তাঁকে এই সিদ্ধান্তে উপনীত হতে হল যে মীরজাফরকে আবার তখ্‌তে বসাতে হবে। স্বাভাবিক ভাবেই বৃদ্ধের পর তখ্‌তের অধিকারী হবে তাঁর পুত্র।

কিন্তু সেই অসম্ভব সম্ভব করবেন কিভাবে?

কোম্পানির সঙ্গে মীরকাশিমের এখন অত্যন্ত দহরম-মহরম। দাবির অর্থ বাকী নেই উপরন্তু তিনটি জেলা চিরদিনের জন্য কোম্পানিকে ছেড়ে দেওয়া হয়েছে। চতুর মীরকাশিম কাউন্সিলারদের সাধ্যমতো মনোরঞ্জন করে নিজের করায়ত্ব করেছে বলা চলে। এই পরিস্থিতিতে কাউন্সিলারদের মীরজাফরের অনুকূলে আনা বিশেষ কঠিন হবে সন্দেহ নেই।

চতুরতায় মীরকাশিম অপেক্ষা ন্যূন নন মণিবেগম।

চিন্তার সমূদ্রে অবগাহন করে সূত্র আবিষ্কার করতে তাঁর বিলম্ব হল না। তিনি স্থির করলেন, এই পর্বত প্রমাণ প্রতিবন্ধককে অতিক্রম করবেন হেষ্টিংসরূপী পথ দিয়েই। সাফল্য সম্পর্কে নিশ্চিন্ত হলেন মণিবেগম। ওয়ারেন হেষ্টিংস।

কাউন্সিলে তাঁর প্রতিপত্তি ক্রমেই বৃদ্ধি পাচ্ছে। কলকাতায় অবস্থানকারী বহু ইংরেজের চেয়ে গুণাবলীর দিক থেকে শ্রেষ্ঠ। তবে তাঁর নৈতিক চরিত্র কিঞ্চিৎ শিথিল ওই শিথিলতার সুযোগ মণিবেগমকে গ্রহণ করতে হবে। হেষ্টিংসকে কোনক্রমে স্বমতে এনে ফেলতে পারলে, অন্যান্য কাউন্সিলারদের মীরকাশিমের বিপক্ষে চালিত করা সহজ সাধ্য হবে।

দৃঢ়বদ্ধ মনোভাব নিয়ে মণিবেগম নিজের পরিকল্পনাকে রূপ দেবার জন্য তৎপর হলেন।

প্রাতঃকৃত্য সেরে মীরজাফর কক্ষে প্রত্যাবর্তন করে শয্যায় দেহ ঢেলে দিলেন আবার। তাঁর আর কাজ কি? অজস্র দায়িত্বপূর্ণ কাজ নিয়ে যখন তাঁর বিভ্রান্ত থাকা উচিত ছিল তখন তিনি নূপুরের নিক্কন শুনে সময় অতিবাহিত করেছেন—কোন রূপবতী নাচওয়ালীকে বাহুবন্ধনে নিষ্পেষিত করে ভেবেছেন এই ভাবেই বুঝি জীবনের বাকি দিনগুলি কেটে যাবে।

সুতরাং এই নির্বাসন জীবনে আর কি কাজ তিনি করবেন।

প্রতিটি দিন একই ভাবে কেটে চলেছে মীরজাফরের। প্রাতে কয়েকজন পরিচিত ব্যক্তি আসেন, জ্বালাদগ্ধ মীরজাফরের হৃদয়ে খোসামোদের প্রলেপ দিয়ে মুড়ে দেবার চেষ্টা করেন তাঁরা। কখনও মীরকাশিমের বর্তমান কার্যাবলীকে তীক্ষ্ণ ভাষায় সমালোচনা করা হয়।

সকলে চলে যান এক সময়। আহারের পর সমস্ত দুপুর অহিফেনের নেশায় চুর চুরে হয়ে থাকেন প্রাক্তন নবাব। মণিবেগমের সহচার্য পাবার জন্য ব্যাকুল হন কখনও কখনও।

তাঁর কণ্ঠ দিয়ে ক্ষীণ কাকুতি ঝরে পড়ে।

—বেগম—বেগম তুমি কোথায়?

এই আহ্বানে কখনও মণিবেগম সাড়া দেন আবার কখনও দেন না।

সন্ধ্যার সময় মীরজাফর অলিন্দে এসে বসেন।

শোভমান পথ দৃষ্টিগোচর হয়। জনস্রোত চলেছে পথের উপর দিয়ে। দেশ দেশান্তরের মানুষ বর্ণাঢ্য পোষাকে সজ্জিত হয়ে চলেছে। সকলেই ব্যস্ত। মীরজাফর সে দিকে দৃষ্টি দেন না। আনমনে চিন্তা

করতে থাকেন। চিন্তা করেন নিজের অক্ষমতার কথা। চিন্তা করেন সোনালী ভবিষ্যতকে কি ভাবে হেলায় নষ্ট করেছেন তার কথা। রাত্রে আবার নেশা তাঁকে গ্রাস করে।

এই ভাবেই মীরজাফরের দিন অতিবাহিত হচ্ছে।

কক্ষে প্রবেশ করলেন মণিবেগম। শয্যার উপর দৃষ্টি পড়তেই তাঁর মন বিতৃষ্ণায় ভরে উঠল। কদাকার মীরজাফর শায়িত রয়েছেন। দুই হাতে কুষ্ঠের চিহ্ন প্রকট হয়ে উঠেছে। মুখের এখানে ওখানে রক্তিম আভা। ওগুলি কালে বীভৎস আকার নেবে। মাংস গলে পড়বে ওখান থেকে।

পদশব্দ শুনে মুদিত নয়নেই তিনি বললেন, কে, নিয়ামত—?

—আমি।

—ও, বেগম।

মীরজাফর উঠে বসলেন।

—বস, এখানে এসে বস।

—একটা প্রয়োজনীয় কথা বলতে এলাম।

—প্রয়োজন না থাকলে তো তুমি আজকাল আমার কাছে আসতে চাও না। আমরা একই গৃহে বাস করি অথচ কি বিরাট ব্যবধান!

ও কথার কোন উত্তর না দিয়ে মণিবেগম বললেন, একটা দাওয়াতের ব্যবস্থা করতে চাই। সেই কথাই আপনাকে জানাতে এলাম।

—দাওয়াত্!—মীরজাফর বিস্মিত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, এখানে কাকে দাওয়াত দিতে চাও বেগম? তাছাড়া আথিক অবস্থা আমাদের ভাল নয়, এই সময়........

—ভাল নয় বলছেন কেন? বর্তমানে নবাবী তোষাখানা অবশ্য আপনার নেই, তবে আমার কাছে যে অর্থ আছে সুবে বাংলার প্রখ্যাত জমিদারের তা নেই।

—তা বটে। তুমি বললে না তো, কাদের দাওয়াত দিতে চাও। তাছাড়া দাওয়াতের উপলক্ষ্য কি? এখন ঈদলফেতর বা অন্য কোন ধর্মীয় অনুষ্ঠান নেই যে দাওয়াত দিয়ে লোক খাওয়াবে।

অধীর কণ্ঠে মণিবেগম বললেন, কোনরকম অনুষ্ঠানের উপলক্ষ্য না থাকলে প্রয়োজনের খাতিরেও কেন দাওয়াতের ব্যবস্থা করা যাবে না আমি উপলব্ধি করতে পারছি না।

—প্রয়োজন?

—হ্যাঁ, প্রয়োজন। আমি গভর্নরসাহেব ও একজন কাউন্সিলারকে দাওয়াত দিতে চাই।

জাফার আলী উচ্চকণ্ঠে হেসে ওঠবার চেষ্টা করলেন।

—ওরা সুচারুরূপে মসনদ থেকে আমাকে বিতাড়িত করেছে সুতরাং চর্বচস্য লেহ্য পেয়র ব্যবস্থা অন্তত একদিনের জন্য না করলে আমাদের কি আর মান থাকে।

মণিবেগম নিজের কণ্ঠে শ্লেষ ঢেলে দিলেন।

—গ্রাম্য নারীর মতো ঈর্ষাযুক্ত কথাবার্তা আপনার শোভা পায় না। আজ যে কাজ আমি করতে চলেছি, বহু পূর্বেই এই বিষয়ে আপনার মনোযোগী হওয়া উচিত ছিল। মসনদ ফিরে পেতে হলে শুধু অর্থ ব্যয় করলেই চলবে না, কৌশল ও অবলম্বন করতে হবে।

—মসনদ!

—সুবে বাংলার মসনদ।

আর্তকণ্ঠে জাফার আলী বললেন, এ সমস্ত তুমি কি বলছো বেগম?

—এই মুহূর্তে আমার যা বলা উচিত জনাব।

—আমরা মসনদের জন্য ষড়যন্ত্র করব?

অবজ্ঞা ভরে নাসিকা কুঞ্চিত করলেন মণিবেগম। অস্থির কণ্ঠকে সংযত রূপ দিয়েই বললেন, ষড়যন্ত্র নয়। আপনি নিজের দাবি পুনঃপ্রতিষ্ঠা করবার জন্য অগ্রসর হবেন। কি ভাবে অসম্ভব সম্ভব হবে তার

পরিকল্পনা আমি করেছি। আপনি শুধু সমস্ত ক্ষেত্রে নির্বিচারে আমাকে সমর্থন করে যাবেন।

জাফার আলী কিছু বললেন না।

হতবাক্ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন মণিবেগমের দিকে।

আমন্ত্রিত হলেন ভ্যান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস।

আমন্ত্রণ পেয়ে দুজনেই বিস্মিত হলেন। গভর্নর এই আমন্ত্রণ গ্রহণ না করারই পক্ষপাতি ছিলেন। তাঁর ধারণা হল কোন স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে এই ব্যবস্থা। হেষ্টিংস তাঁকে বোঝালেন, স্বার্থসিদ্ধির উদ্দেশ্যে নয়, এই আমন্ত্রণ নিতান্ত সৌজন্যমূলক হওয়াই স্বাভাবিক।

জাফার আলীর গৃহে দুজনে এলেন আমন্ত্রণ রক্ষা করতে।

অতিথিদ্বয়ের মনোরঞ্জনের বহুবিধ ব্যবস্থা করেছেন মণিবেগম। তার মধ্যে অন্যতম হল জোহরা বাঈ-এর নৃত্য। দ্বিতলের একটি বৃহৎ কক্ষে মখমলের তাকিয়া ঠেসান দিয়ে বসেছেন ভ্যান্সিটার্ট ও হেষ্টিংস। মূল্যবান অঙ্গাবরণে সজ্জিত জাফার আলীও আছেন এখানে।

অপূর্ব ছন্দে নৃত্য পরিবেশন করে চলেছে জোহরা বাঈ।

ইংলণ্ডের অনেক কিছুর জন্য গর্ব অনুভব করে ইংরেজরা। কিন্তু ভারতের মাটিতে পা দেবার পর একটি বিষয়ে সকলেই একমত, এখানকার মত নৃত্যপটিয়সী লাস্যময়ী নারী ইংলণ্ডে নেই। এই আকর্ষণেই অনেকে বহু বাধা-বিপত্তি অতিক্রম করে হিন্দুস্থানে চলে এসেছেন। আবার এমন কয়েকজন কাউন্সিলারও আছেন অজস্র অর্থ উপার্জন করেছেন অথচ এক কপর্দক দেশে পাঠাতে পারেন নি। সবই ঢেলে দিয়েছেন রূপসী বাঈজীদের চরণ প্রান্তে। এই বিকারের শিকার হয়েছেন বোধহয় এদেশের জল-হাওয়ার গুণেই।

কক্ষে প্রবেশ করলেন মণিবেগম।

আলোকসামান্যা রূপবতী তিনি, অপূর্ব সাজে আরো মনোহারী হয়ে উঠেছেন। হেষ্টিংস দৃষ্টি তুললেন। তীব্র হিল্লোল তাঁর হৃদয়কে মোহিত করে দিল। অনেক রূপবতীর রূপসুধা পান করেছেন তিনি। কিন্তু—শুনেছিলেন মণিবেগমের সৌন্দর্যের খ্যাতি। চাক্ষুস করবার সুযোগ পাননি।

অভাবিতভাবে আমন্ত্রণ পেয়ে হেষ্টিংস অতিমাত্রায় আনন্দিত হয়েছিলেন। ভ্যান্সিটার্ট আমন্ত্রণ গ্রহণে আপত্তি প্রকাশ করার প্রারম্ভেই তাই অন্য যুক্তি প্রদর্শন করেছিলেন। আর কিছু না হোক মণিবেগমকে প্রাণ ভরে দেখবেন।

মণিবেগম আসন গ্রহণ করলেন।

হেষ্টিংস দেখলেন। অপলক দৃষ্টিতে মোহময় সৌন্দর্যকে দেখলেন। নৃত্যের আকর্ষণ এখন তাঁর কাছে মূল্যহীন। ভাগ্যতাড়িত জাফার আলী আজ কোম্পানির দয়ার পাত্র। তবু তাঁকে ঈর্ষা না করে পারেন না হেষ্টিংস। সব গেছে জাফার আলীর তবু মণিবেগম আছে। ওই অপার সৌন্দর্যময়ী নারীর অধিপতি লোলচর্ম এক বৃদ্ধ। ঈশ্বরের বিচার অপূর্ব।

নৃত্য শেষ হল একসময়। তসলিম জানিয়ে জোহরাবাঈ সদলবলে কক্ষান্তরে গেল।

আহার পর্বও সমাপ্ত হল। বিলিতী সরাব পরিবেশিত হল।

ভ্যান্সিটার্ট বললেন, এখানকার মতো অতিথি পরায়ণতা দেখা যায় না। তোমার কি মত ওয়ারেন?

—আপনার সঙ্গে আমি একমত—হেষ্টিংস বললেন, ইতিহাসে আমার জ্ঞান খুব বেশী নয়। তবু বলতে বাধা নেই, এই অতিথি পরায়ণতাই এ দেশের ভাগ্যে অনেক দুর্যোগের সূত্রপাত ঘটিয়েছে।

গম্ভীর কণ্ঠে জাফার আলী বললেন, আমাদের অতিথেয়তা আপনাদের মুগ্ধ করেছে জেনে আনন্দিত হলাম। একটা কথা……

—বলুন—বলুন।

—আমার জন্য যে অর্থ বরাদ্দ করা হয়েছে তা নিয়মিত হস্তগত হচ্ছে না। ভ্যান্সিটার্ট হেস্টিংসের সঙ্গে দৃষ্টি বিনিময় করে নিয়ে বললেন, বরাদ্দ অর্থ তো আপনার নিয়মিত পাওয়ার কথা।

—নিয়মিত যে পাচ্ছি না তা আপনাদের অজানা নেই। আমাকে সরিয়ে নূতন চুক্তি করে কাশিম আলীকে তখ্‌তে বসিয়েছেন—সেই কাশিম আলী অহরহ কত চুক্তি ভঙ্গ করে চলেছে সে সম্পর্কে আপনারা ওয়াকিবহাল কি?

—আমরা সতর্কতার সঙ্গে চতুর্দিক লক্ষ্য করছি। আপনি মাসিক অর্থ যাতে অবিলম্বে পান সে বিষয়ে অনুরোধ জানিয়ে নবাবকে পত্র দিচ্ছি।

জাফার আলী কিছু বললেন না আর।

মণিবেগম বললেন, আপনাদের প্রাপ্য নিশ্চয় সমস্ত পেয়ে গেছেন?

—প্রতিটি পাই।

—কাশিম আলী অত্যন্ত চতুর ব্যক্তি। কোম্পানির সঙ্গে নিজের সম্পর্ক জটিল করে তুলতে চায়নি।

ভ্যান্সিটার্ট লক্ষ্য করলেন আলোচনার গতি ক্রমশ বাঁকা পথ নিচ্ছে। তিনি আতিথেয়তার আরেক প্রস্ত প্রশংসা করে বিদায় চাইলেন। আরো কিছুক্ষণ মণিবেগমের সান্নিধ্যে থাকার ইচ্ছে ছিল হেস্টিংসের। উপায় নেই। অনিচ্ছার সঙ্গে তিনি গভর্নরকে অনুসরণ করলেন।

কাউন্সিল গৃহের নিকটেই অধিকাংশ কাউন্সিলারের গৃহ।

হেস্টিংস কিন্তু বাস করেন অন্যান্যদের কাছ থেকে অনেক দূরে। হৈচৈ গোলমাল তাঁর ভাল লাগে না। বাল্যকাল থেকেই নির্জনতাকে তিনি পছন্দ করেন। কলকাতায় পদার্পণ করেই নিভৃত বাসস্থানের ব্যবস্থা করেছেন।

প্রতিদিন কাজকর্ম শেষ করে সন্ধ্যার পূর্বেই গৃহে প্রত্যাবর্তন করেন। কারুর দায়িত্ব তাঁর স্কন্ধে নেই, কেউ তাঁকে বিরক্ত করতে আসে না। আত্মীয় বন্ধুহীন অবস্থায় একাই বাস করেন। বিবাহ করলে উদ্দাম জীবনের উপর ছেদ পড়বে সন্দেহ নেই, তবু বিবাহ করবার অনিচ্ছা তাঁর নেই। করবেন। পদোন্নতি ঘটলেই পাত্রী নির্বাচনের জন্য সচেষ্ট হবেন।

গৃহে প্রত্যাবর্তন করবার পরই সোফায় গা এলিয়ে দেন। কয়েক পাত্র মদ গলায় ঢেলে দিয়ে ক্লান্তি অপনোদন করেন। তারপর ভৃত্যদের কোন একজনকে আহ্বান করেন। জানতে চান রাত্রের ব্যবস্থা পাকা আছে কিনা। ভৃত্যরা প্রভুর স্বভাবে অভ্যস্ত হয়ে পড়েছে। তারা জানে একটি স্বাস্থ্যবতী নবযৌবনা নারী সংগ্রহ করে দিতে পারলেই বকশিশ পাওয়া যায় প্রচুর।

তারা সানন্দে এই কাজ করে। অসুবিধাও বিশেষ কিছু নেই। বারবধূ পল্লী থেকে নিত্য নূতন সংগ্রহ করে আনা কিছুই নয়। অবস্থা এমন দাঁড়িয়েছে ভৃত্যদের এখন আর ওই পল্লীতে যেতে হয় না, পণ্যা নারীরাই অনুসন্ধান করতে আসে তাদের প্রয়োজন আছে কি না।

হেষ্টিংস অন্যান্য দিনের চেয়ে কিছু পরে গৃহে এলেন।

তাঁকে ক্লান্ত দেখাচ্ছে। দীর্ঘ সময় ধরে তাঁকে আজ গুরুতর কাজ সম্পন্ন করতে হয়েছে। ক্লান্ত হয়ে পড়া অস্বাভাবিক নয়। সোফায় গা এলিয়ে দিয়ে কয়েক পাত্র নিঃশেষ করলেন। কিছুক্ষণ তাকিয়ে রইলেন ঘরের দেওয়ালে একটি পল্লীচিত্রের দিকে। ইংলণ্ডের ওই গ্রামে জন্মগ্রহণ করেছেন ওয়ারেন।

চিত্রের দিক থেকে দৃষ্টি সরিয়ে নিয়ে এসে ভৃত্যকে আহ্বান করলেন।

—জয়রাম।

আহ্বানের অপেক্ষায় ছিল জয়রাম। দ্রুত কক্ষে প্রবেশ করল।

তার নিবাস সপ্তগ্রাম। জাতিতে কায়স্থ। সাহেবের পাদুকার পরিচর্যা করা থেকে আরম্ভ করে রাত্রের সঙ্গিনী সংগ্রহ করে দেওয়া পর্যন্ত সবই তাকে করতে হয়। আরো দুজন ভৃত্য ও একজন বাবুর্চি আছে কিন্তু হেস্টিংস জয়রামের উপরই অধিক আস্থাশীল।

জয়রাম কায়স্থের ছেলে, এই সমস্ত কাজ তার করা উচিত নয়। করতে সে চায় নি। অবস্থার বিপাকে পড়ে তাকে এই কাজ করতে হয়েছে। মাতৃপিতৃহীন হবার পর অন্নের সংস্থানের জন্য সে প্রচুর পরিশ্রম করেছে। কোন কাজে কেউ তাকে নিযুক্ত করে নি। অর্ধাহারে থেকেছে। এই সময় ঈশ্বরের অনুগ্রহে ওয়ারেন হেস্টিংস তাকে পথ থেকে কুড়িয়ে এনে ভৃত্য নিযুক্ত করেন।

জয়রামের দিকে তাকিয়ে হেস্টিংস বললেন, আমি অত্যন্ত ক্লান্ত।

—রাত্রের আহার এখনই শেষ করবেন ?

—না। তুমি সমস্ত ব্যবস্থা করে রেখেছো বোধহয় ?

—হ্যাঁ।

—আমি নিজের শয়নকক্ষে যাচ্ছি। তাকে পাঠিয়ে দাও।

হেস্টিংস সোফা ত্যাগ করলেন।

জয়রাম তখন কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয় নি—জয়রাম—

—সাহেব।

—মেয়েটিকে কোথা থেকে সংগ্রহ করলে ?

—আজ্ঞে কালিঘাট থেকে।

—কালিঘাট।—ও, কালিঘাট।

হেস্টিংস আবার সোফায় বসলেন।

—তোমার কোন আত্মীয় হয় নাকি ?

প্রশ্নের ধরন লক্ষ্য করে জয়রাম সতর্কতার সঙ্গে বললে, আজ্ঞে না। আমার আত্মীয় নয়। তবে ভদ্রঘরের মেয়ে। ঘাটের মড়ার সঙ্গে বিয়ে হয়েছিল। ভরা যৌবনের স্রোতকে ঘাটের মড়া কি আর রোধ

করতে পারে হুজুর। সব ছেড়েছুড়ে বেরিয়ে পড়েছিল আমিও সুযোগ পেয়ে নিয়ে এলাম এখানে।

আচম্বিতে প্রচণ্ড ক্রোধে ফেটে পড়লেন হেষ্টিংস।

—মিথ্যে কথা। বাষ্টার্ড, ব্লাডি নিগার—

জয়রাম কিছু বলতে পারে না। ভয়ে তার মুখমণ্ডল কৃষ্ণবর্ণ ধারণ করে।

—দিনের পর দিন কেন আমায় মিথ্যেকথা বলছো?

—হুজুর....মালিক....

—দিনের দিন তুমি ভদ্রঘরের মেয়ে সংগ্রহ করে আনছো? এত সহজ লভ্যা তারা এই কথাই বিশ্বাস করতে হবে আমাকে?

জয়রাম হেষ্টিংসের পদপ্রান্তে লুটিয়ে পড়ল।

তার চাতুরী সাহেব ধরে ফেলবেন সে কল্পনা করতে পারে নি।

হেষ্টিংস থামলেন না। ক্রুদ্ধ কণ্ঠে বলে চললেন, একের পর এক গণিকাকে তুমি আমার কাছে উপস্থিত করে চলেছো। ওই সমস্ত অন্তঃসার শূন্য বহুভোগ্যা গণিকাদের সাহচর্য আমি চাই না। এই গৃহে উপস্থিত কর কোন গৃহস্থের বধূ, কোন যুবতী বিধবাকে, কোন গণিকাকে নয়।

—হুজুর চেষ্টার আমি ত্রুটি করি না। নগরে অনেক অসুবিধা আছে। গ্রামাঞ্চলে গিয়ে কৌশলে সংগ্রহ করে আনতে হয়।

—এত কথা আমি জানি না। অর্থ ব্যয়ে কার্পণ্য করছি না। নগর বা গ্রাম যেখান থেকে পার সংগ্রহ কর। নইলে গুলি মেরে ঝাঁজরা করে দেব তোমাদের। যাও—জয়রাম বাক্যব্যয় না করে কক্ষ ত্যাগ করল।

রন্ধনশালা থেকে সমস্ত কথা শোনা যাচ্ছিল। বাকী তিনজন সেখান থেকে জয়রামের লাঞ্ছনা উপভোগ করছিল। সাহেব জয়রামকে স্নেহের চক্ষে দেখেন বলে এরা কেউই তার উপর সন্তুষ্ট নয়। কিন্তু মুখে সে

কথা কেউ প্রকাশ করে না। বকশিশের বখরাও কিছু পাওয়া যাচ্ছে বললে পাওয়া যাবে না।

বিমর্ষ মুখে জয়রাম রন্ধনশালায় এল।

করিম মৃদু কণ্ঠে বললে, সাহেব এত রাগারাগি করছিলেন কেন?

জয়রাম ফেটে পড়ল। সে বেশ জানে, এরা তার লাঞ্ছনা উপভোগ করছিল।

—আমার উপর তো শুধু রাগারাগি করেছেন। তোমাদের কারুর পিঠের চামড়া থাকবে না। চাবুক দিয়ে রক্ত গঙ্গা বইয়ে দেবেন।

কালুদা ভীত কণ্ঠে বললে, আমরা তো কিছু করি নি ভাই। মাল যুগিয়ে সাহেবের কাছ থেকে মোটা বকশিশ আদায় কর তুমি। মন-মর্জি হলে আমরা পাই ছিটেফোঁটা আমাদের........

—মিথ্যে কথা বলে আমার মেজাজ বিগড়ে দিস না কালুদা। ওরে হারামজাদার বাচ্চা, আমার কাছ থেকে নিয়মিত টাকা না পেলে সোহাগ কাড়িয়ে বৌকে সোনার গহনা দিলি কোথা থেকে। সোনা কি গাছে ফলে? নাড়া দিলেই ঝুর ঝুরিয়ে পড়তে থাকবে?

কৃষ্ণলাল বয়স্ক ব্যক্তি। সে দুজনের মধ্যে এসে বলল, কথা বাড়ালেই কথা বাড়বে। এখন বিবাদের সময় নয়। সাহেব আমাদের সকলকে দূর করে দিলে কি খুব ভাল হবে?

করিম বললে, তা হবে না। এখন সাহেব যা চান তাই করতে পারলেই সব দিক রক্ষা পায়। গেরস্ত ঘরের বৌ এখন কোথা থেকে পাওয়া যায় বল তো? কালুদা, তুমি তো এই অঞ্চলের মানুষ। তোমার কোন···

—কে বললে আমি এই অঞ্চলের মানুষ! আমরা হলাম পাবনার লোক। সাহেব সেখানে গিয়ে কুঠি বেঁধে বাস করলে মাগীতে অরুচি ধরিয়ে দিতাম।

—সাহেবের তো মাথা খারাপ হয়ে যায় নি। কাজকর্ম ফেলে তোমার পাবনায় গিয়ে কুঠি বাঁধবে।

জয়রাম আত্মগত ভাবে বললে, কোন গোলমালই হত না। সমস্ত দিক বাঁচিয়ে দিন বেশ কেটে যেত। যত নষ্টের মূল ওই ছুঁড়ীগুলো।

করিম বললে, ছুঁড়ি কাকে বলছো জয়রামদা, আধবয়সী মাগী বল। সেজেগুজে পটের বিবিটি হয়ে থাকে। মনে হয় কাঁচা বয়স।

কৃষ্ণলাল কিছু বলতে যাচ্ছিল, বলা হল না। রন্ধনশালার একটি দ্বার উদ্যানে সংলগ্ন। সেই দ্বার দিয়ে প্রবেশ করল উত্তর যৌবনা একটি নারী। উত্তর যৌবনা হলেও তার সাজপোষাকের চটকে তাকে পূর্ণযৌবনা বলে ভ্রম হয়।

—লবঙ্গবালা যে—

কালুদা এগিয়ে তার হাত ধরল।

এক ঝটকায় হাত সরিয়ে নিয়ে লবঙ্গ বললে, আ মর, হাত ধরছিস কেন?

—হাত ধরলেই যত অপরাধ। বলি সাহেবের কাছে এই সতীপনা থাকে কোথায়?

সকলে হেষ্টিংসের কান বাঁচিয়ে অনুচ্চ কণ্ঠে হাসল।

লবঙ্গ জয়রামের কাছে এগিয়ে গিয়ে বললে সাহেবের আজ মনের অবস্থা কেমন?

জয়রাম উত্তর দেবার আগেই করিম বললে, সাহেব আগুন হয়ে আছেন।

—আমাকে দেখলেই সাহেবের আগুন জল হয়ে যাবে। জয়রাম, আমায় বাপু আজ ব্যবস্থা করে দাও। ডালিম, ফিরোজা এরা সাজগোজ করছে দেখে এসেছি। এল বলে। তারা আসবার আগেই আমি সাহেবের কাছে চলে যেতে চাই। কথা দিচ্ছি পাওনা থেকে ভাগ দেব।

জয়রাম মুখ বিকৃত করে বললে, আর ভাগ দিতে হবে না। আমাদের চাবকাবে বলেছে, তোমাকে দেখলে চাবকে ছাড়বে সাহেব। তোমাদের

জন্য আজ আমাকে এতগুলি কথা শুনতে হয়েছে। বলি, ওই অনামুখো সাহেবের সামনে ছলা কলা না দেখালে কি তোমাদের চলে না?

এই কথার অর্থ বুঝতে পারে না লবঙ্গবালা।

ভীতকণ্ঠে বলে, কেন আমি কি ……

—তোমরা যে গেরস্ত ঘরের মেয়ে-বৌ নও সাহেব তা ধরে ফেলেছে। বারংবার বলে দিয়েছিলাম, এমন হাবভাব প্রকাশ করবে যাতে বুঝতে পারা না যায় তোমাদের আসল পেশার কথা।

—তাহলে আমি কি ফিরে যাব?

—হ্যাঁ, তাই যাবে। এপথ মাড়াবে না আর। আমার হয়েছে যত অধম্য। কে ফুর্তি করবে আর যোগান দিতে হবে আমায়। দেখি গিয়ে কি করতে পারি?

কৃষ্ণলাল বললে, কোথাও যাচ্ছ নাকি?

—পিঠের চামড়া বাঁচাতে গেলে যেতেই হবে। শুনলে তো গেরস্ত ঘরের বৌ কিম্বা বিধবা ছুঁড়ী সাহেবের চাই। এই ভর সন্ধ্যাবেলা কি যে করি, বাগানের ফুল তো নয়, ইচ্ছে করলেই ছিঁড়ে নিয়ে আসা যায়।

জয়রাম হেষ্টিংসের উদ্দেশ্যে এক অশ্রাব্য গালাগালি উচ্চারণ করে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। লবঙ্গবালা নিজের অসহায় দৃষ্টি বাকী তিনজনের মুখের উপর বুলিয়ে নিয়ে বললে, আমি তাহলে ফিরেই যাই।

কালুদা বললে, ফিরে যাবে কেন লবঙ্গলতিকে। এসে পড়েছো যখন রাতটা না হয় আমার সঙ্গেই কাটিয়ে গেলে।

—মরণ আর কি।

জয়রাম হেষ্টিংসের বাংলো থেকে বেরিয়ে সিমলা অঞ্চলে গিয়ে উপস্থিত হল। কলকাতার অন্যতম প্রসিদ্ধ গণিকালয় এখানে অবস্থিত। এই অঞ্চলের বহু গৃহে জয়রামের যাতায়াত আছে ভরা সন্ধ্যা তখন

নৃত্য গীতের হররা চলেছে। দেহ পসারিণীরা তীক্ষ্ণ চক্ষে অপেক্ষা করছে অলিন্দে অলিন্দে।

জয়রাম একটি গৃহে প্রবেশ করল।

দ্বিতলে যাওয়ার প্রয়োজন হল না। একটি স্থূলাঙ্গী বর্ষীয়ান নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ হয়ে গেল। তার মুখ চোখের ভাব লক্ষ্য করলে অনুমান করে নেওয়া যায় এই নারীর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতেই সে এসেছে।

জয়রামকে দেখে পানের রসে রাঙা দন্তকৌমুদী বিকশিত করে নারী বললে, তোমার তো আজকাল দেখাই পাওয়া যায় না।

—কাজে ব্যস্ত থাকি মাসী।

—বাছা আমার কাজের মানুষ। বস। পান খাবে তো?

—আজ বসবার সময় নেই। আরেকদিন এসে তোমার সঙ্গে গল্প গুজব করব। এখন এসেছি কাজে। একটা উপকার করে দিতে হবে মাসী।

—সাধ্যে কুলোলে নিশ্চয় করব।

—আমাকে একটা মেয়ে যোগাড় করে দিতে হবে।

সমস্ত শরীর কাঁপিয়ে মাসী হাসল।

—আমি ভাবলাম না জানি তুমি কি বলবে। মেয়ের অভাব কি গো বাছা। কজন চাই?

—আজ একজন হলেই চলবে।

—সরলাকে নিয়ে যাও। তাকে দেখলে তোমার সাহেব মুচ্ছো যাবে। যেমন গড়ন, তেমনি মুখ চোখ, কাঁচা সোনার মতো গায়ের রং। খরচ একটু বেশী পড়বে, বলে রাখছি আগেই।

—এ অঞ্চলের কোন মেয়েকে দেখলেই সাহেব গুলি করে মারবে। শুধু তাকে নয়, ওই সঙ্গে আমাকেও। তার চাই গেরস্ত ঘরের মেয়ে-বৌ।

জয়রাম ঘটনাটা খুলে বলল।

মাসী চিন্তিত কণ্ঠে বললে, দিন দুই পরে এলে একটা ব্যবস্থা করা যায়। নবীন খুলনা গেছে। ওখানে আকাল পড়েছে শুনছি। পেটের দায়ে গেরস্ত ঘরের মেয়েরা বেরিয়ে আসছে। নবীন চালাক ছেলে। কয়েকজনকে এনে ফেলতে পারবে।

—সে তো পরের কথা মাসী। সাহেবকে আজ উপোসী রাখলে আমাদের আর রক্ষা থাকবে না। চিন্তা করে দেখ কিছু করতে পার কিনা।

মাসী চিন্তা করতে লাগল।

—উপায় একটা আছে।

—কি উপায়?

—একটা ছুঁড়ী সংসারের অত্যাচারে অস্থির হয়ে আত্মহত্যা করতে যাচ্ছিল। গঙ্গার ঘাট থেকে তাকে নিয়ে এসেছি। কিন্তু—সোৎসাহে জয়রাম বললে, সধবা?

—বামুন ঘরের কড়ে রাঁড়ি। দেখতে খাসা।

—অল্প বয়সের বিধবা। সাহেব লুফে নেবে।

—ও মেয়ে বশে আনা খুব শক্ত। তেউড়ে রয়েছে। তোমার সাহেবের নাজেহাল অবস্থা করে ছাড়বে।

—তুমি জান না মাসী, সাহেব ওই রকম মেয়েই চায়। যারা এক কথায় বুকে ঢলে পড়ে তাদের দেখতে পারে না।

—বেশ তো, নিয়ে যাও। টাকাটা বাছা নগদ দিতে হবে।

জয়রাম দশটি টাকা দিল।

—মাত্র দশ!

—আহাহা ব্যস্ত হচ্ছ কেন। সাহেবের মনে ধরলে টাকা দিয়ে জাজিম বুনে দেব তোমায়। আর দেরি ক'রো না। আবার এতটা পথ যেতে হবে।

—পালকি.......

—ওমা, পালকি আনো নি ?

—পালকি যোগাড় হয়ে যাবে। তোমার ওই খাসা মেয়েকে আগে দেখি। মাসী গলা ছাড়ল।

—রুমালী—রুমি—

—যাই গো মাসী।

—আসতে হবে না। নারাণীকে পাঠিয়ে দে।

নারায়ণী এল। তাকে দেখে জয়রাম মোহিত হয়ে গেল। দুধে আলতা মেশানো গায়ের রং। সুশ্রী মুখ। বয়স বোধহয় কুড়ির নীচেই। ভয়ে থরথর করে কাঁপছে। ফোঁটা ফোঁটা ঘামে ভিজে উঠেছে সমস্ত মুখ। দেখলে দয়া হয়।

—কি গো বাছা, মনে ধরল ?

—সত্যি, খাসা মেয়ে মাসী।

—ওরে নারাণী, তোর ভাগ্য ভাল বলতে হবে। প্রথম দিনই কোম্পানির সাহেবকে মক্কেল পেয়েছিস। সাহেবের দরাজ হাত। মানিয়ে চলতে পারলে রানীর মত থাকবি।

কম্পিত কণ্ঠে নারায়ণী বললে, আমি যাব না। দুটি পায়ে পড়ি, আমায় নরকের পথে ঠেলে দিও না।

মাসী ঝঙ্কার দিয়ে উঠল।

—আ গেল যা, নরক কিরে ছুঁড়ী ? উপায় না করলে তো কি বসিয়ে খাওয়াব নাকি ? মরে যাই আর কি—

—কেনই বা আমাকে বসিয়ে খাওয়াবে। আমি তো এখানে আসতে চাই নি। মরতে গিয়েছিলাম। ছেড়ে দাও আমায়।

জয়রাম বললে, কেন তুমি অস্থির হচ্ছ। মরে কি লাভ ? বেঁচে থাকায় অনেক আনন্দ।

—আমার আনন্দের প্রয়োজন নেই। আমি মরতে চাই।

—ছেনালিপনা আর করিস না। মরতে চাই—! মুখ বিকৃত করে মাসী বললে, ছেঁড়া থান পরে আর কলমি শাক সিদ্ধ খেয়ে তো দিন কাটিয়েছিস। ত্বদিন সুখ ভোগ করে নে। মরতে চাইলেই মরা যায়। ইচ্ছে করলেই রাজভোগ খেয়ে বাঁচা যায় না—আর তোমাকেও বলি বাছা, দাঁড়িয়ে দেখছো কি? পালকি ডেকে আনতে পারছ না!

জয়রাম পালকি ডাকতে গেল।

পালকি আসার পর অবাধ্য নারায়ণীকে হাত, পা, মুখ বেঁধেই তুলতে হল। বাংলোয় এসে যখন পৌঁছাল, হেষ্টিংসের তখন নৈশ আহার সমাপ্ত হয়েছে। করিম জানালে সাহেব জয়রামের খোঁজ করছিলেন। সে আরো জানাল, তাঁর মেজাজ শান্ত হয়েছে। পায়ের বাঁধন খুলে নারায়ণীকে নিয়ে জয়রাম হেষ্টিংসের শয়নকক্ষে গেল। সাহেব সেখানে নেই। নারায়ণীর মুখের ও হাতের বাঁধন খুলে দিয়ে কক্ষের দ্বার বাইরে থেকে অর্গল রুদ্ধ করে সে উপবেশন কক্ষে গেল।

হেষ্টিংস মদের পাত্র হাতে নিয়ে পদচারণা করছিলেন।

জয়রামকে দেখে শান্ত কণ্ঠে বললেন, কোথায় গিয়েছিলে?

—মাসীর বাড়ি গিয়েছিলাম হুজুর।

—কেন?

—মাসীর এক দূর সম্পর্কে বিধবা আত্মীয়া গলগ্রহ হয়েছিল। আপনার সেবায় তাকে নিয়ে এলাম হুজুর। গ্রামের মেয়ে। বড়ই উদ্ধত।

—হুঁ। সে কোথায়?

—আপনার শয়নকক্ষে।

হেষ্টিংস নিজের শয়নকক্ষের দ্বারের সম্মুখে উপস্থিত হলেন। অর্গল মুক্ত করে প্রবেশ করলেন কক্ষে। নারায়ণী দেওয়ালে পিঠ রেখে দাঁড়িয়ে রয়েছে। কাঁপছে। তার অপূর্ব্ব মুখশ্রী ও দেহলতা দেখে হেষ্টিংস হতবাক্ হয়ে গেলেন। জয়রাম তাঁকে মিথ্যে কথা বলে নি।

প্রকৃতই কোন গৃহস্তের বিধবা বধূকে তাঁর কামানলে উৎসর্গ করতে নিয়ে এসেছে।

সুধৃত কাঁচের পাত্র দূরে নিক্ষেপ করলেন। ঝনঝন শব্দে তুলে ভেঙে খান খান হয়ে গেল মূল্যবান পাত্রটি। দু বাহু বিস্তার করে তিনি অগ্রসর হলেন। চীৎকার করে উঠল নারায়ণী।

—না, না আমাকে স্পর্শ ক'রো না। আমায় ছেড়ে দাও, দোহাই তোমার, আমায় ছেড়ে দাও।

হেষ্টিংস হাসলেন।

নেশা জমে উঠলে মানুষের মুখে এই হাসি খেলা করে।

এগিয়ে গিয়েও নারায়ণীকে দুই বাহুর মধ্যে সাপটে ধরতে পারলেন না। সে সরে গেছে। কক্ষের আরেক প্রান্তে গিয়ে কান্নায় ভেঙে পড়েছে। সে জীবনে কখনো বিদেশী দেখে নি। ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামের মেয়ে। বিবাহ হয়েছিল আরেক ব্রাহ্মণপ্রধান গ্রামে। দুরারোগ্য ক্ষয় রোগ আক্রান্ত এক বয়স্ক ব্যক্তির সঙ্গে তার বিবাহ দেওয়া হয়েছিল নিজেদের কূল রক্ষা করার জন্য। স্বামী অল্প দিনের মধ্যেই পৃথিবীর মায়া ত্যাগ করলেন। তারপর দিনের পর দিন চলল শ্বশুর গৃহের অকথ্য অত্যাচার।

এক রাত্রে কাউকে কিছু না জানিয়ে গৃহত্যাগ করেছিল নারায়ণী। পুরুষের লোলুপ দৃষ্টি বাঁচিয়ে কলকাতায় চলে এসেছিল কোনক্রমে। গঙ্গার অতল গহ্বরে তলিয়ে গিয়ে চিরতরে শান্তি লাভ করতে চেয়েছিল। কিন্তু সব এলোমেলো হয়ে গেল।......সাহেবের চোখে অপার ক্ষুধা। ওর হাত থেকে কি সে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে?

হেষ্টিংস দ্রুত পায়ে এগিয়ে এলেন।

নারায়ণী মরিয়া হয়ে সরিয়ে নিল নিজেকে। আছড়ে পড়ল দ্বারের ওপর। দ্বার খুলল না। হেষ্টিংস তাকে সবল বাহুর মধ্যে গ্রহণ করলেন। তার নিষ্কলঙ্ক, শুচিস্নিগ্ধ দেহ লালসার যূপকাষ্ঠে বলি হতে

আর বিলম্ব নেই। গেল, সমস্ত গেল। আর চিন্তা করতে পারে না নারায়ণী।

আত্মহারা হেষ্টিংস নবলব্ধ সৌন্দর্যকে শয্যার দিকে নিয়ে চললেন। কয়েক পা অগ্রসর হয়েই তিনি থামলেন। তাঁর বাহুবন্ধনের মধ্যে সৌন্দর্যময়ীর দেহ এত শিথিল হয়ে পড়ল কেন? বাহুবন্ধন মুক্ত করতেই নারায়ণী লুটিয়ে পড়ল কক্ষতলে। অভিজ্ঞ হেষ্টিংস অনুমান করলেন, ভয়ে ও জ্ঞান হারিয়েছে।

জ্ঞান ফিরে পাবার জন্য তিনি চেষ্টা করলেন। সফল হল না তাঁর চেষ্টা। অনিন্দ্যসৌন্দর্যের অধিকারিণী নারায়ণী অজ্ঞান অবস্থায় কক্ষতলে শায়িতা রইল। হেষ্টিংসের রসসিক্ত মন তিক্ত হয়ে উঠল। দেশী যুবতীরা কেন যে অকারণে ভীত হয়ে পড়ে তিনি বুঝে উঠতে পারেন না।

এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হয়ে হেষ্টিংসের দুর্বার কামনা স্তিমিত হয়ে এল। তিনি দ্বারের অর্গল মুক্ত করে অলিন্দে এলেন। কেউ নেই সেখানে। ভৃত্যরা আহার শেষ করে শয্যায় আশ্রয় নিয়েছে বোধহয়। তিনি উপবেশনকক্ষে গিয়ে নিজেকে নিক্ষেপ করলেন সোফায়। দ্রুত কয়েকপাত্র মদ গলাধঃকরণ করলেন।

কিছুক্ষণের মধ্যেই নারায়ণীর জ্ঞান ফিরে আসবে। আজ আর তাকে গ্রহণ করবেন না। বিচিত্র তাঁর মন, এইভাবে বাধাপ্রাপ্ত হলে সেই নারীর ত্রিসীমানায় যান না। যান না অবশ্য শুধু সেই রাত্রেই। পরের দিন আবার সেই নারী অত্যন্ত রুচিকর হয়ে ওঠে তাঁর কাছে। সময় এগিয়ে চলল।

তীব্র আঙুরের আরকে ডুবে রইলেম হেষ্টিংস।

কোথাও কোন শব্দ নেই। শুধু ঝিল্লির ঐকতান কানে এসে বাজছে। হঠাৎ—

দ্বারে করাঘাতের শব্দ হল। মত্তপ হেষ্টিংসের রক্তাভ চক্ষু দুটিতে

ঝিলিক খেলল। এই রাত্রে কে এল তাঁর সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে। তিনি অপেক্ষা করলেন। ভৃত্যরা কেউ গিয়ে দ্বার খুলে দিল না। তারা নিদ্রার কোলে ঢলে রয়েছে। করাঘাত হয়ে চলেছে একটানা। তিনি আসন ত্যাগ করে স্খলিত চরণে এগিয়ে গিয়ে বাংলোর প্রবেশ দ্বারটি খুলে দিলেন।

হেনরী ল্যাসিংটন।

ল্যাসিংটন হ্যাট উন্মোচন করে ভিতরে প্রবেশ করলেন।

—ঘুমিয়ে পড়েছিলে?

—না। নেশার সেবা করছিলাম।

দুজনে উপবেশনকক্ষে এলেন।

—এই রাত্রে তুমি কোথা থেকে উদয় হলে?

—বাংলোয় ভাল লাগল না। একা থাকতে থাকতে আমি অতিষ্ঠ হয়ে পড়েছি ওয়ারেন। অতি অল্প বয়সেই হেনরী ল্যাসিংটন এদেশে এসেছেন। সিরাজউদ্দৌলা কলকাতায় এসে যখন ইংরেজদের সম্পূর্ণ পরাস্ত করে—কিছু সংখ্যককে বন্দী করেন। ল্যাসিংটন তাদের মধ্যে ছিলেন। এবং অক্ষত অবস্থায় হলওয়েলের সঙ্গে মুক্তি লাভও করেছিলেন। তাঁর জীবনের শ্রেষ্ঠ কীর্তি হল ঐতিহাসিক জাল দলিলে স্বাক্ষর দেওয়া। পলাশীর যুদ্ধের পূর্বে উমিচাঁদকে প্রবঞ্চনা করার যে চক্রান্ত করেন ক্লাইভ—সেই চুক্তি পত্রে স্বাক্ষর দিতে অস্বীকার করেছিলেন অ্যাডমিরল ওয়াটসন। চতুর ক্লাইভ ল্যাসিংটনকে দিয়ে ওয়াটসনের স্বাক্ষর জাল করিয়েছিলেন।

অনেক উত্থান পতন, অনেক আবিলতার পথ অতিক্রম করেছেন ল্যাসিংটন। এখন তিনি একজন অর্থবান কাউন্সিলার। হেষ্টিংসের সঙ্গে তাঁর গভীর হৃদ্যতা সকলেরই দৃষ্টি আকর্ষণ করে। হেষ্টিংসকে ইংরেজ রেসিডেন্ট রূপে মুর্শিদাবাদে প্রেরণ করার নেপথ্যে তাঁর সক্রীয়তা অল্প ছিল না।

হেষ্টিংস মৃদু হেসে বললেন, একা থাকার প্রয়োজন কি রোজাকে ঘরে নিয়ে এলেই তো হয়।

—রোজা আর আমার সম্পর্কে ইন্টারেষ্টেড নয়। সে নরিসের জন্য পাগল হয়ে উঠেছে আমিও বোধহয় একজনকে পেয়ে সন্তুষ্ট থাকতে পারব না। তুমি প্রতি রাত্রি সুরার আরাধনা করেই অতিবাহিত করছো নাকি ?

—সুরা এবং নারীর।

—তুমি ভাগ্যবান ওয়ারেন।

—কতকগুলি চতুর এবং উপযুক্ত ভৃত্যের আমি কর্তা, ভাগ্যবান বই কি। আমায় কিছুই করতে হয় না হেনরী। ইচ্ছা প্রকাশ করেই নিশ্চিন্ত। ওরা আমায় নিত্য সংগ্রহ করে এনে দেয় সুন্দরী যুবতী।

—আবার বলছি ওয়ারেন তুমি ভাগ্যবান।

হেষ্টিংস দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

—তুমি শুনলে বিস্মিত হবে তবু আমি সুখী নই। অভিজাত হলেও এক দরিদ্র পরিবারে আমি জন্মগ্রহণ করেছিলাম, তা তুমি জান হেনরী। কঠোর পরিশ্রম করবার পর আজ আমি প্রতিষ্ঠা পেয়েছি। অপর্যাপ্ত অর্থের অধিকারী। অসংখ্য নারীর যৌবনকে নিয়ে আমি খেলা করেছি। আমার সুখী হওয়া উচিত। কেন সুখী হতে পারছি না জান ?

ল্যাসিংটন সবিস্ময়ে প্রশ্ন করলেন, কেন ?

—এমন একজন আছে যাকে নিজের করে কোনদিন যদি পাই তবেই সম্পূর্ণ সুখী হতে পারব ?

—কে সে ওয়ারেন ?

—তার নাম শুনতে চেও না হেনরী।

—আমার অত্যন্ত আগ্রহ হচ্ছে। কথা যখন তুলেছো নামটাও বল ?

হেষ্টিংস একটু নীরব থেকে বললেন, মণিবেগম।

—মণিবেগম !

—প্রাক্তন নবাবের পত্নী মণিবেগমের কথা বলছি।

ল্যাসিংটনের দৃঢ় ধারণা হল ওয়ারেন প্রকৃতস্থ নেই। নেশার ঝোঁকে প্রলাপ বকতে আরম্ভ করেছে।

—তাকে কি তুমি দেখেছো হেনরী? এমন নারী শুধু সুবে বাংলায় নয় সমস্ত হিন্দুস্থানেও নেই। বৃদ্ধ জাফার আলী তার যৌবনের মূল্য দিতে পারছে না। শুধু একটি দিনের জন্য আমি যদি তাকে বাহুপাশে পেতাম—

—তুমি প্রকৃতস্থ নেই। রাত্রি গভীর হচ্ছে ওয়ারেন, আমি বিদায় নিচ্ছি।

উচ্চকণ্ঠে হাসলেন ওয়ারেন হেষ্টিংস।

—আমি প্রলাপ বকছি বলে তোমার মনে হচ্ছে হেনরী? না, মাতাল আমি হই নি। মনের কথা তোমাকে অকপটে বললাম সম্পূর্ণ সজ্ঞানে।

—আকাশের চাঁদ তুমি কি হাতে পেতে চাইছো না ওয়ারেন?

—হয়তো তাই; তবে তুমি জানবে, চাঁদকে হাতে পাবার আপ্রাণ চেষ্টা আমি করে যাব।

ল্যাসিংটন আসন ত্যাগ করলেন।

—ঈশ্বর তোমার সহায় হোন। আর অপেক্ষা করব না। বাকী রাতটুকু দুচোখের পাতা এক করতে পারি কিনা দেখি। শুভরাত্রি—

—শুভরাত্রি।

ছায়াচ্ছন্ন মনে ল্যাসিংটন বিদায় নিলেন।

হেষ্টিংসও আসন ত্যাগ করলেন। অলিন্দ অতিক্রম করে এলেন শয়ন কক্ষে যা কখনও করেন নি তাই করতে চললেন। নারায়ণীর অনিন্দ্য সৌন্দর্য নূতন করে তাঁকে উতলা করে তুলল। এতক্ষণে নিশ্চয় তার জ্ঞান ফিরে এসেছে। কোথায় সে? কক্ষে নারায়ণী নেই। ব্যর্থ অনুসন্ধানের পর তিনি বুঝলেন, পাখি উড়ে গেছে। ল্যাসিংটনের সঙ্গে যখন কথাবার্তায় ব্যস্ত ছিলেন সেই সময় তাঁর জ্ঞান নিশ্চয় ফিরে এসেছিল। দ্বার উন্মুক্ত দেখে দ্বিধা না করে সে স্থান ত্যাগ করেছে।

এই প্রথমবার—কলকাতায় এসে পৌঁছবার পর এই প্রথমবার ধরা দিয়েও শিকার হাতছাড়া হয়ে গেল। কোন অশুভ সূচনার ইঙ্গিত তাই বা কেন? যা কখনো ঘটে নি তাকে কখনও ঘটবে না, এমন কোন বাধ্যবাধকতা আছে কি? গভীর দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন হেষ্টিংস।

এতক্ষণে নারায়নী বোধহয় গঙ্গার তীরে গিয়ে পৌঁছতে পেরেছে। নিজের যৌবনদগ্ধ দুর্ভাগ্যের প্রত্যক্ষ দেহকে চিরতরে বিসর্জন দিতে আর কোন বাধা নেই। কিংবা গঙ্গার তীরে পৌঁছবার পূর্বেই তার গতিরুদ্ধ হয়েছে। নারী মাংস-লোলুপ আরেক শিকারী তাকে সহজেই শিকার করতে পেরেছে।

নারায়ণীর ভাগ্যে কি ঘটেছে এক ঈশ্বর ছাড়া আর কেউ এখন জানে না।

হেষ্টিংস আর উপবেশনকক্ষে গেলেন না। শয্যাতেও আশ্রয় গ্রহণ করলেন না। তিনি উদ্যানে এলেন। এই গভীর নিশীথে তিনি কেন যে উদ্যানে এলেন নিজেও জানেন না। চাঁদের আলোয় চতুর্দিক পরিষ্কার দৃষ্টিগোচর হয়। কাকজ্যোৎস্না। জনমানবের চিহ্ন নেই কোথাও। মনে হয় চিরনিদ্রায় নিদ্রিত এই স্থবির পৃথিবীর প্রতিটি প্রাণী। ইংলণ্ডে, নিজের পল্লীভবনে কত রাত্রি উন্মুক্ত আকাশের নীচে নিজের ভবিষ্যৎ চিন্তা করে কাটিয়েছেন। সেদিন ও আজকের মধ্যেকার পার্থক্য অনেক।

হেষ্টিংসের দৃষ্টি পড়ল উদ্যানের প্রবেশ মুখের দিকে।

তিনি সাবস্ময়ে দেখলেন, সেখানে পালকি রয়েছে। বাহকরাও আছে। কেউ নিশ্চয় এসেছে। সঙ্গতিসম্পন্ন ব্যক্তি তো বটেই। এসে থাকলে সে গেল কোথায়? আগন্তুক কি এখনও পালকি ত্যাগ করে নি? হেষ্টিংস অগ্রসর হলেন। খুব বেশী অগ্রসর হবার প্রয়োজন হল না। একটি দীর্ঘ বাওবারের নীচের আলোছায়ার মধ্যে দাঁড়িয়ে রয়েছে একটি নারী।

নারী! হেস্টিংস হতবাক্ হয়ে যান।

সেই সুন্দরী বিধবা নয় তো? তাই বা কিভাবে সম্ভব? যে নিজেকে রক্ষা করবার জন্য আপ্রাণ চেষ্টা করেছে। মুক্তিলাভের সুযোগ পেয়েও সে কি এখানে অপেক্ষা করতে পারে? পারে না। তবে? তবে কি ল্যাসিংটন যথার্থই বলেছে, তিনি অপ্রকৃতস্থ। নেশার মাত্রা অত্যধিক হয়ে যাওয়ার দরুন ভুল দেখছেন।

তাতো নয়। হেস্টিংস পরিষ্কার দেখতে পেলেন, নারী এগিয়ে আসছে। আলোছায়ার বিস্তার অতিক্রম করে সে সম্পূর্ণ আলোর রাজত্বে এসে পড়ল। আর চিনে নিতে কষ্ট হয় না। একি! এও কি সম্ভব? হেস্টিংস স্তম্ভিত হয়ে যান। স্বপ্ন নয়, নেশার ঘোরও নয়, যে নারী মন্থর পায়ে তাঁব দিকে অগ্রসর হচ্ছে সে আর কেউ নয়—তাঁর হৃদয়ের কন্দরে কন্দরে যার আসন পাতা সেই মণিবেগম।

এত রাত্রে!!

হেস্টিংসের জীবনের এক অচিন্তনীয় অধ্যায়ের সূত্রপাত হল।

মণিবেগম হেস্টিংসের সম্মুখে এসে গতিরোধ করলেন।

তাঁর দেহের সৌরভ যে কোন পুরুষকে মাতাল করে তুলতে পারে।

বললেন নম্র কণ্ঠে, গভীর নিশীথে উদ্যানে পরিভ্রমণ করা স্বাস্থ্য সম্মত নয়।

এই কথার উত্তর না দিয়ে বিহ্বল কণ্ঠে হেস্টিংস বললেন, আপনি আমার বাংলোয় আসবেন কল্পনাও করতে পারি নি। বিশেষে এই সময়—

—সময় সময় কল্পনা করা যায় না এমন ঘটনাও ঘটে।

—আমার নিজের ভাগ্যকে ঈর্ষা হচ্ছে। আসুন—

বহু সমাদরে হেস্টিংস উপবেশনকক্ষে নিয়ে এলেন মণিবেগমকে। আসন গ্রহণ করতে অনুরোধ জানিয়ে বললেন, বিশেষ প্রয়োজনেই এসেছেন। প্রয়োজন ব্যক্ত করলে অনুগৃহীত হব।

তরল কণ্ঠে মণিবেগম বললেন, এসেছি যখন প্রয়োজনের কথা বলব বই কি। তার পূর্বে কিছু অন্যকথাও সেরে নেওয়া যেতে পারে। সাহেব জাফার আলীর বেগম ছাড়া আমার আরো একটি পরিচয় আছে।

—আমি জানি।

—আপনি জানেন আমি·······

—কিশোরী অবস্থায় আপনি পথে পথে নৃত্য দেখিয়ে লোকের মনোরঞ্জন করতেন। মণিবেগম হেষ্টিংসের দিকে তির্যক্ দৃষ্টিহেনে, বললেন, একদিন কোম্পানির কাশিম বাজারের কুঠির কাছে কাফিলার তাঁবু পড়েছিল সারি সারি। আর কাফিলার একটি কিশোরী জলাশয়ে নেমেছিল স্নান করতে। আপনি ছিলেন সেখানে। দৃষ্টিবিনিময় হয়েছিল। তারপর—

—সেই মহোময় দৃষ্টির স্মৃতি আজো আমার মনে অটুট আছে। সেদিন বিনিদ্র রজনী আমার কেটেছিল। অসংখ্য চিন্তা আমাকে বিভ্রান্ত করে তুলেছিল।

—সেই কিশোরী পরবর্তী জীবনে স্নুবে বাংলার নবাবের বেগমের আসনটি অধিকার করেছিল। বিচিত্র তার জীবন।

—আমি জানি—আমি সমস্ত জানি ম্যাডাম।

—জানেন! এও জানেন কি আজ এই গভীর রাত্রে কেন সে এসেছে আপনার গৃহে?

—জানি।

—জানেন!

—আমি জানি ম্যাডাম। সেদিন আহারের আমন্ত্রণ পাবার পরই বুঝতে পেরেছি আপনার প্রকৃত উদ্দেশ্য কি।

—আপনি চতুর।

—চতুর না হলে পদে পদে পরাজয়ের সম্ভাবনা।

মণিবেগম হেষ্টিংসের মুখোমুখি এসে দাঁড়ালেন।

—আপনার সহযোগিতায় আমি নিজের ভবিষ্যৎ গড়ে তুলতে চাই। ওই মীরকাশিম যে তখ্ত অধিকার করবার পর বিদ্রূপের হাসি হেসেছে, তার সমাধি আপনাদের দিয়ে আমি খনন করাতে চাই।

মণিবেগমের প্রখর সৌন্দর্য ও প্রসাধনের মন মাতানো উগ্রগন্ধ হেষ্টিংসকে অসম্ভব উতলা করে তুলল। শিষ্টাচারের সমস্ত রীতিকে ছিন্নভিন্ন করে উৎকট পাশব মনোবৃত্তি প্রকট হতে চাইছে। তিনি নিজের মনোভাবকে অসীম বলে সংযত করার চেষ্টা করতে লাগলেন।

অধর দংশন করে বললেন, নবাব কোম্পানির সমস্ত দাবি পূর্ণ করেছেন। তাঁর বিরুদ্ধে কাউন্সিলারদের নিয়ে যাওয়া কষ্ট সাধ্য হবে।

—কাশিম আলী উদ্ধত। সে আপনাদের সঙ্গে মানিয়ে চলতে পারবে না।

—জানি। বর্তমানে সে রকম কোন তিক্ততার সৃষ্টি হয় নি।

—হয়েছে! মিথ্যা ভাষণে নিজেকে ছোট করবেন না। দেশী ব্যবসাদারদের উপর থেকে শুল্ক তুলে নেওয়ায় জটিলতার সৃষ্টি হয়েছে। কোম্পানি এই ব্যবস্থাকে নিশ্চয় মেনে নেবেন না?

—না। অ্যাডমস আর হে'কে পাঠনো হয়েছে নবাবের কাছে। এই জটিলতার সমাধান হবে আশা করা যায়।

—যদি না হয়।

অর্থপূর্ণ হাসি দেখা দিল হেষ্টিংসের মুখে।

—কাউন্সিলে আপনাকে প্রভাব বিস্তার করতে হবে সাহেব।

—মীরকাশিমের সঙ্গে আমাদের সম্পর্ক যদি ভবিষ্যতে গুরুতর আকার নেয় তখ্ত থেকে তাঁকে অপসারণ করবার প্রয়োজনীয়তা যদি দেখা দেয়—

—দেবে, আমি জানি দেখা দেবে।

—তখন কাউন্সিলাররা বাংলার মসনদ কোন শেঠকে দেওয়া যায় কিনা এই বিষয়ে চিন্তা করবেন।

আর্তকণ্ঠে মণিবেগম বললেন, শেঠ! না—না—

—আমার ক্ষমতা অতি অল্প ম্যাডাম। কোম্পানির গভর্নর হলে স্বতন্ত্র কথা ছিল।

—কাউন্সিলে আপনার প্রতিপত্তির কথা আমার অজানা নেই। ইচ্ছে করলে, চেষ্টা করলে হয়কে নয় আপনি করাতে পারবেন। আজ আর আমি অপেক্ষা করব না। রাত খুব বেশী অবশিষ্ট নেই। আপনি আমার অনুকূলে নিজের মনকে দৃঢ় করুন। আবার আসব।

মণিবেগম উন্মুক্ত দ্বারের দিকে অগ্রসর হলেন।

বুভুক্ষ হেষ্টিংস মদালসা নারীর গমনভঙ্গী নিরীক্ষণ করতে লাগলেন।

অ্যাডমস ও হে'র দৌত্য সফল হয় নি। এলিসের পাটনা আক্রমণের সংবাদ পেয়ে ক্ষিপ্ত নবাব তাঁদের বন্দী করেছেন। হত্যাও করা হয়েছে বোধ হয়। এলিসকে পরাস্ত করতে মার্কার ধাবিত হয়েছে—এই সমস্ত সংবাদ কলকাতায় পৌঁছবামাত্র হুলস্থূল পড়ে গেল।

বহুদিন পরে দীর্ঘ সময়ব্যাপী অধিবেশন বসল কাউন্সিলের। প্রথমে ইতস্তত করেও ভ্যান্সিটার্ট পরে অন্যান্য সদস্যদের সঙ্গে একমত হলেন। মীরকাশিমকে বাংলার মসনদের অধিকারী হিসেবে আর মেনে নেওয়া যায় না। ইংরেজ হত্যার প্রতিশোধ নির্মমভাবে গ্রহণ করতে হবে। মীরকাশিমের পর মসনদ আবার কার অধিকারে যাবে তাও নিশ্চিত হয়ে গেল। মসনদে বসবেন মীরজাফর। ইংরেজদের পুরাতন বন্ধু ছাসমাতদ্দৌলা মীর মহম্মদ জাফারআলী খাঁ। একথা হেষ্টিংসও জানতেন। জানতেন, যদি কোন দিন মীরকাশিমকে অপসারণের প্রয়োজনীয়তা দেখা দেয়, তখ্‌তের অধিকারী হবেন শেঠেরা নয়, মীরজাফর। সেদিন শেঠের কথা বলে মণিবেগমের মনে কিঞ্চিৎ বিভ্রান্তির সৃষ্টি করে ছিলেন মাত্র।

অধিবেশন শেষ করে গৃহে প্রত্যাবর্তন করতে সন্ধ্যা অতিক্রান্ত হল। সমস্ত দিন হৈহৈ করে শ্রান্ত হয়ে পড়েছেন। আজ আর মৌতাতে বসবেন না। রাত্রের আহার সেরে নিয়ে শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করবেন। কাল প্রাতে মণিবেগমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যাবেন জাফার আলীর চিৎপুরের গৃহে। তাঁকে সম্পূর্ণ করায়ত্ত করবার সুবর্ণ সুযোগ এসে গেছে।

আহার সমাপ্ত করলেন।

আঙুরের রসে মনকে সরস করে নিয়ে দেহ ঢেলে দিলেন শয্যায়।

রন্ধনশালায় তখন জটলা চলেছে। চারজনই উপস্থিত। কথা কইছে তিনজন। জয়রাম সম্পূর্ণ নীরব। তার মুখে বিরক্তির ছায়া।

করিম বলছিল, সাহেবের আজ বোধহয় শরীর ভাল নেই। এত তাড়াতাড়ি শুয়ে পড়তে তো কোনদিন দেখি নি।

কৃষ্ণলাল বললে, শরীরের আর দোষ কি। রাতের পর রাত মদ আর মাগী নিয়ে কাটালে শরীর ভাল থাকবে কি ভাবে। সাহেবের বাচ্চা বলে যুঝে চলেছে। আমরা হলে কবে ফৌত হয়ে যেতাম।

—তা বটে।

—সাহেবের কথা বাদ দাও—কালুদা বললে, আমাদের জয়রাম কদিন থেকে এত গম্ভীর কেন?

করিম কালুদাকে সমর্থন করল।

—তাই তো। জয়রাম, তুমি এত গম্ভীর কেন? কি হয়েছে তোমার?

জয়রাম গম্ভীর কণ্ঠে বললে, কি হয় নি বল। ধনে প্রাণে শেষ হয়ে যেতে আমার দেরি নেই।

—সে কি?

—ওই শালা সাহেব এর জন্যে দায়ী।

—আহা খুলেই বল না।

হেষ্টিংসের উদ্দেশ্যে অশ্রাব্য গালাগালি উচ্চারণ করে জয়রাম বললে, দিনকয়েক আগে নারাণী নামে একটা মেয়েকে এনেছিলাম মনে পড়ে? পরের দিন তাকে দেখতে না পেয়ে ভেবেছিলাম মাসীর কাছে ফিরে গেছে। পরে জানতে পারছি ফিরে যায় নি। মাসী আমার পিছনে গুণ্ডা লাগিয়েছে। বলে রাখলাম, নারাণীকে ফিরিয়ে দিতে না পারলে আমার মৃতদেহ কোথাও পড়ে থাকতে দেখবে।

—ছুঁড়ীটা যদি কোথাও পালিয়ে গিয়ে থাকে সাহেবের দোষ কি?

—শালুক চিনেছেন গোপাল ঠাকুর। সাহেবের হাত গলে পালিয়ে যাওয়া সহজ কিনা। শয়তানের দোসর ল্যাসিংটন এসেছিল। কোন সন্দেহ নেই, সাহেব নারাণীকে ল্যাসিংটনের কাছে পাচার করে দিয়েছে। ওখান থেকে আবার নারাণী আরেকজনের কাছে যেতে বাধ্য হবে। এইভাবে চলতে থাকবে। এদিকে ·· ····

ইস···স····কালুদা ওষ্ঠে আঙ্গুল সংযোগ করে বিচিত্র শব্দ করল। সকলে তার দৃষ্টি অনুসরণ করে যা দেখল তাতে স্তম্ভিত না হয়ে উপায় নেই। রন্ধনশালার গবাক্ষ দিয়ে পরিষ্কার দেখা গেল, মূল্যবান একটি পালকি এসে থেমেছে। পালকি থেকে অবতরণ করল একটি নারী। নিখুঁত সুন্দরী নারী বলতে যা বোঝায় তাই—। সে উদ্যান অতিক্রম করে বাংলোর দিকে এগিয়ে আসছে। জয়রাম দ্রুত উদ্যানে উপস্থিত হল।

বিনীত কণ্ঠে নারীকে প্রশ্ন করল, সাহেবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবেন কি?

—হ্যাঁ।

—তিনি নিদ্রিত। নিদ্রায় ব্যাঘাত ঘটলে আমার উপর বিরক্ত হবেন।

—আমার আগমন সংবাদ পেলে তিনি বিরক্ত হবেন না।

জয়রামের মতো চৌকস, নির্ভিক ব্যক্তিও আর কোন প্রশ্ন করতে সাহসী হল না।

শয্যায় আশ্রয় নিলেও হেষ্টিংস তখনও নিদ্রা যান নি। জয়রামের কাছ থেকে সংবাদ পেয়ে তাঁর রক্তে হিল্লোল জাগল। তবে কি আগামীকাল জাফার আলীর গৃহে যাবার প্রয়োজন পড়ল না। ঈশ্বর করুণাময়। দ্রুত পায়ে হেষ্টিংস কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে উদ্যানে নেমে এলেন।

তাঁর চিন্তা ভুল পথে চালিত হয় নি। উদ্যানকে রূপের আভায় যেন উজ্জ্বল করে অপেক্ষা করছেন মণিবেগম। দুজনের দৃষ্টি বিনিময় হল। মণিবেগমের ওষ্ঠ রঞ্জিত হল মধুর হাসিতে।

হেষ্টিংস তাঁকে নিয়ে গেলেন উপবেশনকক্ষে।

মৃদু কণ্ঠে বললেন, কাল প্রাতে আপনার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে যেতাম।

—আজ রাত্রেই আমি চলে এসেছি।

—আমার সৌভাগ্য।

—আমার আগামী সৌভাগ্যকে অর্জন করবার জন্য আপনার কাছে এলাম।

—জীবনে আমার অনেক কিছু দেখবার সৌভাগ্য বা দুর্ভাগ্য হয়েছে। কিন্তু আপনার মতো সাহসী নারী আমি পূর্বে দেখি নি।

—একজন ভদ্র পুরুষের সঙ্গে একজন ভদ্র নারী সাক্ষাৎ করতে এসেছে, এতে সাহসিকতার কি আছে।

—আপনি আমাকে কতটুকু চেনেন ম্যাডাম? সজ্জন এবং উদার হিসেবে ওয়ারেন হেষ্টিংস খ্যাত সন্দেহ নেই। কিন্তু রাতের অন্ধকার যখন নেমে আসে তখন সে অন্য মানুষ। সম্পূর্ণ অন্য।

মণিবেগম প্রসঙ্গান্তরে চলে গেলেন। সেই প্রসঙ্গের অবতারণা করলেন যার জন্য সমস্ত রকম স্বার্থ ত্যাগ করতে তিনি প্রস্তুত।

বললেন, মুঙ্গেরে যে গুরুতর পরিস্থিতির উদ্ভব হয়েছে আমি শুনেছি। কাশিম আলী আর আপনাদের অন্তরঙ্গ ব্যক্তি থাকতে পারে না।

—তাতো পারেই না।

—কাশিম আলীর পর বাংলার মসনদ নিশ্চয় খালি থাকবে না।
—না।
—আপনার এই নির্বিকার ভঙ্গী আমাকে উত্ত্যক্ত করে তুলছে সাহেব। সেদিন আমার বক্তব্য আপনাকে জানিয়েছি। আজ বলুন আমাকে আন্তরিকভাবে সাহায্য করবেন কি না।
—নিশ্চয় করব। তবে তার পূর্বে একটি বিষয়ের নিষ্পত্তি হয়ে যাওয়া প্রয়োজন।
—কোন্ বিষয়।
বিন্দুমাত্র ইতস্তত না করে হেষ্টিংস বললেন, আপনাকে সাহায্য করে আমার লাভ। মানবতার প্রশ্ন তুলবেন না। এদেশে ব্যবসা করতে এসেছি। প্রতিটি বিষয় আমাদের ব্যবসায়িক দৃষ্টিকোণ দিয়ে দেখতে হবে।
অকম্পিত কণ্ঠে মণিবেগম বললেন, বিনিময়ে আপনি কি চান?
—অর্থের অভাব আমার নেই।
—জানি।
—হীরা জহরত আমার কাছে সম্পূর্ণ মূল্যহীন।
—এমন কিছু চাইবেন না যা আমি দিতে পারব না।
—না, তেমন কিছু চাইব না। আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। আপনি জানেন, বহুদিন পূর্বে দেখা এক নাচওয়ালীর কাজল-পরা দুটি আঁখি আজও আমার হৃদয়ে সজীব হয়ে আছে। সেই আঁখি দুটির অধিকারিণীকে—
—সে আর নাচওয়ালী নেই।
মণিবেগমের মুখে প্রশ্রয়ের হাসি।
—নেই বলেই তো এত সঙ্কোচ।
—আপনার মতো পুরুষের সঙ্কোচ শোভা পায় না।
আর দ্বিধা করলেন না হেষ্টিংস। দুই বাহু দিয়ে মণিবেগমকে নিজের

দিকে আকর্ষণ করলেন। নারী পরম নির্ভতার সঙ্গে পুরুষের বক্ষলগ্ন হল। প্রবল নিষ্পেষণে পুরুষ নিজের অস্থি মজ্জায় মিশিয়ে ফেলতে চাইল আকাঙ্ক্ষিতাকে।

দুজনেই নীরব। পলে পলে সময় অতিক্রম করে চলল। হেষ্টিংস চিন্তা করলেন। এত সহজে, এত অভাবনীয়ভাবে এই নারীকে জয় করা যাবে কল্পনাও করা যায় নি। মণিবেগম কি চিন্তা করছেন? হয়তো কিছুই চিন্তা করছেন না। একটি পুরুষকে জয় করার আনন্দ উপভোগ করছেন।

এক সময় হেষ্টিংস বাহু বন্ধন শিথিল করলেন।

মণিবেগম তাঁর কাছ থেকে সরে এসে উপবেশন করলেন সোফায়।

—আমার জীবনের শ্রেষ্ঠতম সাধ পূর্ণ হল ম্যাডাম।

নতমুখে মণিবেগম বললেন, তোমাকে সুযোগ দেবার জন্যই আমি এসেছি সাহেব। তুমি আমার সব নিয়েও আমার পরিকল্পনাকে সার্থক রূপ দেবার আপ্রাণ চেষ্টা কর।

হেষ্টিংস মৃদু হাসলেন।

—চেষ্টা। তোমার পরিকল্পনা রূপ নিতে ইতিমধ্যে আরম্ভ করেছে।

হঠাৎ উঠে দাঁড়ালেন মণিবেগম।

—কি বলতে চাইছো তুমি?

—কাউন্সিলে মারকাশিমকে অপসারণ করবার সিদ্ধান্ত গ্রহণ করা হয়েছে।

—তারপর?

—জাফার আলী তখ্‌তের উত্তরাধিকারী মনোনীত হয়েছেন।

সহর্ষে মণিবেগম বললেন, সমস্ত ব্যবস্থা হয়ে গেছে! তুমি তো আমায় এতক্ষণ কিছুই বল নি।

—নিজের প্রাপ্য বুঝে নেবার পর বলব বলে কিছু বলি নি।

কথা শেষ করে হেষ্টিংস হাসলেন।

রন্ধনশালা নিস্তব্ধ নয়। ভৃত্যদের মধ্যে আলোচনা চলেছে।
আলোচনার বিষয়বস্তু নবাগত নারীটি।
কালুদা বললে, জয়রামের জন্য আমার দুঃখ হচ্ছে।
—কেন?
—বুঝতে পারছো না, কেন? সাহেবের আর উপুড় হস্ত হবে না। তোমার বকশিশ বন্ধ। নিজেই কি রকম সুন্দর জিনিস সংগ্রহ করেছে দেখছো তো—। তোমার পটল তোলা সব কটি পূর্বপুরুষ এলেও এমনটি এনে দিতে পারবে না। সাহেবের আর কি গরজ বল তোমাকে মোটা বকশিশ দিয়ে রাজ্যের এঁটো মাল ঘরে তুলবে। তুমি কি বল করিম?
—বটেই তো। সাহেবের তো আর ভীমরতি হয় নি।
জয়রাম চিন্তিত হল। গ্রহের ফেরে পড়েছে সে। ওদিকে মাসী গুণ্ডা লাগিয়েছে, যে কোন উপায়ে হোক নারাণীকে ফিরিয়ে দিতে হবে। এদিকে আবার এই উড়ো আপদ। মোটা আয়ের পথ বুঝি বন্ধ হয়। কোথা থেকে সাহেব একে সংগ্রহ করলে কে জানে। চাল-চলন দেখলে তো অভিজাত ঘরের বলেই মনে হয়।
অলিন্দে কথাবার্তার আওয়াজ পাওয়া গেল।
চার জোড়া চোখের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি লক্ষ্য করল, উপবেশনকক্ষ থেকে বেরিয়ে সেই সুন্দরীর কটি বেষ্টন করে মৃদুস্বরে কথা কইতে কইতে হেষ্টিংস চলেছেন শয়নকক্ষের দিকে। একসময় দুজনে শয়নকক্ষে অদৃশ্য হলেন।

মধ্যাহ্ন আহার সমাপ্ত করে জাফার আলী শয্যায় আশ্রয় নিয়েছিলেন। কিন্তু তখনও তাঁর চোখে ঘুম নামে নি। গতকাল ফায়জাবাদী নুরীবাঈ

যে সুর লহরীর জাল বিস্তার করেছিল তার কথা চিন্তা করছিলেন। এমন গীত বহুদিন তিনি শোনেন নি। আলীবর্দির আমলে মুর্শিদাবাদে সংগীতের বিশেষ চর্চা ছিল। গুণগ্রাহী নবাব দূর-দূরান্তর থেকে সুকণ্ঠের অধিকারী নারী-পুরুষকে আমন্ত্রণ জানিয়ে নিয়ে আসতেন নিজের কাছে।

তখ্‌তে আরোহণ করবার সময় জাফার আলীও স্থির করেছিলেন, আলীবর্দির পথ অনুসরণ করবেন। কিন্তু মনোগত বাঞ্ছাপূর্ণ করতে পারেন নি। তাঁর সমস্ত কর্মসূচী এলোমেলো হয়ে গেল। অবশ্য এর জন্য কাউকে দায়ী করা চলে না, দায়ী তিনি নিজেই।

সমস্ত দ্বিপ্রহরই চিন্তা-জাল বুনে কাটিয়ে দিতেন জাফার আলী। কিন্তু মণিবেগম এসে তাঁর চিন্তার জালকে ছিন্নভিন্ন করে দিলেন। মণিবেগমের মুখের ভাব উজ্জ্বল। এমন উজ্জ্বলতা বহুদিন লক্ষ্য করেন নি জাফার আলী।

—সুখবর আছে সারতাজ।

—সুখবর! জীবনের আর একটিমাত্র সুখবরের জন্য আমি অপেক্ষা করছি বেগম। আল্লাহ্‌র আহ্বান। আর কোন সুখবরের প্রয়োজন আমার নেই।

—আপনি অত্যন্ত দুর্বল হয়ে পড়েছেন। এইভাবে ভেঙে পড়লে তো চলবে না। ভুলে গেছেন সারতাজ, আপনাকে তখ্‌তে বসাবার জন্য আমি দৃঢ়প্রতিজ্ঞ।

—ভুলি নি বেগম। সাধ্যমতো চেষ্টা করে চলেছি ভোলবার।

—আশাবাদী হোন জাহাঁপনা।

—জাহাঁপনা !!!

মণিবেগম শয্যার একপ্রান্তে উপবেশন করলেন।

—মধুর কণ্ঠে বললেন, সহস্র সহস্র কণ্ঠে ওই আহ্বান শোনবার জন্য আবার প্রস্তুত হোন। কাশিম আলীর সঙ্গে কোম্পানির যুদ্ধ আসন্ন।

জাফার আলী শয্যায় উঠে বসলেন।

প্রায় চীৎকার করে বললেন, একথা সত্য বেগম ?

—সত্য মালেক।

—কাশেম আলীর সাহসকে প্রশংসা না করে আমি থাকতে পারছি না। আমি পারিনি। ফিরিঙ্গি বণিকদের পদলেহন করেছি। সে পারবে। বেইমানের বাচ্চা ইংরেজগুলোকে উচিত শিক্ষা দিতে পারবে।

জাফার আলীর কথা শুনে মণিবেগম হতবাক্ হয়ে যান।

—কাশিম আলী আমাদের শত্রু সরতাজ। আপনাকে সিংহাসনচ্যুত করবার ষড়যন্ত্র সে করেছিল।

—আমি কি সিরাজের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্র করি নি বেগম ?

—পুরোনো কথা এখন থাক। ইংরেজ আমাদের মিত্র। মীরকাশিমের পরিবর্তে তারা আপনাকে তখ্‌তে বসাতে চায়।

জাফার আলীর মুখে বিদ্রূপের হাসি দেখা দিল।

—ওই ইংরেজ চুক্তি করেও আমার পরিবর্তে মীরকাশিমকে তখ্‌তে বসিয়েছিল। আমি চিন্তা করছি তুমি এমন উপাদেয় সংবাদ সংগ্রহ করলে কোথা থেকে। এখন আর এত ছলাকলা কেন ? কোম্পানির গভর্নরও তো ইচ্ছা করলে বাংলার তখ্‌তে বসতে পারেন। কাশিম আলীকে দুনিয়া থেকে বিদায় দিতে পারলে সুবে বাংলায় আর এমন একজনেরও হিম্মত নেই যে কোম্পানির ইচ্ছার প্রতিবন্ধক হয়ে দাঁড়াতে পারে।

—কোম্পানি সে কাজ কোনদিনই করবে না হজরত। তারা জানে বাংলার লোক তাদের চায় না। কাশিম আলীকে পরাজিত করে ওরা আপনাকেই তখ্‌তে বসাবে।

—চমৎকার বুদ্ধি ওদের। আমার আড়ালে থেকে ওরা নিজেদের স্বার্থসিদ্ধি করে যাবে। আর আমি প্রতিমুহূর্তে সহ্য করব প্রজাদের

লাঞ্ছনা, গঞ্জনা আর অপমান। না বেগম, নবাবী আমার চাই না।
দয়ার দান আমি গ্রহণ করব না।

—যে কোন উপায়ে হোক তখ্‌ত একবার অধিকারে আসুক তারপর আপনি শক্ত হবেন। নিজের শাসন ব্যবস্থায় আনবেন আমূল পরিবর্তন। ইংরেজদের শায়েস্তা করা কঠিন হবে না।

—সে সামর্থ্য আজ আমার নেই। আমি বৃদ্ধ। অন্যকে স্তোক দিতে পারি, নিজেকে মিথ্যা স্তোক দেব না।

শয্যা ত্যাগ করে জাফার আলী পদচারণা করতে আরম্ভ করলেন। কঠিন পথ অতিক্রম করে শেষে এই পরিস্থিতির মুখোমুখি দাঁড়াবেন মণিবেগম কল্পনাও করতে পারেননি। তাঁর ধারণা ছিল এক কথাতেই জাফার আলী রাজী হয়ে যাবেন। উপায়ান্তর না থাকায় ব্রহ্মাস্ত্র তাঁকে ত্যাগ করতে হল।

কান্নায় ভেঙে পড়লেন মণিবেগম।

দ্রুতপায়ে তাঁর কাছে এগিয়ে এলেন জাফার আলী।

ত্রস্তকণ্ঠে বললেন, একি, বেগম তুমি ....

তিনি কথা শেষ করবার পূর্বেই মণিবেগম কক্ষ ত্যাগ করলেন। তাঁর গমন পথের দিকে তাকিয়ে দাঁড়িয়ে রইলেন জাফার আলী। তাঁর মনের মধ্যে চিন্তা দ্রুত বিচরণ করতে লাগল। এতদিন একসঙ্গে বাস করেও মণিবেগমকে তিনি সময় সময় চিনতে পারেন না।

জাফার আলী মণিবেগমের সন্ধানে চললেন।

তাঁকে পাওয়া গেল সিঙ্গার কক্ষে। গবাক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে উদাস নয়নে আকাশের দিকে তাকিয়ে আছেন। গণ্ডে অশ্রুর ছাপ বর্তমান। কক্ষে দ্বিতীয় জনের আগমন তিনি লক্ষ্য করলেন না কিংবা বুঝতে পেরেও লক্ষ্য না করার ভান করলেন।

—কি হয়েছে বেগম ?

মণিবেগম গবাক্ষের দিক থেকে দৃষ্টি ফিরিয়ে নিয়ে বললেন, কিছু হয় নি হুজরত।

—কিছু নিশ্চয় হয়েছে। এখন আমার ক্ষমতা অতি অল্প—বল বেগম, ক্ষমতায় কুলোলে আমি তোমার জন্য কোন কিছু করতে কার্পণ্য করব না।

—না, না থাক—

—বল, বল বেগম?

—আপনি আমার সম্মান রক্ষা করুন।

ক্রুদ্ধ কণ্ঠে জাফার আলী বললেন, কার এতবড় সাহস যে তোমার সম্মানহানি ঘটাবার চেষ্টা করেছে?

মণিবেগমের আয়তচক্ষু দুটি বৃদ্ধ স্বামীকে লেহন করল।

—কোম্পানির সঙ্গে আমি সমস্ত কথা শেষ করেছি। আপনি তখ্‌তে বসবেন এ নিশ্চয়তা দিয়েছি তাদের। এখন আপনি মত না করলে বিদেশীদের কাছে আমার সম্মান থাকবে না। হুজরত, আমার সম্মানের কথা বিবেচনা যদি নাও করেন, নাজামদ্দৌলার ভবিষ্যৎ চিন্তা করে ইংরেজদের প্রস্তাবে সম্মত হোন। একটু নীরব থেকে আত্মগত ভাবে জাফার আলী বললেন, নাজামদ্দৌলা!

সময় সময় তার কথা আমি ভুলেই যাই। ভুলে যাওয়া উচিত নয়। দুনিয়ায় তাকে আমি এনেছি, তার দায়-দায়িত্ব সবই তো আমার। ছোট নবাব আজ নেই। আমাকে অন্ধ করে দিয়ে আল্লাহ্‌র কাছে চলে গেছে। নাজাম আছে। তার ভবিষ্যৎ আমাকে দেখতে হবে বই কি।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করে বললেন, তোমার সম্মান আর নাজামের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা করে আমার রাজী না হয়ে উপায় নেই। সাহেবদের সংবাদ পাঠাও।

সংবাদ পেয়ে কারনেক হেস্টিংস ও য়্যাডমস এলেন জাফার আলীর চিৎপুরের গৃহে। তাঁদের আগমনের পূর্বে মণিবেগম গৃহটি সজ্জিত করে রেখেছিলেন। শিষ্টাচার বিনিময় হল। গভর্নর ভ্যান্সিটার্ট নিজে আসেন নি। না আসার কারণ অবশ্য দিনের আলোর মতো উজ্জ্বল। তিনিই জাফার আলীকে সরিয়ে মীরকাশিমকে তখ্‌তে বসিয়েছেন, আবার সেই জাফার আলীকে তখ্‌তে বসবার অনুরোধ জানাতে তাঁর সঙ্কোচ হতে লাগল।

দলের নেতা হিসেবে জাফার আলীর কাছে যাবার জন্য কারনেক মনোনীত হলেন। পদগৌরবে গভর্নরের পরই প্রধান সেনাপতি। বর্তমানে আয়ার কুটের স্থলে টমাস য়্যাডামস ওই পদটির অধিকারী। নেতা নির্বাচিত তাঁরই হওয়া উচিত ছিল—অভিজ্ঞতার কথা বিবেচনা করে কারনেক মুখপাত্র হলেন।

সাহেবদের সমাদরে উপবেশন করতে অনুরোধ করার পর পানীয় পরিবেশিত হল। জাফার আলী কক্ষে প্রবেশ করলেন। শিষ্টাচার বিনিময় হল আরেক প্রস্থ। তিনজনই প্রাক্তন এবং ভাবী নবাবকে তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে পর্যবেক্ষণ করলেন। জরাজীর্ণ দেহ। বয়স সাতের কোঠা অতিক্রম করেছে। কদাকার মানুষটি দুরারোগ্য ব্যাধিতে আক্রান্ত হয়ে আরো কদাকার হয়ে উঠেছেন।

ইনিই হবেন তখ্‌ত মুবারকের অধিকারী।

কারনেক অভিপ্রায় ব্যক্ত করলেন।

জাফার আলী বললেন, বিশদভাবে আমাকে কিছু বলবার প্রয়োজন নেই। বেগম কথাবার্তা আপনাদের সঙ্গে বলেছেন শুনেছি।

—ম্যাডাম বুদ্ধিমতী মহিলা। উপযুক্ত সময় আমাদের সঙ্গে এই সম্পর্কে আলোচনা আরম্ভ করেছেন।

আপনারা আমাকে আবার মসনদের দাবিদার করতে চান সুখের কথা। আপনারা আমাকে অপমানিত করে বিতাড়িত করেছিলেন।

অথচ আপনাদের সঙ্গে যে চুক্তি হয়েছিল—দেশের বিরুদ্ধাচরণ করছি জেনেও আমি তা অক্ষরে অক্ষরে পালন করেছি। কর আদায় হল না। তোষাখানা শূন্য হয়ে গেল। কোম্পানিকে আমি সমস্ত অর্থ দিতে পারলাম না। কাশিম আলী এই সুযোগ গ্রহণ করল। আজ তার পরিবর্তে আমাকে তখ্‌তে বসাতে চাইছেন। সাহেব, তখ্‌ত মুবারককে মূল্য দিয়ে কেনার ক্ষমতা আমার নেই। আমি আপনাদের কৃপার পাত্র, আশ্রিত।

মণিবেগম বললেন, আপনি উতলা হবেন না সারতাজ। সমস্ত দায়িত্ব আমার।

—তোমার! তোমাকে সেদিন কাঁরবার জনারণ্য থেকে তুলে এনে শাদী করেছিলাম বেগম, সেদিন কল্পনাও করতে পারি নি আমার জন্য তোমাকে আবার বে আবরু হতে হবে।

—ও সমস্ত কথা এখন থাক। সাহেবদের সঙ্গে সমস্ত কিছু পাকাপাকি করে ফেলুন।

—বেশ, থাক ও সমস্ত কথা।

কারনেকের দিকে তাকিয়ে জাফার আলী বললেন. আমার অবস্থা দেখছেন। আমি অসুস্থ, আমি অকর্মণ্য—

কারনেক বললেন, আপনাকে কিছুই করতে হবে না। যা কিছু করবার আমরাই করব। আমাদের নির্দেশেই আপনি সুবে বাংলা শাসন করবেন।

—অনর্থের সৃষ্টি কি হবে না? প্রজারা কাশিম আলীর পক্ষে—

মণিবেগম বললেন, কোম্পানির সঙ্গে যুদ্ধ হবে কাশিম আলীর। কর আদায়ের জন্য সে যে অত্যাচার চালিয়েছে সুবে বাংলার সমস্ত ধনী ও অভিজাত ব্যক্তি তার উপর ক্রুদ্ধ। কোম্পানি তাঁদের সহযোগিতা পাবেন। কাশিম আলীর কোন ঐশ্বরিক ক্ষমতা নেই। পরাজিত সে হবেই। প্রজারা আপনার অনুগামী হবে তখন দেখবেন।

—কিন্তু কাশিম আলী যদি কোম্পানির সঙ্গে সন্ধি করে। তখন কোন্ নবাবকে এঁরা পছন্দ করবেন? সুবে বাংলায় দুটি নবাব নিশ্চয় থাকবে না? তখ্‌ত মুবারককে দ্বিখণ্ডিত করবার কোন পরিকল্পনা নিশ্চয় নেই?

হেষ্টিংস বললেন, সন্ধি হবে না। কোন মূল্যে মীরকাশিমের সঙ্গে আমাদের সন্ধি করার প্রশ্ন ওঠে না।

য়্যাডমস বললেন, এই কলকাতায় সিরাজ ইংরেজের রক্ত বইয়েছিল। আমরা তাকে ক্ষমা করি নি। মীরকাশিম পাটনায় অসংখ্য ইংরেজকে নির্মমভাবে হত্যা করেছে আমরা তাকে ক্ষমা করতে পারি না।

হেষ্টিংস বললেন, যুদ্ধে মীরকাশিম যাতে কখনই জয়লাভ করতে না পারে সে ব্যবস্থা আমরা করেছি। তার শক্তি খর্ব করবার চেষ্টা চলেছে। নবাবের নির্ভর আর্মানী সৈন্যদের উপর। অর্থে কিনা হয়। গুরগিন, মার্কার, সমরু এরাও অর্থের লোভ কোন মতেই সংবরণ করতে পারবে না।

কারনেক বললেন, আপনি কোন বিষয় চিন্তা করবেন না। এবার আপনার সঙ্গে ঘনিষ্ঠ সম্পর্ক রাখবার জন্য আমরা দৃঢ়প্রতিজ্ঞ। আর দ্বিরুক্তি করবেন না। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দিন।

—সন্ধিপত্র।

মণিবেগম বললেন, এতবড় ওলোট-পালোট হচ্ছে। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর তো আপনাকে দিতেই হবে হজরত।

জাফার আলী দীর্ঘনিঃশ্বাস ত্যাগ করলেন।

—পলাশির যুদ্ধের পর বাংলার রাজনৈতিক রঙ্গমঞ্চে বিরাট ওলোট-পালোট এসেছিল। সন্ধিপত্রে স্বাক্ষর দিয়েছিলাম, কিন্তু—যাক, আমি তো নিমিত্ত মাত্র। কোথায় স্বাক্ষর দিতে হবে বলুন?

য়্যাডমস সন্ধিপত্রটি এগিয়ে ধরলেন।

বাক্যব্যয় না করে স্বাক্ষর করলেন জাফার আলী।

কারনেক উঠে দাঁড়িয়ে কুর্নিশ করে বললেন, ইয়োর এক্সেলেন্সি দীর্ঘ জীবন লাভ করুন। বাকী দুজন আসন ত্যাগ করে কুর্নিশ করলেন।

মণিবেগম বললেন, আমি এবার অর্থের ব্যবস্থা করছি। আপনারা আর নিশ্চেষ্ট হয়ে বসে থাকবেন না।

—নিশ্চয় না।

জাফার আলী বললেন, প্রথমবার যখন আমার সঙ্গে চুক্তি হয়, স্বাক্ষর করে চুক্তিনামা ওয়াটসের হাতে তুলে দেবার আগে আমি পড়ে দেখেছিলাম। এবার তাও দেখলাম না। আপনারা আমায় কি রকম বাঁধনে বাঁধলেন আল্লাহ্ জানেন। শেষ বারের মতো শুধু অনুরোধ জানাচ্ছি, আর যেন আমার হেনস্তা না হয়। বাকী জীবনটা অন্তত নিশ্চিন্তে বাঁচতে চাই।

য়্যাডমস বললেন, সে নিশ্চয়তা সন্ধিপত্রেই আমরা দিয়েছি। ইয়োর এক্সেলেন্সিকে আরেকটি কথা জানানো হয় নি, মীরকাশিমের মস্তকের মূল্য এক লক্ষ টাকা ঘোষণা করা হয়েছে।

জাফার আলী বিদ্রূপের হাসি হেসে বললেন, মাত্র এক লক্ষ টাকা! বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাবের মস্তক এত অল্প মূল্যে বিক্রয় হবে?

অধৈর্য কণ্ঠে মণিবেগম বললেন, মালেক, কাজ শেষ হয়েছে। সাহেবরা এবার বিদায় নেবেন।

—ও, হ্যাঁ—হ্যাঁ, আমার স্মরণ থাকে না সকলে আমার মতো বেকার নয়। সময়ের মূল্য আছে। আপনাদের বিদায় নেবার পূর্বে আমি একটি অনুরোধ জানাব।

কারনেক বললেন, বলুন?

—আমি নন্দকুমারকে নিজের দেওয়ান নিযুক্ত করতে চাই।

হেষ্টিংস বললেন, তিনি ইংরেজদের সুনজরে দেখেন না। আমরা তাঁকে গৃহবন্দী করে রাখতে বাধ্য হয়েছি।

—এই মুহূর্ত থেকে তাঁকে আমি দেওয়ান নিযুক্ত করলাম। তাঁকে মুক্ত করে দেওয়া হোক।

—আপনার অনুরোধ রক্ষা করা আমাদের পক্ষে সম্ভব নাও হতে পারে।

—সন্ধিনামা না পড়ে স্বাক্ষর দিয়ে আপনার অসংখ্য সর্তে রাজী হলাম। আর আপনারা আমার একটি অনুরোধ রাখতে পারছেন না! আপনাদের এই জেদের বাহাদুরী আছে।

মণিবেগম বললেন, তুচ্ছ একটি বিষয় নিয়ে আপনি কেন ব্যস্ত হচ্ছেন হজরত।

—বিষয়টি তুচ্ছ নয়। নন্দকুমারকে অবিলম্বে মুক্তি দিতে হবে। তাঁর মতো উপযুক্ত ব্যক্তিই আমার দেওয়ানের পদ অলঙ্কৃত করবেন।

তিনজন কাউন্সিলার কক্ষান্তরে গিয়ে পরামর্শ করলেন। আলোচনায় নন্দকুমারকে মুক্তি দিয়ে মীরজাফরের দেওয়ানের পদ গ্রহণ করতে দেওয়া স্থির হল। নিজেদের মত জানিয়ে, বারংবার নবাবকে কুর্নিশ করে তাঁরা বিদায় নিলেন।

হেষ্টিংসের বাংলো।

ভৃত্যদের নৈশ আহার শেষ হয়েছে সবেমাত্র। নানা সরস আলোচনায় রন্ধনশালা মুখরিত করে তুলছে তারা, আচম্বিতে সেখানে হেষ্টিংসের আবির্ভাব ঘটল। এই সময় এখানে প্রভুর আগমন সম্পূর্ণ অপ্রত্যাশিত।

—জয়রাম—

—হুজুর—

—তোমাদের আহার শেষ হয়েছে?

—হয়েছে হুজুর।

—আজ রাত্রে বাংলোয় আমি একা থাকতে চাই। তোমরা চারজন

আজ রাত্রির মতো অন্যত্র থাকার ব্যবস্থা করে নেবে। এই টাকায় রাত্রি অতিবাহিত করতে তোমাদের অসুবিধা হবে না।

জয়রাম প্রভুর হাত থেকে টাকার থলিটি নিল।

হেষ্টিংস যেমন হঠাৎ এসেছিলেন, তেমনই চলে গেলেন।

নির্বোধ দৃষ্টিতে সকলে সকলকে লেহন করল।

নিস্তব্ধতা ভঙ্গ করে জয়রাম বললে, ব্যাপার বুঝছো? আমাদের তাড়িয়ে সমস্ত রাত সাহেব স্ফুর্তি লুটবে সেই ঢল ঢল ললিতের সঙ্গে।

করিম বললে, ফুর্তি লুটেই তো আছে। আমাদের তাড়াবার দরকার কি? বন্ধ ঘরে কি আর শানাচ্ছে না? সমস্ত বাংলো দুজনে হুটোপাটি করে বেড়াবে নাকি। কালুদা মন্তব্য করল, বিচিত্র নয়। নানা ঢঙে পিরিত প্রকাশ করতে পারলে সাহেবরা আর কিছু চায় না।

কৃষ্ণলাল বললে, চুলোদ্দরে যাক সাহেব। জয়রাম, আমার অংশের টাকাটা ফেলে দাও এদিকে। আমিও কোথাও গিয়ে গা ভাসাই।

—আমারও—কালুদা বললে, লবঙ্গবালা পিছলে বেরিয়ে গেছে সেদিন আজ চাঁদির জুতো মেরে তার ঘরে রাতটা কাটিয়ে আসি না হয়।

হেষ্টিংসের দিয়ে যাওয়া টাকা চার সমান অংশে ভাগ করে নিয়ে তারা বাংলো ত্যাগ করল। সময় কারুর অপেক্ষায় থাকে না। রাত্রি গভীর হয়ে চলল। থেকে থেকে নাম না জানা পাখিরা ডেকে চলেছে। প্রকৃতি জ্যোৎস্নালোকিত নয়। শুক্লপক্ষের আয়ু শেষ হয়েছে।

হঠাৎ পালকির বাহকদের একটানা হেঁকে চলার শব্দ শ্রুত হল।

পালকি থেকে নেমে উদ্যানে প্রবেশ করলেন মণিবেগম। কাছেই কোথাও ছিলেন হেষ্টিংস। নিবিড়ভাবে প্রিয়তমাকে আকর্ষণ করলেন। মণিবেগম চমকে উঠেছিলেন। তাঁর দেহে প্রবল শিহরণ জেগেছিল। তারপরই আশ্বস্ত হয়ে নরম কণ্ঠে বললেন, তুমি—

—ম্যাডাম।

এখানে, অন্ধকারে দাঁড়িয়েছিলে আমার জন্য ?

—প্রয়োজন হলে আমি অনন্তকাল তোমার জন্য দাঁড়িয়ে থাকতে পারি।

—এক এক সময় ইচ্ছে করে ম্যাডাম, ব্যবসা, রাজনীতি সমস্ত ছেড়ে তোমাকে সঙ্গে নিয়ে ইংল্যাণ্ডে চলে যাই। রচেষ্টারে গিয়ে বাকী জীবন কাটিয়ে দি।

—ফতেমার অপমানের প্রতিশোধ আর নাজামের ভবিষ্যৎ চিন্তা না থাকলে আমিই তোমাকে বলতাম এখান থেকে অনেক দূরে চলে গিয়ে নূতন করে জীবন আরম্ভ করার কথা। কথা বলতে বলতে দুজনে উপবেশনকক্ষে এলেন।

মণিবেগম বললেন, আজ এখানে খোজা পিক্রুসের উপস্থিত থাকবার কথা ছিল ?

—ছিল এবং সে আছেও।

—কাজের কথা হয়ে যাক। তাকে আমরা আগে বিদায় করে দি।

—পিক্রুস—

হেষ্টিংসের আহ্বানে আলাদিনের দৈত্যের মতো খোজা পিক্রুসের আবির্ভাব ঘটল। অন্য একটি কক্ষে এতক্ষণ সে অপেক্ষা করছিল। মীরকাশিমকে তখ্‌তে বসাবার ষড়যন্ত্রের সময় ইংরেজদের সঙ্গে তার গভীর হৃদ্যতা গড়ে ওঠে। কিন্তু পরিস্থিতি মীরকাশিমের প্রতিকূলে যাওয়ায় পিক্রুসের প্রতি কারুর তেমন আর সহৃদয় মনোভাব ছিল না। কারণ সে নবাবের প্রধান সেনাপতি গুরগিন খাঁর সহোদর ভ্রাতা। বিদেশ থেকে অস্ত্রশস্ত্র আমদানী করেও নবাবকে সাহায্য করেছে।

বুদ্ধিমান হেষ্টিংস কিন্তু এই বিশেষ মুহূর্তে পিক্রুস সম্পর্কে একমত হতে পারলেন না। তিনি পরিষ্কার বুঝতে পারলেন, কণ্টক দিয়ে কণ্টক তোলাই এখন শ্রেষ্ঠ উপায়। পিক্রুস লোভী ও সুবিধাবাদী ব্যক্তি। মীরকাশিমের প্রতি প্রগাঢ় অনুরাগ থাকার কোন প্রশ্নই ওঠে না।

সে অর্থের লোভে তাঁকে সাহায্য করেছিল। আবার অর্থের লোভে তাঁকে অস্ত্রাঘাত করবে না একথা নিশ্চিত রূপে বলা চলে না।

সুতরাং খোজা পিক্রুসের সহযোগিতা এখন সর্বাগ্রে প্রয়োজন।

পিক্রুসকে ইতিপূর্বে মণিবেগম দেখেন নি। নাম শুনেছিলেন। তার প্রতি কিঞ্চিৎ ঘৃণা ভাব ছিল কারণ সে মীরকাশিমের সহযোগী। হেষ্টিংস নিজের পরিকল্পনা তাঁকে বলেছেন। এই ঘৃণ্যজীবটির অন্য পরিচয় পেয়ে তিনি অবশ্য বিস্মিত হন নি। দুজনে পরামর্শ করেই এই গভীর রাত্রে এখানে পিক্রুসকে আহ্বান করেছেন।

পিক্রুস মণিবেগমকে সম্মান প্রদর্শন করল।

হেষ্টিংস বললেন, তোমাকে কেন এখানে আহ্বান করা হয়েছে বুঝতে পেরেছো বোধহয়?

পিক্রুসের কুৎসিত মুখে বাঁকা হাসি খেলল।

—আমার বুদ্ধি চিরকালই একটু ভোঁতা। আমি কিছুই বুঝতে পারি নি।

—বুঝতে না পারলে এলে কেন?

—আমি মৃত্যুকে ভয় পাই হেষ্টিংস সাহেব। না এলে গর্দান আমার থাকত না।

মণিবেগম বললেন, তুমি চতুর। সমস্তই বুঝতে পেরেছো। না বোঝার ভান করে আমাদের বিভ্রান্ত করতে চাইছো মাত্র।

—বেগম সাহেবার বুদ্ধির তারিফ করতে হয়।

—অনর্থক কথা বাড়িয়ে লাভ নেই। হেষ্টিংস বললেন, এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যাক। নিশ্চয় শুনেছো, মীরকাশিমের সঙ্গে আমাদের সম্পর্কের অবনতি হয়েছে। আমরা আবার জাফার আলী খাঁকে সুবে বাংলার নবাব হিসেবে মেনে নিয়েছি।

—একথা সকলেই শুনেছে।

—কাশিম আলীকে পথ থেকে সরাতে হবে।

—জানি।

—এই ব্যাপারে আমরা তোমার সাহায্য চাই পিক্রুস।

—সাহায্য পাবেন।

—এতদিন তুমি মীরকাশিমের সহযোগী ছিলে।

—এই মুহূর্ত থেকে আপনাদের সহযোগী হলাম।

—ক্ষণে ক্ষণে এইভাবে দল পরিবর্তন করার মনোভাব থাকলে তোমার উপর আস্থা রাখা যাবে কি ?

বিচিত্র এক হাসি হাসল পিক্রুস। সময় সময় বেপরোয়া ও নির্লজ্জ ব্যক্তিরা এই হাসির আশ্রয় নিয়ে থাকে।

—আমার মতো সাধারণ মানুষ ক্ষণে ক্ষণে দল পরিবর্তন করবে এ আর বিচিত্র কি। তবে আপনাদের মতো মহানুভবরাও যখন ওই কাজ করেন তখন বিস্ময় বোধ হয়। জাফার আলীকে সমর্থন করতে করতে ঢলে পড়লেন কাশিম আলীর উপর। আবার কাশিম আলীকে ছেড়ে ফিরে এলেন পুরোনো দলে। যাক, ও সমস্ত ব্যাপার নিয়ে মাথা ঘামালে আমার চলে না। ব্যবসাদার লোক। এদেশে এসেছি পয়সা উপায় করতে। মীরকাশিম অর্থ দিয়েছিল তার পক্ষে ছিলাম, আপনারা অর্থ দেবেন আপনাদের পক্ষে থাকব।

পিক্রুসের চরিত্র সম্পর্কে হেষ্টিংসের পুঙ্খানুপুঙ্খ জ্ঞান আছে।

তিনি বললেন, বিনা অর্থে তোমাকে দিয়ে কাজ করাব একথা মনে স্থান দিও না। কি করতে হবে শুনে নাও।

—আগে স্থির হয়ে যাক কত টাকা আমায় দেবেন। যা করতে ডেকেছেন তা যে আমার পক্ষে সম্ভব না জেনে আমাকে আহ্বান করেন নি। আগেই বলেছি আমি ব্যবসাদার লোক। লেন-দেনের কথা হয়ে যাওয়াই ভাল।

সেয়ানে সেয়ানে কুলোকুলি আরম্ভ হল।

—কত চাও ?

—কত দেবেন ?

—যত কম দিতে হয় আমাদের পক্ষে ততই ভাল।

—কিন্তু আমার ঝোঁক বেশীর দিকে। বুঝতেই পারছেন, বেশী পেলে কেউ কম নিতে চায় না। না শুনেই বুঝতে পারছি কাজের গুরুত্ব অত্যন্ত বেশী। কাজেই—

মণিবেগম বললেন, এইভাবে কথাবার্তা চলতে থাকলে সমাধানে পৌঁছাতে বিলম্ব হবে। আমি তোমাকে পঞ্চাশ হাজার টাকা দেব, কাজ সুচারুরূপে সম্পন্ন হওয়া চাই।

পিত্রুসের স্ফুরিত ওষ্ঠের মধ্যে দিয়ে তৈলাক্ত হাসি যেন কুলকুলিয়ে বেরিয়ে আসতে লাগল।

—বেগম সাহেবা, আমি আপনার পরিহাসের পাত্র নই। কোম্পানিই তো কাশিম আলীর মস্তকের মূল্য ঘোষণা করেছে এক লক্ষ টাকা। আপনি তার অর্ধেক দিতে চাইলে আমি রাজী হব কেন।

—বাগাড়ম্বর না করে কত টাকা চাও বল?

—দু'লক্ষ।

মণিবেগম ও হেষ্টিংসের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হল।

কক্ষের অন্য প্রান্তে গিয়ে দুজনে নিম্ন কণ্ঠে আলোচনা করলেন।

—ওই অঙ্কই তোমায় দেওয়া হবে। হেষ্টিংস বললেন, কিন্তু পিত্রুস সাবধান, আমাদের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করবার চেষ্টা ক'রো না। পৃথিবীর কোন প্রান্তে গিয়ে নিজেকে রক্ষা করতে পারবে না।

—ফাদার এব্রাহাম! টাকা যখন দেবেন, দিনের পর দিন আপনাদের পা আমি চাটবো। বিশ্বাসঘাতকতার কথা তুলছেন কেন?

—এবার আসল কথায় আসা যেতে পারে। আমরা মীরকাশিমের সৈন্য বাহিনীকে অকেজো করে দেবার পরিকল্পনা করেছি। তোমার ভাই গ্রেগারী—

—সে এখন গুরগিন খাঁ।

—গুরগিন খাঁর উপর কাশিম আলীর অগাধ বিশ্বাস। তাকে যে কোন উপায়ে বিশ্বাসঘাতক করে তুলতে হবে।

—কঠিন কাজ। আপনারা পিত্রুসকে দেখে গুরগিনকে বিচার করবেন না। একই আর্মেনিয়ান রক্ত দুজনের ধমনীতে বইছে বটে, কিন্তু মনের পার্থক্য বহু সহস্র যোজন পথের। তবু আমি চেষ্টা করব। আপ্রাণ চেষ্টা করব তাকে বিশ্বাসঘাতক করে তুলতে।

—আরেকটি কাজ করতে হবে।

—বলুন।

—শেঠেরা মুঙ্গেরে আছেন। কাশিম আলী তাঁদের বন্দী করে রেখেছে বলা চলে। শেঠেদের সঙ্গে যোগাযোগ রাখবে। তাঁদের সঙ্গে আমাদের যাতে দেখা সাক্ষাৎ হয় তার ব্যবস্থা করবে।

—তাই করব।

অর্থপূর্ণ দৃষ্টি হেনে পিত্রুস বললে, রাত গভীর হয়ে চলেছে। আপনাদের দুজনের আর অসুবিধা ঘটাব না। কিছু গহনা হাতে পেলেই চলে যেতে পারি। আমার পাওনা না হয় পরে দেবেন।

—গহনা। গহনা নিয়ে কি করবে?

—আপনি বোধহয় জানেন হেস্টিংস সাহেব আমার বিবি নেই। নারীর প্রতি কোন আসক্তিও নেই। গহনার প্রয়োজন অন্যত্র। কালই মুঙ্গের রওনা হয়ে যাব।

গুরগিনের আর্মেনিয়ান বিবিকে গহনা উপহার দিয়ে ভাই-এর মন প্রথমেই নরম করে তুলতে হবে। তারপর ধীরে ধীরে কাজের কথা বলব।

মণিবেগম নিজের কণ্ঠ, বলয় ও কর্ণের অলঙ্কার খুলে দিলেন। দুজনকে শুভরাত্রি জানিয়ে খোজা পিত্রুস বিদায় নিল।

হেস্টিংস বললেন, এর মতো নোংরা মনোবৃত্তির মানুষ খুব কমই দেখা যায়।

-আমাদের কাজ করবে তো?

-টাকার গন্ধ আছে, করবে বই কি।

কলকাতায় যে সাজ সাজ রব পড়ে গেছে মুঙ্গেরে সে সংবাদ পৌঁছাতে বিলম্ব হল না। গুপ্তচরদের মুখে বিস্তারিতভাবে না হলেও মোটামুটি সংবাদ পেলেন মীরকাশিম। তাঁর মস্তকের মূল্য এক লক্ষ টাকা ঘোষণা করা হয়েছে তাও শুনলেন।

তিনি আরো সংবাদ পেয়েছিলেন, ইংরেজরা জাফার আলীকে মুর্শিদাবাদে নিয়ে চলেছে। ওখানে অভিষেক হবে। আবার তখ্‌ত মুবারকে উপবেশন করবেন প্রাক্তন নবাব নতুন নবাব রূপে।

—শুনেছো বেগম—মীরকাশিম শ্লেষ জড়িত কণ্ঠে বললেন, তোমার আব্বাজান আবার বাংলার সুখ শান্তিকে নষ্ট করবার জন্য অগ্রসর হচ্ছেন।

ফতেমা সংবাদটি শুনেছিলেন।

ধীরকণ্ঠে বললেন, আব্বাজন নয়, মণিবেগম—নাচওয়ালী মুন্নিবাঈ আমায় শান্তিতে থাকতে দেবে না হজরত। এখন আপনার কর্তব্য কি?

—আমার কর্তব্য হল ওই অবাঞ্ছিত ব্যক্তিদের কার্যকলাপে বাধা দেওয়া। এক খাপে দুটি তরবারি থাকতে পারে না বেগম। সুবে বাংলার তখ্‌তের অধিকারী আমি মীরজাফর আনহূত আগন্তুক মাত্র।

মীরকাশিম অন্দর মহল থেকে মন্ত্রণাকক্ষে গেলেন।

আহ্বান করলেন সেনাধ্যক্ষদের। তারা উপস্থিত হলে সমস্ত পরিস্থিতি বুঝিয়ে বলার পর বললেন, এখন আমার ভবিষ্যৎ তোমাদের হাতে। একলক্ষ টাকা আমার মস্তকের মূল্য ঘোষণা করা হয়েছে। আমার

সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করলে লক্ষ টাকা পাওয়া যাবে সত্য কিন্তু স্মরণ রেখো, বাংলার স্বাধীনতার মূল্য কোটি টাকার উর্ধ্বে। গুরগিন নিজের তরবারি খাপমুক্ত করে নবাবের পদপ্রান্তে রাখল। অন্যান্য সেনা-নায়করাও ওই একই পন্থায় আনুগত্য প্রকাশ করল।

—প্রীত হলাম। তোমাদের মতো যোদ্ধা যে কোন দেশের পক্ষে গৌরবের বস্তু। এবার আমাদের সঙ্কট ত্রাণের জন্য অগ্রসর হতে হবে। আমি ঘোষণা করছি, কাটোয়ায় ইংরেজদের গতিরোধ করা হোক। নজাফ—

—হুজরত।

—অবিলম্বে আমার আদেশ তকী খাঁকে প্রেরণ কর।

নবাব মন্ত্রণাকক্ষ ত্যাগ করলেন। তারপর……

মীরকাশিমের চমক ভাঙল। ভোর হয়ে গেছে। মধ্যরাত্রি থেকে এখন পর্যন্ত তিনি স্মৃতি রোমন্থন করছিলেন চিন্তা করে আশ্চর্য হলেন। ক্লান্ত হয়ে পড়েছেন। দুপায়ে শেলিমশাহী নাগরা আরো শক্ত হয়ে যেন বসেছে। নতুন করে তকী খাঁর কথা মনে পড়ল তাঁর। ইংরেজদের সঙ্গে সংঘাতের সূত্রপাতেই তার মতো বীরকে হারাতে তিনি প্রস্তুত ছিলেন না। আল্লাহ্‌র বিচারের উপর কারুর কিছু বলবার থাকতে পারে না, মীরকাশিম একথা জানেন, তকীর খাঁর প্রয়োজন দুনিয়ায় ফুরিয়েছিল। তবু সান্ত্বনা খুঁজে পান না।

তিনি কুর্সিতে ক্লান্ত দেহ স্থাপন করলেন।

এই সময় তাঁর মনের পর্দায় ফুটে উঠল এক উজ্জ্বল চিত্র। হয়তো গতকাল রাত্রে সদলবলে মীরজাফর মুর্শিদাবাদে পৌঁছে গেছেন। সুখ নিদ্রায় রাত্রি অতিবাহিত করে শয্যাত্যাগ করেছেন আজ শানাই-এর মধুর রাগিণী শুনতে শুনতে। সূর্যোদয়ের কিছু পরে দরবারে যাবেন তিনি। স্তাবকদের প্রবল হর্ষধ্বনির মধ্যে উপবেশন করবেন গিয়ে তখ্‌ত মুবারকে। খেলাত বিতরণ করবেন।

দীর্ঘনিঃশ্বাস ফেলে বাংলা বিহার উড়িষ্যার প্রকৃত নবাব কুর্সি ত্যাগ করলেন। আর চিন্তা করবেন না। চিন্তা মানুষকে পাগল পর্যন্ত করে দিতে পারে। মীরকাশিমের এখন করণীয় হল, ফতেমার কাছে গিয়ে বিশ্রাম করবেন। তারপর যাবেন দরবারে। তিনি অন্দর মহলের দিকে চললেন।

চার

তকী খাঁর সঙ্গে ইংরেজদের যখন যুদ্ধ বাধে তখন ইব্রাহিম সেখানে ছিল। যুদ্ধ শেষ হবার পর সে চলে এল মুঙ্গেরে। এই বিশৃঙ্খলার মধ্যে তাকে গুছিয়ে নিতে হবে নিজের ভবিষ্যৎ। মুঙ্গেরে এসে ইব্রাহিম লক্ষ্য করল, মুর্শিদাবাদ অপেক্ষা গুরগিন খাঁর প্রতিপত্তি বৃদ্ধি পেয়েছে চতুর্গুণ। নবাব তার উপর নির্ভর করছেন অন্ধের মতো।

এমন কি নজাফ খাঁ, সৈয়দবান্দা প্রমুখ মুসলমান সেনানায়করাও তার বীরত্ব ও গুণপনায় পঞ্চমুখ। অথচ গুরগিনের ক্ষমতা খর্ব করতে না পারলে সুফল ফলবার সম্ভাবনা অল্প। ইব্রাহিম চিন্তিত হল। মুর্শিদাবাদে যে জাল বিস্তার করেছিল তা ছিন্ন করে গুরগিন বেরিয়ে আসতে পেরেছে, এবার আরো কঠিন কৌশলে তাকে আবদ্ধ করতে হবে।

ইব্রাহিম সতর্কতার সঙ্গে চতুর্দিকের অবস্থা লক্ষ্য করতে লাগল।

এই সময় পিক্রুস মুঙ্গেরে এল।

কেল্লায় প্রবেশ করার অনুমতি সে সহজেই পেল। কারণ পিক্রুস নবাবের অন্তরঙ্গ ব্যক্তি। আবার গুরগিন খাঁর ভাই। তার গতিবিধি নিয়ন্ত্রিত করবার সাহস কারুর নেই। পিক্রুস প্রথমেই নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করল। ইংরেজদের প্রস্তুতি সম্পর্কে অনেক ভ্রান্তিকর সংবাদ পরিবেশন করল।

নবাব বললেন, তোমার এই সময় চলে আসা উচিত হয় নি। ওদের কাছাকাছি থাকলে নিয়মিত সংবাদ পাঠাতে পারতে।

সবিনয়ে পিক্রুস বললে, আমি নিজের কর্তব্য সম্পর্কে সতর্ক আছি

হজরত। বহুদিন ভাইকে দেখি নি। কয়েক দিনের জন্য চলে এলাম।

নবাবের কাছ থেকে বিদায় নিয়ে সে গুরগিনের প্রাসাদে গিয়ে উপস্থিত হল। ভাই-এর আগমন সংবাদ গুরগিনের জানা ছিল না। এই অভাবনীয় সাক্ষাতে বিলক্ষণ খুশী হল।

পিক্রস বললে, মোভা কোথায়? তাকে ডাক।

আহ্বান করার প্রয়োজন হল না। কথাবার্তার শব্দ শুনে সে নিজেই এসে উপস্থিত হল।

—দেখো তোমার জন্য কি নিয়ে এসেছি।

পিক্রস মণিবেগমের অলঙ্কারগুলি মোভার হাতে দিল।

সবিস্ময়ে গুরগিন বললে, অত্যন্ত মূল্যবান মনে হচ্ছে।

—মূল্যবান বই কি। ঢাকার ফৌজদার আমার বন্ধু। হঠাৎ একদিন এগুলি আমায় উপহার দিয়ে বললে, তোমার বিবির জন্য। আমার বিবি নেই। ভাবলাম তোমার বিবিকে এগুলি মানাবে ভাল। পরিয়ে দাও গ্রেগারী, দেখি একবার।

গুরগিন অলঙ্কারগুলি পরিয়ে দিল মোভাকে।

অনেক কথা হল দুই ভাই-এর মধ্যে এরপর।

কথা প্রসঙ্গে পিক্রস বললে, নিজের ভবিষ্যৎ সম্পর্কে কিছু চিন্তা করেছো? সহাস্যে গুরগিন বললে, আমার ভবিষ্যৎ কি তোমার অন্ধকার বলে মনে হচ্ছে! তোমার দোকানে গজ মেপে কাপড় বিক্রী করতাম, সেই আমি এখন নবাবের প্রধান সেনাপতি। বিনা পরিশ্রমেই ভাগ্য আমাকে কোথা থেকে কোথায় নিয়ে এসেছে দেখো।

—বিনা আয়াসে যা লাভ করা যায় অধিকাংশ ক্ষেত্রে তা দীর্ঘস্থায়ী হয় না। আজ তুমি নবাব বাহিনীর উচ্চপদে আছো, আগামীকাল তোমার ভাগ্যের চাকা ঘুরে যেতে পারে। এখনই নিজের ভবিষ্যতের ব্যবস্থা না করে রাখলে তখন অনুশোচনার সীমা থাকবে না।

—কি বলতে চাইছো?

—এই দুনিয়ায় কেউ অমর নয়।

—জানি। আমার ভবিষ্যতের সঙ্গে এই কথার সম্পর্ক কি?

—গভীর সম্পর্ক আছে। নবাব যদি মারা যান—

—মারা যাবেন!

—কিম্বা ভাগ্য বিপর্যয় ঘটে। তুমি তখন কি করবে?

গুরগিন পিক্রুসের মুখের দিকে তাকিয়ে বললে, সে রকম কোন সম্ভাবনা তুমি দেখতে পাচ্ছো কি?

—সম্ভাবনা নয় নিশ্চিত। তোমাকে বলছি গোপনে, নবাব ইংরেজদের কোন ক্রমেই ঠেকিয়ে রাখতে পারবেন না। তাদের প্রস্তুতি আমি দেখেছি স্বচক্ষে।

গুরগিন আরক্তমুখে বললে, এই আলোচনা আমাদের বন্ধ করতে হবে। আমি তোমাকে এ নিশ্চয়তা দিতে পারি ইংরেজদের উপযুক্ত শিক্ষা দেব। বুঝতে কষ্ট হচ্ছে না। তুমি আমার মনকে নরম করবার চেষ্টা করছো। সুবে বাংলার নরম মাটিতে অসংখ্য বিশ্বাসঘাতক জন্ম নিয়েছে। তাদের কার্যকলাপে এই সোনার দেশ নষ্ট হয়ে গেছে। আমরা বিদেশী। আমাদের অন্তত উচিত বিশ্বস্ততার মূল্য দেওয়া।

পিক্রুস ও প্রসঙ্গে আর কিছু বললে না।

একদিনে বেশী চাপ দেওয়া ভাল নয়।

কাটোয়ার যুদ্ধে ইংরেজরা জয়লাভ করলেও তাদের প্রচুর ক্ষয়ক্ষতি হয়েছিল। মুর্শিদাবাদ অধিকার করবার পর ক্ষয়ক্ষতি অনেকাংশে পূরণ হয়ে গেল। আহত ব্যক্তিদের চিকিৎসার জন্য অবিলম্বে সেখানে চিকিৎসালয় স্থাপিত হল। ক্যাপটেন ক্যাম্বেলকে নির্দেশ দেওয়া হল সৈন্য সংগ্রহ করবার জন্য। অল্প চেষ্টাতেই প্রচুর সৈন্য

সংগ্রহ করলেন ক্যাম্বেল। তাদের শিক্ষাকার্যও সমাপ্ত হল অল্প'দনের মধ্যে।

নবাব সেনা কাটোয়ার রণক্ষেত্র ত্যাগ করবার পর গিরিয়ার নিকট সমবেত হয়েছিল। সমরু, মার্কার ও আসাদ্দৌলা সতর্কতার সঙ্গে চতুর্দিক লক্ষ্য করছিল। তাদের অজানা নয়, ইংরেজরা প্রস্তুত হয়ে নিয়েই আবার ধাবিত হবে। মুঙ্গের থেকে নবাব সংবাদ পাঠিয়েছেন, যে কোন উপায়ে কাটোয়ার পরাজয়ের প্রতিশোধ যেন গিরিয়া নেওয়া হয়।

মুর্শিদাবাদ থেকে সূতী পর্যন্ত বহু পুরাতন একটি পথ ছিল। গিরিয়ার নিকট এই পথকে দ্বিখণ্ডিত করে বাঁশলী নালা ভাগীরথীতে গিয়ে মিলিত হয়েছিল। তারই কাছাকাছি ছাউনি পড়েছিল নবাবী সেনার। অপেক্ষা খুব বেশীদিন করতে হল না। ইংরেজরা বাঁশলী নালা অতিক্রম করছে লক্ষ্য করে তাদের গতিরোধ করবার জন্য সম্মুখীন হতে হল।

প্রথম দিন যুদ্ধ হল না।

দুপক্ষই প্রতিপক্ষকে দূর থেকে লক্ষ্য করল। স্থান নির্বাচনের পালা চলল। যুদ্ধ আরম্ভ হল পরের দিন। ইংরেজদের কামান গর্জনের উত্তরে নবাব বাহিনীর কামানও গর্জে উঠল। প্রথমে কিছুক্ষণ দূর থেকে কামানের গোলা বিনিময় হবার পর দুপক্ষের মধ্যেকার ব্যবধান কমে আসতে লাগল।

আরম্ভ হল প্রকৃত যুদ্ধ।

আসাদ্দৌলার অধীনস্থ বদরুদ্দীন নিজের অশ্বারোহি সৈন্যদের নিয়ে বিপক্ষদলকে ব্যতিব্যস্ত করে তুলল। ক্যাপটেন স্টিবার্ড যে বূ্যহ রচনা করেছিলেন তা ছিন্ন ভিন্ন করে দিয়ে বদরুদ্দীন অগ্রসর হল। অসংখ্য সাদা মানুষের লাশ রক্ত গিরিয়ার মাটি কর্দমাক্ত করে তুলল। এই সময় মীরনাসির প্রচণ্ড বিক্রমে ইংরেজদের আরেক অংশ আক্রমণ

করেছে। কাটোয়ার যুদ্ধে জয়ী লেফট্‌নান্ট গ্লেন নিজের জীবন রক্ষা করতে পারলেন না। প্রাণরক্ষার জন্য ইংরেজরা বাঁশলী নালায় ঝাঁপ দিয়ে পড়তে লাগল।

ইংরেজদের পরাজয় অবশ্যম্ভাবি হয়ে উঠল।

এই সময় ত্রাণকর্তারূপে যুদ্ধক্ষেত্রে উদয় হলেন মেজর য়্যাডমস। বদরুদ্দীনও মীরনাসিরের রণকৌশল দেখে তিনি হতবুদ্ধি হয়ে গেলেন। তিনি লক্ষ্য করলেন নবাবী সৈন্য তিনস্তরে বিভক্ত হয়ে যুদ্ধ চালিয়ে যাচ্ছে। প্রথম সারিতে বদরুদ্দীন, মীরনাসির ও সের আলী। মধ্যভাগে আসাদ্দৌলা এবং তার পশ্চাতে মার্কার ও সমরু।

অসম্ভব পরিশ্রম করে য়্যাডমস নিজের সৈন্যদের উৎসাহিত করতে লাগলেন। সমুদ্র পার হয়ে এই দেশে পা দিয়ে ক্লাইভের যুদ্ধের অভিজ্ঞতা প্রথম হয় দক্ষিণ ভারতে। মেজর টমাস অ্যাডমসও দক্ষিণ ভারতেই প্রথম যুদ্ধের অভিজ্ঞতা লাভ করেছিলেন। এমন কি দুজনের স্বভাবের পার্থক্যও আকাশ-পাতালের ছিল না। অবশ্য তিনি ক্লাইভের মতো উদ্ধত স্বভাবের ছিলেন না।

এই বিশেষ গুণটির জন্য তাঁর অধীনস্থ সেনা যে কোন আদেশ পালন করতে জীবন পর্যন্ত দিতে প্রস্তুত ছিল। অ্যাডমসের দৃঢ়তা ইংরেজ মহলে এক বিশেষ দৃষ্টান্তের বিষয় ছিল। এমন বহুবার হয়েছে অল্প সংখ্যক সেনা নিয়ে প্রবল প্রতিপক্ষকে তিনি পর্যুদস্ত করেছেন শুধু তাঁর অসীম দৃঢ়তার জন্যই।

অ্যাডমসের বুদ্ধিও দৃঢ়তা নবাব বাহিনীকে শেষ রক্ষা করতে দিল না। চরম জয়লাভ যেখানে সুনিশ্চিত ছিল—চরম পরাজয় ঘটল সেখানে। মীরকাশিমের সেনা ইংরেজ অপেক্ষা অনেক বেশী ছিল। বদরুদ্দীন ও মীরনাসিরের মতো বীর দলপতিও ছিল—ছিল না শুধু সংযম, ছিল না শৃঙ্খলা। পরাজয়ের এই হল মূল কারণ সন্দেহ নেই।

এই যুদ্ধে জয়লাভ করে ইংরেজদের নানা দিক থেকে প্রচুর লাভ হল।

নবাবের স্থায়ী সুরক্ষিত গড়বন্দী অঞ্চলটি তাদের হস্তগত হল। রসদ, গোলা বারুদ ও অন্যান্য সরঞ্জাম অপর্যাপ্ত সংগ্রহ করল তারা। তাদের শৌর্য-বীর্যের কাহিনী চতুর্দিকে ছড়িয়ে পড়ল। সাধারণ মানুষের মনে এই ধারণাই বদ্ধমূল হতে লাগল ইংরেজদের ঠেকিয়ে রাখা অদূর ভবিষ্যতে কারুর পক্ষেই সম্ভব হবে না। অপর দিকে, মীরকাশিম গিরিয়ার যুদ্ধে শুধু শোচনীয় ভাবে পরাজিত হলেন না, বাংলার মাটির শেষ অধিকারটুকুও হারালেন।

মনের মধ্যে প্রবল আলোড়ন থাকলেও, অত্যন্ত শান্ত মুখেই পরাজয়ের সংবাদ শুনলেন মীরকাশিম। শুধু শুনলেন। কোন প্রশ্ন করলেন না, করলেন না কোন মন্তব্য। সমস্ত দরবার গৃহ তখন নিস্তব্ধ।

বিষণ্ণ।

মীরকাশিম তখ্ত ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে বিশাল দরবারের চতুর্দিকে দৃষ্টি বুলিয়ে নিলেন। অন্য কোন বিষয়েও আর কোন কথা বললেন না। ধীর পদক্ষেপে অসংখ্য দৃষ্টির মধ্যে দিয়ে দরবার ত্যাগ করলেন।

প্রাসাদে প্রবেশ করে নবাব চলে এলেন সেই অলিন্দে যেখান থেকে গঙ্গাকে পরিষ্কার ভাবে দেখা যায়। এখানে দাঁড়িয়েই তিনি পরপারের গ্রামগুলিকে বন্যার প্রবল তোড়ে ভেসে যেতে দেখলেন। তিনি দেখেছেন আর দীর্ঘ নিশ্বাস ফেলেছেন। এখনও গঙ্গার দিকে তাকিয়ে দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন।

এখন দীর্ঘ নিশ্বাস ফেললেন, দুর্ভাগ্যের অশান্ত স্রোত তাঁকে কোথায় ভাসিয়ে নিয়ে যাচ্ছে চিন্তা করে। কিন্তু কেন এমন হচ্ছে? নিষ্ঠার অভাব নেই তাঁর। সৈন্য বাহিনীকে প্রস্তুতির পথে এগিয়ে নিয়ে যেতে অজস্র অর্থ ব্যয় করেছেন। সুবে বাংলার তখ্তকে নিয়ে যারা ছিনিমিনি খেলেছে তাদের নজর বন্দী করে রেখেছেন। যাতে নতুন কোন খেলা তারা খেলতে না পারে—সমস্ত কিছুই তাঁর অনুকূলে তবু কেন বারংবার পরাজিত হচ্ছেন?

কেন?

গিরিয়ায় ইংরেজরা যে তাঁকে পরাজিত করবে একথা স্বপ্নেও চিন্তা করেন নি মীরকাশিম। হিসেবে কি কোথাও ভুল হয়ে যাচ্ছে? কোথায়? না, কোন বিশেষ অপরাধের জন্য ঈশ্বর তাঁকে শাস্তি দিচ্ছেন। মনের গহনে আকুলতা অনুভব করলেন মীরকাশিম।

ইচ্ছা হল, ঈশ্বরের উদেশ্যে চীৎকার করে প্রশ্ন করেন, ইয়া পারবার দিগার, বলে দাও, বলে দাও আমার অপরাধ কি? কোন্ অপরাধের শাস্তি আমি এই ভাবে পদে পদে ভোগ করছি।

পরমুহূর্তে মীরকাশিম নিজেকে সংযত করলেন। ঈশ্বরকে কোন প্রশ্ন করবার অধিকার কি তাঁর আছে? নেই। কেনই বা তিনি প্রশ্ন করবেন। বরং ভাগ্যকে ক্রমান্বয়ে যাচাই করে যাওয়াই হল একজন পুরুষের প্রকৃত কাজ। গিরিয়ার পতন হয়েছে হোক, উদয়নালা আছে।

উদয়নালা।

অপর্যাপ্ত গোলা বারুদ, রসদ ও শক্তি সঞ্চয় করে রেখেছেন। ওখানকার দুর্ভেদ্য দুর্গকে অধিকার করা ইংরেজদের পক্ষে সম্ভব হবে না। বরং ইবলিশের বাচ্চাদের নবাব সেখানেই সম্পূর্ণ পরাজিত করবেন।

এই সময় তাঁর চিন্তা বাধা প্রাপ্ত হল।

ফতেমা এলেন অলিন্দে। তাঁর মুখে উদ্‌বিগ্নতা।

নিকটবর্তী হয়ে ব্যগ্র কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, হজরত, আপনি এই সময় এখানে?

নবাবের ওষ্ঠ প্লাবিত হল ম্লান হাসিতে।

—দরবারে মন বসাতে পারলাম না।

—আপনি অসুস্থ হজরত?

—না। আমি সম্পূর্ণ সুস্থ বেগম।

মীরকাশিম পত্নীর স্কন্ধে হাত রেখে বললেন, আমার জন্য অহরহ তুমি প্রচণ্ড চিন্তার দোলায় দুলছো তা আমি জানি বেগম। চিন্তা মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দাও। শুধু একটা কথা মনে রেখো—

—কোন্ কথা।

—যা ঘটছে তা আল্লাহ্‌র ইচ্ছাতেই ঘটেছে। এই প্রবাহকে রোধ করবার সাধ্য আমার তোমার বা দুনিয়ার কোন মানুষের নেই।

ফতেমা কিছু বললেন না। নির্নিমেষ দৃষ্টিতে তাকিয়ে রইলেন স্বামীর মুখের দিকে।

—কি দেখছো?

—আপনাকে দেখছি হজরত।

মীরকাশিম আবার হাসলেন।

—আমাকে। আমাকে কি এত দেখছো বেগম?

ফতেমা মুখ নত করলেন।

—আমি আপনার মুখের উপর সেই পরিচিত ভাব আর খুঁজে পাই না হজরত। খোঁজবার অবিরাম চেষ্টা করে চলেছি।

—তুমি বলতে চাইছো কবি কাশিম আলী হারিয়ে গেছে নবাব মীরকাশিমের মধ্যে। ভুল, তোমার ধারণা ভুল বেগম। রাজনৈতিক ঝড় মীরকাশিমকে বিপর্যস্ত করে তুলেছে সন্দেহ নেই, তবু কবিত্বের স্রোত ফল্গুধারার মতো তার মনের মধ্যে বয়ে চলেছে।

—আমার এক এক সময় ভয় হয়।

—কিসের ভয়?

—ভয়—মন থেকে মুছে ফেলতে পারি না আমি মীরজাফরের কন্যা। আমার জন্মদাতা আপনার প্রবল প্রতিপক্ষ। এমন দিন হয়তো আসবে সারতাজ যেদিন—মীরকাশিম পত্নীকে আকর্ষণ করলেন।

—আমিও জানি, হয়তো এমন দিন আসবে যেদিন তোমার জন্মদাতা আমার জীবনের শেষ আশার আলোটুকুও ছিনিয়ে নেবেন। তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পারো বেগম, সেদিন নিজেকে ধিক্কার হয়তো দেব—কিন্তু তোমার সম্পর্কে বিরূপ মনোভাব পোষণ করার কোন প্রশ্নই উঠবে না। ও প্রসঙ্গ এখন থাক।

দীর্ঘ নিশ্বাস ত্যাগ করে ফতেমা বললেন, আমি সমস্ত বুঝি। তবু মনকে প্রবোধ দিতে পারি না। আমার এই অক্ষমতাই সময় সময় আপনার মনে বিষাদ এনে দেয় হজরত। আল্লাহ্‌র কাছে তাই মৃত্যু কামনা করি।

পত্নীর কাছ থেকে সরে এলেন মীরকাশিম। গঙ্গার গেরুয়া স্রোতের দিকে তাকিয়ে বললেন, আল্লাহ্‌র কাছে যখনই কামনাই করছো, এমন কিছু কামনা কর যা সহজ লভ্য নয়। মৃত্যু তো অনিবার্য বাস্তব। আজ হোক কাল হোক একদিন না একদিন তার কোলে ঢলে পড়তেই হবে। মৃত্যু নয়, তাঁর কাছে জীবন কামনা কর, উপযুক্ত পরিবেশে বেঁচে থাকার মতো জীবন। থাক ওকথা। জীবন মৃত্যুর সন্ধিক্ষণে যখন সকলেই অহরহ দুলছি তখন ও সম্পর্কে আলোচনা বাড়িয়ে লাভ নেই। নবাব মীরকাশিমের এই মুহূর্তে অসংখ্য চিন্তা—গিরিয়ার কি হল, উদয়নালায় কি হবে? তবু সে চিন্তার আবরণকে ছিন্নভিন্ন করে কবি কাশিম আলীতে রূপান্তরিত হতে চায়। শুনবে বেগম, শুনবে আমার হৃদয়া বেগের কয়েক ছত্র?

—শুনব সারতাজ।

মীরকাশিম পদচারণা করলেন নিঃশব্দে কয়েকবার।

তাঁর প্রশস্ত চিন্তার কুঞ্চনে অসমতল ললাট সরল হয়ে এল। শিশুর সারল্যে ছেয়ে গেল সমস্ত মুখমণ্ডল। কুটিল রাজনৈতিক আবর্ত থেকে নিজেকে ক্ষণিকের জন্য সরিয়ে আনতে পেরেও তিনি যেন অপার আনন্দ লাভ করছেন।

এক সময় পদচারণা বন্ধ করে গম্ভীর কণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলেন—

কাটকে আসিকনে
খুন সে লাতপাত কলেজা
রাখদিয়া
শুনা যো দিল বালানে
দারদে সে
আহ আহ কিয়া।
খাত'মে ইসকদের শায়কড়োঁ
জিগার কাট রাখখা হায়
শুনা যো মায়ফিলনে
বেকদর বাহ বাহ কিয়া।

বলতে বলতে থামলেন।

—কি হল সারতাজ? ফতেমার ব্যগ্র জিজ্ঞাসা।

—কি বলতে চেয়েছিলাম। কি বলে ফেললাম। এত হালকা রসের কোন কিছু পূর্বে বোধহয় তোমাকে শোনাই নি। ভাল লাগছে না। ভেবেছিলাম ছন্দের দোলায় আমরা দুজন বহুক্ষণ দুলবো। কিন্তু না—তাল কেটে গেল। এখন আর নয়। চল বেগম, বিশ্রামকক্ষে যাই।

অত্যন্ত সতর্কতার মধ্যে দিয়ে পিক্রুসের দিন অতিবাহিত হচ্ছে মুঙ্গেরে। ইচ্ছে থাকলেও ব্যস্ততার সঙ্গে কোন পরিকল্পনাকে রূপ দেবার চেষ্টা করছে না সে। সে জানে মীরকাশিমের সহস্র চক্ষুর সতর্ক দৃষ্টি চতুর্দিকে প্রসারিত। হিসেবে একটু ভুল হলে, নিষ্ঠুর মৃত্যুর কঠিন আলিঙ্গনে বাঁধা পড়তে হবে।

মৃত্যু চায় না পিক্রুস।

এইরূপ রস, গন্ধময় দুনিয়াকে দীর্ঘদিন ধরে উপভোগ করতে চায়। তাই সতর্কতার চরম বাঁধনে নিজেকে বেঁধেছে। গত রাত্রে শ্রেষ্ঠীবর্গ

অনুচর পাঠিয়ে ছিলেন তার কাছে। প্রয়োজনীয় আলোচনা আছে একথাও জানান হয়েছিল। পিক্রুস যায় নি। এমনকি সেই অনুচরের মারফত কোন সংবাদও পাঠায় নি। বরং এমন নির্লিপ্ত ভাব দেখিয়েছে যাতে মনে হয় এই আহ্বানের কোন সার্থকতাই সে বুঝতে পারছে না। পিক্রুস মাছ ধরতে চায়, কিন্তু জলে হাত দিতে নারাজ।

ইতিমধ্যে সে কয়েকবার নবাবের সঙ্গে সাক্ষাৎ করেছে। সাদরে তাকে গ্রহণ করেছেন মীরকাশিম। সাদরে তাকে গ্রহণ না কবার কোন কারণও নেই। তাঁর গুপ্তচরবৃন্দ পিক্রুসের বিরুদ্ধে কোন গুরুতর সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে নি। বরং সে নবাবের জন্যই প্রাণপাত করছে এই ধরণের সংবাদই পাওয়া গেছে।

নবাব তাকে মুর্শিদাবাদও কলকাতা সম্পর্কে নানা প্রশ্ন করেছেন। কখনও হাসি মুখে, কখনও গম্ভীর মুখে তৎপরতার সঙ্গে উত্তর দিয়েছে পিক্রুস। বলা বাহুল্য উত্তরগুলির সঙ্গে সত্যতার সম্পর্ক ছিল না। ইংরেজদের গতিবিধিও প্রস্তুতি সম্পর্কে মিথ্যার জাল বুনে গেল পিক্রুস।

কিছু দামী উপহার তাকে দিলেন নবাব।

দুচার দিন দুর্গে থেকে যেতে অনুরোধ করলেন।

দুর্গের মধ্যে পা দিয়ে একবার যা সাক্ষাৎ হয়েছিল পিক্রুসের সঙ্গে গুরগিনের। মণিবেগমের গহনাগুলি মোভাকে উপহার দিয়ে, ভাই-এর মনে কিছু আশঙ্কা জাগিয়ে চলে এসেছিল। আর যায় নি।

ইচ্ছে করে যে যায় নি তা নয়। প্রতিদিন গুরগিনের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য উদগ্রীব হয়ে উঠেছে কিন্তু গুরগিনের দৃঢ় মনোভাবের কথা মনে উদয় হওয়ায় ইচ্ছে দমন করেছে।

এই ভাবে আর কতদিন চলতে পারে সেই কথাই পিক্রুস চিন্তা করছিল গত রাত্রে। গুরগিনের এই দৃঢ়তা কি দ্রবীভূত হবে না? দুনিয়ায় অর্থ প্রতি মুহূর্তে কত অনর্থ ঘটাচ্ছে। দুর্লভ চরিত্রে কত মানুষ অর্থের

লালসায় উন্মত্ত হয়ে নিজের চরিত্রকে দৃঢ়তা জলাঞ্জলি দিয়ে লোভের সাগরে তলিয়ে যাচ্ছে।

আর গ্রেগারী—?

নবাবের প্রিয় পাত্র গুরগিন খাঁ—?

তার মনের গঠন কি আরো বলিষ্ঠ?

পীর পাহাড়ে অবস্থিত গুরগিনের সুরম্য অট্টালিকায় দ্বিতীয়বার গিয়ে উপস্থিত হল পিক্রুস। লোভের আগুনকে দাউ দাউ করে প্রজ্বলিত করে দিতে এবার। মোভা সাদরে স্বাগত জানাল পিক্রুসকে।

গুরগিনের মুখে অপ্রসন্ন ভাব।

আসন গ্রহণ করবার পর পিক্রুস বললে ভাই-এর মুখের দিকে তাকিয়ে, তোমাকে দেখে মনে হচ্ছে তুমি যেন সুস্থ নেই?

গুরগিন অস্বাভাবিক গম্ভীর কণ্ঠে বললে, সম্পূর্ণ সুস্থ আছি। তবে তোমার সঙ্গে সাক্ষাৎ হবার পর থেকেই অত্যন্ত উত্ত্যক্ত বোধ করছি।

—আমার অপরাধ?

—প্রশ্ন নিস্প্রয়োজন।

—তোমার কথার অর্থ বুঝতে না পারলে প্রশ্নের প্রয়োজনীয়তা আছে বই কি। গুরগিন নিজের তীক্ষ্ণ দৃষ্টি পিক্রুসের মুখের উপর স্থাপন করে বললে, অবুঝকে বোঝাবার আপ্রাণ চেষ্টা করতে পারি, তুমি বুঝবে না জানি। কবে, কত কাল আগে তোমার মনে সূক্ষ্ম পাপ প্রবেশ করেছিল জানি না। সেই পাপ ক্রমে, ক্রমে মহীরুহ হয়ে উঠেছে। আমার কথা শোন, ওই মহীরুহকে মূল থেকে ছেদন কর—সুখ পাবে, শান্তি পাবে।

—অর্থ পাবে না।

বিদ্রূপের হাসি পিক্রুসের মুখের কানায় কানায়।

—তোমাকে যোদ্ধা বলেই জানতাম। উপদেশ দিতে এত পটু হয়ে উঠেছো জানতাম না।

—আমি সেনানায়ক, কঠোরতার সঙ্গে সমস্ত নিয়মতান্ত্রীক কাজ করে যাওয়াই হল আমার ধর্ম।

—না, তোমার ধর্ম তা নয়। তুমি বিদেশী। এদেশে এসেছো অর্থ উপার্জ্জন করতে। ন্যায়পরায়ণ ও নিয়মতন্ত্রীক হওয়া তোমার শোভা পায় না। যে কোন উপায়ে অর্থ সংগ্রহ করাই তোমার ধর্ম হওয়া উচিত। আমার কথা চিন্তা করে দেখো, কাপড়ের ব্যবসা করতে সুদূর আর্মেনিয়া থেকে এখানে এসেছিলাম। বুদ্ধির বলে আজ আমি অজস্র অর্থের অধিকারী। আর দশজনের মতো শুধু কাপড়ের ব্যবসায় লিপ্ত থাকলে শুধু গজ মেপেই কি জীবন কেটে যেত না। নির্বুদ্ধিতার পরিচয় দিও না। বুদ্ধিকে তীক্ষ্ণ করে তোল।

—কূট বুদ্ধিকে ?

—হ্যাঁ, কূট বুদ্ধিকে। কূট বুদ্ধিতে কি হয় আর কি হয় না তা তুমি দেখেছো। দেখেছো, এই কূট বুদ্ধিকে মূলধন করে একটি রাজ্যের পট পর্যন্ত পরিবর্ত্তন আমি করতে পেরেছি। আবার—

—আমাকে বিভ্রান্ত করবার চেষ্টা ক'র না।

মিনতি মিশ্রিত কণ্ঠে গুরগিন বললে, তুমি আমার জ্যেষ্ঠ। আমাকে বিপথে চালিত করা তোমার উচিত নয়। পূর্বেও অনুরোধ করেছি আবার অনুরোধ করছি, তুমি মুঙ্গের ত্যাগ কর। আমার কর্ত্তব্যকর্ম আমাকে শান্তিতে করতে দাও।

—দীর্ঘদিন ধরে তুমি যদি তোমার কর্ত্তব্যকর্ম করে যেতে পারতে তাহলে হয়তো আমাকে এই ভাবে আসতে হত না। কিন্তু সে অবকাশ তুমি পাচ্ছ না গ্রেগারী। কাশিম আলীর বেলা শেষ হতে বিলম্ব নেই। গিরিয়া গেছে, উদয়নালা যাবে তারপর মুঙ্গের—। এখানকার প্রতিটি পথ রক্তে রাঙা হয়ে উঠবে। যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু বরণ করতে হবে নবাবকে। তুমিও রক্ষা পাবে না, রক্ত পিচ্ছিল পথের উপর তোমার মৃতদেহ পড়ে থাকবে। নির্বুদ্ধিতার চরম ফল ভোগ করতে হবে তোমাকে।

পিক্রস এক নিশ্বাসে কথাগুলো বলে থামল।

কনিষ্ঠের মুখের ভাব লক্ষ্য করে আবার আরম্ভ করল, জীবন কার না কাম্য। আমি জানি তুমি সুখে স্বচ্ছন্দে দীর্ঘদিন এই দুনিয়ায় থাকতে চাও। তবু আগুন নিয়ে খেলা করার পরিণাম বুঝতে পারছো না আমি তোমার জ্যেষ্ঠ, তোমাকে নিবৃত্ত করা আমার কর্তব্য।

—না। আমার সম্পর্কে তোমার কোন দায়দায়িত্ব নেই। আর্মেনিয়া থেকে হিন্দুস্থানে আসবার পর তুমি আমাকে সাহায্য করেছিলে, আমি সে জন্য কৃতজ্ঞ। আর নয়—আর কোন সহযোগিতা আমার চায় না। তুমি আজই মুঙ্গের ত্যাগ কর।

—তুমি আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়েছো জানতে পারলেই আমি মুঙ্গের ত্যাগ করব।

—তোমার সাহস দেখে আমি অবাক হয়ে যাচ্ছি। সুবে বাংলা বিহার উড়িষ্যার প্রধান সেনাপতিকে বিশ্বাসঘাতকে পরিণত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছো। অন্য কেউ এই প্রসঙ্গে একটি কথা উচ্চারণ করলে চিরদিনের জন্য আমি তার কণ্ঠরোধ করে দিতাম। সাবধান। এই প্রসঙ্গ নিয়ে আলোচনা করতে তুমি যদি ক্ষান্ত না হও রক্তের সম্পর্কে আমি আর মান্য করব না। বন্দী করে তোমায় নিক্ষেপ করা হবে কারাগারে। তারপর—এই অপরাধে, মীরকাশিমের বিচারে ক্ষমা নেই জানবে। যন্ত্রণাদায়ক শাস্তি মৃত্যুর দিকে তোমায় এগিয়ে নিয়ে যাবে তিলে তিলে। নিজের আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়িয়ে অট্টহাস্যে ভেঙে পড়ল পিক্রস। তার গোলাকার মুখ রক্তবর্ণ হয়ে উঠল। তার বিশাল দেহ দ্বিগুণ ফুলে উঠল।

ভ্রূ কুঞ্চিত করে বিরক্তি মিশ্রিত কণ্ঠে গুরগিন বললে, তোমার ব্যবহারে ক্রমেই আমি বিরক্ত বোধ করছি। যা বললাম বাস্তবে তার একটি কথারও অন্যথা হবে না জানবে।

নিজেকে সংবরণ করেছে পিক্রস। শান্ত কণ্ঠে বললে, তোমার কথা

অবিশ্বাস করবার সাধ্য আমার কোথায়? নবাবের প্রিয় পাত্র তুমি, বাংলা বিহার উড়িষ্যার প্রধান সেনাপতি—তোমার একটি ইঙ্গিতে যন্ত্রণাদায়ক মৃত্যু আমাকে আলিঙ্গন করবে আমি জানি। প্রকৃত পক্ষে সমস্ত জেনেই আমি তোমার কাছে এসেছি। তবে আমাকে নবাবের সম্মুখে উপস্থিত করবার পূর্বে চিন্তা করে নাও নিজের ভবিষ্যৎ চিরদিনের জন্য অন্ধকারের জঠরে নিক্ষেপ করতে চাও কিনা।

গুরগিনকে কিছু বলতে না দিয়ে নির্বিকার কণ্ঠে পিত্রুস বলে চলল, বিচারের প্রহসনের পর নবাব আমাকে শাস্তি দেবেন। সে শাস্তি যন্ত্রণাদায়ক হবে সন্দেহ নেই। তবে শাস্তি মাথা পেতে নেবার পর নবাবকে আমি কিছু নিবেদন করব। আমার বক্তব্যে তুমি গুরুতর সঙ্কটের সম্মুখীন হবে, সে কথা এখনই জানিয়ে রাখা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করছি।

—গুরুতর সঙ্কট! কি বলতে চাও?

—অতি সরল ভাষায় আমি নবাবকে জানাব, আমাকে যে শাস্তি তিনি দিলেন, এই শাস্তি তাঁর প্রিয় গুরগিন খাঁকেও দেওয়া হোক। কারণ সে ইয়োর এক্সেলেন্সির সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করে মীরজাফর ও ইংরেজদের সহযোগী হয়ে উঠেছে।

—তোমার মিথ্যা উক্তি নবাব বিশ্বাস করবেন না।

—প্রমাণ পাবার পর বিশ্বাস তাঁকে করতেই হবে।

—কোন প্রমাণ নেই।

শ্লেষের হাসি হেসে পিত্রুস বললে, খোজা পিত্রুস অনর্থক দম্ভ করে না গ্রেগরী। প্রমাণ আছে। আমার কাছ থেকে উপহার পাওয়া যে অলঙ্কারে স্ত্রী মোভাস্কায়াকে সাজিয়েছো, সেই অলঙ্কারগুলিই প্রমাণ। মণিবেগমের কাছ থেকে ওগুলি আমি এনেছি। অলঙ্কারগুলি নবাবের পরিচিত। সিরাজদ্দৌলা যখন বন্দী হন। অসহায়া লুৎফার কাছ থেকে ছিনিয়ে নিয়ে ছিলেন এগুলি সেদিনের কাশিম আলী। অজস্র

সন্দেহের দোলায় নবাবের মন এখন দুলছে। তাঁর পরিচিত অলঙ্কারগুলি তোমার অধিকারে আছে জানবার পর তীক্ষ্ণধার অস্ত্র খণ্ড খণ্ড করে দেবে তোমার ভবিষ্যৎ বলা বাহুল্য অনুমান করতে পারছো। কুটিল পরিস্থিতির মধ্যে যাবার কি প্রয়োজন। আমার প্রস্তাবে সম্মত হয়ে যাও। পরম নিশ্চিন্ততায় নিজের জীবনকে উপভোগ করবার জন্য সচেষ্ট হও।

গুরগিন স্তম্ভিত হয়ে গেল পিক্রুসের কথা শুনে।

সে কল্পনাও করতে পারে নি। মোভাকে অলঙ্কার-উপহার দেওয়ার নেপথ্যে এত বড় চক্রান্ত আছে। সুবিধাবাদী, লোভী পিক্রুসকে সে চিনতো না। ও যে এত নীচ কুচক্রী তার অজ্ঞাত ছিল। স্বার্থের জন্য নিজের একমাত্র কনিষ্ঠকে হত্যা করতেও পশ্চাদ্‌পদ নয়।

কি বিচিত্র দুনিয়া!

বিশ্বাস করা কঠিন যে, জলের চেয়ে রক্ত গাঢ়।

গুরগিন উচ্চকণ্ঠে মোভাকে আহ্বান করল।

—মোভা—মোভা—

মোভা নিকটেই কোথাও ছিল। গুরগিনের আহ্বানে দ্রুত কক্ষে প্রবেশ করে জিজ্ঞাসু দৃষ্টিতে তাকাল। তার অঙ্গে মণিবেগমের অলঙ্কারগুলি ঝলমল করছে। তার সৌন্দর্য বর্ধিত হয়েছে সহস্র গুণ।

গুরগিন কিছু বলবার পূর্বেই পিক্রুস বললে, তোমার স্বামী উত্তেজিত হয়ে পড়েছে। নিরর্থক কতকগুলি কথা তোমায় বলবে। সেগুলি পরে শুনলেও চলতে পারে। তুমি এখন এখান থেকে যাও। আমি নিজের কথাগুলি শেষ করে নিতে চাই।

ইতস্তত করে মোভা কক্ষান্তরে গেল।

—অলঙ্কারগুলি আমায় ফিরিয়ে দিয়ে নিজের বিরুদ্ধে প্রমাণ লুপ্ত করতে চাইছিলে গ্রেগারী? তুমি আমাকে এত নির্বোধ মনে কর।

একটি প্রমাণকে মূলধন করে আমি কার্যক্ষেত্রে অবতীর্ণ হই নি। আরো আছে। সময় উপস্থিত হলে আমি তা প্রকাশ করব। এখন আমি বিদায় নিচ্ছি। আবার সাক্ষাৎ হবে। ইতিমধ্যে তুমি স্থির করে নাও বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ নিয়ে মৃত্যু বরণ করতে চাও না অজস্র আশরফির ঝনঝনানির মধ্যে জীবন উপভোগ করতে চাও।

পিত্রুস নিজের কথা শেষ করে, গুরগিনকে কিছু বলার অবকাশ না দিয়ে কক্ষ থেকে নিক্রান্ত হল। আর মুহ্যমান গুরগিন, চিন্তার অতলান্ত সাগরে ক্রমেই যেন তলিয়ে যেতে লাগল।

ইব্রাহিম নিশ্চিন্ত নেই। গুরগিনের প্রতিটি কাজের উপর তীক্ষ্ণ দৃষ্টি রেখেছে সে। যে কোন উপায়ে নিজের উচ্চ আশাকে পূর্ণ করবার চেষ্টা তাকে করতে হবে। সম্প্রতি আশার আলো দেখতে পাওয়া গেছে। নবাবের ধুরন্ধর গোয়েন্দারা যে সংবাদ সংগ্রহ করতে পারে নি সেই সব সংবাদ ইব্রাহিম সংগ্রহ করেছে। সংগ্রহ করা সংবাদকে মূলধন করেই গুরগিনকে করায়ত্ত করা যাবে।

সেই বিশেষ সংবাদটি হল, ইব্রাহিম জানতে পেরেছে পিত্রুস আর নবাবের পক্ষে নেই। মণিবেগম কর্তৃক চালিত হয়ে সে মুঙ্গেরে এসেছে। তার উদ্দেশ্য হল নবাবের বিরুদ্ধে গুরগিনকে উত্তেজিত করা। এই গুরুতর সংবাদ সংগ্রহ করেও ইব্রাহিম নিশ্চেষ্ট আছে।

সতর্কতার সঙ্গে লক্ষ্য করছে চতুর্দিক। সংগৃহীত সংবাদ এই মুহূর্তে নবাবকে জানাতে সে প্রস্তুত নয়। একথা নিশ্চিত যে নবাব প্রশ্ন করবেন, সংবাদটি অক্ষরে অক্ষরে সত্য তার প্রমাণ কি? প্রমাণ করা সম্ভব হবে না। তখন হিতে বিপরীত হওয়া অসম্ভব নয়।

কয়েকদিন থেকে ইব্রাহিম চিন্তার বেড়াজালের মধ্যে আছে। এখনও

অসংখ্য চিন্তা তাঁকে কুরে কুরে খেয়ে চলেছে। এই-সময় তারই গৃহে পিক্রসকে প্রবেশ করতে দেখে সে স্তম্ভিত হয়ে গেল।

পিক্রস।।।

তার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে এসেছে পিক্রস ?

কেন ? ব্যক্তিগত ভাবে পিক্রসের সঙ্গে তার আলাপ পরিচয় নেই। এমন কি মুঙ্গেরে আসার পূর্বে চাক্ষুস দেখে নি পর্যন্ত। দ্রুত চিন্তা করতে লাগল ইব্রাহিম। উদ্দেশ্য কি। কি চায় ওই কুৎসিত আর্মেনিয়ান তার কাছ থেকে ?

পিক্রস ইব্রাহিমের নিকটবর্তী হয়ে অভিবাদন করে বললে, আমার পরিচয় আপনার কাছে বোধহয় অজ্ঞাত নেই ?

—আপনি গুরগিন খাঁর জ্যেষ্ঠ সহোদর।

—আমার অনুমান মিথ্যা নয়। আপনি আমার পরিচয় জ্ঞাত আছেন।

—আপনার আগমনের উদ্দেশ্য জানতে পারি কি ?

—নিশ্চয় পারেন। কিছু গোপনীয় আলোচনা আছে।

—গোপনীয় আলোচনা।

হতবাক্ হয়ে যায় ইব্রাহিম।

—আমার সঙ্গে গোপনীয় আলোচনা ?

—ক্ষতি কি।

—লাভ ক্ষতির কথা থাক। যা বলতে চান পরিষ্কার করে বলুন।

—এই প্রকাশ্য স্থানে আমি কোন আলোচনা করতে চাইনা। গোপনীয় আলোচনা গোপনে হওয়াই ভাল।

ক্ষণেক ভ্রূ-কুঞ্চিত করে চিন্তিত থাকার পর ইব্রাহিম বললে, আসুন।

তাকে অনুসরণ করল পিক্রস।

গতকাল সে গুরগিনের গৃহ ত্যাগ করবার পর স্থির নিশ্চিত হয়েছিল, কনিষ্ঠ ভ্রাতার মনে বিশ্বাসঘাতকতার বীজ বপন করা যাবে না।

একই রক্ত দুজনের ধমনীতে প্রবাহিত হলেও গুরগিন অন্য ধাতুর মানুষ। অথচ এত অগ্রসর হয়ে পিছিয়ে পড়াও যায় না। পিছিয়ে পড়লে অর্থ প্রাপ্তিতে যে শুধু বিঘ্ন উপস্থিত হবে তা নয়। দুনিয়া থেকে বিদায়ও নিতে হবে।

মুঙ্গেরে যাত্রা করবার পূর্বে ওয়ারেন হেষ্টিংস পরিষ্কার জানিয়ে দিয়েছেন, অকৃতকার্য হলে বা বিশ্বাসঘাতকতা করলে দুনিয়ায় এমন কোন স্থান নেই যেখানে আত্মগোপন করে ইংরেজের গুলির হাত থেকে জীবন সে রক্ষা করতে পারবে। কৃতকার্য হলে মণিবেগম ছাড়াও কোম্পানি তাকে পুরস্কৃত করবে।

সুতরাং যে কোন উপায়ে পিক্রসকে কৃতকার্য হতেই হবে।

বিচিত্র সমাপতন বলা যায়। বহু চিন্তার পর ইব্রাহিম যেমন পিক্রসকে মূলধন করেই অগ্রসর হতে চেয়েছে—পিক্রসও ইব্রাহিমকে অবলম্বন করে এই বৈতরণী অতিক্রম করার মনস্থ করল। মীরকাশিম যখন মুর্শিদাবাদে ছিলেন, হুগলীর কাছাকাছি হওয়ার দরুন ঘন ঘন যাতায়াত ছিল তার সেখানে। সেই সময় গুরগিনের মুখেই সে শুনেছিল ইব্রাহিম কি ভাবে তাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করেছিল। অনুসন্ধান করে একথাও জানতে পেরেছিল গুরগিনকে এই ভাবে বিপদে ফেলার প্রকৃত উদেশ্য কি ? এখনও কি সেই ইচ্ছা ইব্রাহিমের মনে প্রভাব বিস্তার করে নেই ? হয়তো আছে। উচ্চপদ অধিকার করবার দুর্নিবার লোভ একবার মনের গহনে প্রবেশ করলে মুছে যাওয়া কঠিন।

লোভাতুর মনে ইন্ধন যোগাবে পিক্রস। কাজটি কিঞ্চিৎ কঠিন সন্দেহ নেই। বিপদের সম্ভাবনাও প্রবল। তবু সে এই পথেই অগ্রসর হবে। আবহমান বিপদকে সঙ্গের সাথী করে অগ্রসর হয়েছে। সৌভাগ্য বলতে হবে কোন অশুভ আঁচ তাকে স্পর্শ করে নি।

বিস্মিত ইব্রাহিম একটি নিভৃত কক্ষে পিক্রসকে সঙ্গে নিয়ে উপস্থিত

হল। পিক্রুস গুরগিনের সহোদর। সুতরাং তার শত্রু। শত্রু মিত্রের মতো গোপনীয় আলোচনা নিয়ে তার কাছে উপস্থিত হয়েছে বিস্ময়ের বিষয় বই কি।

ইব্রাহিমকে কোন প্রশ্নের অবতারণা করতে না দিয়ে পিক্রুস বললে, আমার ব্যবহারে আপনি কিঞ্চিৎ বিস্মিত হচ্ছেন সন্দেহ নেই। বিস্মিত হবার কথাই। আপনার স্থলে আমি থাকলে আমারও একই অবস্থা হত।

—আপনার বক্তব্য দ্রুত শেষ করলে আমি আনন্দিত হব। খুব বেশী সময় আপনাকে দেওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হচ্ছে না।

—সময় অত্যন্ত মূল্যবান বস্তু আমার অজানা নয়। আমার বক্তব্য ততোধিক মূল্যবান। আপনি কি এখনও অনুমান করতে পারছেন। আপনারও আমার উদেশ্য এক হতে পারে?

—উদেশ্য?

স্বাভাবিক কণ্ঠে পিক্রুস বললে, গুরগিনকে অপসারণ করার উদেশ্য।

ইব্রাহিম স্তম্ভিত হয়ে গেল।

তার দেহে রক্তের গতি অসম্ভব দ্রুত হয়ে উঠল। একি কথা শুনছে সে। অন্য কেউ একথা বললে গুরুত্ব আরোপ না করলেও চলত। কিন্তু অপরিচিত পিক্রুস তার সঙ্গে রহস্য করতে পারে না। বিশেষে গুরগিন তার সহোদর। আবার প্রশ্ন উঠতে পারে, কনিষ্ঠ সহোদরের বিরুদ্ধে সে চক্রান্ত করতে উদ্ধত কেন?

গুরুতর মনোমালিন্য ঘটেছে কি?

না, অন্য কোন উদেশ্য নিয়ে তাকে পরীক্ষা করবার জন্য এই বিষয়ের অবতারণা করছে? দৃঢ় চিত্ত, বহুদর্শী ইব্রাহিম নিজেকে অত্যন্ত অসহায় বোধ করতে লাগল।

পিক্রুস ইব্রাহিমের মুখের দিকে তাকিয়ে ছিল। তার মনের মধ্যে অজস্র চিন্তা ওঠা নামা করছে অনুমান করে নিয়ে বললে, আপনি

নিশ্চিন্ত থাকতে পারেন, রহস্য আপনার সঙ্গে করি নি। নিজের প্রকৃত উদ্দেশ্য বক্তব্য করেছি। আমি জানি মুর্শিদাবাদে অবস্থান কালে গুরগিনকে হত্যা করবার এক চমৎকার পরিকল্পনা গ্রহণ করেছিলেন। আপনার দুর্ভাগ্য, পরিকল্পনা সফল হয় নি। আমার সহযোগিতা গ্রহণ করলে এবার সাফল্য অনিবার্য।

—আপনার—গুরগিন যাঁর সঙ্গে আপনার রক্তের সম্পর্ক।

—স্বার্থের যেখানে হানাহানি রক্তের সম্পর্ক সেখানে প্রাতবন্ধক সৃষ্টি করতে পারে না। এরপর চতুরে চতুরে আলোচনা আরম্ভ হল।

এদিকে জগৎশেঠের কাছে সংবাদ এসে পৌঁছেছে। সংবাদ এসেছে ইংরেজশিবির থেকে। শ্রেষ্ঠীদের সঙ্গে একবার সাক্ষাৎ করতে চান মীরজাফর। মীরজাফরের নাম লেখা থাকলেও প্রকৃতপক্ষে মণিবেগম যে সাক্ষাৎ করতে চান একথা তাঁরা বুঝলেন।

অনেক বিষয় অলোচনা আছে নাকি। উদয়নালা হস্তগত করতে পারলেও মীরকাশিমকে সম্পূর্ণ পরাস্ত করা যাবে না। সম্পূর্ণ পরাস্ত করতে গেলে মুঙ্গেরে দুর্গের পতন হওয়া প্রয়োজন। অথচ ওই দুর্গের চতুর্দিকে সর্বশক্তির বেড়াজাল রচনা করে রেখেছেন নবাব।

আলোচনা হবে ওই সুদৃঢ় দুর্গটির পতন কিভাবে ঘটান যায়। শ্রেষ্ঠীবর্গ এই বিষয় কি পরিমান সাহায্য করতে পারেন তার নিশ্চয়তা পাওয়া প্রয়োজন। সাক্ষাৎ কোথায় হবে এবং দুর্গ থেকে কি বেরিয়ে আসা সম্ভব তাও পত্রে নির্দেশ দেওয়া আছে। নির্দেশ দেওয়া না থাকলেও কোন অসুবিধা হত না। কারণ ওই একটি মাত্র উপায়ে দুর্গ থেকে বাইরে যাওয়া সম্ভব। গঙ্গাস্নান এবং পূজা পার্বণের সুবিধার জন্য নবাব শ্রেষ্ঠীবর্গকে পাঞ্জা দিয়েছেন। পাঞ্জা দেখিয়ে দুর্গের বাইরে যাওয়া যায়। তবে ফিরে আসতে অধিক বিলম্ব হলে বিপদ অনিবার্যরূপে দেখা দেবে সন্দেহ নেই।

নিজেদের মধ্যে আলোচনা করে তাঁরা মণিবেগমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করাই স্থির করলেন। উত্তর চলে গেল যথাস্থানে। এই সময় আরেক সুবিধা তাঁরা পেলেন। চর মুখে সংবাদ পাওয়া গেল, নবাব আজই গোপনে উদয়নালার আয়োজন প্রত্যক্ষ করতে গেছেন। সুতরাং নির্ভাবনায় ইংরেজ শিবিরে যাওয়া যেতে পারে।

তখনও প্রথম যাম ঘোষিত হয় নি।

সৈন্য শিবিরগুলি থেকে কলগুঞ্জন ভেসে এলেও, চতুর্দিকে নিদ্রার রাজ্য যে বিরাজ করছে অনুমান করা যায়। চতুর্দিকে অন্ধকার। তিথি অনুসারে চন্দ্রের সাক্ষাৎ পেতে কিছু বিলম্ব হবে।

অত্যন্ত সন্তর্পণে ও সতর্কতার সঙ্গে জগৎশেঠ, রাজবল্লভ ও রায়দুর্লভ দুর্গের উত্তর দিকের দ্বারের কাছে পৌঁছলেন। নহুষের প্রেতাত্মার অতি দীর্ঘকায় একজন অন্ধকার ভেদ করে তাঁদের সামনে এসে দাঁড়াল। তার দেহে সৈনিকের পোষাক। দুচোখে লোভের বন্যা।

মৃদু অথচ কর্কশ কণ্ঠে সে বললে, আপনারা নির্দিষ্ট সময়ে এসে পড়েছেন। জগৎশেঠ নিম্ন কণ্ঠে বললেন, তুমি নিশ্চিতভাবে জানতে, নবাব দুর্গে নেই?

—তিনি এখন উদয়নালার দুর্গে বিশ্রাম করছেন একথা নিশ্চিতভাবে বলতে পারি। আপনার নৌকা অপেক্ষা করছে। অন্যান্য ব্যবস্থাও করে রেখেছি।

—তোমার কর্মতৎপরতা প্রশংসনীয় লায়ক।

লায়ক আলী কিছু বললে না। নিজের দক্ষিণ হাত প্রসারিত করল। জগৎশেঠ তার প্রসারিত হাতে একমুঠো আশরফি রাখলেন। অগ্রসর হলেন তিনজন। নির্বিঘ্নেই দ্বার অতিক্রম করলেন। লায়ক আলীর মতো বহু বিশ্বাসঘাতক আছে যারা নবাবের নিমক খাচ্ছে অথচ আশরফির লোভে শ্রেষ্ঠীদের ক্রীড়ানক হয়ে রয়েছে।

দ্বিতীয় যামের কিছু পরে নৌকা যোগে তাঁরা নির্দিষ্ট স্থানে গিয়ে পৌঁছালেন। একটি স্বল্পালোকিত বস্ত্রাবাসের মধ্যে মণিবেগমও মীরজাফর অপেক্ষা করছিলেন। শ্রেষ্ঠীরা অভিবাদন জানিয়ে আসন গ্রহণ করলেন। পুরাতন বন্ধুদের বহুদিন পরে নিকটে পেয়ে মীরজাফরের দুচোখ সজল হয়ে উঠল।

রাজবল্লভ বললেন, আমরা বেশীক্ষণ এখানে অপেক্ষা করতে পারব না। ভোরের আলো ফুটে ওঠবার পূর্বেই ফিরে যেতে হবে। আলোচনা দ্রুত এবং সংক্ষেপে সেরে না নিলে আমরা বিপদকে আমন্ত্রণ জানাব।

—রাজা যথার্থই বলেছেন। রায়দুর্লভ বললেন, কাশিম আলী দুর্গে নেই এই সংবাদ পেয়ে আমরা এসেছি। এমনও হতে পারে সেই চতুর আমাদের বিভ্রান্ত করবার জন্য দুর্গে অনুপস্থিত থাকার সংবাদ প্রচার করেছে। সুতরাং যতদূর সম্ভব সত্বর মুঙ্গেরে ফিরে যাওয়া বাঞ্ছনীয়।

মীরজাফর বললেন, একবার যখন মুঙ্গের থেকে এতদূর চলে আসতে পেরেছেন নাইবা ফিরে গেলেন। ইংরেজ শিবিরে প্রবেশ করে আপনাদের ছিনিয়ে নিয়ে যাবার সাধ্য কাশিম আলীর নেই।

জগৎশেঠ বললেন, মুঙ্গেরে এক মুহূর্ত থাকার তিলমাত্র ইচ্ছা আমাদের নেই হজরত। কিন্তু আমরা অনন্যোপায়। আমাদের পরিবারবর্গ অস্থায়ী সম্পত্তি সমস্তই আছে মুঙ্গেরে। পরিবারের প্রতিটি মানুষকে কাশিম আলী নিষ্ঠুর হত্যা করবে। ধনরত্ন বয়ে নিয়ে যাবে নিজের তোষাখানায়!

মণিবেগম বললেন, এখন এঁরা মুঙ্গেরে থাকলে আমাদের লাভ। অনেক বিষয়ে সহযোগিতা করতে পারবেন। এবার কাজের কথা আরম্ভ করা যেতে পারে। পত্রে আপনাদের জানান হয়েছিল, মুঙ্গের-দুর্গের পতনের বিষয় আলোচনা হবে। কিন্তু ইতিমধ্যে পরিস্থিতি

কিছু ঘোরাল হয়ে বর্তমানে উঠেছে উদয়নালা সম্পর্কে আমাদের অধিক মনোযোগী হতে হবে।

শ্রেষ্ঠীরা বিস্মিত হলেন।

রাজবল্লভ বললেন, গিরিয়ায় যখন জয় হয়েছে তখন উদয়নালা কোন সমস্যার বিষয় হতে পারে না।

—সম্প্রতি যে সংবাদ পাওয়া গেছে তাতে হেলায় দুর্গ অধিকার করা সম্ভব হবে বলে মনে হচ্ছে না। দুর্গটির দুর্ভেদ্য অবস্থান আমাদের চিন্তিত করে তুলেছে।

—আমরা কি ভাবে সাহায্য করতে পারি বলুন ?

জগৎশেঠের প্রশ্নের উত্তরে মণিবেগম বললেন, আমার স্বামীর আপনারা দীর্ঘদিনের বন্ধু। পলাশীর প্রান্তে উদ্ধত সিরাজকে পর্যুদস্ত করা সম্ভব হয়েছিল আপনারা সক্রিয় সহযোগিতা জানিয়েছিলেন বলেই। পরবর্তীকালে কাশিম আলীকে কেন সমর্থন জানালেন আমার তা অদ্যাবধি অজ্ঞাত। কাশিম আলীর অত্যাচারে জর্জরিত হবার পর আবার সহযোগিতার হাত প্রসারিত করেছেন। সারতাজ যদি আবার তখ্ত অধিকার করতে পারেন, আপনাদের কোন ইচ্ছে অপূর্ণ রাখা হবে না।

রায়দুর্লভ বললেন, বেগম সাহেবা, আমরা মরমে মরে আছি। মানুষ মাত্রই ভুল করে, আমরাও করেছিলাম। তখন বুঝতে পারি নি কাশিম আলীর প্রকৃত স্বরূপ। অতীতের কথা আমাদের আর স্মরণ করিয়ে দেবেন না। আমরা আমাদের ভুল সংশোধন করতে বদ্ধপরিকর নইলে আহ্বান পাবার সঙ্গে সঙ্গে এখানে ছুটে আসতাম না।

রাজা রাজবল্লভ বললেন, এই মুহূর্ত থেকে আমাদের সর্বশক্তি হজরতের মঙ্গলার্থে নিয়োজিত জানবেন।

—আপনাদের কথা শুনে নিশ্চিন্ত হলাম। ইংরেজ আমাদের পক্ষে আছে। আপনারাও রইলেন। এই মিলিত শক্তি কাশিম আলীর

দর্প চূর্ণ করবে বিশ্বাস করি। উদয়নালাই হল এখন সর্ববৃহৎ প্রতিবন্ধক। মণিবেগম বললেন, এই প্রতিবন্ধককে অপসারিত করতে আপনারা কিভাবে সাহায্য করতে পারেন?

শ্রেষ্ঠীরা চিন্তিত হলেন।

উদয়নালার দুর্গ হেলায় ইংরেজরা জয় করবে এই ধারণা তাঁদের বদ্ধমূল ছিল। এখন বুঝতে পারা যাচ্ছে কাজটি সরল নয়। গোরা-পল্টন নিয়ে যখন ঝাঁপিয়ে পড়া সম্ভব হয় নি এবং স্বয়ং মণিবেগম যখন চিন্তিত—বিষয়টি নিঃসন্দেহে গুরুতর। প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ এঁরা বোঝেন না। স্বার্থসিদ্ধির জন্য যুদ্ধ বাধিয়ে দেওয়াই এঁদের কাজ।

দুর্গের পতন ঘটিয়ে দেওয়ার ব্যাপারে কি সহযোগিতা করতে পারেন স্থির করতে পারলেন না। কেমন অস্বস্তি বোধ করতে লাগলেন।

তাঁদের কিছু বলতে না দেখে মীরজাফর বললেন, আপনারা নীরব থাকবেন না। বলুন—কিছু বলুন? আপনাদের নির্ভর করতে পারব ভরসা করেই এই বৃদ্ধ বয়সে অসুস্থ শরীরে তখ্‌তের দিকে অগ্রসর হতে সাহসী হয়েছি।

জগৎশেঠ বললেন, যুদ্ধের আমরা কিছুই বুঝি না। একটি দুর্গ নির্মাণ করতে কি পরিমাণে অর্থ ব্যয় হতে পারে আমাদের নখদর্পণে কিন্তু সৈন্য সামন্ত সমেত দুর্গের পতন ঘটানো কিভাবে সম্ভব বলা কঠিন।

মণিবেগম বললেন, সময় সময় কৌশলের আশ্রয় নিতে হয় আপনাদের অজানা নয়। এমন কি কৌশলের সাহায্যে নবাবকে ফকিরে পর্যন্ত রূপান্তরিত করেছেন।

—কৌশল।

—আমি চিন্তা করে দেখেছি বর্তমানে ওই কৌশল অবলম্বন না করে উপায় নেই।

—কোন্ কৌশলের কথা বলছেন বেগম সাহেবা?

—অর্থের প্রলোভন দেখিয়ে কয়েকজনকে বিশ্বাসঘাতক গড়ে তুলতে হবে। উদয়নালা দুর্গের নিশ্চয় কোন গোপন প্রবেশ পথ আছে। যে পথের সন্ধান কাশিম আলীর ঘনিষ্ঠ অনুচরদের অজ্ঞাত নয়। অর্থের বিনিময়ে তারা কেউ সেই পথের সন্ধান আমাদের দেবে। কিংবা আমাদের সৈন্য যখন দুর্গের সম্মুখে উপস্থিত হবে তখন কোন একটি দ্বার কেউ উন্মুক্ত করে দেবে। অর্থে কিনা হয়। আমি বিশ্বাস করি, আমাদের সাহায্য করতে পারে এমন কয়েকজন ব্যক্তি আপনারা সহজেই সংগ্রহ করতে পারবেন।

উৎসাহের সঙ্গে রায়দুর্লভ বললেন, নিশ্চয় পারব।

রাজবল্লভ বললেন, আমাদের চেষ্টার ত্রুটি হবে না। হজরত স্মরণ রাখবেন ভবিষ্যতে আমরা যেন উপেক্ষিত না হই।

মীরজাফর দ্রুত কণ্ঠে বললেন, ইংরেজরা আমাকে যদি উপেক্ষা না করে আপনারাও উপেক্ষিত হবেন না।

কিছু সময় আরো আলোচনা চলবার পর সভা ভঙ্গ হল।

শ্রেষ্ঠীরা চিন্তিত মুখে বিদায় নিলেন।

নবাব উদয়নালা থেকে প্রত্যাবর্তন করেছেন সন্তুষ্ট চিত্তে।

সেখানকার আয়োজনে কোন ত্রুটি তাঁর দৃষ্টিগোচর হয় নি। অপর্যাপ্ত গোলা বারুদ সঞ্চয় করা হয়েছে। রসদ আছে প্রয়োজনের অতিরিক্ত। খুশী মনে সৈন্যরা মহড়া চালিয়ে যাচ্ছে। গিরিয়ার পরাজয় তাদের মনে রেখাপাত করেছে বলে মনে হয় না।

মীরকাশিমের মনে আবার প্রবল আশার সঞ্চার হয়েছে। কাটোয়া আর গিরিয়ার পরাজয় উদয়নালায় নিশ্চিতভাবে গ্রহণ করা যাবে। ইংরেজের কামানের সংখ্যা যতই অধিক হোক না কেন, দুর্গের বিচিত্র অবস্থানের দরুন নিকটবর্তী হতে সাহসী হবে না। সমস্তই আশাপ্রদ

তর গুরগিনকে পাঠিয়েছেন পুঙ্খানুপুঙ্খভাবে সমস্ত কিছু পর্যবেক্ষণ করে আসবার জন্য। বর্তমানে তাঁকে একটি গুরুত্বপূর্ণ কাজ শেষ করতে হবে। উদয়ানালায় যুদ্ধকে পরিচালনা করবে এখনও স্থির হয় নি।

নবাবের ইচ্ছা এই গুরুদায়িত্ব গুরগিনের উপর অর্পণ করা হোক। কিন্তু মনোনয়নে দুটি অসুবিধা দেখা দিচ্ছে প্রথম, গুরগিন উদয়নালায় গেলে তার অধীনস্থ সমস্ত আর্মেনিয়ান সৈন্য সেখানে চলে যাবে। নিজের দৃষ্টির আড়ালে আর্মেনিয়ানদের ইংরেজের কাছাকাছি হতে দেওয়াটা বিবেচনার কাজ নয়। বিশ্বাসঘাতকতা করে তারা বিপক্ষে যোগ দিতে পারে। গিরিয়ার যুদ্ধে মার্কারের অধীনস্থ সৈন্যরা এই কাজ করেছে।

আর্মেনিয়ানদের উপর মীরকাশিমের অসম্ভব দুর্বলতা ছিল। গিরিয়ার যুদ্ধের পর মন তিক্ত হয়ে উঠেছে। তিনি বুঝতে পেরেছেন অর্থের আকর্ষণ তো বটেই, ধর্মের আকর্ষণেও এরা বিশ্বাসঘাতকতা করতে পশ্চাদ্‌পদ হবে না। দ্বিতীয়, উদয়নালা দুর্গের পতন হলে মুঙ্গেরে হল শেষ ঘাঁটি। এখানে ইংরেজদের যে কোন উপায়ে পরাস্ত করতেই হবে। তখন সৈন্যদলকে পরিচালিত করবার দায়িত্ব গুরগিনকে দেওয়াই সঙ্গত হবে। সুতরাং এখন তাকে শ্রান্ত হতে না দেওয়াই বাঞ্ছনীয়।

আরেকটা বিষয়ে মীরকাশিম সতর্ক আছেন। পূর্বের মতো এখন আর গুরগিনের প্রতি তাঁর পূর্ণ বিশ্বাস নেই। প্রচুর অভিযোগ তার বিরুদ্ধে ধূমায়িত হয়েছে। মুসলমান সেনানায়করা গুরগিনের প্রতি নবাবের পক্ষপাতিত্ব সহ্য করতে পারে নি। সুযোগ পেলেই অভিযোগ জানিয়েছে। নবাব তাদের অভিযোগ কর্ণপাত করেন নি। হিংসায় ওরা অনর্থক অভিযোগ জানাচ্ছে অনুমান করে নিয়ে ছিলেন। কিন্তু—

কিন্তু গিরিয়ার যুদ্ধের পর তাঁর দৃষ্টিভঙ্গীর কিঞ্চিৎ পরিবর্তন হয়েছে ওখানে যে সমস্ত আর্মেনিয়ানরা বিশ্বাসঘাতকতা করে ইংরেজদের পক্ষে যোগ দিয়েছে তারা সকলেই গুরগিন কর্তৃক সংগৃহীত। নবাবের দৃঢ় ধারণা ছিল এই সম্পর্কে গুরগিন তাঁর কাছে এসে দুঃখ প্রকাশ করবে। ওই বিশ্বাসঘাতকদের সে মনে প্রাণে ঘৃণা করে একথা বারংবার বলবে।

কার্যক্ষেত্রে তা ঘটে নি। গুরগিন বিশ্বাসঘাতক আর্মেনিয়ানদের বিরুদ্ধে কোন কথাই বলে নি। নবাব সন্দিহান হয়েছেন। সুযোগ পেলে সেও কি তাঁর বিরুদ্ধাচরণ করবে? মীরকাশিমের মনের মধ্যে থেকে কে চীৎকার করে বলেছে কেন করবে না। ও বিদেশী—কুচক্রী খোজা পিদ্রুসের সহোদর। ওরা এদেশে পদার্পণ করেছে অর্থের জন্য। বিবেককে রেখে এসেছে দূরে, অনেক দূরে—সেই আর্মেনিয়ায়।

সন্দেহের দোলায় দুলছেন।

গুরগিনকে উদয়নালায় অধিনায়ক হিসাবে পাঠাতে সাহসী হচ্ছেন না নবাব। এখানে চোখের উপর কিছু করতে হয়তো সাহসী হবে না। কিন্তু ওখানে, সতর্ক প্রহরীর মতো ওখানে কে তার উপর দৃষ্টি রাখবে?

বহুক্ষণ থেকেই চিন্তার জাল বুনছেন মীরকাশিম।

সমস্ত দায়িত্ব দিয়ে উদয়নালায় কাকে প্রেরণ করা যায়।

নজাফ খাঁ—

ইয়ার মহম্মদ—

ইব্রাহিম আলী—

কাকে? কে ওখানে যাবে ইংরেজদের দর্পচূর্ণ করতে?

এই সময় দ্বাররক্ষী প্রহরী এসে জানাল ইব্রাহিম আলী সাক্ষাৎ প্রার্থী।

ইব্রাহিম, এখন। ভ্রূ কুঞ্চিত করে নবাব কি চিন্তা করলেন। তারপর বললেন, আসতে দাও।

ইব্রাহিম এসে কুর্নিশ করল।

তার মুখ অসম্ভব গম্ভীর। সাজ-পোষাকে পরিপাট্য নেই।

—কি সংবাদ ইব্রাহিম?

—আমি অত্যন্ত দুঃসংবাদ নিয়ে এসেছি হজরত।

—দুঃসংবাদ! চতুর্দিক থেকে শুধু দুঃসংবাদই আসছে। বল ইব্রাহিম, কোন্ দুঃসংবাদ নিয়ে এখন তুমি এসেছো?

—গুরগিন খাঁ—

—থামলে কেন? কি করেছে গুরগিন খাঁ?

—গুরগিন খাঁ হজরতের বিরুদ্ধে ষড়যন্ত্রে লিপ্ত আছে তা প্রমাণিত হয়েছে মালেক। একজন আর্মেনিয়ান যে ইংরেজদের গুপ্তচর হয়ে গুপ্ত সংবাদ নিয়ে গুরগিন খাঁর কাছে যাচ্ছিল তাকে আমরা পথে আটক করতে পেরেছিলাম। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সে কথাগুলি প্রকাশ করে গেছে।

মীরকাশিম স্তম্ভিত হয়ে গেলেন।

এ সমস্ত কি শুনছেন তিনি!

প্রায় চীৎকার করে বলে উঠলেন, তোমরা তাকে হত্যা করলে? জীবন্ত অবস্থায় তাকে বন্দী করতে পারলে অনেক তথ্য সংগ্রহ করা যেতে পারতো। তোমরা মূর্খ, অপদার্থের দল।

—আমরা তাকে হত্যা করি নি মালেক। দুর্গের দক্ষিণ দ্বার দিয়ে পাঞ্জা দেখিয়ে সে প্রবেশ করে। আমি ওখানেই ছিলাম। আমার সন্দেহ হয় পাঞ্জাটি মালেকের দেওয়া পাঞ্জা নয়। কিছু দূর অগ্রসর হয়ে আমি তাকে পাঞ্জাটি দেখাতে বলি, সে অস্বীকার করে। তখন তাকে আক্রমণ করা ছাড়া আমার আর কোন পথ ছিল না। আমার আক্রমণ সহ্য করতে না পেরে সেই কাপুরুষ নিজের দেহে অস্ত্রাঘাত করে বসল হজরত। আল্লাহ্‌র অসীম অনুগ্রহ যে, মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তে সমস্ত কথা প্রকাশ করে দিয়ে গেছে।

—তার কাছ থেকে কোন পত্র উদ্ধার করা গেছে কি?

—না, হুজরত। তাঁর সাজ-পোষাক অনুসন্ধান করে দেখি নি। মৃতদেহ প্রাসাদের সম্মুখে আনিয়ে রাখা হয়েছে। মালেকের উপস্থিতিতে অনুসন্ধান করা আমি বাঞ্ছনীয় মনে করি।

গম্ভীর কণ্ঠে মীরকাশিম বললেন, গুরগিনের বিরুদ্ধে যা বললে তা প্রমাণিত না হলে পরিণামের কথা চিন্তা করেছো কি ?

ভীত কণ্ঠে ইব্রাহিম বললে, গুপ্তচর সমস্ত কথা স্বীকার করেছে জাহাঁপনা।

—সে মৃত। সে যে স্বীকার করেছে তা প্রমাণিত হবে কি ভাবে ? তুমি মিথ্যা কাহিনীও আমার কাছে পরিবেশন করে থাকতে পার।

—আকাশচুম্বি দুঃসাহস আমার নেই।

—প্রমাণ চাই—স্থূল প্রমাণ। নইলে আমায় স্থির নিশ্চিত হতে, হবে গুরগিনের বিরুদ্ধে তুমি মিথ্যা অভিযোগ উত্থাপন করেছো।

—ফায়জাল—

উচ্চ কণ্ঠে মীরকাশিম আহ্বান জানালেন।

ফায়জাল কক্ষে প্রবেশ করে অভিবাদন জানাল।

শৃঙ্খলিত কর ইব্রাহিমকে।

ফায়জাল হতবুদ্ধি হয়ে গেলেও আদেশ পালন করল।

—তোমার উক্তি সত্য প্রমাণিত হলে মুক্তি পাবে, পুরস্কৃত হবে আর যদি বিপরীত পরিস্থিতির উদ্ভব হয় মৃত্যু অনিবার্য।

নবাব দ্রুত কক্ষ থেকে নিক্রান্ত হলেন।

ইব্রাহিম মুখে ভীত ভাব দেখালেও মনে মনে জানে অনুসন্ধান করলে নবাব গুরগিনের বিরুদ্ধে প্রচুর প্রমাণ সংগ্রহ করতে পারবেন। সন্দেহের বাত্তিক মীরকাশিমের মজ্জায় মজ্জায় বসে গেছে। প্রমাণগুলি হাতে পাবার পরই তিনি তাঁর প্রিয় সেনাপতিকে কঠিন শাস্তির বিধান দিতে কুণ্ঠিত হবেন না।

তার হাতে যে শৃঙ্খল পরানো হল তা খুলে যাবে। তাঁর জীবনের

আশঙ্কা নেই। অবশ্য পরিস্থিতিকে ঘোরাল করে তুলতে পরিশ্রম করতে হয়েছে ইব্রাহিমকে। দিন দুয়েক চিন্তা করতে হয়েছে। অবশ্য চিন্তা করবার কিছু ছিল না। কারণ পরিকল্পনাটি পিক্রুসের।

একটি আর্মেনিয়ান সৈন্যকে সহজেই সে সংগ্রহ করতে পারল। ইব্রাহিম ভাব দেখিয়েছিল যাতে মনে হয়, একলা ফুর্তি করলে তেমন আমেজ পাওয়া যায় না—একজন সঙ্গী চায়। এই সমস্ত ব্যাপারে আর্মেনিয়ানরা পশ্চাদ্‌পদ হয় না। সানন্দে রাজী হয়েছিল। ইব্রাহিম তাকে দুলারী বাঈ-এর নাচ দেখিয়েছিল। আকণ্ঠ পান করিয়েছিল উগ্র সরাব।

অসংলগ্ন কথার জাল বুনতে বুনতে এক সময় অজ্ঞান হয়ে পড়েছিল সে। তারপরের কাজ অত্যন্ত সহজ দ্বিধাহীন চিত্তে তাকে হত্যা করতে কোন অসুবিধা হয় নি ইব্রাহিমের। তার পোষাকে একটি পত্র ও একটি পাঞ্জা রেখে দিতে ভোলে নি। মীরজাফরের মোহর অঙ্কিত পাঞ্জাটি পিক্রুস তাকে দিয়েছিল। পত্রটিও।

শৃঙ্খলিত ইব্রাহিম মন্ত্রণা কক্ষে আবদ্ধ রইল।

নবাব তখন প্রাসাদের সম্মুখস্থ চত্বরে গিয়ে উপস্থিত হয়েছেন। মৃতদেহ পড়ে রয়েছে সেখানে। কয়েকজন মুসলমান সেনা মৃতদেহের এক পাশে দাঁড়িয়ে নানা জল্পনা-কল্পনায় ব্যস্ত ছিল। আকস্মিকভাবে নবাবকে উপস্থিত হতে দেখে তারা তটস্থ হয়ে উঠল।

আভূমি কুর্নিশ করে তারা কয়েক পা সরে দাঁড়াল।

হতভাগ্য আর্মেনিয়ানের মৃতদেহ উপুড় হয়ে পড়েছিল। গাঢ় লালরক্তে চতুর্দিক রঞ্জিত। ভাগ্যের কি করুণ পরিহাস। মৃত্যুর পূর্ব মুহূর্তেও বুঝতে পারে নি কেন সে জীবন দিচ্ছে! জীবনের পরপারে গিয়ে সে কি ইব্রাহিমকে অভিশাপ দিচ্ছে?

নবাব একা ছিলেন না। কয়েকজন ঘনিষ্ঠ অনুচর তাঁকে অনুসরণ

করে এসেছিল। মৃতদেহের পোষাক অনুসন্ধান করতে তাদের আদেশ দিলেন তিনি

বিশেষ অনুসন্ধানের প্রয়োজন হল না।

পাঞ্জা ও পত্র পাওয়া গেল।

পাঞ্জাটি তীক্ষ্ণ দৃষ্টিতে নিরীক্ষণ করলেন মীরকাশিম। সন্দেহের অবকাশ নেই।

নবাবের আসনে অধিষ্ঠিত থাকার সময় মীরজাফর যে মোহর ব্যবহার করতেন, সেই মোহর অঙ্কিত রয়েছে পাঞ্জায়। তাঁর মুখমণ্ডলে জলদ গাম্ভীর্যের প্রলেপ পড়ল।

পত্রটি খুললেন তিনি।

রুদ্ধ নিঃশ্বাসে পত্রের প্রতিটি ছত্রের উপর দৃষ্টি বুলিয়ে গেলেন। স্তব্ধ হয়ে গেলেন। একি পড়লেন তিনি। দেহের প্রতিটি বিন্দু রক্ত দেহের আবরণ ভেদ করে বেরিয়ে আসতে চাইল। অথচ এই পত্রকে অবিশ্বাস করবার উপায় নেই। মীরজাফরের মোহরলাঞ্ছিত এই পত্রট লিখেছেন মণিবেগম। তাঁর অতি পরিচিত স্বাক্ষর নিম্নে প্রদত্ত রয়েছে।

দ্বিতীয়বার পড়লেন মীরকাশিম।

মণিবেগম গুরগিন খাঁকে লিখেছেন—

খোজা পিক্রুসের কাছ থেকে ইতিপূর্বে তুমি সমস্ত সংবাদ পেয়ে গেছো। আমার পাঠানো অলঙ্কারগুলি তোমার স্ত্রী অবশ্যই ধারণ করেছে। তার সৌন্দর্য চতুর্গুণ বৃদ্ধি পেয়েছে অনুমান করি। আমার প্রস্তাবে তুমি পূর্ণ সমর্থন জানাবে এ বিশ্বাস আমার আছে। বিশ্বাস অর্জন করবার হেতু হল, গিরিয়ার যুদ্ধে তোমার স্বজাতীয় সৈনিকদের সহযোগিতা মূলক ব্যবহার।

অত্যাচারী মীরকাশিমের অত্যাচারে চতুর্দিকে হাহাকার পড়ে গেছে। সুবে বাংলার সমস্ত শান্তিকে অশান্তিময় করে তুলে সে অপার আনন্দ

লাভ করছে। আমরা, সুবুদ্ধি সম্পন্নতা, এই নির্মম প্রবাহকে বজায় থাকতে দিতে চাই না। তুমিও ক্রুরকর্মা মীরকাশিমের হাত থেকে পরিত্রাণ পেতে চাও। পলাশীর যুদ্ধে বাংলার মসনদের একমাত্র দাবিদার জাফার আলী খাঁ যা করেছিলেন, তোমাকেও তাই করতে হবে। ইংরেজ ও আমাদের মিলিত সৈন্য যখন মুঙ্গের দুর্গের দ্বারপ্রান্তে উপস্থিত হবে—তুমি নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করবে নিজের অধীনস্থ সৈন্যদের নিয়ে।

যুদ্ধক্ষেত্রে নিরপেক্ষ দর্শকের ভূমিকা গ্রহণ করলেও, একটি গুরুতর দায়িত্ব তোমাকে পালন করতে হবে। জীবিত বা মৃত মীরকাশিমকে আমাদের হাতে তুলে দিতে হবে। একলক্ষ টাকা পুরস্কার তোমার জন্য নির্দিষ্ট রইল। পিক্রুস নিয়মিত যোগাযোগ রক্ষা করে যাবে।

মীরকাশিম আর পড়লেন না।

পত্রের প্রতিটি ছত্র কণ্ঠস্থ করে কি লাভ। যা জানবার জেনেছেন। যা জেনেছেন তা পরিপাক করা কঠিন। এই মুহূর্তেও নবাবের ওষ্ঠ হাসিতে রঞ্জিত হয়ে উঠল। বিষাদের হাসি। তাঁর জীবনের মূল্য মাত্র একলক্ষ টাকা। সুবে বাংলা বিহার উড়িষ্যার নবাবের জীবন এত অল্প মূল্যে বিক্রি হয়ে যাবে?

তিনি একটি শব্দও উচ্চারণ না করে মন্ত্রণাকক্ষে ফিরে এলেন।

তাঁর সন্দেহ শেষ পর্যন্ত সত্য প্রমাণিত হল। বিচিত্র ব্যাপার। যাকে চরম নির্ভর করে রয়েছেন সে বিশ্বাসঘাতকতা করবার জন্য উন্মুখ! এ মাটির দোষ। যুগ যুগ ধরে একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়ে চলেছে। এদেশ শ্মশান হয়ে যাক, মরুভূমি হয়ে যাক—কোটি কোটি মানুষ মরণের কোলে ঢোলে পড়বে সন্দেহ নেই, ওই সঙ্গে বহু সহস্র দেশী ও বিদেশী বিশ্বাসঘাতক জীবন দেবে এও কম সান্ত্বনার কথা নয়।

মীরকাশিমের ইচ্ছা হল উচ্চকণ্ঠে আল্লাহ্‌র কাছে অভিযোগ জানান।

ইচ্ছে হল মনের সমস্ত অভিমানকে উজাড় করে দেন। অশ্রুরুদ্ধ কণ্ঠে বলেন, ইয়া পারবারদিগার, তোমার একি পরিহাস। মনে প্রাণে একজন খাঁটি মুসলমান আমি। ধর্মের অনুশাসন মেনে, প্রজার সুখ সুবিধার দিকে:দৃষ্টি রেখে রাজ্যপালন করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি। দেশকে বিদেশীর কবল থেকে মুক্ত করবার জন্যে জীবন পর্যন্ত উৎসর্গ করবার জন্য প্রস্তুত হয়ে আছি।

একজন প্রজাপালক হিসেবে যা কিছু করে চলেছি তা কি অপরাধের ? যদি তা না হয় তবে কেন পদে পদে পরাজয়ের গ্লানি আমায় গ্রাস করছে ? কেন আমি ক্রমেই দুশ্চিন্তা ও বিশৃঙ্খলার মধ্যে ডুবে চলেছি ? কেন—কেন ?—দিন দুনিয়ার মালিক, কিসের শাস্তি তুমি আমায় দিচ্ছ ? বলে দাও ইলইল্লাহে রাসুল, আমার অপরাধ কি ?

আচম্বিতে নিজেকে সংযত করলেন মীরকাশিম।

এ সমস্ত কি চিন্তা করছেন !!!

তিনি কি জানেন না, আল্লাহ্‌কে কোন অভিযোগ জানাবার কোন অধিকার তাঁর নেই। কোন মানুষের নেই। অতীতেও তো অসংখ্যবার ভেঙে পড়া মন নিয়ে এই অভিযোগ জানাতে গেছেন—আবার সংযত করে নিয়েছেন নিজেকে। যা কিছু ঘটেছে সমস্তই তাঁর ইচ্ছাতেই সম্ভবপর হয়েছে, একথা জেনেও কেন বারংবার এই দুর্বলতা ?

কেন ?

মীরকাশিম আর কোন চিন্তাকে প্রশ্রয় না দিয়ে নিজের করণীয় কাজগুলি সম্পর্কে তৎপর হয়ে উঠলেন। গুরগিনের প্রতি তাঁর গভীর অনুরাগ আছে সন্দেহ নেই কিন্তু বিশ্বাসঘাতক অনুচরের প্রতি আর অনুরাগ প্রদর্শন করা চলে না।

বিশ্বাসঘাতকতার শাস্তি মৃত্যু।

আইনকে অমান্য তিনি করতে পারেন না। অনেক বিশ্বাসঘাতককে তিনি মৃত্যুদণ্ড দিয়েছেন। তাঁর প্রিয় গুরগিন খাঁ আইনের ওই ধারাকে

অতিক্রম করে যেতে পারে না। মনের কন্দরে কন্দরে কেমন শূন্যতা অনুভব করেছিলেন মীরকাশিম।

কি বিচিত্র দুনিয়া।

যাকে বিশ্বাস করতে যান সেই বিশ্বাসঘাতক হয়ে ওঠে। হয়তো এমন দিন বেশী দূরে নয় যেদিন তিনি নিজেই নিজের বিরুদ্ধাচরণ করবার জন্য তৎপর হয়ে উঠবেন।

তবে গুরগিনকে শাস্তি দেওয়ার পূর্বে তার সঙ্গে কিছু কথাবার্তা বলে নেওয়া বাঞ্ছনীয় মনে করলেন। গম্ভীর কণ্ঠে আহ্বান করলেন সৈয়দ-বান্দাকে।

—খোদাবন্দ—

কুর্নিশ করে এসে দাঁড়াল সৈয়দবান্দা।

—অবিলম্বে গুরগিন খাঁকে আহ্বান কর।

সূর্য তখনও অস্ত যায় নি।

ছাউনি থেকে গৃহে ফিরল গুরগিন।

অভ্যাস মতো উচ্চ কণ্ঠে আহ্বান করল, মোভা—মোভা—

গুটি কয়েক মার্জার শিশুর পরিচর্যায় ব্যস্ত ছিল মোভা। স্বামীর আহ্বানে দ্রুত চলে এল তার কাছে। তাকে বিষণ্ণ দেখাচ্ছে। সদা সর্বদা হাসি উচ্ছ্বাসে ঝলমল মোভাস্কায়ার মুখে এখন শুধু বিষণ্ণতা নেই, ওই সঙ্গে আছে চিন্তার ছায়া।

গুরগিন সবলে তাকে কাছে টেনে নিল।

আদরের বন্যায় তাকে করে তুলল বিবশা।

—মোভা—

—উঁ—

—তোমাকে আজ এত বিষণ্ণ দেখাচ্ছে কেন?

—বিষণ্ণ! কই না তো।

—অস্বীকার ক'রো না ডারলিং। অনান্য দিনের মতো আজ যেন তুমি তেমন স্বাভাবিক নেই।

—যেমন প্রত্যহ দেখ ঠিক তেমনি আছি।

—মুখ তুলে আমায় বল কি হয়েছে।

স্বামীর বুকে আরো গভীরভাবে মুখ ডুবিয়ে মোভা বললে, কিছু হয় নি, বিশ্বাস কর কিছুই হয় নি।

—কিছুই যদি না হবে তবে তোমার চোখের জল আমার বুককে কেন ভিজিয়ে দিচ্ছে মোভা? তোমায় কি কেউ অপমান করেছে? আমার অনুপস্থিতিতে পিক্রুস এসে এমন বহু কিছু বলেছে যা তোমার পক্ষে কি সহ্য করা কষ্টকর হয়েছে? চুপ করে থেকো না--বল ডারলিং?

মোভা গুরগিনের বাহুবন্ধন থেকে সরে এল।

তার ম্লান মুখ চোখের জলে মাখামাখি।

—তুমি যা চিন্তা করছো সে রকম কিছুই ঘটে নি। নবাব বাহিনীর প্রধান তুমি। তোমার স্ত্রীকে অপমানিত করবার দুঃসাহস কার হবে।

—তবে? আমার কোন ব্যবহারে কি তুমি মর্মাহত? বিশ্বাস কর ডারলিং, তুমি কষ্ট পাও এমন কোন কাজ আজ পর্যন্ত ইচ্ছাকৃতভাবে আমি করি নি।

মোভার ম্লান মুখে হাসির ঝিলিক খেলে গেল।

—আমি কি ভুলে গেছি, আমার জন্য তুমি নিজের জীবনকেও তুচ্ছ মনে করেছিলে। যা ঘটেছে তা বলতে চাইছি না এই কারণে, শুনলে তুমি পরিহাস করবে আমায়।

উচ্চহাস্যে চতুর্দিক সচকিত করে তুলল গুরগিন।

পরিহাস! বিষয়বস্তু কিছু গুরুগম্ভীর মনে হচ্ছে। আগ্রহ আরো প্রবল হয়ে উঠল।

—কাল শেষ রাত্রে আমি স্বপ্ন দেখেছি।

—স্বপ্ন দেখেছো।

—হ্যাঁ। দুঃস্বপ্ন বলতে পার। আমার মন তখন থেকেই উতলা হয়ে রয়েছে। ভোরের স্বপ্ন মিথ্যা হয় না।

গুটিকয়েক পরিহাসের কথা গুরগিনের ঠোঁটের আগায় এগিয়ে এল। কিন্তু স্ত্রীর মনোভাবের কথা চিন্তা করে নিজেকে সংযত করল সে।

—ভোরের স্বপ্ন সত্য হয় কে বলেছে তোমায়?

—আমি জানি। জ্ঞান হওয়া পর্যন্ত ওই কথা শুনছি। গ্রামে থাকাকালীন অনেক প্রমাণও পেয়েছি।

—স্বপ্ন হল একধরনের শারীরিক দুর্বলতা ডারলিং। স্বাভাবিক কারণেই মানুষ স্বপ্ন দেখে থাকে। ভবিষ্যতের শুভাশুভ স্বপ্ন নিয়ন্ত্রিত করবে বিশ্বাস করি না।

—তোমরা পুরুষমানুষরা অনেক কিছু বিশ্বাস কর না। সংস্কার বলে হেসে উড়িয়ে দাও। কিন্তু এমন অনেক কিছু আছে যা হেসে উড়িয়ে দেবার মতো নয়। গুরগিন মৃদু হেসে বললে, বেশ, তোমার কথাই মেনে নিলাম। বিশ্বাস-অবিশ্বাসের কথা এখন মুলতুবি থাক। যে স্বপ্ন দেখে তোমার মন এত ম্রিয়মাণ হয়ে উঠেছে সেই স্বপ্নের কথা বল?

—স্বপ্ন!

—হ্যাঁ, হ্যাঁ স্বপ্ন—

—স্বপ্নে আমি পরিষ্কার দেখলাম, যুদ্ধে তুমি পরাজিত হয়েছো। মারাত্মক আহত অবস্থায় যুদ্ধক্ষেত্র ত্যাগ করলে। গঙ্গার জল হয়ে উঠেছে টকটকে লাল। অসংখ্য মৃতদেহ ভেসে চলেছে স্রোতের মুখে। নবাব উন্মাদ হয়ে গেছেন। কখনো উচ্চ হাস্যে সকলকে সচকিত করে তুলছেন আবার কখনো ভেঙে পড়ছেন প্রবল কান্নায়।

—আর আমি?—আমার কি হল? আহত অবস্থায় আমি কোথায় গেলাম?

—তুমি........

—মারাত্মকভাবে আহত হয়েছিলাম বলছো। আমার নিশ্চয় মৃত্যু হল। তোমাকে শোকের সাগরে ভাসিয়ে দুনিয়া থেকে বিদায় নিলাম। এবার অনুমান করে নিতে কষ্ট হচ্ছে না তোমার মনের অবস্থা কেন এত শোচনীয়।

মোভা মাথা নত করেছিল।

তার দিকে মুগ্ধ দৃষ্টিতে তাকিয়ে গুরগিন আবার বললে, মন থেকে সমস্ত ভয় আশঙ্কাকে মুছে ফেল মোভা। বীরের মৃত্যু যুদ্ধক্ষেত্রেই কাম্য হওয়া উচিত সন্দেহ নেই। তবু তুমি নিশ্চিন্ত থাকতে পার, তোমার স্বপ্নে দেখা ওই মর্মন্তুদ মৃত্যু আমার এই পূর্ণ যৌবনে আসবে না মোভা। দুনিয়ায় দীর্ঘদিন ধরে শৌর্য-বীর্যের পরিচয় দিতে থাকব এ নিশ্চয়তা আমি দৃঢ়তার সঙ্গে দিতে পারি।

—এত দৃঢ়তা তুমি কোথা থেকে পেলে গ্রেগ।

—এই দৃঢ়তা আমার আজন্মের।

—কিন্তু ইংরেজ, তাদের রোধ করা কি সম্ভব?

—শৃঙ্খলার অভাব আছে নইলে তাদের পর্যুদস্ত করা কিছুই নয়।

ক্রতকণ্ঠে মোভা বললে, সৈন্যদের মধ্যে শৃঙ্খলা ফিরিয়ে আনবার কোন পথ কি এখন নেই।

—এখন নেই। সময় সাপেক্ষ। তবে সেজন্য চিন্তারও কোন কারণ নেই। আমি ইয়োর এক্সেলেন্সির কাছে অনুরোধ জানাব জাফার আলীর সঙ্গে সন্ধি করে নেবার জন্য। এতে সুফল ফলবে সন্দেহ নেই। আমরা বিশ্রাম পাব। আমাদের প্রস্তুত হবার অপর্যাপ্ত সময় হাতে আসবে। ইতিমধ্যে অবশ্য কূটনৈতিক চালে ইংরেজ ও জাফার আলীর মধ্যেকার সম্পর্ককে তিক্ত করে তুলতে হবে। পরিশেষে আমরাই জয়লাভ করব মোভা।

—ইয়োর এক্সেলেন্সি শত্রুর সঙ্গে সন্ধি করতে সম্মত হবেন?

—উনি স্থির বুদ্ধিসম্পন্ন বহুদর্শী ব্যক্তি। ইংরেজ ও জাফার আলীর মিলিত বাহিনীর দুর্বার গতিকে রোধ করার এখন একমাত্র পথ হল সন্ধি করা, একথা অবশ্যই তিনি হৃদয়ঙ্গম করবেন।

মোভা কোন উত্তর দেওয়ার পূর্বেই বাইবে ধাবিত অশ্বের পদশব্দ শোনা গেল। গবাক্ষের কাছে এগিয়ে গেল গুরগিন। সন্ধ্যার ধূসর ছায়া প্রকৃতিকে গ্রাস করেছে। দ্রুত চড়ায়ের পথ অতিক্রম করছে সৈয়দবান্দার অশ্ব। গবাক্ষের কাছ থেকে সরে এল গুরগিন।

—নবাব নিশ্চয় কোন সংবাদ পাঠিয়েছেন। আমি সৈয়দবান্দার সঙ্গে সাক্ষাৎ করে অবিলম্বে ফিরে আসছি।

গুরগিন কক্ষ থেকে নিক্রান্ত হল।

ফিরে এল অল্প সময়ের ব্যবধানে।

—নবাব কি সংবাদ পাঠিয়েছেন গ্রেগ ?

—অবিলম্বে তিনি আমার সঙ্গে সাক্ষাৎ করতে চান।

—ফিরতে বিলম্ব হবে ?

—বেশী বিলম্ব হবার তো কথা নয়। তুমি কোন চিন্তা করো না। আমি শীঘ্রই ফিরে আসছি।

মোভার ওষ্ঠে নিজের ওষ্ঠের স্পর্শ দিয়ে গুরগিন মীরকাশিমের সঙ্গে সাক্ষাৎ করবার জন্য যাত্রা করল। নবাব মন্ত্রণাকক্ষে অপেক্ষা করছিলেন। একা ছিলেন না তিনি। ইব্রাহিম ও নজাফ খাঁ উপস্থিত ছিল কক্ষে। গুরগিন কক্ষে প্রবেশ করতেই নবাব ইঙ্গিতে তাদের বিদায় দিলেন।

প্রথমে কিছু বললেন না মীরকাশিম। গম্ভীর মুখে পদচারণা করতে লাগলেন। তাঁর শেলিমশাহী নাগরার অল্প শব্দ কক্ষের নিস্তব্ধতাকে ক্ষুণ্ণ করে চলল। বিস্মিত গুরগিন নতমস্তকে শুধু দণ্ডায়মান রইল।

এক সময় পদচারণা বন্ধ করে আসন গ্রহণ করলেন নবাব।

নিজের আর্মানী সেনাধ্যক্ষকে আপাদমস্তক দেখে নিয়ে বললেন, তোমার নিজের অতীতের কথা মনে আছে গুরগিন খাঁ ?

প্রশ্ন শুনে গুরগিনের বিস্ময় বহুগুণ বর্ধিত হল।

—মনে আছে ইয়োর এক্সেলেন্সি।

—বেশীর ভাগ মানুষ নিজের অতীতকে ভুলে যেতে চায়। একথাও নিশ্চয় তোমার মনে আছে, খোজা পিক্রুসের ব্যবসায় তুমি গজ মেপে কাপড় বিক্রি করতে।

—পরিষ্কার মনে আছে ইয়োর এক্সেসেন্সি।

—তোমার নিজের ভবিষ্যতের কোন পরিকল্পনা ছিল না। বাকী জীবন কাপড়ের গজ মেপেই হয়তো তোমার কেটে যেত। কোথা থেকে তুলে এনে তোমায় কোথায় বসিয়েছি সুবে বাংলার মানুষ তা দেখেছে। আমি জানি, সকলে এক বাক্যে আমার দুরদৃষ্টিকে প্রশংসা করেছে।

—আমি অনুগৃহীত ইয়োর এক্সেলেন্সি। জীবনের শেষ মুহূর্ত পর্যন্ত আপনার এই অনুগ্রহের কথা আমার স্মরণ থাকবে। আমার প্রতিটি রক্তবিন্দু আপনার সেবায় নিয়োজিত আছে।

মীরকাশিম ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন।

আসন ত্যাগ করে কয়েক পা এগিয়ে এসে বললেন, তাই ছিল। আমি জানতাম আমার জন্য তুমি নিজের জীবনকে তুচ্ছ মনে কর। তোমার সততা, তোমার বিশ্বস্ততা তুলনাহীন। কিন্তু—

তিনি নিজের কথা শেষ করলেন না।

—ইয়োর এক্সেলেন্সিকে আমার বিরুদ্ধে কেউ উত্তেজিত করেছে অনুমান করছি ; আমার বিশ্বস্ততায় কোন চিড় খায় নি। পূর্বের মতো এখনও আপনার যে কোন আদেশ পালন করবার জন্য প্রস্তুত আছি।

—আমার আদেশে নিজের অগ্রজ খোজা পিক্রুসকে হত্যা করতে পার ?

—পারি।

—লক্ষ লক্ষ টাকার উৎকোচের প্রলোভনকে জয় করতে পার?

—পারি।

—পার না, পার না গুরগিন খাঁ। তাই যদি পারতে তবে তোমার পত্নীর অঙ্গশোভার জন্য মণিবেগমের বহুমূল্য অলঙ্কারের প্রয়োজন হত না।

গুরগিন হতবুদ্ধি হয়ে গেল। সে বুঝতে পারল সত্য মিথ্যা মিলিয়ে নবাব অনেক কথাই শুনেছেন। শুনেছেন অর্থে তাঁকে কৌশলে শোনান হয়েছে। তার বিরুদ্ধে তাঁর মনকে পরিচালিত করা হয়েছে। ক্ষুব্ধ হয়েছেন মীরকাশিম।

রুষ্ট হয়েছেন।

গুরগিন বিনীত কণ্ঠে বললে, আমার দুর্ভাগ্য, ইয়োর এক্সেলেন্সি আমার সততাকে সন্দেহের চোখে দেখছেন। আমার স্ত্রীকে খোজা পিক্রুস কিছু অলঙ্কার উপহার দিয়েছিল, স্বাভাবিক কারণেই তিনি সেগুলি গ্রহণ করেছিলেন। অলঙ্কারগুলি মণিবেগম কর্তৃক প্রেরিত আমাদের অজ্ঞাত ছিল। আমি নগণ্য বিদেশী, আমার উপর আপনি অপর্যাপ্ত অনুগ্রহ প্রদর্শন করেছেন। সহযোগীরা অনেকেই তা পছন্দ করেন নি জানি। তাঁরা আমার বিরুদ্ধে গভীর চক্রান্ত সৃষ্টি করতে পারেন, ইয়োর এক্সেলেন্সি অনুমান করে নিয়েছেন ভরসা করি।

মীরকাশিম কিছুক্ষণ মূক রইলেন।

গভীরভাবে কিছু চিন্তা করছেন যেন।

ফিরে গেলেন নিজের আসনে। বললেন তারপর, ও আলোচনা এখন থাক। প্রচুর অবসর আসবে এই বিষয় নিয়ে আলাপ-আলোচনা করবার। কিছু কাজের কথা হোক।

—আদেশ করুন।

—উদয়নালার প্রস্তুতি বোধহয় সম্পূর্ণ ?

—এখনও অসম্পূর্ণ ইয়োর এক্সেলেন্সি।

—অসম্পূর্ণ! অসম্পূর্ণ কেন ?

—উদয়নালার দায়িত্ব আপনি আমার উপর ন্যস্ত করেন নি। তবু আমি ওখানকার সংবাদ পুঙ্খানুপুঙ্খ ভাবে রেখেছি। আয়োজন সম্পূর্ণ করা অসম্ভব। সৈন্যদের মধ্যে শৃঙ্খলাবোধ নেই। ইংরেজদের শক্তিকে অকারণ ভয় করবার প্রবণতা রয়েছে।

—হুঁ। তুমি যদি এই সময় তখ্‌তের অধিকারী হতে তোমার করণীয় কি হত গুরগিন খাঁ ?

গুরগিন উত্তর দিতে গিয়েও উত্তর দিল না।

—কি করতে তুমি এই সময় ?

—আমার ধৃষ্টতা মার্জনা করবেন। এই অবস্থায় আমি জাফার আলীর সঙ্গে সন্ধি করতাম।

—সন্ধি করতে!

—অনেক বিবেচনার পরই এই কাজ আমায় করতে হত। নিজেকে সম্পূর্ণ প্রস্তুত করে নেবার জন্য চাই সময়। শত্রুর সঙ্গে সন্ধি না করে নিলে সে সময় আমি পাব না। ইতিমধ্যে অবশ্য আরো একটি পরিকল্পনাকে কার্য্যকরী করে নিতে হবে।

—কোন্ পরিকল্পনা ?

—জাফার আলী ও ইংরেজদের মধ্যে মনোমালিন্য ঘটিয়ে দিতে হবে। মনোমালিন্য হলে স্বাভাবিকভাবেই শত্রুপক্ষ দুর্বল হয়ে পড়বে। এই কাজটি সম্ভবপর করা খুব কঠিন হবে না।

বিরস মুখে মীরকাশিম শুনছিলেন।

—কঠিন না হবার কারণ ? নিরাসক্ত কণ্ঠে প্রশ্ন করলেন।

গুরগিনের ধারণা হল তার বক্তব্য নবাব শুনছেন একাগ্র মনে। কিঞ্চিৎ উৎসাহের সঙ্গে বললে, অর্থলোভী সুবিধাবাদীর অভাব সুবে

বাংলায় নেই ইয়োর এক্সেলেন্সি। জাফার আলীর অনেক বিশ্বস্ত কর্মচারী টাকার লোভে তাঁর বুকে ছুরি পর্যন্ত বসাতে পারবে।

একথা আমার সম্পর্কেও প্রয়োজ্য। আমার বিশ্বস্ত অনুচরেরা যে আমার প্রতি অস্ত্র উঁচিয়ে নেই একথা কি তুমি দৃঢ়তার সঙ্গে বলতে পার ?

—সকলের কথা আমি বলতে পারব না ইয়োর এক্সেলেন্সি। আমিও আমার আর্মানী সৈন্যরা আপনাকে ঈশ্বরের অংশ বলে মনে করে থাকি একথা নিশ্চিত।

মীরকাশিমের মুখে ক্ষীণ হাসি ফুটে উঠে মিলিয়ে গেল। তিনি গুরগিনের প্রকৃত স্বরূপ সম্পর্কে স্থির নিশ্চিত হলেন। বহুদর্শী নবাব নিজের মনের কোণে এ চিন্তাকে স্থান দিলেন না যে, তাঁব এই সহচর তাঁকে বিপথে পরিচালিত করছেন। তাঁর মতো উন্নত হৃদয়ের মানুষের পক্ষে কোন কদর্য কাজ করা কোনমতে সম্ভব নয়। নিজের পূর্বেকার চিন্তাশক্তি নবাব ক্রমেই হারিয়ে ফেলেছেন। চতুর্দিকের পরিস্থিতি জটিল হয়ে ওঠার দরুন তাঁর মনে অজস্র বিকার ক্রমেই বাসা বাঁধছে।

তিনি নিজের চারপাশের মানুষগুলিকে বিশ্বাসঘাতক ছাড়া আর কিছু মনে করতে পারছেন না। পূর্বে—অনেক পূর্বে মৃত্যুকে তিনি ভয় করতেন না। স্বাভাবিক নিয়মে ওই পর্বটি যথাসময় সমাধা হবে সুতরাং ও নিয়ে কিছু চিন্তা করবার ছিল না। কিন্তু এখন ওই চিন্তাটি তাঁর প্রধান চিন্তা হয়ে দাঁড়িয়েছে। অনুচরদের উপর সতর্ক দৃষ্টি রেখেছেন। তাদের সামান্যতম অসংলগ্ন ব্যবহারকে তিনি আর ক্ষমার চোখে দেখতে প্রস্তুত নন।

গুরগিনের সঙ্গে কথাবার্তা চালিয়ে যাবার আর কোন সার্থকতা নেই নবাব বুঝলেন। গুরগিন খাঁ অবশ্য বুঝতে পারল না, পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার সময় তার সমাসন্ন। আর কোন কথা বললেন

না নবাব। গুরগিনকে ইঙ্গিতে গৃহে প্রত্যাবর্তন করবার আদেশ দিলেন।

সে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে যাওয়ার পরই ইব্রাহিম ও নজাফ খাঁকে আহ্বান করা হল। তারা কুর্নিশ করে এসে দাঁড়াতেই নবাব বললেন, গুরগিন নিজের গৃহে ফিরে যাচ্ছে। পথটি অন্ধকারাচ্ছন্ন। ঐ অন্ধকারাচ্ছন্ন পথে তোমরা তার পূর্বেই পৌঁছতে পারবে আমি বিশ্বাস করি।

ইব্রাহিম ও নজাফের মধ্যে দৃষ্টি বিনিময় হল।

তারা দুজনেই নবাবের মনের কথা বুঝতে পেরেছে। তারা বুঝতে পেরেছে, উনি ইঙ্গিতে একটি বিশেষ আদেশ দিলেন। ইব্রাহিমের মন আনন্দে নেচে উঠল। তার পরিকল্পনা সফল হয়েছে। পথের কাঁটা এতদিন পরে দূর হবে। সে কুর্নিশ করে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হল। নজাফ খাঁ অনুসরণ করল তাকে।

অসম্ভব উত্তেজিত অবস্থায় ইব্রাহিম প্রাসাদের বাইরে এল।

নজাফ খাঁর সঙ্গে কোন রকম পরামর্শ করবার বিন্দুমাত্র প্রয়োজনীয়তা আছে বলে সে মনে করল না। নিজের কয়েকজন অন্তরঙ্গ অনুচরকে সঙ্গে নিয়ে ধাবিত হল গুরগিনের আবাসস্থল পীর পাহাড়ের উদ্দেশ্যে। সমস্ত পথ সতর্কতার সঙ্গে অগ্রসর হল তারা।

গুরগিনের সাক্ষাৎ পাওয়া গেল না। সাক্ষাৎ পাওয়া না যাবার কারণ হল, সে গৃহে প্রত্যাবর্তন করে নি। প্রাসাদ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়ে ক্ষুব্ধচিত্তে নিজের অধীনস্থ সৈন্যদের ছাউনতে গেছে। তার মনে দৃঢ় বিশ্বাস জন্মেছে, সহজ উপায়ে করায়ত্ত তাকে করতে না পেরে, বাঁকা পথে গভীর চক্রান্তর সৃষ্টি করে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করেছে কেউ।

আর্মানী সৈন্যদের ছাউনিতে এখন যাবার উদ্দেশ্য হল, অর্থের লোভ দেখিয়ে কজনকে পিক্রস দলে টানবার চেষ্টা করেছে তা পরীক্ষা করে দেখা। কাজটি নিঃসন্দেহে কঠিন। কঠিন হোক তবু চেষ্টা করে দেখতে হবে। বিন্দুমাত্র দয়া-মায়া কারুর প্রতি প্রদর্শন করবে না গুরগিন। সন্দেহের প্রথম অবকাশেই নির্মমভাবে তাকে হত্যা করা হবে।

অসংখ্য বিশ্বাসঘাতক অনুচর নিয়ে যুদ্ধক্ষেত্রে উপস্থিত থাকা অপেক্ষা অল্পসংখ্যক বিশ্বস্ত অনুচর নিয়ে শত্রুর উপর ঝাঁপিয়ে পড়া সহস্রগুণ ভাল। গুরগিন নিজের সততার চূড়ান্ত দৃষ্টান্ত নবাবের সামনে তুলে ধরতে চায়। এদিকে—

একটি সুবিধাজনক স্থান বেছে নিয়ে সঅনুচর ইব্রাহিম অপেক্ষা করছে। পাহাড়ের চূড়ায় গুরগিনের চমৎকার আবাসস্থলটি চাঁদের আলোয় পরিষ্কার দেখা যায়। আর্মানী সান্ত্রীরা পাহারা দিচ্ছে। তাদের ভারী পদশব্দ চতুর্দিকে প্রতিধ্বনিত হচ্ছে ক্ষণে ক্ষণে।

সময় অতিক্রম করে চলেছে।

গুরগিনের সাক্ষাৎ নেই।

অসীম ধৈর্যের সঙ্গে অপেক্ষা করছে ইব্রাহিম। মশককুল সমস্ত শরীর ক্ষতবিক্ষত করে দিচ্ছে, তার ভ্রূক্ষেপ নেই। ভবিষ্যতের সোনালী চিন্তায় সে মোহিত হয়ে রয়েছে।

কিছু সময় আরো অতিক্রান্ত হল।

আচম্বিতে একটি চিন্তা ইব্রাহিমের মনকে আলোড়িত করে তুলল। গুরগিনের প্রত্যাবর্তন করতে বিলম্ব হচ্ছে। এই অবসরে তার স্ত্রীকে করায়ত্ত করে নিতে পারলে মন্দ হয় না। আর্মেনিয়ান নারী অপূর্ব সুন্দরী হয় ইব্রাহিম জানে। এবং এও তার অজানা নয় যে, গুরগিনের অর্ধাঙ্গিনীর সৌন্দর্য তুলনাহীন। বহুবার লোলুপ দৃষ্টি হেনেছে সেই নারী রত্নটিকে দেখবার। সফলকাম হতে পারে নি।

এই হল চমৎকার অবসর। গুরগিনের মৃত্যু পর্যন্ত অপেক্ষা করলে সমস্ত কিছু ভণ্ডুল হয়ে যাওয়ার সম্ভাবনা প্রবল। তখন নজাফ খাঁও সৈয়দবান্দার মতো অংশিদারকে ঠেকিয়ে রাখা কষ্টকর হবে। সুতরাং পূর্বেই কাজ গুছিয়ে রাখা বুদ্ধিমানের কাজ।

নারী হরণের উল্লেখ না করে ইব্রাহিম অনুচরদের জানাল, গুরগিন প্রত্যাবর্তন করবার পূর্বে তার গৃহটি অধিকার করে নেওয়া প্রয়োজন। এই কাজটি বাস্তবে রূপ দিতে গেলে প্রথমে সান্ত্রীদের স্থানচ্যুত করতে হবে। মনে হয় জন দশেকের বেশী ওরা ওখানে নেই। দু-চার কথায় পরিকল্পনা স্থির হয়ে গেল।

দু-চারজন পাহাড়ের কিছু দূর উঠে গিয়ে সামান্য শব্দের সৃষ্টি করবে। সেই শব্দ শুনে স্বাভাবিক কারণেই সান্ত্রীরা শব্দের উৎস সন্ধান করতে নেমে আসবে। তারা নেমে আসা মাত্র তাদের হত্যা করা হবে।

যেমন আশা করা গিয়েছিল কার্যক্ষেত্রে তাই ঘটল।

সান্ত্রীরা অতর্কিতভাবে আক্রান্ত হয়ে নিজেদের রক্ষা করতে পারল না। একজন মানুষের খেয়াল খুশীর শিকার হয়ে তারা পৃথিবী থেকে বিদায় নিল। ইব্রাহিমের পক্ষে দুজন গুরুতররূপে আহত হল। মৃতদেহগুলি সরিয়ে নিয়ে যাওয়া হল ঝোপের মধ্যে। আহতদের ঔষুধপত্রের কোন ব্যবস্থা করা গেল না। এই মুহূর্তে এখান থেকে তাদের নগরে নিয়ে যাওয়াও কষ্টকর। সুতরাং নিশ্চিতভাবে ধরে নেওয়া চলে ওদের প্রাণ দেহের মধ্যে বেশীক্ষণ স্পন্দন সৃষ্টি করবে না।

ইব্রাহিম কয়েকজনকে সঙ্গে নিয়ে উপরে উঠে চলল।

উৎকুণ্ঠিতা মোভা তখন গুরগিনের অপেক্ষায় বসেছিল।

এত বিলম্ব হওয়ার কোন সঙ্গত কারণ সে খুঁজে পাচ্ছিল না। এমন বহুবার হয়েছে, গৃহে ফেরবার সম্ভাবনা নির্দিষ্ট সময়ে নেই অনুমান করা মাত্র গুরগিন সংবাদ পাঠিয়েছে। মোভা নিশ্চিন্ত থেকেছে। কিন্তু আজ তার ব্যতিক্রম হচ্ছে কেন?

চিন্তা করতে করতে মোভা কিছু অন্যমনস্ক হয়ে পড়েছিল। কিসের শব্দ কানে যেতে তার চমক ভাঙল। আসন ছেড়ে উঠে দাঁড়াল সে। গুরগিন ফিরে এল কি? দ্রুত পায়ে মোভা কক্ষ থেকে অলিন্দে এল।

কেউ কোথাও নেই।

শুধু রন্ধনশালা থেকে দাসীদের কলহাস্য শুনতে পাওয়া যাচ্ছে।

মোভা আবার কক্ষে ফিরে আসছিল। কয়েক পা অগ্রসর হবার পর দাঁড়িয়ে পড়ল সে অনড়ভাবে। এক অবিশ্বাস্য দৃশ্য তার চোখের উপর ধরা দিল। অলিন্দের শেষ প্রান্তে এসে দাঁড়িয়েছে একজন। তার দুচোখের দৃষ্টিতে লোভের আগুন ধকধক করে জ্বলছে।

বলা বাহুল্য আগন্তুক আর কেউ নয় ইব্রাহিম।

প্রথমে বিলক্ষণ ঘাবড়ে গিয়েছিল মোভা। দ্রুত সংযত করল নিজেকে। সে ভুল দেখেছে। আগন্তুকের দৃষ্টি স্বাভাবিক। ও বোধ হয় সংবাদ বাহক। গুরগিনের ফিরে আসতে বিলম্ব হবে এই কথা বোধহয় জানাতে এসেছে।

কিছুদূর অগ্রসর হয়ে মোভা প্রশ্ন করল, কি সংবাদ এনেছো?

নির্বিকার কণ্ঠে ইব্রাহিম বললে, গুরগিন খাঁ বিশেষ ব্যস্ত হয়ে পড়েছেন নগরে। দিন দুয়েক ফিরে আসবার সম্ভাবনা নেই। তিনি আমাকে পাঠিয়েছেন। আপনাকে সঙ্গে করে নগরে নিয়ে যাবার জন্য।

—কিন্তু……

—যাওয়া না যাওয়া আপনার ইচ্ছা। আমি তাঁর আদেশে এখানে এসেছি আপনি সঙ্গে না গেলে তিনি অত্যন্ত অসন্তুষ্ট হবেন নিঃসন্দেহে।

সন্দেহের দোলায় দুলতে লাগল। সত্যই কি গুরগিন তাকে নগরে নিয়ে যাবার জন্য লোক পাঠিয়েছে। পূর্বে এরকম যে কয়েকবার না হয়েছে তা নয়। তবে প্রতিবার তাকে সঙ্গে নিয়ে গেছে কোন না

কোন একজন আর্মেনিয়ান। এবার মুসলমান কেন? এই ব্যতিক্রম স্বাভাবিকভাবে তার মনে সন্দেহের উদ্রেক করতে লাগল।

—আপনি অপরিচিত। আপনার সঙ্গে একা যাওয়া আমার পক্ষে সম্ভব হবে না। লুকাসকে আহ্বান করুন সে যাবে আমাদের সঙ্গে।

ইব্রাহিম কিছু অগ্রসর হয়েছে।

—লুকাস কি এখানকার কোন রক্ষী? তার পক্ষে........

তার কথা শেষ হল না, রন্ধনশালা থেকে দাসীদের আর্ত চীৎকার ভেসে এল। তারপর ধ্বস্তাধ্বস্তির পরিষ্কার আওয়াজ শুনতে পাওয়া গেল। সন্দেহের আর অবকাশ নেই। মোভা নিজের বিপদের গুরুত্ব বুঝতে পেরে দ্রুত কক্ষের দিকে অগ্রসর হল।

ইব্রাহিম নিশ্চেষ্ট নেই। সঙ্গে সঙ্গে ধাবিত হল সে। কক্ষ থেকে কক্ষান্তরে ছুটে চলল মোভা। ওই সঙ্গে তীক্ষ্ণ কণ্ঠে অবিরাম আহ্বান করে চলল রক্ষীদের। তাকে সাহায্য করবার জন্য কেউ এগিয়ে আসছে। পৃথিবীর পরপারে চলে গেছে যারা তাদের আসবার সাধ্য কোথায়?

দুশ্চিন্তার বোঝা মাথায় নিয়ে এতক্ষণে বোধহয় গুরগিন ফিরে আসছে। সে কল্পনাও করতে পারছে না তার সুরম্যগৃহে আরেক ভয়ানক ভয়াবহ দৃশ্যের অবতারণা হয়েছে। ক্রমেই ক্লান্ত হয়ে পড়ছে মোভা। দুজনের দূরত্ব কমে আসছে। ইব্রাহিমের মুখে ক্লেদাক্ত হাসি। বাসনায় জর্জরিত পাশব পুরুষ নিজের শিকারকে খেলিয়ে তোলবার আনন্দে আত্মহারা।

গৃহের শেষ প্রান্তে—মোভা পাহাড়ের ধারে গিয়ে পড়ল। আর এক পা অগ্রসর হলে গভীর খাদে তলিয়ে যাবে তার অনিন্দ্য দেহ। পথ নেই, নিজেকে রক্ষা করবার আর কোন পথ উন্মুক্ত নেই। ইব্রাহিমের আর ব্যস্ততা নেই। সে অতি ধীর পদক্ষেপে এগিয়ে আসতে আসতে

বললে, ও ধারে মৃত্যু, এ ধারে জীবন—জানেমান, বেছে নাও কি চাও তুমি।

আহত সিংহীর মতো ফুঁসে উঠল মোভা।

—এর উপযুক্ত শাস্তি তুমি পাবে। আমার স্বামী ……

তাকে কথা শেষ করতে দিল না ইব্রাহিম। তার কণ্ঠে বিদ্রূপের হাসির ঢেউ জাগল। বলল দ্রুত কণ্ঠে, তোমার স্বামী, ওই অপদার্থ আর্মেনিয়ান? তার বুকের রক্ত এতক্ষণ বোধ হয় ধুলার সঙ্গে মাখামাখি হয়ে গেছে পিয়ারী। প্রচণ্ড আঘাত মোভাকে স্তব্ধ করে দিল। পর মুহূর্তে মনের মধ্যে এক যন্ত্রণা হুহু করে উঠল।

গ্রেগ নেই!!!

তাকে হত্যা করেছে এই পাষণ্ড?

না না, মিথ্যা কথা। তাকে প্রতারিত করছে লোকটি। কিন্তু গ্রেগারী বেঁচে থাকলে কারুর সাধ্য হত কি এই গৃহে প্রবেশ করে তার নিরাপত্তাকে ছিন্নভিন্ন করে দিতে?

অসহায় মোভা দুস্তর খাদের দিকে দৃষ্টিপাত করল।

গভীর অন্ধকার হাতছানি দিয়ে ডাকছে তাকে। গ্রেগ নেই। জীবনের শ্রেষ্ঠ সম্পদ আজ তার হস্তচ্যুত। মোভা আকুল হয়ে উঠল। কান্নায় ভেঙে পড়তে চাইল মন। কিন্তু সে অবসর কোথায়? দুবাহু প্রসারিত করে লোভাতুর চিত্তে এগিয়ে আসছে নিজের নক্কারজনক অবয়ব নিয়ে লোকটি।

ইব্রাহিম ও মোভার দূরত্ব এখন মাত্র হাত তিনেকের।

—ওখান থেকে সরে এস মেরিজান। নাটকীয়ভাবে হঠকারিতা প্রকাশ করে বসলে নিজেকে ঠকাবে। গুরগিন খাঁ তোমাকে কতটুকু স্বাচ্ছন্দ্য দিতে পেরেছে?

মণিমুক্তায় তোমায় মুড়ে দেব। জীবনকে উপভোগ করবে বোখারোর নেশা যুক্ত সরাবের মতো।

ইব্রাহিম আরো অগ্রসর হল।

মোভা আর ইতস্তত করল না। অল্প একটু শব্দ হল যেন, তারপর তার দেহ অতল গহ্বরে তলিয়ে গেল। ইব্রাহিম নিজের জীবনে এমন অবিশ্বাস্য দৃশ্য কখন দেখেনি। সমস্ত পাওয়াকে উপেক্ষা করে এক মুহূর্তে নিজের জীবনকে শেষ করে দেওয়া নিবুর্দ্ধিতা ছাড়া আর কি। আর্মেনিয়ান মেয়েদের যে এত তেজ, বিমূঢ় অবস্থায় বেশীক্ষণ চিন্তা করবার:অবসর পেল না ইব্রাহিম। অশ্বের পদশব্দ কানে এসে বাজল। গুরগিন আসছে। তার জীবনের সমস্ত আশা আকাঙ্ক্ষার প্রতিবন্ধক গুরগিন খাঁ আসছে। অস্ত্রের ঝনৎকারে এবার সমস্ত প্রতিবন্ধককে দূরে নিক্ষেপ করবে সে।

ইব্রাহিম ফিরে চলল।

ওধারে—

সান্ত্রীদের দেখতে না পায়ে গুরগিন বিস্মিতভাবে চতুর্দিকে তাকাল। কোথায় গেল তারা? লুকাস তো মদ্যপ নয় তার অনুপস্থিতিতে সে যে সঙ্গীদের নিয়ে নেশার হররা তুলবে তাও তো নয়। তবে?

গুরগিন গৃহে প্রবেশ করল। চতুর্দিকে কেমন বিশৃঙ্খলা ভাব। খাঁখাঁ করছে তার মর্মরসৌধ। কি হয়েছে? মোভা কোথায়? দাসীরাই বা কোথায় গেল?

গুরগিন উচ্চকণ্ঠে ডাকল, মোভা—মোভা—

মোভার কাছ থেকে কোন উত্তর পাওয়া গেল না। প্রতিবারের মতো দ্রুত পায়ে এসে তার বুকে আশ্রয় নিল না। শুধু তার কণ্ঠস্বর প্রতিধ্বনিত হতে হতে দূর দূরান্তরে চলে গেল। উদ্বিগ্ন গুরগিন আবার উচ্চকণ্ঠে আহ্বান করল মোভাকে।

মোভা এল না। এসে দাঁড়ল ইব্রাহিম।

তার মুখে ক্রুর হাসি। হাতে উন্মুক্ত অস্ত্র।

—একি! তুমি?

গুরগিন বিস্ময়ের শেষ প্রান্তে।

—আমার গৃহে অনধিকার প্রবেশ করে কতদূর ধৃষ্টতার পরিচয় দিয়েছো। সে জ্ঞান তোমার আছে?

ঝলসে উঠল ইব্রাহিম।

—এ গৃহ আমার। নবাবের সমস্ত অনুগ্রহ তুমি হারিয়েছো। আনাদৃত পথের কুকুরের চেয়েও তোমার জীবনের মূল্য এখন বেশী নয়।

—মিথ্যে কথা। ষড়যন্ত্র—পূর্বে অনেক উপায়ে তুমি আমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করেছো। পার নি। আজ এসেছো এক নতুন পন্থা নিয়ে। কোথায় আমার মোভা? কোথায়, কিভাবে তাকে রেখেছো তুমি?

—তাকে ভালভাবেই রাখতে চেয়েছিলাম। বুদ্ধিহীনা নারী। নিজের ভবিষ্যতের কথা চিন্তা না করেই খাদে লাফিয়ে পড়ল।

—শয়তান।

গুরগিন খাপ থেকে তরবারি উন্মুক্ত করে ঝাঁপিয়ে পড়ল ইব্রাহিমের উপর। প্রথম আঘাতেই ইব্রাহিম পড়ে গেল। দক্ষিণ বাহুতে সৃষ্টি হল ক্ষত। অবিরল ধারায় বেরিয়ে আসতে লাগল রক্ত। সে চেষ্টা করেও উঠে দাঁড়াতে পারল না। গুরগিন দ্বিতীয় আঘাত হানবার জন্য উদ্যত হল। কিন্তু আঘাত আর হানা হল না। ইব্রাহিমের একজন অনুচর পিছনে এসে দাঁড়িয়েছিল। তার তরবারি গুরগিনের দেহ ভেদ করল।

আর্ত চীৎকার বেরিয়ে এল গুরগিনের মুখ দিয়ে। অতর্কিতে এই ভাবে আক্রান্ত হবার জন্য প্রস্তুত ছিল না। হাত থেকে পড়ে গেল অস্ত্র। দুলে উঠল দেহ। তারপর মাটি গ্রহণ করল সে। উপর্যোপরি আঘাত তখন হেনে চলেছে ইব্রাহিমের অনুচর। ভলকে ভলকে আর্মেনিয়ান রক্ত বেরিয়ে এসে মর্মর চত্বর আরক্ত করে তুলল।

বহু যুদ্ধের খ্যাতিমান সেনানায়ক গুরগিন নিস্তেজ হয়ে পড়ল।

আঘাতের বিরাম নেই। মরিয়া হয়ে আঘাত করে চলেছে লোকটি। মানুষের জীবন অত্যন্ত ঠুনকো। এত আঘাত সহ্য করার শক্তি তার কোথায়? গুরগিন খাঁর জীবনের উপর মৃত্যুর যবনিকা পড়ে গেল।
অনেক আশা, অনেক আকাঙ্ক্ষা, প্রচুর কর্মশক্তি নিয়ে আর্মেনিয়ার একটি ক্ষুদ্র গ্রাম থেকে জন গ্রেগারী হিন্দুস্থানে এসেছিল। বিশ্বাসের মর্যাদা রাখবার আপ্রাণ চেষ্টা সে করেছিল। কিন্তু বিশ্বাসঘাতকতার অপবাদ মাথায় নিয়ে মর্মন্তুদভাবে মৃত্যুবরণ করল।
আঘাত জর্জরিত শরীরে পৃথিবী থেকে বিদায় নেবার পূর্ব মুহূর্তে অনেক অভিমান হয়তো তার মনে সঞ্চিত ছিল। মোভা অপেক্ষা করছে। জীবনের পরপারে তার মন থেকে এই অভিমানকে মোভা মুছে ফেলতে পারবে কিনা কে বলতে পারে।

পাঁচ হাজার সৈন্য নিয়ে মেজরটমাস অ্যাডমস এগিয়ে চলেছেন বাদশাহী সড়ক ধরে। তাঁর গন্তব্য স্থল উদয়নালা। মীরকাশিমের এই তুর্ভেদ্য ঘাঁটির পতন ঘটানোর জন্য দৃঢ় বদ্ধ মনোভাব নিয়ে তিনি এগিয়ে চলেছেন।
অবশ্য তাঁর মনের কোণে আশঙ্কার মেঘ যে সঞ্চিত নেই একথা বললে সত্যের অপলাপ করা হবে। তিনি শুনেছেন তুর্গটি রক্ষা করার জন্য নবাব নিজের সর্বশক্তি প্রয়োগ করেছেন। অজস্র সৈন্যের সমাবেশ হয়েছে ওখানে। অথচ তাঁর সৈন্য সংখ্যা মাত্র পাঁচ হাজার। ইংরেজ এক হাজার ও চার হাজার তেলেঙ্গী।
যুদ্ধের সময় ওই চার হাজার তেলেঙ্গী যদি বিশ্বাসঘাতকতা করে তবে জয়ের আশা সম্পূর্ণ নির্মূল তো হবেই, উপরন্তু এক হাজার ইংরেজকে মর্মন্তুদভাবে মৃত্যুবরণ করতে হবে। এই সম্ভাবনার কথা গভর্নরকে জানিয়ে ছিলেন অ্যাডমস। অনুরোধ করেছিলেন আরো কয়েক হাজার

ইংরেজকে তাঁর সঙ্গে যুক্ত করে দিতে। ভ্যান্সিটার্টের পক্ষে এই অনুরোধ রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। সৈন্যের অভাব থাকায় তিনি অক্ষমতা প্রকাশ করেছেন তা নয়।

চতুর্দিকের বিশৃঙ্খলাকে আয়ত্তে আনবার জন্য অজস্র ইংরেজ সৈন্য নিযুক্ত আছে। তাদের যথাস্থান থেকে সরিয়ে আনলে আবার বিশৃঙ্খলার সৃষ্টি হবে। কাজেই বাস্তবতাকে হৃদয়ঙ্গম করা সত্ত্বেও অক্ষমতার অন্তরালে নিজেকে সরিয়ে নিয়েছেন ভ্যান্সিটার্ট। কাজেই উপায়হীন অ্যাডমস এগিয়ে চলেছেন উদয়নালার পথে। রবার্ট ক্লাইভকেও এই রকম উপায়হীন অবস্থায় পলাশীর প্রান্তে উপস্থিত হতে হয়েছিল। সেদিন তাঁর মনেও দৃঢ়তার অভাব ছিল না। ছিল শুধু ক্ষীণ আশঙ্কা—প্রবল সৈন্য পরিপুষ্ট নবাব বাহিনীকে যদি অল্প সংখ্যক ইংরেজ পরাজিত করতে পারে……অ্যাডমস উদয়নালা সম্পর্কে পুঙ্খানুপুঙ্খ সংবাদ সংগ্রহ করেছেন। বাংলা যেখানে শেষ হয়েছে, বিহারের আরম্ভ—এই গুরুত্ব পূর্ণ স্থানে দুর্গটি অবস্থিত হওয়ায় রণতন্ত্রের ক্ষেত্রে বিশেষ মূল্যবান। এই স্থানে দুর্গটি প্রথম কে নির্মাণ করেন তা অনুমান করা কঠিন। এর একধারে প্রবল স্রোতে বয়ে চলেছে ভাগীরথী অন্য ধারে উদয়নামে একটি পাহাড়ী নদী। আরেক দিক বেষ্টন করে রয়েছে বিরাট দৈত্যের মতো পর্বত। স্থানটি দুরধিগম্য সন্দেহ নেই।

মীরকাশিম পুরাতন ক্ষুদ্র দুর্গটিকে বিরাট আকার দিয়েছেন। সুদৃঢ় প্রাচীর বিস্তারিত হয়েছে চতুর্দিকে। প্রাচীরের উপর সারি সারি কামান পেতে রাখা হয়েছে। অতি অল্প সংখ্যক সৈন্য এগুলিকে পরিচালিত করলে প্রবল প্রতিপক্ষের গতিরোধ করা সহজেই সম্ভব। এখানে প্রচুর সৈন্য সমাবেশ হয়েছে। গিরিয়ার যুদ্ধে পরাজিত, পৃষ্ঠ প্রদর্শনকারীরাও এখানে সমবেত হয়েছে। ইংরেজদের উপযুক্ত শিক্ষা দেবার অবসর উপস্থিত এই চিন্তা করে সকলে উৎফুল্ল।

অ্যাডমস সসৈন্যে চলেছেন পদব্রজে। মালপত্র, কামান, গোলা-বারুদ ইত্যাদি নৌকায় নিয়ে যাওয়া হচ্ছে ভাগীরথীতে ভাসিয়ে। ক্রমে তাঁর চলার পথের শেষ হল। অবশ্য তিনি সদলে দুর্গের মুখোমুখি গিয়ে দাঁড়ালেন না। নবাবের সতর্ক কামান তাঁদের নিশ্চিহ্ন করে দেবে এ জ্ঞান তাঁর আছে।

উদয়নালা থেকে পালকিপুরের দূরত্ব একক্রোশের।

পালকিপুরে ছাউনি ফেললেন অ্যাডমস। আবির্ভাবের সঙ্গে সঙ্গে গ্রাম বাসীরা গ্রাম ছেড়ে অদৃশ্য হল। তাদের গৃহগুলি অধিকার করল তেলেঙ্গী সৈন্যরা। ইংরেজদের জন্য উন্নত শ্রেণীর অস্থায়ী আবাস নির্মিত হল। অ্যাডমস সহযোগীদের সঙ্গে মন্ত্রণায় বসলেন। দুর্গের অবস্থান সম্পর্কে সকলে নানা আলোচনার অবতারণা করলেন। সম্মুখ যুদ্ধে দুর্গটি অধিকার করা সম্পূর্ণ অসম্ভব এ সম্পর্কে কারুর দ্বিমত নেই।

এখন একটি মাত্র উপায় আছে।

কৌশল।

লেফটেনেণ্ট মর্গান বললেন, সতর্কতার সঙ্গে আমাদের কৌশলটি চিন্তা করতে হবে। পিক্রুস মুঙ্গেরে গিয়েছিল নবাব বাহিনীর কয়েকজনকে আমাদের দলে টানতে। আমার দৃঢ় ধারণা সে সাফল্য লাভ করেছে। মরিস বললেন, সাফল্য লাভ যদি সে করেও থাকে বর্তমানে আমাদের তো কোন সুবিধা হচ্ছে না।

—একথা ভুলে গেলে চলবে না, মুঙ্গেরের অধিকাংশ সৈন্য বর্তমানে উদয়নালার দুর্গে রয়েছে। সুতরাং সেই সুবিধাবাদীরা যে ওখানে আছে তা চিন্তা করে নিতে দোষ কি?

অ্যাডমস আলোচনা শুনছিলেন। বললেন এবার, তুমি ঠিকই বলছো মর্গান। কিন্তু তাদের সঙ্গে আমাদের দেখা-সাক্ষাৎ হবে কি ভাবে। দেখা-সাক্ষাৎ না হলে পরিকল্পনা প্রস্তুত হতে পারে না।

আমি একটি বিষয় চিন্তা করছি। তোমাদের সমর্থন পেলে—এবং কার্যকারী করতে পারলে ফল ভালই হবে আশা করি।

সকলে উৎসুক দৃষ্টিতে অধিনায়কের দিকে তাকালেন।

অ্যাডমস নিজের পরিকল্পনা বর্ণনা করলেন।

এক বাক্যে সকলে স্বাগত জানালেন তাঁর পরিকল্পনাকে।

দ্রুত কাজে হাত দেওয়া হল। জল পেরিয়ে শত্রুপক্ষর দৃষ্টি এড়িয়ে দুর্গে পৌঁছানো সম্পূর্ণ অসম্ভব। ভাগীরথীর পাড় ধরে ধীর গতিতে কোম্পানির সৈন্য অগ্রসর হল। দুর্গের দু'শ হাতের কাছাকাছি পৌঁছে অ্যাডমস ঘাঁটি গড়ে তুললেন। তিনটি উচ্চমঞ্চ প্রস্তুত হল। শক্তিশালী কয়েকটি কামান তুলে নেওয়া হল তার উপর। গোলন্দাজরা উপরে গেল।

পদাতিকরা প্রস্তুত হয়ে রইল। গোলার ঘায়ে যখন দুর্গের প্রাচীর ভেঙে পড়বে তখন তারা ঝাঁপিয়ে পড়বে নবাবের বিশৃঙ্খল সৈন্যদের উপর। তিন সপ্তাহ সময় লাগল এই সমস্ত প্রস্তুতিতে। দুর্গের অভ্যন্তরের পদস্থ কর্মচারীরা ইংরেজদের কার্যকলাপ লক্ষ্য করছিল। তাদের মন শঙ্কাকাতর হয়ে উঠেছিল সন্দেহ নেই।

একটি রক্তিম প্রাতে ইংরেজের কামান গর্জে উঠল।

প্রজ্বলিত গোলাগুলি পড়তে লাগল দুর্গপ্রাচীরের উপর। কিন্তু এত পরিশ্রম, এত পরিকল্পনা সমস্তই ব্যর্থ হল অ্যাডমসের। একটানা দ্বিপ্রহর পর্যন্ত গোলা বর্ষণ করেও দুর্গের বিন্দুমাত্র ক্ষতি করা সম্ভব হল না। নিরেট প্রাচীরগুলি ইংরেজের গোলাকে ভ্রূক্ষেপ না করে অনড় হয়ে রইল।

যে প্রবল ভয় নজাফ খাঁ, মার্কার প্রভৃতিকে গ্রাস করবার জন্য উদ্যত হয়েছিল তা দূর হল। সকলের মনে দৃঢ় ধারণা জন্মে গেল গোলার ঘায়ে এই প্রাচীর ভেঙে পড়বার নয়। নিশ্চিন্ততা এল। ইংরেজদের উপেক্ষা করবার মনোভাব আবার মনে দানা বাঁধলো।

কয়েক শো কামান দুর্গের মধ্যে রয়েছে। রসদপত্র, সাজ-সরঞ্জাম কিছুরই অভাব নেই। আছে চল্লিশ হাজার সৈন্য। সৈন্যদের সুখ সুবিধার সম্পর্কেও নবাব আন্তরিকতার সঙ্গে বিবেচনা করেছেন। সৈনিকরা যেমন যুদ্ধ করবে তেমনই তাদের হালকা অবসরেরও প্রয়োজন আছে। প্রয়োজন আছে কিঞ্চিৎ মনের খোরাকের। নবাব এখানে পাঠিয়েছেন বাঈজী, নাচওয়ালী, কসবী তবলচী আরো কত কি।

ইংরেজদের প্রস্তুতি লক্ষ করবার পর দুর্গের মধ্যে থমথমে ভাব বিরাজ করছিল। ভয় কেটে যাবার সঙ্গে সঙ্গে দুর্গ হেসে উঠল। উচ্ছল হয়ে উঠল। মাতাল হয়ে উঠল। আলোর বন্যায় ভরে গেল চারিদিক। লাস্যময়ীদের নূপুরের নিক্কণ ঘাগরার ওঠানামা মাদকতা সৃষ্টি করল যুদ্ধউন্মুখ পুরুষদের মনে মনে। আদিম অরণ্যের ক্ষুধার্ত পশু মাংস নিয়ে যেমন কাড়াকাড়ি করছে, নারীদেহ নিয়ে দৈহিক ক্ষুধা মেটাবার জন্য সেইভাবে প্রকাশ পেতে লাগল পাশব মনোভাব।

কেল্লার মধ্যে উচ্চ নীচ ভেদাভেদ শূন্যভাবে যখন উন্মত্ততার হররা চলেছে তখন কিন্তু একটি মানুষ নিজেকে এই আওতায় জড়িয়ে ফেলে নি। সেই মানুষটি হল নজাফ খাঁ। এই শঙ্কটের সময় আমোদ-আহ্লাদের ঘোর বিরুদ্ধবাদী সে। সহকর্মীদের কয়েকবার সচেতন করতে গিয়ে ব্যর্থ হয়েছে।

তার ভাগ্যে জুটেছে বিদ্রূপ।

উপেক্ষা জর্জরিত তীক্ষ্ণ হাসি।

নজাফ খাঁ আর কাউকে কিছু বলে নি। দৃঢ় মনোভাব নিয়ে নিজেই কিছু করবার জন্য সচেষ্ট হয়েছে। পারশিক মীর্জা নজাফ খাঁ ভাগ্যের অন্বেষণে হিন্দুস্থানে এসেছিল। পারস্যের এক মর্যাদাসম্পন্ন বংশে তার জন্ম। কালক্রমে পরিবারের অবস্থা দুস্থ হয়ে পড়ায় তাকে মাতৃভূমি ত্যাগ করতে হয়েছিল।

সিন্ধু প্রদেশ দিয়ে হিন্দুস্থানে প্রবেশ করে নজাফ চলে এসেছিল অযোধ্যায়। নবাব সুজাউদ্দৌলা তাকে স্থান দিয়েছিলেন নিজের ফৌজে। কিন্তু দীর্ঘদিন অযোধ্যর নবাবের অধীন কাজ করতে পারে নি নজাফ। নানা বিষয়ে বারংবার মতান্তর উপস্থিত হওয়ায় সে চাকরি পরিত্যাগ করে বাংলার উদ্দেশ্যে রওয়ানা হয়। তখন তখ্‌তে মীরজাফর নেই। দরবারে এসে চাকরি প্রার্থনা করার সঙ্গে সঙ্গে মীরকাশিম তা মঞ্জুর করেন। ক্রমে নজাফ খাঁ কর্মনিষ্ঠা ও বীরত্ব প্রদর্শন করে উচ্চপদ লাভ করেছে।

তার অনুচরের সংখ্যা প্রচুর নয়। যে কজন ছিল সকলেই বীর, নিপুণ যোদ্ধা। তাদের নিয়ে ইংরেজদের যতদূর সম্ভব ক্ষতি করবার জন্য সে প্রস্তুত হল। গুপ্তপথ ছিল। গভীর নিশীথে গুপ্তপথ দিয়ে বেরিয়ে ইংরেজ সান্ত্রীদের হত্যা করে আসত তার দলবল কিম্বা সম্পত্তির গুরুতর ক্ষতি সাধিত হত। আবার গুপ্তপথ দিয়ে মিলিয়ে যেত তারা।

পুনঃপুনঃ এই ঘটনা সংঘটিত হওয়ায় অ্যাডমস চিন্তিত হয়ে পড়লেন। চেষ্টা করেও নজাফ খাঁকে করায়ত্ত করতে পারলেন না। তবে একটি বিষয় নিশ্চিত হলেন তিনি। গুপ্তদ্বার আছে। গুপ্তদ্বার না থাকলে এইভাবে নবাবী সৈন্যদের মিলিয়ে যাওয়ার আর কোন অর্থ খুঁজে পাওয়া যায় না।

গুপ্তপথটি আবিষ্কৃত হবে কি ভাবে?

প্রকৃতপক্ষে ইংরেজরা কোন দিনই গুপ্তপথ আবিষ্কার করতে পারতো না। কিছু দিন চিন্তাচ্ছন্ন মনে অপেক্ষা করে সদলে স্থান ত্যাগ করতে হত অ্যাডমসকে। উদয়নালা দুর্গ জয় করা সম্ভব হত না। কিন্তু বাস্তব ক্ষেত্রে তা ঘটল না। ইংরেজরা এখন ভাগ্যের কূলে দণ্ডায়মান। আচম্বিতে একটি ঘটনা ঘটে যাওয়ায় সমস্ত সমস্যার সমাধান হয়ে গেল।

একসময় একজন ইংরেজপল্টন দুর্নীতির অভিযোগ থেকে অব্যাহতি পাবার জন্য কোম্পানির ফৌজ ছেড়ে মীরকাশিমের সৈন্যবাহিনীতে এসে যোগ দেয়। মার্কারের অধীনে নিযুক্ত হয়ে সে বর্তমানে উদয়নালার দুর্গে আছে। প্রতিদিনই সে লক্ষ্য করত নজাফ খাঁ দলবল নিয়ে দুর্গের বাইরে কোথায় যায়, ফিরে আসে কিছুক্ষণ পরে। লক্ষ্য করতে করতে সে গুপ্তপথটি আবিষ্কার করে ফেলল এবং যাওয়ার উদ্দেশ্যও।

সেদিন নেশায় বুঁদ হয়ে নিজের শয্যায় পড়েছিল সে।

নেশার ঘোর কাটল মধ্যরাত্রে। নিজেকে কেমন অসহায় বোধ করতে লাগল। সুদূর ইংল্যাণ্ড—নিজের মাতৃভূমির কথা মনে পড়ল। মনে পড়ল স্ত্রী ও শিশু সন্তানটির কথা। শিশুর একবছর বয়সে সে হিন্দুস্থানে চলে এসেছে।

কেন এসেছে ?

উপার্জনের জন্য। কিন্তু এইভাবে সজন ও বন্ধুবান্ধবহীন অবস্থার মধ্যে থেকে উপার্জন করা কি স্বাস্থ্যকর ? কোম্পানির ফৌজ ছেড়ে চলে আসার জন্য তার অনুশোচনা হতে লাগল। যৎসামান্য শাস্তিকে এড়িয়ে যেতে নবাবী ফৌজে যোগ দেবার হঠকারিতা না করাই বাঞ্ছনীয় ছিল।

শয্যায় উঠে বসল সে। ইংরেজ শিবিরে যাবার দুর্নিবার ইচ্ছাকে দমন করা কষ্ট সাধ্য হয়ে উঠল। গুপ্তপথ জানা আছে। এই মুহূর্তে চলে যেতে পারে। কিন্তু—একটি আশঙ্কার প্রাচীর ব্যবধান রচনা করে রয়েছে। তাকে যদি বিশ্বাসঘাতক মনে করে, কিংবা তাকে গুপ্তচর মনে করে কঠিন শাস্তি দেওয়া হয় ?

এই সময় একটি সম্ভাবনার কথা তার মনে উদয় হল।

অ্যাডমস দীর্ঘদিন থেকে অপেক্ষা করছেন। সম্ভব অসম্ভব সমস্ত রকম চেষ্টা করেও দুর্গের একরত্তি ক্ষতিসাধন করতে পারেন নি। সে যদি

গুপ্তপথের সন্ধান দেয়। ইংরেজের জয়ের পথকে উন্মুক্ত করে দেয়? তাহলে কি তাকে ক্ষমা করা হবে না? সকলে সম্মানের দৃষ্টিতে দেখবে না?

এই বিরাট উপকারের বিনিময়ে সে নিশ্চয় সকলের দৃষ্টি আকর্ষণ করতে পারবে। মনস্থির করে ফেলল। শুভকাজে বিলম্ব হওয়া উচিত নয়। নিজের কক্ষর বাইরে এল সে। দুর্গ নিশ্চুপ, নিস্তরঙ্গ। সরাব আর নারী নিয়ে উন্মত্ত পুরুষরা শান্ত নিস্তেজ অবস্থায় যে যার শয্যায় আশ্রয় গ্রহণ করেছে। এখনও হয়তো অনেক পদস্থব্যক্তির শয্যা উত্তপ্ত করে রেখেছে দেহপসারিণীরা।

সতর্কতার কোন প্রয়োজন ছিল না। সে গুপ্তপথ দিয়ে বেরিয়ে এল দুর্গের বাইরে। বলা বাহুল্য কিছুদুর অগ্রসর হবার পর সান্ত্রীরা বাধা দিল তাকে। এই বাধাই তো তার আকাঙ্ক্ষা। মেজর অ্যাডমসের সে সাক্ষাৎপ্রার্থী একথা জানাতে বিলম্ব করল না সান্ত্রীদের। যথাস্থানে নিয়ে যাওয়া হল তাকে। অ্যাডমস তার বক্তব্য শুনলেন। শুনলেন পরম আগ্রহভরে। নিজেদের এতখানি সৌভাগ্যকে বিশ্বাস করতেও যেন তাঁর কষ্ট হচ্ছিল।

পরিশেষে আগন্তুক জানাল, তার অতীতের অপরাধ ক্ষমা করতে হবে এবং তাকে উচ্চপদস্থ কর্মচারী হিসেবে গণ্য করলে তবেই সে পথের সন্ধান দেবে। এখন যে কোন বিষয়কে তুচ্ছ জ্ঞান করার সময়। অ্যাডমস সম্মত হলেন। আজ আর কিছু করা সম্ভব নয়। ভোর হতে বিশেষ বিলম্ব নেই। আগন্তুক বিদায় নিল। স্থির হল, আগামী কাল যথাসময় এখানে এসে ইংরেজবাহিনীকে পথ দেখিয়ে নিয়ে যাবে দুর্গের অভ্যন্তরে।

পরের দিন যথাসময় আগন্তুক এল।

অ্যাডমস সসৈন্যে প্রস্তুত ছিলেন। আরভিং গোলন্দাজদের নিয়ে প্রথমে অগ্রসর হলেন। তিনি দুর্গের মুখে অপেক্ষা করবেন। মোরান

থাকবেন তাঁর পিছনে সহায়ক সেনা নিয়ে। আর সকলে আগন্তুককে অনুসরণ করল। কর্দমাক্ত পথের উপর দিয়ে অধিক দূর অগ্রসর হতে হল না। গুপ্তপথ দিয়ে ইংরেজরা দুর্গের ভিতরে গেল।
তাদের অভ্যর্থনা করবার জন্য উন্মুক্ত অস্ত্র নিয়ে কেউ অপেক্ষা করছিল না। পরম নিশ্চিন্ততায় সকলে সুপ্তির কোলে ঢলে রয়েছে। ঘুমন্ত সান্ত্রীদের প্রথমে ইংরেজ পল্টনরা পরপারে পাঠিয়ে দিল। সহস্র সতর্কতা অবলম্বন করলেও কিছু শব্দ হয়েছিল। সেই শব্দে দু এক জনের প্রথমে নিদ্রা ভঙ্গ হয়েছিল। তারপর অনেকের। দুর্গ জেগে উঠল। কিন্তু তখন আর কিছু করবার নেই। প্রধান তোরণ উন্মুক্ত হয়েছে। কামান দাগতে দাগতে কাতারে কাতারে কোম্পানির সৈন্য প্রবেশ করেছে ভিতরে।
ঘুমন্ত অবস্থায় সহস্র সহস্র সৈন্য জীবন দিল।
প্রকৃতপক্ষে যুদ্ধ কিছুই হল না। অতর্কিতে আক্রান্ত হয়ে দিশেহারা হয়ে পড়েছিল নবাবী সৈন্য। একত্রিত হয়ে বিপক্ষকে আক্রমণ করার সাহস তাদের মধ্যে অবশিষ্ট ছিল না। তারা নিজেদের প্রাণ রক্ষার জন্য দুর্গ থেকে অন্যত্র চলে যাবার জন্য তৎপর হয়ে উঠল। পলায়মান এই সমস্ত সৈন্যরা একবার চিন্তা করে দেখল না দেশ ও জাতির সর্বনাশ সাধিত করে তারা চলে যাচ্ছে। এখনও দৃঢ়তার সঙ্গে রুখে দাঁড়ালে মুষ্টিমেয় ইংরেজকে পরাস্ত করা কিছুই নয়।
নিজের কর্তব্য থেকে চ্যুত হয় নি নজাফ খাঁ। সে তার অনুচরদের নিয়ে আপ্রাণভাবে যুদ্ধ করেছে। কিন্তু তার অল্প সংখ্যক অনুচর ইংরেজের বিক্রমের জোয়ারকে রোধ করতে পারে নি। সমরু, মার্কার প্রভৃতি বিদেশী সেনানায়করা পরিস্থিতি সম্পূর্ণ প্রতিকূল লক্ষ্য করে শত্রুর দৃষ্টি বাঁচিয়ে অদৃশ্য হল।
চূড়ান্তভাবে জয় হল কোম্পানির।
চল্লিশ হাজারের মধ্যে পনেরো হাজার মৃত্যুর হিম শীতল গহ্বরে প্রবেশ

করেছে। মীরকাশিমের সমস্ত আশা-আকাঙ্ক্ষা, সমস্ত পরিশ্রম একটি ফুৎকারে নিভে গেল। ভাগ্যের প্রতিকূলতাকে লঙ্ঘন করে জয়লাভ করা শুধু কঠিন না, অসম্ভব। সেই অসম্ভবকে সম্ভব করবার চেষ্টায় ব্যাপৃত রয়েছেন মীরকাশিম। কিন্তু কতদিন—কতদিন এই ভাবে চলবে?

কয়েকদিন থেকেই আকাশে মেঘগুলি ইতস্ততভাবে ভেসে বেড়াচ্ছিল। আজ জমাট আকার নিয়েছে। মিশমিশে কালো কোন প্রাগৈতিহাসিক সরীসৃপ যেন সমস্ত আকাশকে বেষ্টন করে রয়েছে। গুমগুম শব্দ হচ্ছে থেকে থেকে।

বৃষ্টি নামবে। যে কোন মুহূর্তে নামবে।

পশ্চিমের দীর্ঘ অলিন্দে পদচারণা করছেন মীরকাশিম।

আকাশের অবস্থার মতো তাঁর মনের অবস্থাও থমথমে। কাটোয়া আর গিরিয়ার যুদ্ধের সংবাদ পাবার জন্য যেমন উদগ্রীব ছিলেন, উদয়নালার সংবাদের জন্য তাঁর তেমন আগ্রহ নেই। ওখানে কি ঘটবে তিনি যেন জানেন।

বারংবার অন্তরীক্ষ থেকে কে তাঁকে জানিয়ে দিচ্ছে, কাশিম আলী, পদে পদে নিজের প্রতিকূল ভাগ্যের দোহাই দিও না। নিজের সর্বনাশকে আমন্ত্রণ করেছো তুমি স্বয়ং। উদয়নালায় পরাজিত হলে বিভ্রান্ত হবার কিছু নেই। এই ফলাফলই তো অবধারিত। নিরপরাধ বিশ্বস্ত গুরগিনকে তুমি হত্যা করেছো! মূঢ় দাম্ভিক পুরুষ, হত্যা তাকে কর নি—হত্যা করেছো নিজের একমাত্র নির্ভরকে। হত্যা করেছো তুমি সুবে বাংলার নবাবের ভবিষ্যৎকে।

নবাবের সে কান্তি নেই। তাঁর কুঞ্চিত দীর্ঘ কেশদাম অবিন্যস্ত। প্রশান্ত ললাটে অসংখ্য চিন্তাকুটিল রেখা। বিনিদ্রা ও গভীর

দুশ্চিন্তার চিহ্ন চোখের কোলে কোলে। সংযমের বাঁধকে বেঁধে রাখা আর বুঝি সম্ভব নয়। ধৈর্য ও স্থৈর্যের প্রতীক কাশিম আলী নিজেকে সম্পূর্ণ হারিয়ে ফেলেছেন।

মানসিক দুশ্চিন্তা তাঁর ছিল। ছিল সেইদিন থেকে যেদিন তিনি তখ্ত অধিকার করেছিলেন। উত্তরোত্তর বৃদ্ধি পেয়েছিল সে দুশ্চিন্তা সন্দেহ নেই। তবে চরম আকার নিয়েছে গুরগিনের মৃত্যুর পর থেকেই। সন্দেহের দোলায় দোদুল্যমান তাঁর মন চেয়েছিল গুরগিনের মৃত্যু হোক। বিশ্বাসঘাতকদের দুনিয়ায় বেঁচে থাকার অধিকার নেই।

তবু তাকে বন্দী করে নিয়মতান্ত্রিকভাবে প্রাণদণ্ড দিতে তাঁর সঙ্কোচ হয়েছিল। ইঙ্গিতে অনুচরদের প্রশ্রয় দিয়েছিলেন। উত্তেজিত করেছিলেন তাদের বৈরীভাবকে। উৎফুল্ল ইব্রাহিম কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হয়েছিল। তাকে অনুসরণ করেছিল নজাফ। মন্ত্রণা কক্ষে কিছুক্ষণ চরম অস্থিরতার মধ্যে ছিলেন মীরকাশিম। একসময় তাঁর বিবেক তাঁকে সতর্ক করে তুলল।

বিশ্বাসঘাতকার অপবাদ দিয়ে গুরগিনকে দুনিয়া থেকে বিদায় করে দেবার অধিকার তাঁর নেই। তিনিও কি ওই অভিযোগ থেকে নিজেকে মুক্ত করতে পারেন? মীরজাফর সিরাজের সঙ্গে বিশ্বাসঘাতকতা করেছিলেন। ঘৃণার পাত্র। ওই ঘৃণার পাত্রকে সদম্ভ সম্মুখ যুদ্ধে আহ্বান করে তখ্ত অধিকার করে নেওয়া হয়তো দোষণীয় ছিল না। তা না করে নিজেকে সন্দেহের উর্ধ্বে রেখে, ষড়যন্ত্রে ইংরেজদের সঙ্গে হাত মিলিয়ে তখ্ত অধিকার করেছিলেন কেন? এও কি চরম বিশ্বাসঘাতকতা নয়?

তাঁকে যদি কৃতকর্মের জন্য আল্লাহ্ শাস্তি দিতে পারেন তবে গুরগিনকে শাস্তি দেওয়ার অধিকার থেকে ঈশ্বরকে বঞ্চিত করবার কোন অধিকার আছে তাঁর?

নবাব চীৎকার করে আহ্বান করেছিলেন আরব আলীকে।

আরব আলী কুর্নিশ করে এসে দাঁড়িয়েছিল।

—খোদাবন্দ—

—ইব্রাহিম, নজাফ এরা কি চলে গেছে?

—চলে গেছে হজরত।

—চলে গেছে। অবিলম্বে গিয়ে তাদের গতিরোধ কর আরব আলী। তাদের জানিয়ে দাও, আমার আদেশ, আমার ইচ্ছাকে যেন কার্যকরী করা না হয়।

বিস্মিত আরব আলী আদেশ পালন করবার জন্য ধাবিত হয়েছিল। কিন্তু শেষ রক্ষা করা সম্ভব হয় নি। সে ঘটনাস্থলে পৌছবার পূর্বে এই হিংসাপরায়ণ ক্লেদাক্ত পৃথিবী থেকে গুরগিন বিদায় নিয়েছিল। শান্তচিত্তে সংবাদটি গ্রহণ করতে পারেন নি নবাব। সেইদিন থেকে শোচনীয় মনের অবস্থা নিয়ে তাঁর দিন অতিবাহিত হচ্ছে।

এক সময় তাঁর মনে হয় কে যেন তাঁকে অনুসরণ করছে। মুখ ফিরিয়ে দেখতে সাহসী হন না। যদি গুরগিনের প্রেতাত্মাকে দেখতে পান। দৃষ্টি বিনিময় হতে সে যদি বলে, ইয়োর এক্সেলেন্সি এত অস্থির হয়ে পড়েছেন কেন? যা ইচ্ছা করেছিলেন সুচারুরূপে তা পালিত হয়েছে। অস্থিরতা আপনার শোভা পায় না? গজ মেপে কাপড় বেচতাম আমি। সেই আমাকে প্রধান সেনানায়কের পদ দিয়েছিলেন। ভুল বুঝতে পারার সঙ্গে সঙ্গে কঠোর শাস্তির বিধান দিয়েছেন। দুঃখ করার তো কিছু নেই।

—আছে—আছে—

চীৎকার করে উঠলেন নবাব।

—অন্তর থেকে তোমার মৃত্যু আমি চাই নি গুরগিন। আমি বিভ্রান্ত হয়েছিলাম। আমাকে ভুল পথে চালিত করা হয়েছিল। সে ভুলের মাসুল আমি দিয়েছি। এর শাস্তি আল্লাহ্ আমায় দেবেন—নিশ্চয় দেবেন।

মীরকাশিমের চীৎকার শুনে ফতেমা অলিন্দে এলেন

তাঁর মনের অবস্থাও ভাল নেই। চতুর্দিকের পরিস্থিতি তাঁকে আশঙ্কা ও দুর্ভাবনার শেষপ্রান্তে নিয়ে গিয়ে উপস্থিত করেছে।

তিনি দ্রুতকণ্ঠে প্রশ্ন করলেন, কি হল হজরত?

—কিছু হয় নি। তুমি কখনও নিজের চোখের সামনে কোন হত্যা-কারীকে দেখেছো ফতেমা?

—দেখেছি।

—দেখেছো?

—হ্যাঁ সারতাজ।

—কে, কে সে ফতেমা?

—আমার আব্বাজান। পলাশীর প্রান্তরের রক্তপিপাসু নায়ক মীরজাফর আলী।

—ঠিক, ঠিক বলেছো তুমি। ওরকম নৃশংস হত্যাকারী আমাদের কালে আর জন্মগ্রহণ করে নি। তবে একজন নয়, আরো একজনকে তুমি দেখেছো। সে তোমার সামনে উপস্থিত রয়েছে।

ছুপা পিছিয়ে গেলেন ফতেমা।

—ওকথা বলবেন না সারতাজ।

—না বলে উপায় নেই ফতেমা। গুরগিনকে আমি হত্যা করেছি।

—ওকথা ভুলে যান। ঘটনাচক্রে যা ঘটে গেছে তা নিয়ে চিন্তা করে নিজের মনকে ভারাক্রান্ত করে রাখবেন না।

—বিবেকের দংশন আমার হৃদয়কে ছত্রখান করে দিয়েছে। গুরগিনকে যে শুধু আমি হত্যা করেছি তা নয়, তার সাহায্য থেকে বঞ্চিত হয়ে আমি নিজেকেও হত্যা করেছি বেগম।

—হজরত আপনি যদি এইভাবে ভেঙে পড়েন আমি কোথায় যাব? আমার জীবন তো আপনাকে নির্ভর করেই।

মমতাভরা দৃষ্টিতে পত্নীর দিকে তাকালেন মীরকাশিম। বিন্দু বিন্দু

ঘামে ভরে উঠেছে ফতেমার অসহায় মুখ। তিনি ফতেমাকে কাছে টেনে নিয়ে বললেন,—তুমি ছাড়া আমারও তো কেউ নেই বেগম। নিজের মনকে সংযত করবার আপ্রাণ চেষ্টা করে চলেছি। কিন্তু যেখানে অজস্র ক্ষত, সমস্তগুলিকে সর্বক্ষণ প্রলেপ লাগানো কি সম্ভব? যাক ওকথা। আমি এখন মন্ত্রণা কক্ষে চলি। যে কোন মুহূর্তে উদয়নালার সংবাদ এসে পড়বে।

পত্নীর কাছ থেকে সরে এলেন তিনি।

মন্থর পায়ে অলিন্দ অতিক্রম করলেন।

সন্ধ্যার সময় সমস্ত আকাশে ঘন মেঘের আস্তারণ ছিল। ক্রমে মেঘের উপর আরো মেঘের প্রলেপ পড়েছিল। এখন বৃষ্টি আরম্ভ হল। প্রথমে বিন্দু, বিন্দু তারপর প্রবল বর্ষণ।

এই অকাল বর্ষণে আবহাওয়া আরো শীতল হয়ে উঠল।

একটি বৃহৎ কক্ষে প্রবল উৎকণ্ঠা নিয়ে অপেক্ষা করছেন জগৎশেঠ, রাজবল্লভ, রায়দুর্লভ ও স্বরূপচাঁদ। তাঁদের উৎকণ্ঠার কারণ হল, এত আয়োজনের পরও যদি ইংরেজ পরাজিত হয়ে থাকে উদয়নালায় তাহলে নিশ্চিতরূপে বিশ্বাস করতে হবে তাঁদের ভবিষ্যৎ সম্পূর্ণ অন্ধকারে ডুবে গেল। তাঁরা অপেক্ষা করছেন সংবাদবাহকের। যুদ্ধের ফলাফল কি হয়, এই সংবাদ দ্রুত বয়ে আনবার জন্য একটি লোক তাঁরা নিযুক্ত করেছেন। অবশ্য এই বিশেষ ব্যবস্থার কথা আর কারুর গোচরে নেই।

বহুক্ষণ থেকে চারজন নীরবে বসে আছেন।

এই রকম সঙ্গীন মুহূর্তে আলাপ-আলোচনায় সময় অতিবাহিত করতে মন চায় না। উৎকণ্ঠার শেষ প্রান্তে উপস্থিত হলে, নানা অবান্তর চিন্তা মনকে ভরিয়ে তোলবার জন্য কেমন উগ্র হয়ে ওঠে। সময় আর কাটতে চায় না। সময়ের গতি হয়ে গেছে অসম্ভব শ্লথ।

শেষে রাজবল্লভ নীরবতা ভঙ্গ করলেন।

এক রকম মরিয়া হয়েই বললেন, ঈশ্বর কি আমাদের দিকে মুখ তুলে চাইবেন। নবাবের জয়লাভ হলে আমাদের ষড়যন্ত্রের কথা তাঁর অজ্ঞাত থাকবে না। নিষ্ঠুর নবাব আর দয়া করবে না। তখন—

—আপনি উতলা হয়ে পড়বেন না রাজাসাহেব। স্বরূপচাঁদ বললেন, পাশার দান আমাদের স্বপক্ষেও পড়ে থাকতে পারে। কাটোয়ায় জয়লাভ করেছি, গিরিয়ায় জয়লাভ করেছি। আমার দৃঢ় বিশ্বাস উদয়নালাতেও আমাদের জয় হয়েছে। জগৎশেঠ বললেন, ভোর হয়ে আসছে। আমারও বিশ্বাস উদয়নালা দুর্গ এতক্ষণ ইংরেজের করায়ত্ত হয়েছে।

কাঁপা গলায় রাজবল্লভ বললেন, আপনাদের মুখে ফুল চন্দন পড়ুক।

রায়দুর্লভ এতক্ষণ কিছু বলেন নি। এবার বললেন, আমি সংবাদ পেয়েছি নবাব আজ শয্যাগ্রহণ করেন নি। মন্ত্রণাকক্ষে আছেন। তিনিও সংবাদের প্রতীক্ষা করছেন। আমাদের দূতের আসতে যখন বিলম্ব হচ্ছে তখন চলুন আমরা তাঁর কাছে গিয়ে থাকি। যুদ্ধ ক্ষেত্রের সংবাদ সংগ্রহ করতে কিঞ্চিৎ সুবিধা হবে।

জগৎশেঠ বললেন, মন্দ প্রস্তাব নয়। হয়তো এতক্ষণে সংবাদ এসে গেছে। তাঁরা কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হবার উপক্রম করতেই একজন ক্লান্ত-শ্রান্ত ব্যক্তি কক্ষে প্রবেশ করল। তাকে দেখে চারজন আর এক পাও অগ্রসর হলেন না। আগন্তুক তাঁদের নিযুক্ত দূত।

রাজবল্লভ দ্রুত গলায় প্রশ্ন করলেন, কি সংবাদ এনেছো রিয়াজ?

দীর্ঘপথ যথাসম্ভব দ্রুত এই বৃষ্টির মধ্যে আসার জন্য রিয়াজ অসুস্থতা বোধ করছিল। নিজেকে সামলাবার আপ্রাণ চেষ্টা করে নিস্তেজ গলায় সে বললে, কোম্পানির ফৌজ জয়লাভ করেছে রাজাসাহেব।

সকলে চাপা গলায় হর্ষধ্বনি করে উঠলেন।

রায়দুর্লভ বললেন, দুর্গ অধিকার করতে বিশেষ অসুবিধা হয় নি বোধহয়?

—অসুবিধা হয়েছিল। কৌশলে কার্যোদ্ধার করতে হয়েছে।

স্বরূপচাঁদ বললেন, উপযুক্ত ব্যক্তিদেরই গুপ্তচর নিযুক্ত করা হয়েছিল। তারা যথাসময় দুর্গের তোরণদ্বার খুলে দিতে পেরেছিল এও কম কথা নয়।

—গুপ্তচররা কোন সাহায্য করে নি। নবাব বাহিনীর একজন ইংরেজ সৈন্য গুপ্তপথের সন্ধান দিয়েছিল কোম্পানির ফৌজ......

আর কথা বলতে পারল না রিয়াজ। তার ক্লান্ত, অসুস্থ দেহটি গড়িয়ে পড়ল মাটিতে। আর কিছু শোনবার প্রয়োজন ছিল না শ্রেষ্ঠীদের। যা শুনেছেন তাতেই তাঁদের মন ভরে উঠেছে। আশঙ্কা বিলীন হয়ে গেছে। কক্ষ থেকে চারজন নিষ্ক্রান্ত হবার পূর্বে জগৎশেঠ অবহেলা ভরে অর্থের একটি থলি মূর্ছিত রিয়াজের দেহের উপর নিক্ষেপ করলেন।

মীরকাশিম গম্ভীর মুখে মন্ত্রণা কক্ষে পদচারণা করছিলেন। শ্রেষ্ঠীদের দেখে ভ্রূ কুঞ্চিত করলেন। প্রশ্ন করলেন তারপর।

—আপনাদের এই সময় এখানে আসবার হেতু ?

জগৎশেঠ সবিনয়ে বললেন, আমরা অত্যন্ত অস্বস্তির মধ্যে আছি হজরত। নিদ্রাকর্ষণ হচ্ছে না।

স্বাভাবিক। নবাব বললেন, মনে নিশ্চিন্ত ভাব না থাকলে নিদ্রার আশ্রয় গ্রহণ করা নিশ্চিত কঠিন। শ্রেষ্ঠী মহতাবচাঁদ আমি জানি, উদয়নালায় আমার পরাজয়ের সংবাদ না পাওয়া পর্যন্ত আপনাদের মনে নিশ্চিন্ততা আসবে না।

রাজবল্লভ বললেন, আমাদের প্রতি অবিচার করলেন না জাহাঁপনা। ইংরেজদের ওখানে যাতে আমরা সম্পূর্ণ পর্যুদস্ত করতে পারি এই প্রার্থনাই অবিরত জানিয়ে চলেছি ঈশ্বরের কাছে।

স্বরূপচাঁদ বললেন, ঈশ্বর নিশ্চয় আমাদের অনুগ্রহ করবেন। উদয়নালায় জয় হবে নিশ্চিত। তবু সংবাদটি পাবার জন্য উতলা হয়ে রয়েছি। দূতের মুঙ্গেরে পেঁাছোতে বোধহয় বিলম্ব নেই।

—মুখে যাই বলুন মনে মনে যা চাইছেন তাই যদি ঘটে। আমি যদি পরাজিত হয়ে থাকি ওখানে। তারপর আপনারা কি করবেন ?

—আমরা ?

—হ্যাঁ, আপনারা। শ্রেষ্ঠী মহতাবচাঁদ, রাজাসাহেব কি হবে আপনাদের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা তখন ?

রায়দুর্লভ বললেন, আমাদের দৃঢ় বিশ্বাস আমরা জয়লাভ করব। আর যদি সে রকম দিন সত্যিই আসে, আমরা এখানকার মতো তখনও আপনার সেবায় নিযুক্ত থাকব। মীরকাশিম বললেন, আপনাদের অত্যধিক বিনয় আমার মনে সন্দেহের উদ্রেক করছে। জগৎশেঠ বললেন, আমরা আপনার দাসানুদাস।

—আমার কি সন্দেহ হচ্ছে জানেন ? আমার সন্দেহ হচ্ছে যুদ্ধের সংবাদ আপনারা পূর্বাহ্নেই সংগ্রহ করেছেন। এখানে এসেছেন হিংস্র উল্লাস অনুভব করবার জন্য।

—না না হজরত। আমরা·······

—থাক্‌। কৈফিয়তের অন্তরালে যাবার চেষ্টা করা মিথ্যা।

কুটিল হয়ে উঠল মীরকাশিমের মুখ।

—আপনাদের কার্যকলাপের উপর দৃষ্টি রাখবার জন্য লোক নিযুক্ত আছে। আপনাদের সততা সম্পর্কে আমি নিশ্চিন্ত হতে চাই। আরব আলী—

—খোদাবন্দ।

আরব আলী নিখুঁত ভঙ্গীতে কুর্নিশ করল।

—এঁদের গতিবিধির সংবাদ আমার অবিলম্বে চাই।

আরব আলী প্রস্থান করল।

নবাব আর কিছু বললেন না। শ্রেষ্ঠীরাও নীরব।

উত্তেজিত ভঙ্গীতে সমরু প্রবেশ করল কক্ষে।

নবাব গবাক্ষের সামনে দাঁড়িয়ে ছিলেন শূন্য দৃষ্টি মেলে। মুখ না ফিরিয়েই প্রশ্ন করলেন, কে—

ইয়োর এক্সেলেন্সি, আমি রাইন হার্ড।

ফিরে দাঁড়ালেন মীরকাশিম। তাঁর মুখের উপর আশঙ্কা ও আগ্রহ মিলেমিশে রয়েছে। সমরু অত্যন্ত ক্লান্ত, ধূলি-মলিন তার সাজপোশাক। উদয়নালা থেকে কোথাও না থেমে সে চলে এসেছে মুঙ্গেরে।

—কি সংবাদ এনেছো সমরু?

—আমরা.......

—বল—বল—?

—বিশ্বাসঘাতকের চক্রান্তে আমরা পরাজিত হয়েছি ইয়োর এক্সেলেন্সি।

—পরাজিত হয়েছি—আমরা পরাজিত হয়েছি।

শ্রেষ্ঠীরা নবাবের মুখের দিকে তাকিয়ে রইলেন।

কক্ষ প্রকম্পিত করে দীর্ঘলয়ে হাসলেন মীরকাশিম।

—গণনা কখন ভুল হতে পারে না। উদয়নালাতেও আমরা পরাজিত হলাম। আমার বিরাট বাহিনীকে মুষ্টিমেয় ইংরেজ বিধ্বস্ত করল। এ আমার ভাগ্যের দোষ। এ হল এই দেশের মাটির দোষ—মাটির দোষ।

—ইয়োর এক্সেলেন্সি—

—তুমি আপ্রাণভাবে যুদ্ধ করেছিলে সমরু একথা আমি অবিশ্বাস করছি না। নিজেরাই যখন নিজের বুকে অস্ত্রাঘাত করতে উদ্যত তখন আমার মতো সহস্র মীরকাশিমও এদেশের দুঃখ ঘোচাতে পারবে না।—ইংরেজরা এখন কোথায় তারা কি উদয়নালা দুর্গে আস্তানা নিয়েছে?

—তারা নিজেদের বিশ্রামের প্রয়োজনীয়তা বোধ করে নি ইয়োর এক্সেলেন্সি। দুর্বার গতিতে এগিয়ে আসছে মুঙ্গেরের দিকে।

—আসবেই। আমাদের দুর্বলতা তারা যে জেনে ফেলেছে। অর্থ ছড়ালেই বিশ্বাসঘাতক পাওয়া যায়। ইংরেজদের তারাই তো প্রধান সহায়।

এতবড় দুঃসংবাদ শুনে মীরকাশিমের সম্পূর্ণ ভেঙে পড়া উচিত ছিল। এখন তিনি অভ্যস্ত হয়ে গেছেন। একের পর এক দুঃসংবাদ শুনে যাওয়াই তো এখন তাঁর প্রধান কাজ। তাছাড়া যুদ্ধের ফলাফল সম্পর্কে তিনি সচেতন ছিলেন। জ্যোতিষীরা পূর্বেই জানিয়েছিলেন, মঙ্গল শুভফল না দেওয়ায় যুদ্ধ জয়লাভ করা কঠিন। তবু সংবাদটি শোনার সঙ্গে সঙ্গে মনের মধ্যে উত্তাল তরঙ্গ সৃষ্টি হয়েছে।

—রাজা রাজবল্লভ—

নবাবের আহ্বানে রাজবল্লভ বললেন, জাহাঁপনা—

—যুদ্ধের ফলাফলে আপনারা আনন্দিত?—না, না অস্বীকার করবেন না। সংবাদ আপনারা পূর্বাহ্ণেই সংগ্রহ করেছিলেন। এখানে দেখতে এসেছেন শুধু তামাশা।

জগৎশেঠ বললেন, আগেও বলেছি হজরত। এখনও বলছি আমাদের প্রতি অবিচার করবেন না। পরাজয়ের সংবাদ আমি তো বিশ্বাস করতে পারছি না। হয়তো আপনাকে বিভ্রান্ত করা হচ্ছে।

তীক্ষ্ণ দৃষ্টি দিয়ে জগৎশেঠকে লেহন করল সমরু।

—আপনার স্তোকবাক্যটি চমৎকার সন্দেহ নেই। শুনুন শ্রেষ্ঠী মহতাব চাঁদ আপনারাও সকলে শুনুন, যে সমস্ত বিশ্বাসঘাতকরা পদে পদে আমাকে বিপদে ফেলবার চেষ্টা করছে তাদের ক্ষমা করব না। তখ্‌তে বসবার দিন হয়তো আমার ফুরিয়ে গেল। নতুন কেউ আসবে তখ্‌তের অধিকারী হয়ে, তাকে আমি নিষ্কণ্টক করে যেতে চাই। অন্তত অল্প কিছুক্ষণের জন্যও। সুবে বাংলার অসংখ্য বিশ্বাসঘাতকের সঙ্গে আমার পরিচয় নেই। তবে যে কজনকে চিনি, তাদের পৃথিবী থেকে বিদায় নিতে হবে।

আরব আলী কক্ষে প্রবেশ করল। সে অত্যন্ত উত্তেজিত।

—রিয়াজ খাঁকে আমরা বন্দী করেছি খোদাবন্দ।

শ্রেষ্ঠীদের শিরায় শিরায় রক্ত দ্রুত হল।

—রিয়াজ খাঁকে ?

—সৈয়দবান্দার অধীনস্থ একজন সেনা। তাকে স্বরূপচাঁদজীর গৃহ থেকে পাওয়া গেছে। সে এঁদের গুপ্তচর চক্রের একজন কর্মী। মুঙ্গের ও উদয়নালায় গুপ্তচরেরা কাজ করে চলেছে। সমস্ত স্বীকার করেছে রিয়াজ।

শ্রেষ্ঠীদের দিকে তাকিয়ে মীরকাশিম সশ্লেষে বললেন, আপনাদের বক্তব্য কি ? সকলের কণ্ঠতালু শুষ্ক হয়ে এসেছিল।

রায়দুর্লভ কোন রকমে বললেন, মিথ্যা অপবাদ হজরত। রিয়াজ নামে কাউকে আমরা চিনি না।

—সমস্ত দুনিয়া মিথ্যা অপবাদ দিয়ে বেড়ায়, আপনারা সত্যের প্রতীক।

—আমাদের বিশ্বাস করুন হজরত।

—বিশ্বাস ! বিশ্বাস শব্দটিকে কেন আর অপবিত্র করছেন।

জগৎশেঠ বললেন, রাত্রি শেষ হয়ে গেছে। দেব অর্চনার সময় হয়েছে। আমাদের এবার বিদায় দিন জাহাঁপনা।

বিদ্রূপের হাসিতে ভেঙে পড়লেন মীরকাশিম।

—দেব অর্চনা করে কি হবে শ্রেষ্ঠী মহাতাবচাঁদ। মানুষের ঘৃণা আর অবজ্ঞা কুড়িয়ে যুগ যুগ ধরে যারা ধিক্কৃত হতে থাকবে—দেব অর্চনা করেও কি তা খণ্ডানো যাবে ? যাবে না। আপনাদের বলেছি আমি অসংখ্য বিশ্বাসঘাতকের পরিচয় আমার জানা নেই। যারা পরিচিত তাদের ক্ষমা করব না। ক্ষমা করলে মৃত্যুর পর আল্লাহ্‌ সামনে মুখ তুলে কিছু বলবার অধিকার কি আমার থাকবে ?

শ্রেষ্ঠীদের চোখে জল এসে পড়ল।

সকলে প্রায় একই সঙ্গে বলে উঠলেন, আমাদের ক্ষমা করুন হজরত—

—আপনাদের ক্ষমা করার অধিকার আমার নেই। গবাক্ষের মধ্যে দিয়ে বহতা গঙ্গা দেখতে পাচ্ছেন। আপনাদের ক্ষত-বিক্ষত মৃতদেহ

ওখানে ভাসিয়ে দেওয়া হবে। গলিত শব আহার যোগাবে জলচর প্রাণীদের।

—ক্ষমা—ক্ষমা করুন হুজরত। রাজনীতি থেকে আমরা বিদায় নেব। আপনার দাসানুদাস হয়ে থাকবো বাকী জীবন।

রাজবল্লভ কান্নার বেগ সংবরণ করতে পারলেন না।

কঠিন কণ্ঠে মীরকাশিম বললেন, উদয়নালায় পরাজিত হবার পর আমার প্রভুত্ব আর রইল কোথায়? দাসরাখার অধিকার আমি হারিয়ে ফেলেছি। সিরাজ আপনাদের স্বরূপ জেনেও আপনাদের রেহাই দিয়েছিল। আপনাদের শাস্তি দিলে হয়তো মীরজাফরের পতন ঘটত না। সেই ভুলের পথ আমি অনুসরণ করতে চাই না। শাস্তি পেতে হবে—কঠিন শাস্তি। সমরু—

—ইয়োর এক্সেলেন্সি।

—নিষ্ঠুরভাবে হত্যা কর এই বিশ্বাসঘাতকদের।

মীরকাশিম দৃঢ় পদে কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হলেন।

সমরু খাপ থেকে মুক্ত করল অস্ত্র। তার ভয়াবহ মুখ আরো ভয়াবহ হয়ে উঠল। শ্রেষ্ঠীরা দ্বারের দিকে ধাবিত হলেন। কিন্তু কক্ষ থেকে নিষ্ক্রান্ত হতে পারলেন না। উন্মুক্ত অস্ত্র নিয়ে দ্বার রক্ষা করছে আরব আলী। তাঁরা উদ্‌ভ্রান্তের মতো কক্ষর এক প্রান্ত থেকে অপর প্রান্ত পর্যন্ত ছুটে বেড়াতে লাগলেন। আরব আলী আর সমরুর কাছে জীবন ভিক্ষা করতে লাগলেন প্রচুর অর্থের বিনিময়ে। বাংলার মসনদকে নিয়ে বারংবার যাঁরা হেলায় খেলা করেছেন। তাঁরা কল্পনাও করতে পারেন নি তাঁদের জীবননাট্যের পরিণতি এত শোচনীয়।

অধিক সময় অপচয় করার পক্ষপাতী সমরু নয়। মন্ত্রণাকক্ষে এক বীভৎস দৃশ্যের অবতারণা হল। অস্ত্রাঘাতে কক্ষতল আরক্ত হয়ে উঠল বিশ্বাসঘাতকদের রক্তে। যাদের জীবনের উপর বহুদিন পূর্বেই

যবনিকা পাত হওয়া উচিত ছিল, এতদিন পরে তা অত্যন্ত নিষ্ঠুর ভাবে সম্পন্ন হল।

মৃতদেহগুলি একে একে গঙ্গায় ভাসিয়ে দিল দুই সেনানায়ক।

শ্রান্ত, ক্লান্ত, বিপর্যস্ত মন নিয়ে মীরকাশিম ফিরে চলেছেন অন্দরে। এত চেষ্টা করেছিলেন কিন্তু সমস্ত ব্যর্থ হল। মুঙ্গেরে অবস্থান করার আয়ুও ফুরিয়ে এল তাঁর। জ্যোতিষীরা ভবিষ্যদ্বাণী করেছেন, উদয়নালার পতন হলে মুঙ্গের থেকে দূরে সরে যেতে হবে—নতুবা মৃত্যুকে এড়িয়ে যাওয়া সম্ভব নয়।

জ্যোতিষীদের প্রতিটি কথা অক্ষরে অক্ষরে শুনে এসেছেন মীরকাশিম। তিনি স্থির করেছিলেন একবার উপেক্ষা করে দেখবেন। উদয়নালার পতন হলে মুঙ্গের থেকে কোথাও যাবেন না। এখানেই ইংরেজদের বিরুদ্ধে রচনা করবেন দুর্ভেদ্য প্রতিরোধ। এখন আর সে মনের জোর নেই। যাকে নির্ভর করে তিনি এই পরিকল্পনা রচনা করেছিলেন, সেই গুরগিনকে তাঁরই ইচ্ছায় নিষ্ঠুরভাবে পৃথিবী থেকে বিদায় দেওয়া হয়েছে।

মনের মধ্যে হাহাকার করে উঠল মীরকাশিমের। দীর্ঘ নিঃশ্বাস ত্যাগ করে তিনি এগিয়ে চললেন। আজ তাঁর মতো অপরিণামদর্শী, দুশ্চিন্তা-গ্রস্ত মানুষ এই বিরাট হিন্দুস্থানে বোধহয় দ্বিতীয় নেই।

শয়নকক্ষে প্রবেশ করলেন নবাব। নত মস্তকেই প্রবেশ করলেন। চিন্তা জর্জরিতা ফতেমা ম্রিয়মাণ মুখে অপেক্ষা করছিলেন। তিনি উদয়নালায় নবাববাহিনীর পরাজয়ের কথা শুনেছেন। পরাজয়ের সংবাদ শুনে তিনি ভেঙে পড়েছেন। বারংবার অনুভব করছেন, এই পরাজয় স্বামীর মনকে ক্ষত-বিক্ষত করে দিয়েছে। আঘাত—কত আঘাত তাঁকে দেবেন আল্লাহ্?

ফতেমা দ্রুত পায়ে এগিয়ে গেলেন।

—সারতাজ—

ক্লান্ত কণ্ঠে মীরকাশিম বললেন, তোমাকে বলবার মতো আজ কোন কথা আমার কাছে নেই বেগম।

ফতেমার দুই আয়ত চোখ অশ্রুসজল হয়ে উঠল।

—সারতাজ—

—তোমার সামনে মাথা তুলে কথা বলার অধিকারটুকুও যেন হারিয়ে ফেলেছি। এ আমার কি হল বেগম? আমি শায়ার ছিলাম। অর্থের অভাব তো ছিল না। বাকী জীবনটা কি শায়রী করে কাটিয়ে দিতে পারতাম না? নবাব হবার বিলাসকে মন থেকে ঝেড়ে ফেলে দিলাম না কেন?

—আপনি উতলা হবেন না সারতাজ।

—নিজেকে আর প্রবোধ দিতে পারছি না বেগম।

মীরকাশিম নিজের দুই বাহুর মধ্যে ফতেমাকে গ্রহণ করলেন।

নিষ্পেশিত করে দিতে চাইলেন।

কতক্ষণ কেটে গেল এইভাবে। আবেগ প্রশমিত হবার পর নবাব বললেন, তবে এই প্রচণ্ড হাহাকারের মধ্যে একটি সান্ত্বনা আছে। হিন্দুস্থানের মানুষ আমাকে ও মীরজাফরকে এক আসনে বসাবে না। তারা অন্তত ইতিহাসে এটুকু পড়বে, বিদেশীর হাতে দেশকে আমি বিকিয়ে দিতে চাই নি। আপ্রাণ চেষ্টা করেছিলাম রক্ষা করবার।

ফতেমা বললে, কোম্পানির ফৌজ কি মুঙ্গেরের দিকে এগিয়ে আসছে?

—দ্রুত গতিতে এগিয়ে আসছে। তারা পৌঁছবার পূর্বেই আমাদের মুঙ্গের ত্যাগ করতে হবে বেগম।

—মুঙ্গের ত্যাগ করতে হবে।

—হ্যাঁ। জ্যোতিষীর গণনা। এখানে অপেক্ষা করলে আমার জীবনের

আশঙ্কা। আরব আলীর উপর দুর্গের দায়িত্ব ন্যস্ত করে আমরা বিদায় নেব।

—কোথায় যাব হজরত?

—পাটনা। ক্রমেই দূরে চলে যাচ্ছি। তখ্‌ত মুবারক ক্রমেই সরে যাচ্ছে আমার কাছ থেকে। মুর্শিদাবাদ থেকে মুঙ্গেরে এলাম। মুঙ্গের থেকে পাটনা চলেছি। ওখান থেকে আবার হয়তো কোথাও যেতে হবে। ভাগ্য আমাকে তাড়িত করে চলেছে। এ যাত্রার কোথায় শেষ হবে আমি জানি না বেগম।

রোরুদ্যমানা ফতেমা বললেন, আপনি বিশ্বাস করেন না কিন্তু আমি জানি। আমার দুর্ভাগ্য, আপনার সফলতার পথে বাধা হয়ে রয়েছে। আমাকে ত্যাগ করুন হজরত। আমার ছায়া আপনার উপর থেকে অপসারিত হলেই আপনি জয়যুক্ত হবেন।

—ভাবাবেগে আবিষ্ট হয়ে তুমি আমার মনকে আর ক্ষতবিক্ষত করে দিওনা বেগম। তোমার আগমনে আমার জীবন স্নিগ্ধ হয়েছে, সরস হয়েছে। তুমি না থাকলে এই একের পর এক আঘাত আমি সহ্য করতে পারতাম না। নিজেকে ছোট ক'র না বেগম। সময় সময় আমিও নিজেকে অত্যন্ত ছোট করে ফেলি। আবার সাহস সঞ্চয় করতে হয়। আমার শক্তির দম্ভকে উদয়ানালায় ইংরেজ ভেঙে চুরমার করে দিয়েছে। মুঙ্গের ছেড়ে চলে যাচ্ছি। তবে আবার আমি সাহস সঞ্চয় করব বেগম। পাটনায় ইংরেজকে প্রবল প্রতিরোধের সম্মুখীন হতে হবে।

—আল্লাহ্ আপনাকে জয়যুক্ত করুন।

—সময় বেশী নেই। পাটনা যাবার সমস্ত প্রস্তুতি আজই শেষ হওয়া চাই।

—আমার প্রস্তুত হবার কিছু নেই হজরত। আপনার ইসারা পাওয়া মাত্র আমি যাত্রা করতে পারি।

—বেগম—

—সারতাজ—

—এই প্রাসাদের সঙ্গে আমাদের অনেক স্মৃতি জড়িয়ে রইল। দুনিয়ায় যখন আমরা থাকব না, অন্যের চোখে এই সমস্ত স্মৃতি হয়তো প্রকট হয়ে উঠবে। আমাদের আজকের এই কলগুঞ্জন তারা কি তখন অনুভব করতে পারবে? পারবে ফতেমা।

অসংখ্য বৈষয়িক চিন্তায় ভারাক্রান্ত মীরকাশিম কেমন ভাবালু হয়ে পড়লেন। স্বামীর মুখের দিকে তাকিয়ে ফতেমা বললেন, আজকের নিরর্থক কলগুঞ্জন তারা হয়তো অনুভব করবে না। তবে তারা শুনতে পাবে আপনার সুললিত কণ্ঠের রোবাই—এই প্রাসাদের প্রতিটি কক্ষে আবহমান যা ধ্বনিত হতে থাকবে।

—আমার রোবাই। রোবাই লিখে জীবন কাটিয়ে দিলে হয়তো ভাল করতাম কিন্তু এখন ও চিন্তা করে লাভ নেই। রাজনৈতিক আবর্ত আমাকে গ্রাস করেছে। তবু সুযোগ পেলেই দুচার কথাকে ছন্দোবদ্ধ করতে পশ্চাদ্‌পদ হই না। শুনবে বেগম, এই বিশেষ মুহূর্তে আমার একটি রোবাই। এই হয়তো শেষ অবকাশ। শুনবে?

—আপনার রোবাই আমাকে সমস্ত কিছু ভুলিয়ে দেয়।

—শুনবে তুমি?

—শুনব হজরত।

মীরকাশিম স্ত্রীর সুন্দর মুখের দিকে তাকিয়ে শান্ত উদাসকণ্ঠে বলতে আরম্ভ করলেন, দুটি রোবাই শোনাচ্ছি তোমায়,—

"হাম্রমেভি কুত্রবানা
আনেসে যায়েঙ্গে হাম
আওর আগর পুর্শিস না হোগি
তো পালাটকে আয়েঙ্গে হাম।"

"মেরে তাসবিকে দানে হ্যাঁয় ইয়ে সারে
হাসীন চেহরে
নিগাহেঁ ফিরতি যাতি হ্যায়
এবাদৎ হোতি যাতি হ্যায়।"

ঠিক এই সময় মেজর অ্যাডমস সসৈন্যে দুর্বার গতিতে মুঙ্গেরের দিকে এগিয়ে আসছেন। উধুয়ানালায় জয়লাভ করে তাঁর শক্তি ও সাহস সহস্রগুণ বর্ধিত হয়েছে। মুঙ্গেরে দুর্গ হেলায় জয় করবেন এ সম্পর্কে তাঁর সন্দেহের কোন অবকাশ নেই।